প্রচেত গুপ্ত

একটু পরে রোদ উঠবে



boierpathshala.blogspot.com

একটু পরে রোদ উঠবে

boierpathshala.blogspot.com

প্রচেত গুপ্ত

একটু পরে রোদ উঠবে



boierpathshala.blogspot.com

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৮

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সৌজন্য চক্রবর্তী

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

EKTU PORE ROD UTHBE
by Pracheta Gupta
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/PatraBharati

ISBN 978-81-8374-436-2

boierpathshala.blogspot.com

পৌলোমী বসু
ব্রাত্য বসু
সুজনেষু

boierpathshala.blogspot.com

সূচিপত্র

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

লেখকের কথা

একটু পরে রোদ উঠবে

boierpathshala.blogspot.com

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

শূন্য খাম
চাঁদ পড়ে আছে
দেরি হয়ে গেছে
ছাদে কে হাঁটে
গোপন বাক্স খুলতে নেই

boierpathshala.blogspot.com

লেখকের কথা

এক শীত শীত সকালে ঘুম ভেঙে দেখলাম, আকাশ মেঘলা। চারপাশ ধূসর, ঘোলাটে। কেমন একটা থম মারা বিষণ্ণ ভাব। মন খারাপ হয়ে গেল। সেই মন খারাপ কাটাতে নিজেকে বোঝালাম, চিন্তা নেই, একটু পরে রোদ উঠবে। আবার চারপাশ ঝলমল করবে। কোন রূপক নয়, সরাসরি মেঘ কেটে রোদ ওঠবার কথাই ভেবেছিলাম। এই কাহিনিও তাই। আড়ালে অন্য জটিলতা কিছু নেই।

ভেবেছিলাম, অনেক ভাবনাচিন্তা করে লিখব। পেন চিবোব, মাথার চুল ছিঁড়ব। মোটা মোটা বই থেকে উদ্ধৃতি দেব। ধারাবাহিক উপন্যাস বলে কথা। কাহিনি, চরিত্র, সবাই আমার কাছে তটস্থ হয়ে থাকবে। একটু এদিক-ওদিক করলেই ধমক খাবে। বলা বাহুল্য লেখা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সব আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে লাগল। এক সময় দেখলাম, চরিত্র থেকে গল্প পর্যন্ত সবাই হাতের বাইরে! তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলছে, কথা বলছে, ভাবছে। শাসন করবার চেষ্টা করলাম। লাভ হল না। লেখক হিসেবে নিজেকে অসহায় লাগল। হাল ছেড়ে দিলাম। যা হয় হোক।

মজার কথা হল, একটা সময়ের পর বুঝতে পারলাম, হাতের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে কাহিনি, চরিত্র, গল্প বলবার ভঙ্গি নিয়ে লেখক হিসেবে অনেক বেশি আনন্দ পাচ্ছি। তারাও খুব খুশি। ফলে এই কাহিনির ভালো-মন্দর দায় আমার নয়। কাহিনির নিজের।

কাহিনিতে মজা আরও আছে। কাহিনির নাম 'একটু পরে রোদ উঠবে' হলে কী হবে, মূল চরিত্রের নাম বারিধারা। এই উলটো কম্মটি আমি ভেবেচিন্তে করিনি। এটিও নিজের মতো হয়ে গেছে। লেখা নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকলে যা হয় আর কী। ঝকঝকে এই তরুণীটির বুদ্ধি, আধুনিক চিন্তা, প্রতিবাদ, মূল্যবোধ, ভালোবাসা বারিধারার মতোই কাহিনির বিভিন্ন জায়গায় ঝরে ঝরে পড়েছে।

একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে এই সময়ের কথা বলতে চেয়েছি। কাহিনির বিস্তার অনেকটাই। চরিত্র, ঘটনা অজস্র। চরিত্রদের বয়স একানব্বই থেকে চব্বিশ। ঘটনা ছড়িয়েছে কলকাতা থেকে সুন্দরবনের গ্রাম পর্যন্ত। এই সময়ের প্রেম, রাজনীতি, জাদু বাস্তবতা, লোভ, হিংসা, অপরাধ, মায়া-মমতা, বিশ্বাস ভঙ্গ আর বিশ্বাস গড়া নিয়ে একটা দলিল তৈরির চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে চেষ্টা করেছি, কাহিনিকে সময়োত্তীর্ণ করতে। কতটা পারলাম জানি না।

অনেকের কাছে কৃতজ্ঞ। আজকাল পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত চাপ না দিলে লেখাটা শুরুই হত না। শৌনক লাহিড়ি উৎসাহ না দিলে লেখাটা আজকাল পত্রিকার রবিবাসরের পাতায় ছিয়াত্তর সপ্তাহ ধরে চালাতেই পারতাম না। ঋণী দেবাশিস চন্দর কাছে। প্রতি সপ্তাহে ঠেলা দিয়ে লেখা বের করে নিয়েছে। কৃতজ্ঞ প্রিয় শিল্পী দেবব্রত ঘোষের কাছে।

বই আকারে প্রকাশ করবার আগে কিছু পরিমার্জনা করলাম। জানি না, তাতে কাহিনি আরও ভালো হল কিনা।

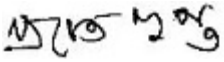
পত্রভারতী সংস্থার কর্ণধার ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় একটা বিস্ময়কর কাজ করতেন। রবিবার রাতে লেখা পড়ে আমাকে ফোন করতেন। একবারও বাদ যায়নি (উনি দেশের বাইরে না থাকলে)। তাঁর প্রতিক্রিয়া শুনে অবাক হতাম। মনে হত, কাহিনির বহু চরিত্রকেই উনি আমার থেকে অনেক বেশি ভালোবাসেন, অনেক বেশি চেনেন। তাদের প্রতি কোনও অবিচার সহ্য করবেন না। প্রয়োজনে আমার সঙ্গে হাতাহাতি পর্যন্ত

boierpathshala.blogspot.com

যাবেন। এই বইয়ের প্রচ্ছদ শিল্পী সৌজন্যকে ধন্যবাদ। ভারী চমৎকার কাজ করেছেন। ধন্যবাদ পত্রভারতী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে। তারা বহু বছর ধরে আমার জ্বালাতন সহ্য করে চলেছেন। এবারও করলেন।

দীর্ঘদিন ধরে একটা লেখা চালাতে হলে বাড়ির জোরদার সমর্থন দরকার হয়। সেই জোরদার সমর্থন আমার স্ত্রী মিত্রা, পুত্র সমুদ্র এবং আমার পিসিমার কাছ থেকে। আমার বউদি শ্রাবণী গুপ্ত অপেক্ষা করে আছেন কবে বই প্রকাশ হবে আর কবে তিনি সংগ্রহে রাখবেন। আর আমার দাদা পূষণ গুপ্তর কড়া সমালোচনা শোনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি আমি। আড়াল থেকে আমার ভাই পুষ্কর নিশ্চয়ই আমার লেখা-লিখির ওপর নজর রাখছে।

সবথেকে বেশি কৃতজ্ঞ আমি আমার পাঠকদের কাছে। ধারাবাহিক প্রকাশের সময় তারা কখনও রাগ করে, কখনও প্রংশসা করে, কখনও অনুযোগ করে, কখনও ভালোবেসে আমার লেখার সঙ্গে থেকেছেন। আমার বিশ্বাস, তারা এই বইয়ের সঙ্গেও থাকবেন।



৩১ অক্টোবর, ২০১৬
সল্টলেক

boierpathshala.blogspot.com

একটু পরে রোদ উঠবে

এক

খুব বেশি হলে পনেরো সেকেন্ড। তার থেকেও কম হতে পারে। গুনে গুনে ক'টা কথা। একবার পেটের কাছে চুলকুনি আর একটু চোঁয়া ঢেকুর। তাও পুরো ঢেকুর নয়, আধখানা ঢেকুর। সেই ঢেকুর গলার কাছ পর্যন্ত এসে থমকে গেছে। এই কর্মকাণ্ডে সব মিলিয়ে কত সময় লাগবার কথা? তারপরেই আবার নরমাল। যে কে সেই। যেমন ছিলেন তেমন।

বিমলকান্তি সেন ভুরু কোঁচকালেন। এটা কী ঘটল! আদৌ কি কিছু ঘটল? নিশ্চয় নয়। একটা ভুল মাত্র। সাধারণ ভুল নয়, হাবিজাবি ভুল। বিমলকান্তি সেনের ভুরু আরও কুঁচকে গেল। তিনি একজন সিরিয়াস মানুষ। জীবনে হাবিজাবি ভুল তিনি বরদাস্ত করেন না। পনেরো সেকেন্ডের জন্য হলেও নয়। তিনি স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলেন।

'প্রহ্লাদ, টাকা কবে লাগবে?'

প্রহ্লাদ গদগদ গলায় বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্যার।'

'কত তাড়াতাড়ি?'

প্রহ্লাদ হাত কচলে বলল, 'ওই তো স্যার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

প্রহ্লাদ 'সেন এন্ড অ্যাসোসিয়েটস' কোম্পানির একজন কর্মচারী। গোড়াতে বিমলকান্তিবাবু তার এই মাঝবয়সি কর্মচারীটির মুখ চিনতে পারলেও, নাম মনে করতে পারেননি। আজকাল এটা হচ্ছে। বয়েসের লক্ষণ। বাষট্টি বছর কম বয়স নয়। বিজ্ঞান নানা ধরনের ওষুধবিষুধ আবিষ্কার করায় মানুষের আয়ু বেড়ে গেছে। সকলেই বলে, বাষট্টি বছর এখন কিছু নয়। বাষট্টি কেন? বাহাত্তর, বিরাশিও কিছু নয়। বিমলকান্তিবাবু তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, বেশি বয়স অবশ্যই 'কিছু'। ওষুধবিষুধ হল চাবুকের মতো। হাঁপিয়ে পড়া ঘোড়াকেও ছোটায়। ঘোড়া যত জোরেই ছুটুক, আসলে সে ক্লান্ত। ছোটায় তার কোনও আনন্দ নেই। একটা সময় নিজের কোম্পানির একশো কুড়িজন কর্মীকেই নামে চিনতেন বিমলকান্তিবাবু। শুধু নামে নয়, কে কোন পোস্টে আছে তাও বলে দিতে পারতেন। এখন পারেন না। কাজে কি আনন্দ কমে যাচ্ছে? চাবুকের শাসনে ছুটতে হয় তাই ছুটছেন? কে জানে!

খানিক আগে প্রহ্লাদ যখন ঘরে ঢোকে, তখনও একই ব্যাপার হয়েছে। মুখটুকু শুধু চিনতে পেরেছিলেন। এই লোককে অফিসে দেখেছেন। কিন্তু কোথায় মনে পড়েনি। প্রহ্লাদ নিজেই নাম, ডিপার্টমেন্ট আর পোস্ট বলল।

'স্যার, এবার কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

বিমলকান্তিবাবু বিরক্ত হলেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? এই লোক কি তার পরীক্ষা নিচ্ছে? প্রশ্নের জবাব দিলেন না। কঠিন গলায় বললেন, 'যা বলবার দ্রুত বলবে। আমার হাতে সময় নেই।'

খানিকটা রাগের কারণেই লোকটার ডিপার্টমেন্ট, পোস্ট পরক্ষণেই ভুলে গেলেন বিমলকান্তি। শুধু মনে রাখলেন আহামরি কিছু নয়, ছোটখাটো কোনও একটা কাজ করে। ক্লার্ক, টাইপিস্ট ধরনের। লোকটার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একধরনের কুঁজো ভাব। বিমলকান্তি দ্রুত মনে করবার চেষ্টা করলেন, তার এই কর্মচারীটি কি সবসময়ই কুঁজো? নাকি অনুগ্রহ নিতে এসেছে বলে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে? দ্বিতীয়টাই হবে। মাঝে মাঝে

boierpathshala.blogspot.com

হাতও কচলাচ্ছে। এক বগলে ছাতা, অন্য বগলে ব্যাগ নিয়ে হাত কচলানো কঠিন কাজ। যারা ছোটখাটো কাজ করে, তাদের এই ধরনের নানা কঠিন কাজ সামলাতে হয়।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বলে কোনও দিন হয় না। কত তাড়াতাড়ি দরকার সেটা বলো।'

মালিকের কথায় উৎসাহ ডবল হয়ে যায় প্রহ্লাদের। সে বলে, 'এই সপ্তাহের মধ্যে পেলে সবথেকে ভালো হয় স্যার। ইতিমধ্যেই দশদিন দেরি করে ফেলেছি। পরের ইনস্টলমেন্ট দু'মাস পর। তিন নম্বরটা নেবে পুজোর মুখে মুখে। তার মধ্যে স্যার আমি অবশ্যই একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। দেশের জমিটা বিক্রিবাটা হয়ে যাবে। জ্ঞাতিদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছি। অনেকটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কেবল ছোটকাকা গোল পাকাচ্ছে। তাও স্যার আপন ছোটকাকা নয়। বাবার খুড়তুতো ভাই। মামলাবাজ লোক।'

বিমলকান্তিবাবু চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজ সরালেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, 'এত কথা বলছ কেন? আমি কি এসব জানতে চেয়েছি?'

প্রহ্লাদ আরও জোরে হাত কচলে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে স্যার। আর বলব না।'

বিমলকান্তিবাবু একটু চুপ করে থাকলেন। কিছু ভাবলেন। বললেন, 'এত দেরি করে টাকা জোগাড়ে নেমেছ কেন?'

বগলে ছাতা ধরা অবস্থাতেই প্রহ্লাদ ডান হাত দিয়ে পেটের পাশটা খসখস করে একপ্রস্থ চুলকে নিল। বলল, 'আগেই ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম স্যার। আমার ভায়রাভাই দেবে ঠিক ছিল। পাকা কথা হয়েছিল। দুদিন আগে টাকা আনতে গেলাম, বললে এখন হবে না। ব্যবসায় লস যাচ্ছে। অর্ডার ক্যানসেল হয়েছে। মিছে কথা। ওর অর্ডারের কাজকারবারই নেই স্যার। দুটো লরি, তিনটে ম্যাটাডর আছে। ভাড়া খাটায়। তার অর্ডার কী হবে? আমিও বলে ফেললাম। তোমার আবার অর্ডার কীসের হে? গাড়ি ভাড়া দাও। মিছে কথা বলছ কেন? ভায়রাভাই বলল, ওই একই হল। ভাড়ার বাজার ডাউন যাচ্ছে। আমার ভায়রাভাই স্যার মানুষ খারাপ নয়। শালিটাই যত গণ্ডগোলের। স্বামীকে আটকেছে। বোন হলেও আমার বউকে হিংসে করে। মেয়েতে মেয়েতে হিংসে বেশি।'

বিমলকান্তিবাবু হাত তুলে বললেন, 'আ:, আবার বেশি কথা বলছ।'

প্রহ্লাদ আরও খানিকটা কুঁজো হয়ে বাঁ-হাতে কান ছুঁয়ে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে। আর বলব না।'

কথাটা বলে একটা ঢেঁকুরের মতো তুলল প্রহ্লাদ। ঢেঁকুর না হেঁচকি? মাঝপথে কেমন থমকে গেল। সে যাক গে। বিমলকান্তিবাবু বিরক্তির সঙ্গে অবাক হচ্ছেন। অফিসে কাজ করে, অথচ এই লোক মালিকের স্বভাবচরিত্রের খবর রাখে না? তিনি অতিরিক্ত কথা পছন্দ করেন না, একজন সিরিয়াস মানুষ সে বিষয়ে কি এই লোকের কিছু জানা নেই! এই লোকের ডিপার্টমেন্টের মাথায় কে?

বিমলকান্তিবাবু বুঝতে পারলেন, তার বিরক্তি বাড়ছে। সকালবেলা বিরক্তি বাড়া ভালো কথা নয়।

সিরিয়াস মানুষ হয় দু'প্রকার। ভক্ত সিরিয়াস এবং বিরক্ত সিরিয়াস। ভক্ত সিরিয়াস মানুষরা সিরিয়াস ভাবের ভক্ত হয়। ভাবে বিভোরও বলা যায়। সিরিয়াস ধর্মে মেতে থাকে। চারপাশে কে কী করল, তা নিয়ে মোটে মাথা ঘামায় না। নিজের মতো করে কাজ করে। জটিল ক্যালকুলাস সলভ করা এবং ঘর ঝাঁট দেওয়া, দুটোতেই সমান মনোযোগ দেয়। এতে কাজ যে সবসময় ঠিক হয়, এমন নয়। অতিরিক্ত ক্যাজুয়াল ভঙ্গি যেমন খারাপ, অতিরিক্ত সিরিয়াস ভঙ্গিও গোলমাল করে। কাজের সূক্ষ্ম গুণাবলি নষ্ট হয়ে যায়। তা হোক। ভক্ত সিরিয়াসরা সে কথা মানে না। কাজ সূক্ষ্ম না মোটা এটা তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়। সিরিয়াস ভাবের প্রতি ভক্তিটাই আসল। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ধরনের সিরিয়াস মানুষে ঝামেলা বেশি। এরা বিরক্ত সিরিয়াস। নিজে সদা বিরক্ত। আবার অন্যকেও বিরক্ত করে। এদের বিশ্বাস, শুধু নিজে সিরিয়াস হলে চলবে না, চারপাশের সবাইকে সিরিয়াস হতে হবে। সিরিয়াস নয় বলেই মানবজাতির এই দুর্দশা। হাসি-ঠাট্টা, তরল কথা, লঘু আচরণ এই মানুষরা মোটে সহ্য করতে পারে না। তাদের কাছে এসব 'ছ্যাবলামি' ছাড়া কিছুই

boierpathshala.blogspot.com

নয়। মানুষের জন্ম ছ্যাবলামি করবার জন্য হয়নি। মানুষের জন্ম হয়েছে দায়িত্ব পালন করবার জন্য। জীবনে অবাস্তবতা এবং কল্পনার কোনও স্থান নেই। ও সব অলস ও ফাঁকিবাজদের বিষয়। দায়িত্ব এড়ানোর ফন্দি।

লক্ষ করবার মতো বিষয় হল, দু'ধরনের সিরিয়াস মানুষের ভঙ্গিও দু'ধরনের। ভক্ত সিরিয়াসদের ভঙ্গি গদগদ। 'আমি সব কাজ কত সিরিয়াসভাবে করছি' তার জন্য গদগদ। আর বিরক্ত সিরিয়াসরা হল গোমড়ামুখো। সবাই কেন তার ইচ্ছেমতো 'সিরিয়াস' নয়, সেই কারণে গোমড়ামুখো।

বিমলকান্তিবাবু একজন বিরক্ত সিরিয়াস মানুষ। যত বয়স বাড়ছে, তার এই ভাব বাড়ছে। তিনি গম্ভীর থাকা পছন্দ করেন। ঠান্ডা গলায় ধমক দেন। কারণে দেন, অকারণেও দেন। অকারণ ধমক বেশি কাজের বলে মনে করেন। এতে আগাম সতর্ক করবার সুযোগ থাকে। গৃহকর্তার এই উদ্ভট স্বভাবে বাড়ির সদস্যদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারা বিরক্ত। শুধু তার একানব্বই বছরের পিতা কমলকান্তি সেন এবং বাইশ বছরের ছোট মেয়ে বারিধারা তার স্বভাব এবং মেজাজকে আমল দেয় না।

কর্মক্ষেত্রেও তাই। বিমলকান্তিবাবুর এই সিরিয়াস বাই কর্মচারীদের তটস্থ করে রেখেছে। অফিসে, ওয়ার্কশপে কোনওরকম আলগা ভাব তিনি বরদাস্ত করেন না। তার মত হল, কাজ ভুল না ঠিক সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা, কাজে সিরিয়াস ভাব আছে কিনা। কেউ যদি মন দিয়ে ভুল কাজ করে, তিনি রাগ করেন না। তার বিশ্বাস জন্মায়, এই লোক নিজেকে সংশোধন করতে পারবে। কিন্তু হেলাফেলায় করা ঠিক কাজে কোনও ভরসা নেই। যে-কোনও সময় গোলমাল করবে। একমাস পরে ফাইলে গোলমাল বা তিনমাস পরে প্রোডাকশনে খুঁত ধরা পড়বে। শুধু কাজে নয়, ছুটিতেও 'সেন এন্ড অ্যাসোসিয়েটস'-এর মালিক সিরিয়াস। একবার অ্যাকাউন্টসের ঋত্বিক বিরাট বিপদে পড়েছিল। সে বারোদিনের ছুটি নিয়ে, দশদিনের মাথায় কাজে জয়েন করে। খবর পেয়ে বিমলকান্তিবাবু তাকে ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বিপদের কথা কেউ আঁচ করতে পারেনি। বরং উলটো ভেবেছিল। ভেবেছিল ঋত্বিক মালিকের পিঠ চাপড়ানি পাবে।

ঋত্বিক ঘরে ঢোকবার পর বিমলকান্তি সহজ গলায় জিগ্যেস করেছিলেন, 'বেড়াতে গিয়েছিলে?'

ঋত্বিক গদগদভাবে বলে, 'হ্যাঁ, স্যার। ফ্যামিলি নিয়ে সিমলা, মানালি গিয়েছিলাম।'

বিমলকান্তিবাবু আরও সহজভাবে বললেন, 'কেমন বেড়ালে? ওয়েদার ভালো পেয়েছ?'

গম্ভীর বসের হালকা ভঙ্গিতে ঋত্বিক উত্তেজিত বোধ করেছিল।

'ওয়েদার ভালো পেয়েছি স্যার। একদিন বরফও পেয়েছি। আমার মেয়ে তো বরফ দেখে পাগল।'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'এই সময় তো ওদিকটায় বরফ পাওয়ার কথা নয়। তোমার আইস লাক ভালো দেখছি ঋত্বিক।'

ঋত্বিক দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'আপনার আশীর্বাদ স্যার।'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'তুমি তো বারোদিন ছুটি নিয়েছিলে।'

ঋত্বিক সাহস পেল। বলল, 'দশদিনের ট্যুর ছিল স্যার। তারপরেও দুটো দিন এক্সট্রা রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, বাড়ি ফিরে রেস্ট নেব। জার্নির তো একটা ধকল থাকে। তাছাড়া চেনা-পরিচিতদের সঙ্গে বেড়ানোর গল্প করব। ফটো দেখাব। বেড়ানোর এটাও একটা পার্ট। সেই কারণে দুদিন।'

'ভালো করেছিলে, ঠিক করেছিলে। তাহলে আজ এলে কেন?'

ঋত্বিক বুঝতে পারল, পিঠ চাপড়ানির সময় এসেছে। বলল, 'স্যার, সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হল, অহেতুক বাড়িতে শুয়ে-বসে ছুটি কাটিয়ে লাভ কী? তার থেকে অফিসে দুদিন আগেই জয়েন করে ফেলি। কাজ অনেকটা জমে গেছে...।'

এরপর বিমলকান্তি সোজা হয়ে বসলেন। একটু চুপ করে, টেবিলে রাখা পেনসিল তুলে নাড়াচাড়া করতে করতে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'ভালো করেছ। কিন্তু তোমার সামনে এখন দুটো অপশন ঋত্বিক। এক, তুমি এখনই বাড়ি চলে যেতে পারো। জার্নির ধকল সারিয়ে, আত্মীয়-বন্ধুদের বেড়ানোর গল্প করে, বরফের ফটো দেখিয়ে দুদিন ছুটি কাটিয়ে তারপর ফিরে আসবে। প্রমাণ করবে, তুমি যে ছুটি নিয়েছিলে সে ব্যাপারে তুমি

boierpathshala.blogspot.com

সিরিয়াস। দুটো ছুটির দিন কোনও হেলাফেলার বিষয় নয়। আর দু'নম্বর অপশন হল, তুমি টেবিলে গিয়ে কাজ করো, কিন্তু তোমার বারোদিনের ছুটি আমি আমার বিশেষ ক্ষমতাবলে বাতিল করে দিচ্ছি। এতে তোমার পাওনা ছুটি নষ্ট হবে। মাইনে পর্যন্ত কাটা যেতে পারে।

ঋত্বিকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সে কি ঠিক শুনল? এই মানুষটা কি পাগল?

বিমলকান্তিবাবু নীচু গলায় বললেন, 'আমার কাছে কাজটা যেমন সিরিয়াস, ছুটিটাও তেমন। আশা করি, আমার কর্মচারীদের কাছেও তাই হবে। এখন যাও। যে অপশনটা তোমার পছন্দ, সেটা বেছে নাও।'

শুকনো মুখে ঋত্বিক ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

বিমলকান্তিবাবু একতলার ড্রইংরুমে বসে আছেন। হাতে খবরের কাগজ। কাগজটা তুলে মুখ ঢাকলেন। তার বিস্ময় ভাব যেন বাইরে থেকে বোঝা না যায়। এখন সকাল আটটা বেজে কুড়ি মিনিট। পুবদিকের জানলা দিয়ে ঘরে আলো আসছে। তবে আলোর জোর কম। আকাশে সম্ভবত মেঘ রয়েছে। বাড়িতে অফিস বা ওয়ার্কশপের কারও সঙ্গে দেখা করা বিমলকান্তি পছন্দ করেন না। তারপরেও করতে হয়। বাধ্য হয়ে করতে হয়। কোম্পানির ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে হয়। একসময় ঠাকুরদা করতেন। তার থিওরি ছিল, 'ব্যবসার বাইরেও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন-অপ্রয়োজন থাকতে পারে। সেসব কাজের জায়গায় না শোনাই ভালো।' বিমলকান্তি এই থিওরি মানেন না। তার বাবাও মানতেন না। কিন্তু তিনিও দেখা করেছেন। তবে দিন কমেছে। ঠাকুরদা সপ্তাহে তিন করতেন। বাবা সেটা নামিয়ে দুদিনে আনেন। বিমলকান্তিবাবু দেখা করেন মাত্র একদিন। বুধবার। সকালে একঘণ্টা। আজ বুধবার নয়, বৃহস্পতিবার। তবু প্রহ্লাদ এসেছে। ভবানী গেট থেকে এসে খবর দিল।

'বললাম, দেখা হবে না। পরের বুধবার এসো। তারপরেও যেতে চায় না। বলছে, খুব দরকার। পরের বুধবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না।'

বিমলকান্তিবাবু একবার ভাবলেন, তাড়িয়ে দিতে বলবেন। ভবানী ভালো দারোয়ান। লোক কীভাবে তাড়াতে হয় সে জানে। তারপরেও থমকে গেলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও।' সম্ভবত এটা বয়েস বাড়বার লক্ষণ। সিদ্ধান্তে অনিশ্চয়তা। ভবানী চলে যাওয়ায় বিমলকান্তি নিজের ওপরই বিরক্ত হলেন। এটা ঠিক নয়। সিদ্ধান্তে অনিশ্চয়তা মানে কাজ ভালো লাগছে না। তিনি কি ক্লান্ত?

খাটো ধুতি, কলার দেওয়া হাফহাতা শার্ট পরা প্রহ্লাদ এসে হাজির হল মিনিট দুয়েকের মধ্যে। নিজের পরিচয় দিতে বিমলকান্তিবাবু রাগী গলায় বললেন, 'যা বলবার দ্রুত বলবে। আমার হাতে সময় নেই।'

এর অল্প কিছু পরেই ঘটনাটা ঘটল। যা হয়তো আদৌ ঘটেনি। হয়তো কেন? অবশ্যই ঘটেনি। এরকম কিছু কখনও ঘটতে পারে না। একটা ভুল। মনের ভুল। বিমলকান্তি সেনের খচখচানি যাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে, ভুলটা ভয়ঙ্কর! সত্যি তাই। ভয়ঙ্কর।

বিমলকান্তিবাবু মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

গণ্ডারদের মধ্যে সঙ্গীতপ্রেমের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে গানের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি। তানজানিয়ার ওকারু হুনাই গণ্ডার গবেষণাকেন্দ্রে দীর্ঘ বাইশ বছর পরীক্ষার পর পশুবিজ্ঞানীরা এই চমকপ্রদ তথ্যটি জানতে পেরেছেন। পরীক্ষা বলছে, বাদ্যযন্ত্র যদি বাঁশি জাতীয় কিছু হয়, তাহলে সবথেকে ভালো। বাঁশির সুর শুনলে গণ্ডাররা থমকে দাঁড়াচ্ছে। কান খাড়া করছে। অল্প অল্প লেজও নাড়ছে। গণ্ডারের লেজ অতি সংক্ষিপ্ত, তবু নাড়ছে। কোনও কোনও সময় তারিফ করবার ভঙ্গিতে তাদের মাথা দোলাতেও দেখা গেছে। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। মাঝপথে বাঁশি থেমে গেলে গণ্ডাররা বিরক্ত হচ্ছে। রেগে যাচ্ছে। একখানা শিং বাগিয়ে পা দিয়ে মাটি খোঁড়ে। ফোঁস ফোঁস আওয়াজে নি:শ্বাস ফেলে। তখন ফের বাজনা শুনিয়ে শান্ত করতে হয়।

তানজানিয়া সরকার বিরাট খুশি। গবেষণার পিছনে অর্থ বরাদ্দ দ্বিগুণ করে দিয়েছে। প্রজেক্টের নাম হয়েছে, 'রাইনো মিউজিক'। 'রাইনো মিউজিক' প্রজেক্টে এবার বাঁশি ছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের প্রতি গণ্ডারদের

boierpathshala.blogspot.com

অনুরাগ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে তারের বাজনা। প্রাথমিকভাবে লক্ষ করা গেছে, জগঝম্প সঙ্গীতের থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি গণ্ডারদের ঝোঁক বেশি। প্রজেক্টের মাথায় আছেন পশু বিজ্ঞানী হার্ড কিমোলাই। গণ্ডারেরর সঙ্গীতপ্রেম আবিষ্কারের কারণে তিনি নাকি যে-কোনও সময় নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে পারেন। তিনি বলেছেন, গণ্ডারের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। গণ্ডারকে নিয়ে যাবতীয় গবেষণা ধৈর্যের বিষয়। বিভিন্ন স্তরের চামড়া এবং চর্বি ভেদ করে অনুভূতিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে হয়। সময় লাগাটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, এই গবেষণার প্রতিবাদে তানজানিয়ায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, যে দেশের মানুষ না খেতে পেয়ে দুর্ভিক্ষে মারা যায়, সেই দেশে গণ্ডারের সঙ্গীতপ্রেমের পিছনে সরকারের অর্থ ব্যয় অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এ জিনিস মানা যায় না। আশার কথা, সরকার কড়া হাতে বিক্ষোভ দমন করছে।

প্রহ্লাদ আসবার আগে বিমলকান্তিবাবু গণ্ডার বিষয়ক এই খবর পড়ছিলেন। ইন্টারেস্টিং খবর। যদিও খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে ভিতরের পাতায়, কোণের দিকে। চট করে চোখে পড়ে না। বিমলকান্তিবাবু খেয়াল করে দেখেছেন, খবরের কাগজগুলো আজকাল ইন্টারেস্টিং খবর গুরুত্বহীনভাবে প্রকাশ করে। এটা সিরিয়াস ভাবের অভাব। মানুষ এতদিন দাবি করে এসেছে, প্রাণীজগতে শুধু তারাই সূক্ষ্ম বোধবুদ্ধি, অনুভূতির অধিকারী। গণ্ডারের বাঁশিপ্রেম সেই দাবি নস্যাৎ করবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়?

খবরটা দ্বিতীয়বার পড়বার জন্য বিমলকান্তিবাবু তৈরি হচ্ছিলেন। এই ধরনের খবর একবার পড়লে হয় না, দুবার পড়তে হয়।

দু'বার পড়া হল না। তখনই ভবানী গেট থেকে প্রহ্লাদকে নিয়ে এসেছে।

'স্যার, মাপ করবেন, আজ আপনি দেখা করেন না, কিন্তু আমার বিষয়টা আর্জেন্ট।'

বিমলকান্তিবাবু আবার বিরক্ত হলেন। এই লোক তো সবদিকে গোলমাল করে। এক নম্বর, বুধবারের বদলে আজ এসেছে। দু'নম্বর, তাকে চেনা গেছে কিনা তাই নিয়ে প্রায় কৈফিয়ত তলব করেছে। এখন আবার বলেছে, তার ব্যাপারটা আর্জেন্ট। যেন বাকি যারা তার সঙ্গে দেখা করে তাদের ব্যাপার এখন হলেও হয়, না হলেও হয়। এই লোককে কি জোর ধমক দেওয়া উচিত নয়? নিজেকে সামলালেন বিমলকান্তি। সকালবেলা মেজাজ গরম করে লাভ নেই। মেজাজ গরমের জন্য সারাদিন পড়ে আছে। তিনি খবরের কাগজের পাতা উলটোতে উলটোতে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'কেন আর্জেন্ট?'

'স্যার, আমার কিছু টাকা চাই।'

বিমলকান্তিবাবু চমকালেন না। ব্যক্তিগতভাবে যারা তার কাছে আসে, তারা মূলত দুটো কারণে আসে। চাকরি এবং টাকা। অফিসে-ওয়ার্কশপে ভাগ্নে, শালাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অথবা মেয়ের বিয়ে, বাবার চিকিৎসা, ছেলের লেখাপড়ার জন্য টাকা লাগবে। অফিস থেকে লোন পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এমনকী এমারজেন্সি ফান্ডও রয়েছে। সেখানে অ্যাপ্লাই করলে হঠাৎ প্রয়োজনে সাহায্য মেলে। তার পরেও লোক আসে। যাদের নিয়মকানুনের বাইরে টাকার প্রয়োজন অথবা যারা নিয়মকানুনের জালে জড়াতে চায় না তারা এসে কাঁদুনি গায়। এখন আবার নতুন ফ্যাচাং শুরু হয়েছে। সেন অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমন লোকজনও আসতে শুরু করেছে। প্রথম প্রথম ভবানীকে দিয়ে গেট থেকেই তাড়িয়ে দিতেন বিমলকান্তি।

ভবানী কড়া গলায় বলত, 'হবে না। স্যার শুধু কোম্পানির লোকেদের সঙ্গে দেখা করেন।'

'ওদের ফাঁকে একবার ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না?'

ভবানী তেড়েফুঁড়ে উঠত, 'বলছি তো হয় না। নিয়ম নেই।'

'তুমি ইচ্ছে করলেই নিয়ম ভাঙতে পারো ভাই। পৃথিবীর সব দারোয়ানই নিয়ম ভেঙে লোক ঢোকাতে পারে। তার জন্য আলাদা সিস্টেম থাকে।'

ভবানী কাজে কড়া হলেও বোকার দিকে মানুষ। তাকে বাড়ির দারোয়ান পদে বহাল করবার আগে বিমলকান্তি কথা বলে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে সে বোকা। পাহারাদার, দারোয়ানের বুদ্ধি বেশি হলে সমস্যা।

boierpathshala.blogspot.com

বোকা এবং গোঁয়াড় প্রকৃতি তাদের প্রধান যোগ্যতা হওয়া উচিত। 'অর্ডার নেই' বলে বহু 'উচিত কাজ' তারা করবে না। চোখের সামনে যদি কেউ জলে ডুবে মারাও যায়, তারা হাত বাড়াবে না। অর্ডার নেই। বিমলকান্তিবাবু এই কারণে বোকা লোক খুঁজে বের করেছেন। ভবানী নিয়ম ভেঙে লোক ঢোকানোর সিস্টেম ধরতে পারেনি। অবাক হয়ে জানতে চায়, 'সিস্টেম! কীসের সিস্টেম?'

'আহা, উত্তেজিত হচ্ছ কেন? তুমি চা খেয়েছ? নাকি সকাল থেকে টুল পেতে বসে আছ? নাও ভাই, এই দশ টাকাটা রাখো। যাও, চা-কচুরি খেয়ে এসো। ততক্ষণে চট করে তোমার স্যারের সঙ্গে কথা সেরে আসি।'

দশ টাকার লোভ দেখিয়েও ভবানীকে টপকানো যায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত বাইরের লোক আসা পুরোপুরি ঠেকাতেও পারেননি বিমলকান্তি সেন। বড়-মেজো-সেজো নানা ধরনের রেকমেন্ডেশন নিয়ে তারা হাজির হয়। গরিব দেশে রেকমেন্ডেশন হল সবথেকে ঝামেলার বিষয়। সাপের ছুঁচো গেলার মতো। না গেলা যাবে, না উগরানো যাবে। তার ওপর কোনও কোনও ছুঁচো হুমকি-ধমকিও দেয়।

'দাদা চিঠি দিয়েছে।'

'কারও নাম বলতে হবে না, স্যারকে গিয়ে শুধু বলো কবিরাজ বাই লেন থেকে এসেছি। ব্যস, তাহলেই হবে। কবিরাজ বাই লেনের কথা শুনলে আজও অনেকের প্যান্টে ইয়ে হয়ে যায়। দেখবে তোমার স্যার আমাকে রিসিভ করতে ছুটে না আসেন।'

ব্যবসা করতে হয়। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে চলে না। পছন্দ হোক না হোক। তাছাড়া শুধু ব্যবসার কারণে নয়, সামাজিকতা বলেও একটা ব্যাপার আছে। সেটাও মানতে হয়। মণিকুন্তলাও সে কথা বলেছে। স্ত্রীর সঙ্গে তার এই বিষয়ে তর্ক হয়েছে।

'সিরিয়াস মানুষরা সমাজেই বাস করে। জঙ্গলে করে না। জঙ্গলে যেমন অসুবিধে আছে, সমাজেও কিছু অসুবিধে থাকে। সেই অসুবিধে নিয়েই থাকতে হয়।'

বিমলকান্তিবাবু বলেছেন, 'এর মধ্যে সমাজ বা জঙ্গলের কী প্রশ্ন ওঠে! বুধবার সকালে তো আমার সবার সঙ্গে দেখা করবার কথা নয়। আমি শুধু আমার অফিসের কারখানার লোকদের সঙ্গে দেখা করি। অন্যদিন আসুক। অফিসে আসুক।'

'সবাই তোমার এত নিয়ম জানবে কী করে? কেউ এলে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারো না।'

বিমলকান্তিবাবু রেগে গিয়ে বলেন, 'অবশ্যই পারি। আমার অধিকার আছে।'

মণিকুন্তলাদেবী বলেন, 'সমাজে বাস করতে গেলে নিজের অধিকার, ক্ষমতা নিয়ে সবসময় থাকা যায় না।'

বিমলকান্তিবাবু থামকে যান। বলেন, 'মণিকুন্তলা, তুমি কি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ?'

'জ্ঞান নয়, যেটা উচিত সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। তুমি শুধু ''সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়টস''-এর মালিক নও, তার বাইরেও তোমার একটা পরিচয় আছে।'

বিমলকান্তিবাবু ভুরু কুঁচকে বলেন, 'তার বাইরে আবার কী পরিচয়!'

মণিকুন্তলা শান্ত গলায় বলেন, 'তুমি বিমলকান্তি সেন এটাই তোমার আসলে পরিচয়। সেখানে তোমার ক্ষমতা নয়, ব্যবহার, আচরণটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

বিমলকান্তিবাবুর রাগ বাড়ে। দাঁত কিড়মিড়িয়ে চাপা গলায় বলেন, 'আমাকে কি একটু বেশি ছেলেমানুষ ভাবছ না মণিকুন্তলা? উপদেশ, শিক্ষা নেওয়ার মতো বয়স কি আমার এখনও আছে বলে তোমার মনে হয়? নাকি মনে হয়, ব্যবহার, আচরণ সম্পর্কে এখনও আমি কিছু শিখিনি?'

মণিকুন্তলাদেবী বললেন, 'উপদেশ-টুপদেশ নয়, আমি যা মনে করি সেটাই বললাম। বাড়িতে সময়মতো এলে সবার সঙ্গে দেখা করাটাই উচিত।'

বিমলকান্তি রাগ সামলালেন। বললেন, 'তা বলছি না। সে তোমার কাজ তুমি বুঝবে আমি শুধু সামাজিকতার কথাটুকু বললাম। তোমার মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়।'

boierpathshala.blogspot.com

বিমলকান্তিবাবু জীবনে যে অল্প কয়েকজনের তর্ক অ্যালাও করেন, নিজের স্ত্রী তাদের একজন। মণিকুন্তলার বুদ্ধি ও যুক্তির ওপর তার ভরসা রয়েছে। যদিও সেই ভরসা-কথা বিবাহিত জীবনের বত্রিশ বছরে কখনও তিনি প্রকাশ করেননি। স্ত্রীর কাছেও নয়। মণিকুন্তলার কলেজ শুরুতেই বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর সংসার। সেই চাপ সামলে আর পড়া হয়নি। তার পরেও এত বোঝেন কী করে! রাগ এবং বিরক্তির প্রকাশ করেও তিনি স্ত্রীর যুক্তি শোনেন এবং কিছু ক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্ত বদলও করেন। মুখে কিছু বলেন না। মণিকুন্তলাদেবীও কিছু বলেন না। তার যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে বা মেনে নিয়ে বিমলকান্তি সেন যে সিদ্ধান্ত বদলেছেন, সেটা যেন তিনি বুঝতেও পারেননি। প্রকাশ্যে স্বামীর দাপটের সামনে চুপ করে থাকেন। তার ইচ্ছেমতো নিজে চলতে এবং সংসার চালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আড়ালে তর্ক করতে ছাড়েন না। বিমলকান্তি এবং মণিকুন্তলার ধারণা, তাদের তর্কের কথা বাড়ির কেউ জানে না। ঘটনা ঠিক নয়। সকলেই জানে। একজন মানুষের জীবনে এটাও একটা রহস্য। সে নানারকম ভুল জেনে নিশ্চিন্তে থাকে।

টাকার কথা বলে প্রহ্লাদ হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যেন টাকা চাওয়াটা কোনও আনন্দের ঘটনা। বিমলকান্তিবাবুর মনে হল, এই লোকের অন্য দোষ আছে, কিন্তু ভণিতা নেই। এটা ভালো।

'টাকা কেন লাগবে?'

প্রহ্লাদ এবার লজ্জা পেল। বলল, 'স্যার, একটা ফ্ল্যাট নিচ্ছি। নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই। অনেকদিনের স্বপ্ন। বুড়ো বয়েসে এসে মেটাতে যাচ্ছি। বারুইপুর স্টেশন থেকে ভ্যানরিকশায় চল্লিশ মিনিট যেতে হবে স্যার। এখনও মাটি। মাটি থেকে বুকিং করছি বলে সস্তা। ওদিকটায় স্যার হুড়দুড় করে শহর বাড়ছে। শুনছি কয়েক বছর পর মেট্রো রেলও যাবে। তখন তো স্যার জমির দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। আমার মতো মানুষ ঝুপড়িতেও ঘর পাবে না।'

বিমলকান্তি বিরক্ত গলায় বললেন, 'এত কথা বলছ কেন! ফ্ল্যাটের টাকার জন্য আমার কাছে এসেছ কেন? অফিসে লোনের ব্যবস্থা নেই? ব্যাঙ্কে যাও।'

প্রহ্লাদ বগলের ছাতা এবং ব্যাগ সামলেই ডান হাত দিয়ে মাথা চুলকাল।

'স্যার, পুরো টাকা চাই না। শুধু বুকিংয়ের টাকাটুকু পেলেই এখনকার মতো হয়ে যাবে। তারপর ম্যানেজ করব। গত বছর মেয়ের বিয়ের জন্য অফিসের লোন নিয়ে ফেলেছি। মাইনে কাটছে। এখন হাতে যা পাই তাতে সংসার চলা মুশকিল। আবার যদি ব্যাঙ্কে গিয়ে গাদাখানেক টাকা কাটাই, খাব কী? তাই বলছিলাম, আপনি যদি ব্যবস্থা করে দেন...একটা বছর পর খানিকটা সামলে নিয়ে শোধ দিতে শুরু করব।'

এই লোকের আবদার বিরাট! এক বছর টাকা ফেরত দেবে না বলছে! আবদারের বহরে বিমলকান্তিবাবু হালকা মজা পেলেন। বললেন, 'কত টাকা?'

প্রহ্লাদ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'লাগবে এক লাখ বিশ হাজার। আপনি স্যার এক লাখ দিলেই হবে। বিশ হাজার স্যার বউয়ের গয়না বেচে হয়ে যাবে। বুকিং মানি নিয়েই ঝামেলায় পড়েছি। পরেরগুলো জোগাড় হয়ে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

চিন্তা করবেন না! এই লোকের কথাবার্তা তো একেবারে ঠিক নেই। তার টাকা জোগাড় নিয়ে বিমলকান্তি সেন কেন খামোকা চিন্তা করতে যাবেন! না, অনেক হয়েছে। এবার ভবানীকে ডেকে গর্দভকে বের করে দেওয়াই ভালো। নইলে সত্যি সত্যি সকালেই মেজাজ গোলমাল হয়ে যাবে। লোকটার মাথায় হালকা গোলমাল আছে মনে হচ্ছে। ভারী পাগল ভালো। চিনতে সুবিধে হয়। হালকা পাগল নিয়েই সমস্যা। বিমলকান্তিবাবুর ইজি চেয়ারের পাশে ছোট টেবিলে ইন্টারকম রয়েছে। গেটে যোগাযোগ করা যায়। বিমলকান্তিবাবু হাত বাড়ালেন।

আর তখনই সব উলটে গেল। মুহূর্তের জন্য যেন চারপাশ দুলে উঠল। ভূমিকম্প হলে যেমন হয় অনেকটা সেরকম।

boierpathshala.blogspot.com

বিমলকান্তি সেনের মনে হল, তিনি বিমলকান্তি সেন নন। তিনি অন্য কেউ। আরেকটা মানুষ। যিনি সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের মালিক নন, একজন কর্মচারী মাত্র। অতি সামান্য কর্মচারী। বারুইপুরের কাছে ফ্ল্যাট কিনবেন। বহুদিনের স্বপ্ন স্যার নিজের বাড়ি হবে। জায়গা দেখেছে, কিন্তু ফ্ল্যাট বুকিং করবার টাকা জোগাড় হয়নি। ঘুরছেন টাকার চেষ্টায়। তার এক বগলে ছাতা, এক বগলে সস্তার ব্যাগ। তাতে টিফিন কৌটো। 'স্যার'-এর সামনে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পেটের কাছটা চুলকে উঠল। একটা চোঁয়া ঢেঁকুর গলার কাছ পর্যন্ত এসে থমকে গেল। ঠিক যেন প্রহ্লাদ! তিনি কি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহ্লাদ হয়ে যাচ্ছেন! ভয়ঙ্কর! একটা ঠান্ডা স্রোত বিমলকান্তির শিরদাঁড়া দিয়ে সরসর করে নেমে গেল। তার মাথায় কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। নিজের কথা নয়, অন্য মানুষের কথা।

বিমলকান্তি কি তাকে টাকা দেবে? সবাই বলেছে, দেবে না। আমার মনে হচ্ছে, দেবে। কড়া মানুষটার ভিতরে একটা নরম মানুষ আছে। সে অন্যের স্বপ্নকে সম্মান করবে। উনি নিশ্চিত বুঝতে পারছেন আমার স্বপ্নটা সিরিয়াস।

বুকের ভিতরটা ধুকপুক করে উঠল বিমলকান্তিবাবুর। কী হচ্ছে এসব! তিনি কি প্রহ্লাদ হয়ে গেলেন? তার মতো করে ভাবছেন!

হতে পারে না। ভুল হচ্ছে। ভয়ঙ্কর একটা ভুল হচ্ছে।

ভাবতে ভাবতেই নিমেষে সব ঠিক হয়ে গেল। খুব বেশি হলে পনেরো সেকেন্ড। যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমন দ্রুতই চলে গেল সব। মনের ভিতর থেকে মুছে গেল। এমনকী পেট চুলকোনো, হাফ ঢেঁকুরও ভ্যানিশ! সব নরমাল। বিমলকান্তি সেন যেমন ছিলেন তেমন হয়ে গেলেন।

এর পরে আরও দু-চারটে কথা চালালেন বিমলকান্তি। ইচ্ছে করছে না। কেমন একটা অস্বস্তি। ভিতরে খচখচ করছে। এটা কেমন ভুল? একটা মানুষ আরেকটা মানুষ হয়ে যাবে কেন! যত কম সময়ের জন্যই হোক, কেন হবে? জেগে জেগে স্বপ্ন দেখলেন না তো? দু:স্বপ্ন?

বিমলকান্তিবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'প্রহ্লাদ, তুমি অফিসে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন জমা দেবে। আমি বলে রাখব। দুদিন পরে টাকা পেয়ে যাবে। এখন যাও।'

প্রহ্লাদ চলে যাওয়ার পর, অনেকটা সময় চুপ করে বসে রইলেন বিমলকান্তিবাবু।

দুই

'কেন পারবে না? কেন?'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে বারি?'

'হ্যাঁ পাগল হয়ে গিয়েছি। তাতে তোমার সমস্যা কোথায়? তুমি তো পাগলের ডাক্তার নও যে ছুটে এসে আমার ট্রিটমেন্ট করবে। তুমি কিছুই নও। তুমি একজন বেকার।'

'আমি কিছু নই! আমি বেকার! এটা কী বলছ বারি? আমি একজন আর্টিস্ট। ফটোগ্রাফার এবং কপিরাইটার। অ্যাডভার্টাইজিং অফিসে কাজ করি। আজও বেলা তিনটের সময় অফিসে যাব। তিনটে নয়, আড়াইটে। আমি কেন বেকার হব?'

'আর্টিস্ট নয় শ্রবণ, ফ্রিলান্স আর্টিস্ট। বিজ্ঞাপন অফিসে ফ্রিলান্স আর্টিস্ট বেকারের থেকেও খারাপ। আমি যা জিগ্যেস করছি, তুমি সে কথার উত্তর দাও। কী কারণে পারবে না সেটা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলো। তুমি তো জানো আমি যুক্তি পছন্দ করি শ্রবণ।'

'কী উত্তর দেব ধারা? এটা কি উত্তর দেওয়ার মতো কথা হল?'

'কথা হল না! তাহলে কোনটা কথা হল? তোমার কথাটাই শুধু কথা হল? আমার কথাটা কথা নয়?'

'আহা, রাগ করছ কেন? বারি আমি তা বলতে চাইনি। ইনফ্যাকট আমি তো কোনও কথাই বলিনি।'

boierpathshala.blogspot.com

'তুমি কী বলতে চেয়েছ আমার জানার কোনও ইচ্ছে নেই শ্রবণ। প্রয়োজনও নেই। তুমি বলো পারবে কি পারবে না। ইয়েস অর নো।'

'ধারা প্লিজ, প্লিজ বারি...আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো। লক্ষ্মী মেয়ে। ধারা, কথাটা হল...।'

'একটা নাম বলো শ্রবণ। হয় বারি বলো, নয় ধারা বলো। একবার বারি, একবার ধারা অসহ্য লাগে। মাথা ঝিমঝিম করে। আমার পুরো নাম বলতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে? অসুবিধে কেন হবে? বারিধারা উচ্চারণে তো কোনও ঝামেলা নেই। তোমাকে অনেকবার বলেছি, ছেলেদের আদিখ্যেতা আমি পছন্দ করি না। প্রেমিকার নাম ভেঙে ভেঙে বলবার কী হয়েছে? আমি কি তোমাকে শ বা ব বলে ডাকছি? বলো ডাকছি? একটা মেয়ে হয়ে আমি আহ্লাদিপনা করছি না, তুমি কেন করছ? বেশি প্রেম দেখাচ্ছ?'

'ওহ এত চটছ কেন? আচ্ছা, বাবা ভুল হয়ে গেছে। এবার থেকে পুরো নাম ধরে ডাকব। বারিধারা, বারিধারা, বারিধারা। হয়েছে? তুমি মাথা ঠান্ডা করো।'

'আমার মাথা ঠান্ডা না হলে তোমার কী সমস্যা? তুমি তো এখন আমাদের বাড়িতে এসে আমার মাথায় বরফ দেবে না। তাহলে? আগে আমার কথার জবাব দাও। বলো কেন পারবে না? সমস্যা কোথায়?'

'উফ বারি, সরি বারিধারা তুমি একবার ভেবে বলো। এটা কি সম্ভব?'

'অবশ্যই সম্ভব।'

'বলা নেই কওয়া নেই, কীভাবে আমি...বারি, তুমি একবার ঘটনাটা চিন্তা করে দেখো ধারা...সরি বারিধারা...।'

'ঠিক আছে। বুঝেছি আমার জন্য তুমি সামান্য কাজটা পারবে না।'

'এটা সামান্য কাজ! এটা সামান্য হল?'

'সামান্য অসামান্য কিছু জানার দরকার নেই। আমার বোঝা হয়ে গেছে।'

'ধারা, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ।'

'তোমাকে ভুল বুঝলেও তোমার মুরোদ আমার বোঝা হয়ে গেছে শ্রবণ। তোমার হল বিড়ালের মুরোদ। বিড়াল যেমন ম্যাও ম্যাও করে তুমিও তেমনি একবার বারি, একবার ধারা, একবার বারি, একবার ধারা করতে পারো। এতদিন জানতাম আমি একজন মানুষ প্রেমিকের সঙ্গে প্রেম করছি। এখন দেখছি ভুল জানতাম। আমি একজন বিড়াল প্রেমিকের সঙ্গে প্রেম করি। আমি ফোন রাখছি। তুমি যদি আমাকে আর কখনও, কোনওভাবে বিরক্ত করতে চেষ্টা করো তোমার বিপদ আছে। তুমি জানো আমি কমলকান্তি সেনের নাতনি, বিমলকান্তি সেনের মেয়ে। কেবলা বড় মেয়ে নয়, সাংঘাতিক ছোট মেয়ে। আমি কাউকে মিথ্যে হুমকি দিই না।'

'বারি শোনো...ধারা, ফোন কেটো না প্লিজ....ধারা...বারি...।'

বারিধারা মোবাইল সুইচ অফ করে খাটের ওপর ধপাস করে শুয়ে পড়ল। আজ ইউনিভার্সিটি না গেলে কেমন হয়?

কী কী কাজ আছে? মনে মনে একটা তালিকা তৈরি করে ফেলল বারিধারা।

১) দুটো ক্লাস আছে। তার মধ্যে একটা মধুজা রায়ের ক্লাস।

২) লাইব্রেরি থেকে বই তোলবার ব্যাপার আছে।

৩) তিথির হয়ে একটা ছেলেকে চড় মারবার আছে।

তিনটে কাজই গোলমেলে। তবে তুলনামূলকভাবে তিন নম্বরটায় ঝামেলা কম। তিথির ওই ছেলেটার কী যেন নাম? মনে পড়ছে না। থাক মনে পড়তে হবে না। চড় মারবার সঙ্গে নামের কোনও সম্পর্ক নেই। এমন নয় যে কারও নাম রামের বদলে শ্যাম হলে চড়ের কোনও হেরফের হয়। সুতরাং নাম জেনে লাভ কী? তিথির কাছ থেকে চড় মারবার এই দায়িত্ব সে নিয়েছে পরশু দিন। একরকম জোর করেই নিয়েছে। তিথি যখন কাঁদো কাঁদো মুখে ঘটনাটা বলে, বারিধারা অবাক হয়।

boierpathshala.blogspot.com

'তুই ঠাসিয়ে একটা চড় মারলি না কেন?'

ত্রিধি আরও কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আমি ওসব পারি না।'

বারিধারা চোখ পাকিয়ে বলল, 'তাহলে কী পারিস ফিচফিচ করে কাঁদতে?'

তিথি বলল, 'সেটা আমার মতো মেয়ের জন্য সহজ। দরকার হলে কাঁদব, কিন্তু ওসব পারব না। আমি তো আর তোদের মতো স্মার্ট নই। কলকাতায় থাকি না। মফসসল থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় পড়তে আসি।'

বারিধারা তিথির চিবুকে হাত দিয়ে ভেংচি কেটে বলল, 'কোথায় পড়তে আসি? স্কুলে? ওসব ন্যাকা কথা একদম বলবি না।'

তিথি বারিধারার হাত ধরে বলল, 'আমি কোনও রকম সিন ক্রিয়েট করতে পারি না। পারি না বলেই চুপ করে চলে এসেছি।'

বারিধারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'এর মধ্যে সিনের কী আছে। ঠাসিয়ে একটা চড় মারবি, ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ চা খাবি, তারপর ক্লাসে চলে যাবি। ফিনিশ।'

তিথি মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি জানি, সেটাই উচিত ছিল। কাল সারা রাত ঘুমোতে পারিনি।'

বারিধারা একটু ভাবল। তারপর তিথির পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'ঠিক আছে তোকে ভাবতে হবে না। তোদের মতো আতুপুতুদের দ্বারা চড়টড় হবে না। চোখের জলই হবে। তুই আমাকে সুপারি দে।'

তিথি অবাক হয়ে বলল, 'সুপারি দেব মানে! সুপারি আবার কী?'

বারিধারা চোখ কপালে তুলে বলল, 'সে কী রে! সুপারি কী জানিস না? ইউনিভার্সিটিতে পড়িস সুপারি জানিস না! হিন্দি মুভিতে তো সুপারির ছড়াছড়ি। যাক, আমাকে ভাড়া কর। যেমন সুপারি কিলার হয়, আমি তেমন হব সুপারি চড়ার। তোর থেকে সুপারি নিয়ে ওই ছেলেকে চড় মেরে আসব।'

তিথি চমকে উঠে বলল, 'থাক, দরকার নেই। একটা হুজ্জুতি হবে।'

'অবশ্যই দরকার আছে। তোর ওই ছেলেকে চড় না মারলে, ও এরকম ঘটনা আরও ঘটাবে। এরা চড় খেলে চুপ করে যায়। হুজ্জুতির ভয় পাস না।'

তিথি নার্ভাস গলায় বলল, 'বারিধারা, ইউনিভার্সিটিতে জানাজানি হয়ে যাবে।'

বারিধারা চোখ কটমট করে বলল, 'বোকার মতো কথা বলিস না। জানাজানি হলে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে আড়ালে ডেকে মারব। আজ তো আর হল না, কালও হবে না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব। শ্রবণের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। পরশু মারব। তুই মাথা ঘামাস না।'

সেই 'পরশু'ই হল আজ। চড় মারবার দিন। দিনটা কি পিছোনো যায়? তালিকার দু নম্বরেও সমস্যা আছে। বইয়ের ব্যাপারটাও ঝামেলায় ফেলবে। না তোলা হলে অন্য কাউকে ইস্যু করে ফেলবে। তার মধ্যে একটা লেখাপড়ার বই, অন্যটা গল্প-উপন্যাসের। লেখাপড়ার বইটা হল দার্শনিক নিৎসজের 'দাস স্পেক জারাথ্রুসত্রা' আর উপন্যাস হল জাপানি লেখক হারুকি মুরাকামির 'নরউইগিয়ান উডস'। মুরাকামির এই উপন্যাসের বিরাট চাহিদা। লাইব্রেরিতে পড়তে পারছে না। বইটা যখন আনবার জন্য বলা হল, লাইব্রেরিয়ান 'অসিতদা' অবাক হয়েছিল।

'এটা কী!'

'বই।'

'বই তো বুঝেছি। লাইব্রেরিতে আনতে বলছ যখন, তখন তো আর মোবাইল ফোন বা হোমিওপ্যাথি ওষুধ হবে না, বই-ই হবে। কীসের বই সেটা, জানতে পারি? ফিলসফি? হিস্ট্রি?'

'না, গল্পের বই। নভেল।'

'অসিতদা' বলল, 'এই বইয়ের লেখক কে?'

boierpathshala.blogspot.com

'কী বলছ অসিতদা। মুরাকামি কে! পৃথিবীর জীবিত পপুলার লেখকদের মধ্যে অন্যতম। এখন নাম্বার ওয়ানও বলা যায়। অ্যালিস মনরো, মারিও ভার্গাস লোসা, মোদিয়ানা, মো-ইয়াং-রাও-এর মতো লেখকরাও মুরাকামির জনপ্রিয়তার ধারেকাছে আসে না। 'নরউইগিয়ান উডস' বইটা জাপানে সবার বাড়িতে আছে। এই বইয়ের নামটা বিটলসের বিখ্যাত গানের লাইন। বাংলায় অনেক লেখক যেমন রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন দিয়ে গল্প উপন্যাসের নামকরণ করে, সেরকম। বিটলস কী জানো তো? গানের দল।'

সেই বই লাইব্রেরিতে ঢোকবার পর কাড়াকাড়ি চলছে। বইটার এমন কিছু দাম নয়। ইচ্ছে করলে কিনে নেওয়া যায়। ডাউনলোড করে ই-বুক হিসেবেও পড়া যায়। কিন্তু লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে বলে সবার ওদিকেই নজর। তার ওপর বইটা কদিনের জন্য দখলে রাখাও একটা তৃপ্তি। বেশ ব্যাগে ব্যাগে ঘুরবে। ভালো বই ব্যাগে থাকলে মন ভালো থাকে।

আজ লাইব্রেরিতে নিৎসজে, মুরাকামি দুজনেরই থাকবার কথা। না গেলে মিস। আচ্ছা, তাও না হয় হল। ক'দিন পরে আবার বই আসবে। কিন্তু মধুজা রায়ের ক্লাস?

মধুজা ম্যাডাম দুদিন ইউনিভার্সিটিতে আসেন। বাকি দিনগুলো তিনি খুবই ব্যস্ত থাকেন। সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিলেবাস কমিটির মিটিং, সিলেকশন কমিটির ইন্টারভিউ, গবেষণা কমিটির স্ক্রুটিনি, ট্রান্সফার কমিটির ঝাড়াইবাছাই—সবে থাকতে হয়। ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে আসবেন কখন? সময় কই? এর সঙ্গে আবার নিয়মিত শিক্ষাবিদদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে প্রণাম করা এবং আশীর্বাদ নেওয়ার ব্যাপার আছে। সবার বাড়িতে নয়, 'ফোন ধরা শিক্ষাবিদ'দের বাড়ি। 'ফোন ধরা শিক্ষাবিদ' মানে যাদের ফোন নেতা, মন্ত্রী, আমলা, উপাচার্যরা ধরে। চারটে অনুরোধ করলে তারা দুটো শোনে। তিনটে কমিটির কথা বললে একটায় নাম ঢুকিয়ে দেয়। কমিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। নামের পাশে যত কমিটি, তত ব্যস্ততা, তত দাপট। মধুজা ম্যাডাম এত দাপট এবং ব্যস্ততার মধ্যে যে দুদিন সময় করে ইউনিভার্সিটিতে আসেন, তাই অনেক। দু দিনের মধ্যে একদিন টিচার্স রুমে বসে বিশ্রাম নেন। নিতেই হবে। এত কমিটিতে থাকলে বিশ্রাম লাগে। ক্লাস করবার সময় পান মোটে একদিন। এই ক্লাস মিস করলে মুশকিল। তবু আজ যেতে ইচ্ছে করছে না।

মণিকুন্তলা ঘরে ঢুকলেন।

মণিকুন্তলা তিনতলায় এলেও ছোট মেয়ের ঘরে ঢুকতে চান না। তার কারণ, এই মেয়ের কাছে বেশিক্ষণ থাকলেই তার প্রেসার বেড়ে যায়। তার পরেও কেন জানি বার বার আসেন।

তার মানে এই নয়, তিনি মেয়েকে ভালোবাসেন না। খুবই ভালোবাসেন। তার পরেও এই অবস্থা। আসলে বারিধারার সঙ্গে একটুক্ষণ কথা বলবার পরই কোনও না-কোনও ইস্যুতে তার ঝগড়া লেগে যায়। মেয়ের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা তিনি সহ্য করতে পারেন না। তার ওপর নানা ধরনের দুষ্টুবুদ্ধি। লেখাপড়ায় বাড়াবাড়ি ধরনের ভালো হলেও এই মেয়ে তার বড় মেয়ের মতো শান্তশিষ্ট নয়, ভদ্র-সভ্যও নয়। এই মেয়ের সবথেকে খারাপ অভ্যেস হল, যা মনে হয় তাই মুখ ফুটে বলে ফেলবে। যা পছন্দ সেটাও বলবে, আবার যা পছন্দ নয় সেটাও বলবে। সভ্য সমাজে এ জিনিস চলে? চলে না। সভ্য সমাজের নিয়মই হল, অপছন্দের কথা সব সময় বলতে নেই। ধারা এই সামান্য সহবতটুকু জানে না। জানে না বললে ভুল হবে, মানে না। জীবনে এই মেয়ে তো পদে পদে হোঁচট খাবে। শ্বশুরবাড়িতে গেলে দু দিন পরেই ঘাড় ধাক্কা। কাজের জায়গাতেও টিকতে পারবে না। অনেক বোঝানো হয়েছে, বকাঝকা হয়েছে। স্থায়ী লাভ হয়নি। ক'দিন সাবধানে থাকে, তারপর আবার যে-কে সেই। উলটে অভিনয় করে আরও গা জ্বালিয়ে দেয়।

'কী মুশকিল, যা মনে এসেছে তা বলব না! মা তুমি এটা আমাকে কী শিক্ষা দিচ্ছ?'

মণিকুন্তলাদেবী রাগী গলায় বলেন, 'একটি চড় লাগাব। উনি যেন কত শিক্ষা নিচ্ছেন। ছি ছি, দিদির শাশুড়িকে কেউ ওভাবে বলে? মহিলা নাহয় একটু বেশিই সাজগোজ করে, তা বলে...ছি ছি।'

বারিধারা আকাশ থেকে পড়ল। বলল 'কী বলেছি! আমি তো গাড়িতে ওঠবার সময় ওকে ভক্তিভরে প্রণাম করতে গেলাম। উনি বললেন, থাক থাক প্রণাম করতে হবে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব গোল্লায়

boierpathshala.blogspot.com

গেছে। বড়দের মোটে ভক্তিশ্রদ্ধা করে না। এখন প্রণাম করছ, আমি চলে গেলেই বলবে, বুড়িটার জন্য কোমরে হ্যাঁচকা টান লেগে গেল। আমি তখন বললাম, ছি ছি মাসিমা, আপনাকে বুড়ি বলব কেন! আপনি মোটেই বুড়ি নন। আপনাকে দেখতে বুড়ি বুড়ি লাগে। তা বলে কি আপনি সত্যিই বুড়ি? অনেক সময় বাড়াবাড়ি ধরনের সাজগোজ করলে বয়স বেশি লাগে। আপনি কি বাড়াবাড়ি ধরনের সাজগোজ করেছেন? এই কথা শুনে ওর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমি খারাপটা কী বলেছি মা? কেন তুমি আমাকে মিছিমিছি বকছ? আচ্ছা ঠিক আছে, ফোন করে ওনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। মাসিমা আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ঠিকই বলেছেন, এখনকার ছেলেমেয়েরা সব গোল্লায় গেছে। আমিও গোল্লায় গেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।'

মা হয়ে এই মেয়েকে বেশিক্ষণ সহ্য করা যায়? করা উচিত?

মণিকুন্তলা ঘরে ঢুকে বললেন, 'কীরে ফোন বন্ধ করে রেখেছিস কেন? দিদি পাচ্ছে না।'

বারিধারা উঠে বসল। দুটো হাত বাড়িয়ে বলল, 'মা চট করে একটু কাছে এসে তো।'

মণিকুন্তলা থমকে গেলেন। কাছে ডাকছে! নিশ্চয় কোনও দুষ্টু বুদ্ধি আছে। বললেন, 'কী হয়েছে?'

বারিধারা হেসে বলল, 'একটা কথা বলব।'

মণিকুন্তলাদেবী বললেন, 'বল।'

'কানে কানে বলব।'

মণিকুন্তলাদেবী সতর্ক হয়ে বললেন, 'এখান থেকে বল।'

বারিধারা বেচারা মুখ করে বলল, 'আরে, এ কথা কানে কানে ছাড়া বলা যায় না।'

মণিকুন্তলাদেবী হাসি গোপন করে বললেন, 'তাহলে বলতে হবে না।'

বারিধারা ঝট করে খাট থেকে নেমে লাফ দিয়ে গিয়ে মাকে জাপটে ধরল। চিৎকার করে বলল, 'আই লাভ ইউ মামি। আই লাভ ইউ। আমি তোমাকে চুমু খেতে চাই। উমমম...।'

মণিকুন্তলাদেবী বললেন, 'ছাড়, ছাড় বলছি। এই জন্য তোর ঘরে আসতে চাই না। খালি অসভ্যতা।'

মণিকুন্তলা খুব ভালো করেই জানেন, এই জন্যই তিনি মেয়ের ঘরে বার বার আসতে চান।

তিন

মোস্ট ইনটেলিজেন্ট।

এটা একটা গোপন গবেষণার নাম। সহজ বাংলা করলে যার মানে দাঁড়ায় সেরা বুদ্ধিমান এবং সেরা বুদ্ধিমতী। গবেষিকার নাম কুমারী বারিধারা সেন।

সব গবেষণাতেই একজন গাইড থাকে। 'মোস্ট ইনটেলিজেন্ট' গবেষণাতেও আছে। গাইডের নাম শ্রীকমলকান্তি সেন। কমলাকান্তি সেন গত চৈত্র মাসের সতেরো বা আঠেরো তারিখ একানব্বই বছরে পা দিয়েছেন। যেহেতু মানুষটার জন্মবিষয়ক কোনও কাগজপত্র নেই এবং সাক্ষী নেই, তারিখ নিয়ে খানিকটা বিভ্রান্তি রয়েছে। সম্প্রতি সেই বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। কিছুদিন আগে এক সকালে কমলকান্তি সেন তাঁর বাঁধানো দাঁতের পাটি যত্ন করে পরে নিয়ে ঘোষণা করলেন।

'আমার জন্ম চৈত্র মাসে নাও হতে পারে। মাসটা মনে হচ্ছে, ভুল করছি।'

মণিকুন্তলাদেবী কাছাকাছি ছিলেন। শ্বশুরমশাইয়ের ছাতুর সরবতে লেবুর রস মেশাচ্ছিলেন। দুটো গোটা পাতিলেবু। পাতিলেবু হল বার্ধক্য নিরোধক। কমলকান্তি সেন দিন শুরু করেন পাতিলেবু দিয়ে। তার কথায় মণিকুন্তলা আঁতকে উঠলেন।

'সে কী! এ আপনি কী বলছেন বাবা! এতদিন তো আমরা চৈত্র মাসই জানতাম।'

boierpathshala.blogspot.com

কমলকান্তি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'এটা কোনও কথা নয় বউমা। মানুষের জানা প্রতি মুহূর্তে বদলায়। এই ধরো, একটা সময় পর্যন্ত আমরা জানতাম, মঙ্গলগ্রহে পৌঁছোনো যায় না। সে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখন কি আমরা সেই জানাটাই ধরে বসে আছি? না, বসে নেই। অথবা ধরো, আমরা জানতাম, পৃথিবী অনেকটা না হলেও, খানিকটা সভ্য হয়েছে। যতটা সভ্য হয়েছে, তাতে আর যাই ঘটুক, শিশুহত্যার মতো ভয়ংকর ঘটনা ঘটবে না। ক'দিন আগে আমেরিকার স্কুলে যেভাবে ছাত্রদের গুলি করে মারা হল, তার পরেও কি আমাদের সেই জানা বদলায়নি? আজও কি আমরা বলতে পারব, মানুষ বিন্দুমাত্র সভ্য হয়েছে? না, পারব না। এখন জেনেছি, আমরা অতি অসভ্য। পৃথিবীর আদিম মানুষও এত অসভ্য, বর্বর ছিল না। তাই বলছি, কোনও জানা আঁকড়ে পড়ে থেকো না।'

মণিকুন্তলাদেবী শ্বশুরের হাতে শরবতের গ্লাস তুলে দিয়ে আমতা-আমতা করে বললেন, 'তারিখ এদিকে-ওদিক হতে পারে, তা বলে একেবারে মাসটাই বদলে যাবে বাবা! এটা কি ঠিক হবে?'

কমলকান্তি কৌতুক ভরা গলায় বললেন, 'ঠিক-বেঠিক কী আছে? ফাল্গুন কি মাস হিসেবে খারাপ?'

মণিকুন্তলাদেবীর সঙ্গে তার শ্বশুরমশাইয়ের সম্পর্ক সহজ। খুবই সহজ। বাঙালি বাড়িতে এমনটা হয় না। বিয়ের আগেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছিল। ফলে এ বাড়িতে পা দেওয়ার পর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব কমলকান্তি পুত্রবধূর হাতে তুলে দেন। বলেছিলেন, 'সংসার মানেই ঝামেলা। এ বাড়িতে মনে হয় বেশি ঝামেলা। সবচেয়ে বড় ঝামেলা আমার ছেলে। আমার ধারণা, খুব অল্পদিনের মধ্যে তুমি সুটকেস গুছিয়ে বাপেরবাড়ি ফিরে যাবে। আমি হলে তাই করতাম। তোমার বরের মতো মানুষের সঙ্গে কারও দুটো দিন থাকাও অসম্ভব। যাই হোক, যখন যাবে আমাকে বলে যাবে।'

মণিকুন্তলাদেবী এই কথায় বিরাট ঘাবড়ে যান। নতুন বউকে এ আবার কী কথা! কান্না চেপে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কমলকান্তি সেন এই কথায় জবাব না দিয়ে বললেন, 'এখনও পর্যন্ত তোমাকে বুদ্ধিমতী মনে হচ্ছে। পরে কী মনে হবে জানি না। আশা করি তুমি ঝামেলা সামলাতে ব্যর্থ হবে।'

বিয়ের এত বছর হয়ে গেল, মণিকুন্তলাদেবী সুইকেস গুছিয়ে যাননি। তিনি এখন মেঘবতী এবং বারিধারা নামে দুই কন্যার মা। একজনের ডাক নাম মেঘ, আরেকজন বৃষ্টি। মেঘবতীর বিয়ে হয়ে গেছে। বারিধারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। ফাইনাল ইয়ার। দূর সম্পর্কের এক বোনের ছেলে অর্চিন এ বাড়িতে থাকে। সে-ও কলেজে ভর্তি হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। মণিকুন্তলাদেবী আজও সঠিকভাবে জানেন না সংসারের ঝামেলা সামলাতে তিনি ব্যর্থ না সফল।

একানব্বই বছরের কমলকান্তি প্রতিদিন সন্ধে সাতটার মধ্যে ডিনার সারেন আর সকাল ছ'টার মধ্যে স্নান করেন। তিনি মনে করেন, রাতের খাবার এবং ভোরের স্নান যত আগে হবে, মানুষের জরা তত পিছিয়ে যাবে। এর মধ্যে ঠান্ডা-গরমের ব্যাপারও আছে। দিনের শেষ খাওয়া হবে গরম, দিনের প্রথম স্নান হবে ঠান্ডা। বাড়ির লোকের দুটোতেই আপত্তি। এই বয়সে গরম খাবার খাদ্যনালি এবং এবং পাকস্থলীর জন্য ঠিক নয়। সকালের স্নান করা উচিত গরম জলে। নইলে যে-কোনও সময় সর্দি-কাশি এবং শেষ পর্যন্ত নিউমোনিয়া পর্যন্ত গড়াতে পারে। একদিন গড়াবেও। কমলকান্তি সেন আপত্তি আমল দেন না। গত তিরিশ বছর ধরেই দেন না। ভোরবেলা স্নান করবার সময় বাথরুম থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়ে স্থান যদি পাই!"

boierpathshala.blogspot.com

বৃদ্ধ মানুষটি তাঁর পুত্রের ঠিক উলটো চরিত্রের। বিমলকান্তি বাষট্টি বছরেই নিজেকে বয়স্ক, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ভেবে বসে আছেন। কমলকান্তি একানব্বইতে পৌঁছে মনে করেন, আরও দশ-পনেরো বছর অনায়াসে হেসে-খেলে বাঁচা যায়। তাঁর ছোট নাতনি এই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছে।

'একটু বয়স হলেই মানুষ ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বলে, অনেক তো হল, এবার যেতে পারলেই ভালো। অথচ তুমি আরও বাঁচতে চাও। কেন?'

কমলকান্তি সেন বলেন, 'অনেক কারণ আছে।'

বারিধারা বলে, 'নিশ্চয় দার্শনিক ধরনের কোনও উত্তর দেবে। আজকাল তোমার মধ্যে ফিলজফি ভাব প্রকট হয়েছে।'

কমলকান্তি বলেন, 'পুরুষ মানুষ বালক বয়েসে থাকে খেলোয়াড়। খালি খেলব খেলব করে। তরুণ বয়সে রোম্যান্টিক। কবি হব, প্রেম করব, বিপ্লব করব। মাঝবয়সে ব্যবসায়ী। কোথা থেকে কতটুকু রোজগার করব সেই সন্ধান। সর্বক্ষণ লাভ-ক্ষতির হিসেব। শেষ বয়েসে হয়ে যায় দার্শনিক। যা দেখেছি তা নয়, যা ভাবছি তা নয়, ভিতরেও আরও কিছু আছে। অন্য কিছু। এমন কিছু, যা দেখাও যায় না, ভাবাও যায় না। এখন আমার সেই পিরিয়ড চলছে রে বৃষ্টি। দার্শনিক পিরিয়ড।

বারিধারা আঁকতে উঠল। বলল, 'এই রে আবার শুরু হল। সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দাও দাদু। এত বয়স হল, তার পরেও তুমি আরও বেঁচে থাকতে চাইছ কেন?'

কমলকান্তি সেনের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো। এই বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত ভালো। সুগার, প্রেসার, কোলেস্টেরল, আর্থরাইটিসের সমস্যা নেই বললেই চলে। আহার, নিদ্রা, বাহার তিনটিই নরমাল। বেশিরভাগ রাতেই ঝরঝরে ঘুম হয়। দিনে পেট পরিষ্কার। কমলকান্তি নিজে বলেন, 'অল ক্লিয়ার।' বেলা বাড়লে খিদে খিদে লাগে। এটাও সুলক্ষণ। আর কী চাই? বাঁধানো দাঁত, গোল চশমা আর একটা পাকানো হাতলের পুরোনো শক্ত লাঠি ছাড়া বাইরের কোনও সাহায্যই প্রায় লাগে না। এই বয়সে শরীর ঠিক থাকলেও মনে নানা অসুখ দেখা দেয়। নানা ধরনের বাতিক। বাতিক থেকে সন্দেহ। সন্দেহ থেকে বিষণ্ণতা। কমলকান্তি সেনের মাথা এ সব থেকে মুক্ত। গৃহ চিকিৎসক ডাক্তার মুখার্জি বলেছেন, 'ব্রেন সেলের অবস্থা এখনও ঠিক আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ঘটনা এক্সসেপশনাল তবে ইমপসিবল নয়।' এই বিষয়ে কমলকান্তি সেনের থিওরি আলাদা।

'সবাই মনে করে স্মরণশক্তিই মানুষের আসল ক্ষমতা। কথাটা মোটেই ঠিক নয়। স্মরণের সঙ্গে বিস্মরণও চাই। অনেক কিছু মনে যেমন রাখতে হবে, তেমন ভুলেও যেতে হবে বহু কিছু। নইলে ব্রেনে চাপ পড়ে। সুখ, দু:খ, টেনশনে সেল ক্ষইতে থাকে। আমি মনে রাখবার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাওয়ার ক্ষমটাও রপ্ত করে ফেলেছি। মস্তিষ্কে তাই ঝামেলা কম।'

ডাক্তার মুখার্জি মাথা নাড়েন। বলেন, 'হতে পারে...হতে পারে। শরীর, মনের বহু রহস্য তো আজও সলভ করা যায়নি।'

এই বয়েসে সমস্যা হওয়ার কথা কানেও। ফ্লুইড শুকিয়ে আসে। মানুষ হয় কম শোনে, নাহয় ভুল শোনে। যন্ত্র লাগাতে হয়। কমলকান্তি সেনের সেই ঝামেলাও নেই। তার শ্রবণক্ষমতা তীক্ষ্ণ। দূরের হালকা আওয়াজও শুনতে পান। বলেন, 'বেঁচে থাকাটা বড় কথা নয়। কীভাবে বেঁচে আছি সেটা বড় কথা। আনন্দে বেঁচে থাকলে চোখ, হার্ট, কান, মাথা সব আনন্দে থাকবে। মনমরা হলে সব মনমরা।'

ডাক্তার মুখার্জি এবারও বলেন, 'হতে পারে...হতে পারে।' চশমার ফাঁক দিয়ে নাতনির দিক পিটপিট করে খানিকটা তাকিয়ে কমলকান্তি সেন বললেন, 'শুনবি, কেন আমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই?'

'শুনব বলেই তো জিগ্যেস করেছি।'

কমলকান্তি একটু চুপ করে রইলেন। তারপর ছেলেমানুষের মতো লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন, 'আসলে আরও কয়েকটা রোববার কচি পাঁঠার ঝোল দিয়ে দুপুরে ভাত খেতে চাই রে বৃষ্টি। দু-এক টুকরো মাংসের

boierpathshala.blogspot.com

পিস, একটা বড় আলু, ঝোলে কাঁচালঙ্কার ঝাল। আহা! তারপর টেনে ঘণ্টা দুয়েক ঘুম। জীবনে আর কী চাই? ওপরে গেলে কি এই সিস্টেম পাব? ওখানে রোববার দুপুরে পাঁঠার মাংস দেয়? মনে হয় না। হয়তো বলবে, এখানে এসব চলে না। নীচে যা অনাচার করবার করে এসেছেন। এখন দুধ-খই সোনামুখ করে খেয়ে নিন। রোববার দুপুরে পাঁঠার মাংসের ঝোল আর ভাতঘুম আরও কয়েকটা বছর বেঁচে থাকবার জন্য কি এনাফ রিজন নয়? তুই কি বলিস বৃষ্টি?'

বারিধারা একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। ভুরু কুঁচকে বলে, 'ক'বছর চাইছ?'

কমলকান্তি একটু ভাবেন। বলেন, 'বেশি নয়, এখন তো নাইটি ওয়ান চলছে। এই ধর আরও বছর দশ-বারো।'

বারিধারা চোখ বড় করে বলল, 'তার মানে ইউ আর এক্সপেক্টিং মোর দ্যান ওয়ান হ্যান্ড্রেড?'

কমলকান্তি সেন মাথা দুলিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আমি তো আর একটু বেশি বলতে চেয়েছিলাম। ঘাবড়ে যাবি বলে বললাম না।'

বারিধারা তার দাদুর ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'দাদু তুমি কি চাইনিজ ওরিজিন? মানে তোমার পূর্বপুরুষরা কেউ চীন দেশের মানুষ ছিলেন?'

'হতে পারে। কেন বল তো?'

বারিধারা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'চীনারা অনেকদিন বাঁচে। ক'দিন আগেই নেটে দেখলাম, একজন একশো আটাশ বছর পর্যন্ত বেঁচে রেকর্ড করেছেন। গোয়াং জি প্রদেশে বাড়ি। নাম লিও মেজহিয়ান।'

কমলকান্তি সেন চোখ জ্বল জ্বল করে বললেন, 'তাহলে তুই বল বৃষ্টি, আমি কী এমন বেশি বলেছি? সত্যি কথা বলতে কী, মনে মনে আমার তেমনই ইচ্ছে। পনেরো-কুড়ির একটা টার্গেট আছে। পাছে তুই ঘাবড়ে যাস তাই বলিনি। কমিয়ে বললাম।'

বারিধারা হেসে বলল, 'খুব ভালো। এখন থেকে তোমাকে কমলকান্তি সেনের বদলে কমলকান্তি মেজহিয়ান বলে ডাকব। তুমি চপস্টিক দিয়ে খাওয়াদাওয়া শুরু করো। তবে চীনে কি রোববার দুপুরে মাংসের ঝোল খেয়ে ভাতঘুম দেওয়ার নিয়ম আছে? দাঁড়াও, নেট দেখতে হবে। আমরা হলাম নেটান। নেটে দেখে বিদ্বান।'

এই কমলকান্তি সেনই নাতনিকে 'মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট' গবেষণার আইডিয়া দিয়েছেন। নাম শুনে মনে হবে, সেরা বুদ্ধিমান এবং সেরা বুদ্ধিমতী বিষয়ক গবেষণা। ঘটনা কিন্তু মোটেই তা নয়।

'এই গবেষণা করে কী লাভ হবে দাদু?'

'নিজেকে বুঝতে পারবি।'

'কী বুঝব?'

'বুঝবি, লেখাপড়ার পরীক্ষায় যতই ফার্স্ট হোস, আসলে তুই একটা বোকা। গবেষণা যত এগোবে, তত নিজের বোকামির মাত্রা ধরতে পারবি। এটা একটা ভালো ব্যাপার নয়?'

বারিধারা উৎসাহ নিয়ে বলল, 'অবশ্যই ভালো ব্যাপার। নিজে কতটা বুদ্ধি রাখি এটা মোটামুটি বোঝা হয়ে গেছে। এবার কতটা বোকা, দেখতে হবে। থার্মোমিটারের মতো আমার এই রির্সাচ হবে বোকামিটার। আচ্ছা, রিসার্চ পেপারের নাম কী রাখব?'

কমলকান্তি আবার চুপ করে রইলেন। নীচু গলায় বললেন, 'আচ্ছা, বোকার উলটো কিছু রাখি যদি? ধর...ধর বুদ্ধি...না না...আচ্ছা ইনটেলিজেন্ট রাখলে কেমন হয়? মোস্ট ইনটেলিজেন্ট।'

বারিধারা হাততালি দিয়ে বলল, 'দারুণ হয়। গবেষণায় বোকাদের নামের তালিকা তৈরি করব, অথচ নাম হবে মোস্ট ইনটেলিজেন্ট। ইউ আর গ্রেট ডার্লিং। আমি আজই কম্পিউটরে ফাইল খুলে ফেলছি।'

কমলকান্তি সেন উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বললেন, 'খুলে ফেল। লিস্ট তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাক আজ থেকেই। বৃষ্টি দেখবি, গবেষণা কেমন বারে বারে লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে। একরকম ভাবে এগোচ্ছিস,

boierpathshala.blogspot.com

হয়ে যাবে আরেকরকম। এটাই মজা। যাকে কাল বোকা ভেবেছিলি, আজ দেখবি সে কেমন বুদ্ধিমান হয়ে গেছে। আজ যাকে বুদ্ধিমান ভেবে লিস্টে নাম তুলবি, কাল দেখবি ব্যাটা বিরাট গাধা। কালকের মার্কসিস্ট আজ হাতে পাথর পরে ঠাকুরের ছবিতে প্রণাম ঠুকছে। বিজ্ঞানী কুসংস্কারে বিশ্বাস করছে। ল্যাবরেটরিতে ঢোকবার আগে বাঁ পা বাড়াচ্ছে। কোনও বিপ্লবীকে দেখবি চরম রাইটিস্টকে বামপন্থী ভেবে জড়িয়ে ধরছে। আবার উলটোটাও পাবি। কুঁকড়ে-মুঁকড়ে থাকা কোনও বোকাকে দেখবি একদিন হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠান্ডা মাথায় বিপদ থেকে কাউকে রক্ষা করে তোকে চমকে দিয়েছে! পরীক্ষায় গোল্লা পাওয়ায় যাকে এতদিন বোকা ভেবেছিস, সে-ই দেখবি ফুটবল ম্যাচে প্যাঁচ কষে গোল দিয়ে এসেছে। দেখবি ভাবনাচিন্তা সব গোল পাকিয়ে যাবে। যাকে এক নম্বর বোকা ভেবেছিলি, সে দেখবি সাত নম্বরে চলে গেছে। জানতেও পারবি না। প্রতিদিন বুঝতে পারবি, নিজের বিচারবুদ্ধি কত ভুল! কত বোকা! কাকে বুদ্ধি বলে তাই নিয়েই ধন্দে পড়বি।'

বারিধারা মুগ্ধ গলায় বলল, 'ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল! দাদু কার নাম দিয়ে গবেষণায় কাজ শুরু করব?'

কমলকান্তি সেন হাত বাড়িয়ে নাতনির মাথার চুল এলোমেলো করতে করতে হেসে বললেন, 'নিজের নাম দিয়ে। দুনিয়ায় নিজের থেকে বড় বোকা আর কে আছে?'

'মোস্ট ইনটেলিজেন্ট' গবেষণার লিস্টে প্রথম নাম রয়েছে বারিধারা সেন। দ্বিতীয় নাম মেঘবতী চৌধুরী। এ বাড়ির বড় মেয়ে। বারিধারার থেকে ছয় বছরের বড়। বিয়ে হয়েছে তিন বছর। সে-ই এখন তার বোনকে ফোন করেছে। অনেকক্ষণ ধরে ফোন করছে। বারিধারার মোবাইল বন্ধ। বাধ্য হয়ে সে তার মাকে ফোন করেছে। মেঘবতী মাকে ফোন করতে চায়নি। মায়ের সঙ্গে তার ঝগড়া চলছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, আর কোনও দিনই সে মায়ের সঙ্গে কথা বলবে না। প্রতিজ্ঞা শুনে বারিধারা বলেছে, 'এতদিনে একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করলি। আমি তোকে সাপোর্ট করছি। মোস্ট ইনটেলিজেন্ট লিস্টে তোর নাম দু'নম্বর থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।'

মেঘবতী অবাক হয়ে বলল, 'মোস্ট ইনটেলিজেন্ট লিস্ট! সেটা কী?'

বারিধারা হেসে বলল, 'এক ধরনের তেল। মাথায় মাখলে বুদ্ধি বাড়ে।'

মণিকুন্তলাদেবী মেয়ের আদর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এখন আহ্লাদ করছে, এক্ষুনি ঝামেলা শুরু করবে। তার থেকে ভালোয় ভালোয় বিদায় নেওয়াই ভালো। বারিধারা আবার ধপাস করে বিছানায় পড়ল। নিজের মোবাইল চালু করে দিদির নম্বর টিপল।

'দিদি, বল।'

মেঘবতী চুপ করে রইল।

বারিধারা বলল, 'কী হল! কথা বলবি তো।'

মেঘবতী ফোনের মধ্যেই 'ভেউ ভেউ' করে কেঁদে উঠল।

চার

হাসি সহজ বিষয়, কিন্তু কান্না সহজ বিষয় নয়। কান্না জটিল বিষয়। মানুষ কেন হাসে? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। মানুষ হাসে মূলত তিনটি কারণে। খুশিতে, উন্মাদ হলে এবং বানিয়ে। কিন্তু মানুষ কেন কাঁদে সে প্রশ্নের উত্তর চট করে বলা যায় না। একটা কান্নার পিছনে অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। জটিল বিষয় হল, কান্নার কারণ অধিকাংশই পরস্পরবিরোধী। মানুষ যেমন দু:খে কাঁদতে পারে, আবার আনন্দেও কাঁদতে পারে। প্রেমে কাঁদে, বিরহে কাঁদে। মারধর খেলে কাঁদে, আদর পেলে কাঁদে। অনেক সময় দেখা যায় দুম করে অনেকটা টাকাপয়সা পেয়ে মানুষ কাঁদছে। হঠাৎ করে নি:সন্তান, অকৃতদার ছোটমামার সম্পত্তি বা লটারি পেলে এমনটা হয়। একে বলে 'গদগদ কান্না'। আবার ধনদৌলত চলে গেলে কাঁদে। টাকার শোক।

boierpathshala.blogspot.com

মানুষ ঈশ্বরের কাছে কাঁদে। বলে, 'ঠাকুর, আমাকে দাও, দাও, আরও দাও। যশ, অর্থ, যৌবন, আয়ু তোমার স্টকে যা আছে সব দিয়ে দাও ঠাকুর। আর ক'টা দিনই বা বাঁচব? ভোগ করব আর ক'টা দিন? সুতরাং দেরি না করে দিয়ে দাও।' একই মানুষ শয়তানের কাছে কাঁদে। কেঁদে বলে, 'আমার ওপর নজর দিও না প্লিজ। তোমার ঘোড়ার খুরের মতো দুটি পায়ে পড়ি। আর কিছুদিন এই পোড়া পৃথিবীটাকে ভোগ করে যেতে দাও।' মানুষ ধনীর কাছে ভিক্ষুক সেজে কাঁদে। ভিক্ষুকের কাছে ধনী সেজে কাঁদে। বছরের একদিন গরিবকে লোটাকম্বল বিলির সময় ধনী মানুষকে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চোখ খামচে কাঁদতে হয়। সম্ভবত শাস্ত্রে এরকমই নিয়ম। গরিব মানুষকে দানধ্যানের সময় চোখের জল ফেলতে হয়। নইলে পুণ্যি ফুলপ্রুফ হয় না। ফাঁক থেকে যায়। ফাঁক দিয়ে পাপ ঢুকে পড়ে।

এই জন্যই কান্নার কারণ সহজে ধরা মুশকিল।

বারিধারা কিন্তু তার দিদির কান্নার কারণ ধরতে পারে। এই যে মেঘবতী টেলিফোনে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, বারিধারা তার কারণ বলে দিতে পারে। নো কারণ। কাঁদবার মতো উপযুক্ত কোনও কারণ ছাড়াই তার দিদি সুন্দর কাঁদতে পারে। মেঘবতী যদিও একটা দুর্বল যুক্তি দেখায়। সেটা এত তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, হাস্যকর যে কেউ মানে না। আগে রেগেও যেত। বকাবকি করত। কখনও বলা হত নেকা, কখনও ছিঁচকাদুনে। এখন সবার অভ্যেস হয়ে গেছে। মেঘবতীর কান্না এখন ইগনোর করা হয়। ছোটবেলা থেকেই বারিধারা এই জিনিসই দেখে আসছে। তবে একটা নিশ্চিন্তির ব্যাপার হল, দিদির কান্না দ্রুত থেমে যায়। এক পশলা বৃষ্টির মতো। মাটি ভেজার আগেই শেষ। মণিকুন্তলাদেবী বড় মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

'এরকম করে না সোনা।'

মেঘবতী ছোট মাথা কাত করে বলত, 'কেন? করলে কী হবে?'

'রাখল বালকের গল্পের মতো হয়ে যাবে।'

ছোটবেলা থেকে মেঘবতীর চোখ বড়। সেই চোখ আরও বড় করে সে বলত, 'সেটা কী গল্প মা?'

মণিকুন্তলাদেবী গুছিয়ে গল্প শুরু করতেন। তাঁর আশা হত, গল্প শুনে মেয়ে নিজেকে শুধরোবে।

'এক গ্রামে একটা রাখাল বালক ছিল। মাঠে ভেড়া চড়াতে যেত আর মিথ্যে মিথ্যে চিৎকার করত...বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে...আমাদের বাঁচাও...বাঘ আমার সব ভেড়া নিয়ে গেল। চিৎকার শুনে গাঁয়ের লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে রে-রে বলে ছুটে আসত। এসে দেখত, কোনও বাঘ নেই! তারা রাখাল বালককে গালি দিতে দিতে ফিরে যেত। পরদিন রাখাল বালক আবার মিথ্যে করে চেঁচাতে লাগল...বাঘ এসেছে...বাঘ এসেছে। একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি বাঘ এল...রাখাল বালকও চিৎকার করতে লাগল...বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে...কিন্তু সবাই ভাবল মিথ্যে...কেউ আর এল না...বাঘও ভেড়ার ঘাড় মটকে দিয়ে গেল।'

মেঘবতী বলল, 'ইস! খুব খারাপ হল।'

মণিকুন্তলাদেবী মেয়ের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে বলতেন, 'হ্যাঁ সোনা, খুব খারাপ হল। তোমারও কিন্তু রাখাল বালকের মতো অবস্থা হবে মেঘ। যেদিন তুমি সত্যি সত্যি কাঁদবে, কেউ তোমার কাছে আসবে না। বলবে, মেঘবতীর কাছে গিয়ে কী হবে? ও তো কারণ ছাড়াই কাঁদে। তুমি কি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ?'

মেঘবতী ঘাড় কাত করে বলে, 'হ্যাঁ মা, বুঝতে পেরেছি।'

'তাহলে তুমি আর কখনও এমনি-এমনি কাঁদবে না তো?'

মেঘবতী চুলের ঝুঁটি নাড়িয়ে বলে, 'না মা। এমনি এমনি কাঁদব না।'

মণিকুন্তলাদেবী মেয়ের গালে চুমু খান। বলেন, 'আমার লক্ষ্মী মেয়ে। আমার হিরের টুকরো মেয়ে।' তারপর নিশ্চিন্ত মনে কাজে চলে যান। ছোট্ট মেঘবতী খেলনা ছড়িয়ে বারান্দায় রান্নাবাটি খেলতে বসে এবং একটু পরেই ডুকরে কেঁদে ওঠে। মণিকুন্তলাদেবী ছুটে আসেন।

boierpathshala.blogspot.com

'কী হল? কী হল মেঘ। কাঁদছ কেন?'

মেঘবতী মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মা, আমার ওই ভেড়াটার জন্য মন কেমন করছে?'

মণিকুন্তলা একটু আগের গল্প ভুলে গেছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'ভেড়া! কোন ভেড়া?'

মেঘবতী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'যাকে বাঘ ঘাড় মটকে নিয়ে গেল, সেই ভেড়াটার জন্য।'

মণিকুন্তলাদেবী মেয়ের গালে চড় বসালেন। মেঘবতীর একটা গুণ ছিল। সে ছোটবেলায় মারধর বা বকাঝকায় কখনও কান্নাকাটি করেনি। থম মেরে গেছে, ঠোঁট ফুলিয়েছে, কিন্তু চোখের জল ফেলেনি। মান-অভিমানেও আর পাঁচজন মেয়ের মতো 'ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ' করা তার ধাতে নেই। এই স্বভাব এখনও আছে। বড় কোনও বিপদ বা দু:সংবাদে হাত-পা ছড়িয়ে 'আগে তো খানিকটা কেঁদে নিই' গোছের অভ্যেস তার নেই। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে। এসব ব্যাপারে সে অবশ্যই শক্ত মনের। আসলে জেনুইন কারণে কান্নাকাটি মেঘবতীর পোষায় না।

দিদির কান্না শুনতে শুনতে বারিধারা পাশে রাখা প্যাকেট থেকে পোটাটো চিপস খেতে লাগল। সে রোজ প্রতিজ্ঞা করে, আজই শেষ। কাল থেকে চিপস ছোঁবে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না। বাড়িতে ঢোকবার সময় দোকান থেকে প্যাকেট নিয়ে ঢোকে। মনকে বোঝায়, কাল থেকে আর নয়। পরদিন মন বিশ্বাসঘাতকতা করে। আগের দিনের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়ে দেয়। শুধু চিপস নয়, সবরকম জ্যাঙ্ক ফুডের প্রতি বারিধারার দুর্নিবার আকর্ষণ। বন্ধুরা বারণ করে।

'এভাবে যা খুশি খাস না বারি। মোটা হয়ে যাবি। এই ছিপছিপে ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে।'

বারিধারা গম্ভীরভাবে বলে, 'আমার একটু মোটা হওয়ার দরকার ত্রিধি।'

ত্রিধি অবাক হয়ে বলে, 'মোটা হওয়ার দরকার। মানে? কী আবোলতাবোল বকছিস? তোর মতো চেহারার জন্য আমরা হেদিয়ে মরছি। ডায়েট, জিম কী না করছি? আর তুই বলছিস মোটা হবি!'

বারিধারা আরও গম্ভীর মুখে বলে, 'তোর চেনাজানা কোনও জিম আছে ত্রিধি? মাসখানেকের মধ্যে মোটা করে দেবে? আছে চেনা?'

'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল বারি? তুই মোটা হওয়ার জিম খুঁজছিস? তোর সব কিছুই উলটোপালটা।'

বারিধারা ত্রিধির কাঁধে হাত রেখে বলল, 'কিছুই উলটোপালটা নয়। তুই আগে ঘটনাটা শোন, তাহলেই সব বুঝতে পারবি। পরশু মুম্বাই থেকে একটা মেল পেয়েছি। আমিরকাকুর মেল। আমিরকাকু কে বল তো? আমির খান। আমির খানকে চিনিস তো? ওর নেক্সট সিনেমায় আমাকে হিরোইন করতে চাইছেন। ফেসবুকে আমার ফটো দেখে পাগল। বলেছেন, তোমার চোখ মুখ নাক চিবুক এভরিথিং অলরাইট। শুধু খানিকটা ওয়েট গেইন করতে হবে। আমার হিরোইন মোটা।'

ত্রিধি হেসে বলল, 'গুল থামা। আর নিতে পারছি না।'

বারিধারা ফোঁস করে নি:শ্বাস ফেলে বলল, 'জানিস তো আমির খানের সিনেমা মানেই সুপার ডুপার হিট। সেখান থেকে নতুন ট্রেন্ড সেট হবে। তখন একটার পর একটা সিনেমা তৈরি হবে মোটা হিরোইন নিয়ে। তারা ট্যুইট করে মোটা হওয়ার টিপস দেবে। যাকে বলে সৌন্দর্যের গোপন রহস্য। কেউ বলবে, আমি দুপুরে পেটপুরে ভাত ঘি খেয়ে ঘুম লাগাই। কেউ বলবে, টিফিনে দুটো আস্ত আলু সিদ্ধ না খেলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কেউ বলবে চিপস চকোলেট আইসক্রিম না থাকলে আমি পার্টিতে যাই না। সব মেয়েরা তখন মোটা হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগবে। দেখবি কী কাণ্ড হয়! একটু থেমে কাতর গলায় বারিধারা বলল, 'প্লিজ ত্রিধি, আমাকে একটা মোটা হওয়ার জিম খুঁজে দে। এক মাসের মধ্যে মোটা না হতে পারলে আমিরকাকু খুব বকাবকি করবে। চল, আগে ফুচকা খেয়ে আসি।'

এ সব ঠাট্টা-ইয়ার্কি করলেও বারিধারা জানে, হাবিজাবি খাবার অভ্যেস তাকে ছাড়তে হবে। আজ তার চেহারা ছিপছপে ঠিকই, কিন্তু সে চেহারা নষ্ট হতে কতদিন? শুধু সুন্দর হওয়ার ব্যাপার নয়, অসুখবিসুখও

boierpathshala.blogspot.com

আছে। তবে চারপাশে এত রোগা হওয়ার ধুম দেখে বিশ্রী লাগে। শুধুমাত্র রোগা হওয়ার জন্য কত আয়োজন! কত হইচই! পেট ভরে খাব না, বেলা করে ঘুমোব না। সুযোগ পেলেই লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে দাপিয়ে ঘাম ঝরাব। বাপরে! এত স্যাকরিফাইজ আর পরিশ্রম দেখে অবাক হতে হয়। বারিধারার কখনও কখনও মনে হয়, এই পরিশ্রম, স্যাকরিফাইজের দশ ভাগের এক ভাগও যদি দেশের অসুখে আর অপুষ্টিতে থাকা মেয়েদের জন্য দেওয়া হত...। পরক্ষণেই মনে হয়, এ সব ছেলেমানুষি ভাবনা।

বারিধারা এখন যে চিপস খাচ্ছে, তার সঙ্গে মোটা-রোগার কোনও সম্পর্ক নেই। সে দিদির টেলিফোনিক কান্না থামার জন্য অপেক্ষা করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কান্না থামিয়ে মেঘবতী কথা বলল।

'বৃষ্টি, শুনতে পাচ্ছিস?'

বারিধারা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। ডান হাঁটুর ওপর বাঁ পা দিয়ে নাড়াচ্ছে। নাড়াতে নাড়াতেই বলল, 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।'

মেঘবতী খানিকটা ধমকের গলাতে বলল, 'তাহলে চুপ করে আছিস কেন?'

বারিধারা মুখে চিপসের কচমচে আওয়াজ করে বলল, 'চুপ করে থাকব না তো কী করব? তোর কান্নার সঙ্গে পোঁ ধরব? কান্না কোনও নহবতখানার সঙ্গীত নয় যে, সঙ্গে সানাই বাজাতে হবে।'

মেঘবতী একটু চুপ করে রইল। বলল, 'তুই কী করছিস?'

বারিধারা নির্লিপ্তভাবে বলল, 'পোটাটো চিপস খাচ্ছি।'

'অ্যাঁ, চিপস খাচ্ছিস! আমি কাঁদছি আর তুই চিপস খাচ্ছিস।'

বারিধারা ফের কচরমচর আওয়াজ তুলে বলল, 'তাতে তোর কী সমস্যা দিদি? তোর কান্নাকাটিতে বিঘ্ন ঘটছে?'

মেঘবতী উত্তেজিত গলায় বলল, 'তা বলে আমার কান্নার সময় তুই খাওয়াদাওয়া করবি! একটা কোনও সিমপ্যাথি থাকবে না? একবার বলবি না, আহারে দিদি, তুই কাঁদছিস কেন? আমি তোদের কেউ নই? আমার জন্য তোদের কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। আমি হাসি, কাঁদি, খাবি খাই, তাতে তোদের কিছু এসে যায় না?'

উত্তেজনা কমলে বারিধারা আহ্লাদি ধরনের গলায় বলল, 'আহারে দিদি, তুই কাঁদছিস কেন?'

টেলিফোনের ওপাশে মেঘবতী খানিকটা চুপ করে রইল। গজগজ করে বলল, 'কী হবে শুনে?'

বারিধারা নির্বিকার গলায় বলল, 'কিছু হবে না। তার পরেও যদি বলতে চাস বলতে পারিস। আমার ধারণা, তুই আজ কোনও গুরত্বপূর্ণ কারণে কান্নাকাটি করছিস। মনে হচ্ছে, তুই মাছের ঝোলে আজ বেশি নুন দিয়ে ফেলেছিস। জ্যোতিষ্কদা খেতে বসে রেখে আগুন হয়ে গেছে। খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়েছে। অফিস যাবার আগে ঘোষণা করেছে, অনেক হয়েছে, আর নয়, এবার তোকে ডিভোর্স করবে। ঠিক বলেছি?'

মেঘবতী গম্ভীর গলায় বলল, 'ফাজলামি করছিস? ছ'বছরের বড় দিদির সঙ্গে ফাজলামি করছিস?'

বারিধারা হেসে বলল, 'সরি দিদি। কান ধরছি। এখন থেকে বাবার মতো সিরিয়াস হয়ে গেলাম। ড্যাম সিরিয়াস। এবার বল কী হয়েছে।'

মেঘবতী একটু চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বলল, 'তোর জামাইবাবু একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছে। আজ সকালে রাস্তা থেকে একটা ভিখিরিকে ধরে বাড়িতে নিয়ে এসেছে।'

বারিধারা ধড়ফড় করে উঠে বসল। বড় হয়ে সে বুঝতে পেরেছিল, মায়ের রাখাল বালকের গল্পটা ঠিক ছিল না। দিদির সঙ্গে যায় না। গল্পের বালক 'বাঘ এসেছে', বলে মিথ্যে কথা বলেছিল। দিদি সহজে মিথ্যে বলে না। সেই কারণেই বোকার তালিকায় তাকে দু'নম্বরে রাখা হয়েছে। যে মানুষ মিথ্যে বলে না, সে একজন উচ্চমানের বোকা ছাড়া আর কী? ছোটবেলা থেকেই মিথ্যে না-বলার বোকামি করে আসছে দিদি। এর জন্য তাকে কম হেনস্থা হতে হয়নি। স্কুলে এবং বাড়িতে অহরহ ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। নিজের দুষ্টুমিজনিত অপরাধ কখনোই সে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারত না। চুপ করে থাকত, কিন্তু মিথ্যে বলত না।

boierpathshala.blogspot.com

স্বীকারও করে ফেলত। গুরুজনেরা তখন বকাঝকা, কান মলা, ঝুঁটি নাড়ার জন্য 'রে-রে' করে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সেই দুর্যোগে বড় নাতনিকে বাঁচাতেন কমলকান্তি সেন।

'যে মিথ্যে বলছে না তাকে তোমরা বকাবকি করো কোন মুখে?'

মণিকুন্তলাদেবী রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, 'মিথ্যে বলে না বলে সব অপরাধ মাপ করে দিতে হবে। এটা আপনি কী বলছেন বাবা! অত সুন্দর ফুলদানিটা কীভাবে ভেঙে গেছে, সেটা একবার দেখবেন না? এত হুটোপাটি করলে চলে? এরা তো বাড়ির সব ভালো জিনিস নষ্ট করে ফেলবে।'

কমলকান্তি ঠান্ডা গলায় বলেন, 'সত্যি বলবার মতো ভালো জিনিস যে বাড়িতে আছে, সে বাড়ির আর দু-চারটে ভালো জিনিস ভেঙে গেলে সমস্যা নেই। বউমা, তুমি মাথা ঘামিও না। মেঘকে আমি শাসন করে দেব।'

কমলকান্তি সেন খুশি হলেও, দিদির সত্যি কথা নিয়ে বারিধারা একেবারেই খুশি ছিল না। বিরক্ত ছিল। রাগও করত। বহু জায়গায় দিদি মিথ্যে বলতে পারেনি বলে তাকেও বিপদে পড়তে হয়েছে। সেই কারণে যেসব গর্হিত কাজে ধরা পড়বার চান্স ছিল, সেগুলো সে দিদিকে বলতে পারত না।

'এই ভরদুপুরে কোথায় যাচ্ছিস?'

'পড়তে। মানির বাড়িতে গিয়ে জিওমেট্রি করব।'

'সে কী রে বৃষ্টি! এই যে কাল বললি মানিরা সাউথে বেড়াতে গেছে। বললি না?'

'বলেছিলাম বুঝি? ঠিকই বলেছি। বেড়াতে গেছে তো কী হয়েছে? ফিরে এসেছে। বেড়াতে গেলে কেউ ফেরে না?'

'এই গেল, এই ফিরে এল!'

'জিওমেট্রি করবে বলে ট্যুর ক্যানসেল করে ফিরে এসেছে। হয়েছে? এবার তোর জেরা বন্ধ করবি দিদি?'

'অ্যাই বৃষ্টি, বল না কোথায় যাচ্ছিস? প্লিজ বল, সিনেমা? কী সিনেমা?'

'খেপেছিস, তোকে বলে মরি আর কী? তুই হলি সত্যবাদিনী। মায়ের একটু চাপেই হড়হড় করে সত্য কথার ফুলঝুরি ফোটাবি। দিদি সত্যবাদিনী হলে বোনের যে কী বিপদ হয়, তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। কথা না বাড়িয়ে টাকা দে দেখি। পপকর্ন খাব।'

এই মেয়ের কথা ভুল হতে পারে, কিন্তু মিথ্যে হবে না। 'ভিখিরি' না আনলেও জ্যোতিষ্কদা যে বাড়িতে কাউকে ধরে এনেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বারিধারা বলল, 'সে কী রে, ভিখিরি এনেছে মানে! লোকটা কোথায়?'

মেঘবতী ফিসফিস করে বলল, 'একতলার গেস্টরুমে।'

বারিধারা চমকে উঠল, 'অ্যাঁ, গেস্টরুমে। বলিস কী রে দিদি! ভিখিরি গেস্টরুমে!'

মেঘবতী বলল, 'হ্যাঁ, তোর জামাইবাবু সেরকম ব্যবস্থা করে অফিস চলে গেছে। ভেবে দেখ একবার। এর পরও কাঁদব না? বল, কাঁদব না?'

বারিধারা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কী করছে লোকটা?'

মেঘবতী ধরা গলায় বলল, 'একটু আগে গুপির মাকে নীচে দেখতে পাঠিয়েছিলাম, সে ঘর পর্যন্ত যেতে পারেনি। ভিখিরিটার জামাকাপড় থেকে বোঁটকা গন্ধ বের হচ্ছে। তবে সিঁড়ির মুখ থেকে শুনে এসেছে বাঁশি বাজাচ্ছে।'

বারিধারা উত্তেজনায় খাট থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল।

'অ্যাঁ, বাঁশি বাজাচ্ছে। বলিস কী রে দিদি! সত্যি বাঁশি বাজাচ্ছে?'

মেঘতীকে জবাব দিতে হল না। টেলিফোনের ওপাশ থেকে বাঁশির আওয়াজ ভেসে এল। বারিধারা থমকে গেল। এই ঘন হয়ে আসা সকালবেলা বালিগঞ্জের বাড়িতে কে বাঁশি বাজাচ্ছে!

boierpathshala.blogspot.com

পাঁচ

অর্চিনের মুখ তেতো।

মাসখানেক যাবৎ এই সমস্যা হয়েছে। সকালে অর্চিনের ঘুম ভাঙছে মুখে তেতো স্বাদ নিয়ে। স্বাদটা চট করে চলে যায় না। একসময়ে মনে হত চা এবং সিগারেট খেলে চলে যাবে। যায়নি। দ্বিতীয় দফায় চা এবং সিগারেট খেওে যায়নি। বরং তেতো ভাবের সঙ্গে সিগারেটের কষা ভাব যুক্ত হয়েছে। মুখটাকে আরও বিচ্ছিরি করে দিয়েছে।

এ বাড়িতে সিগারেট খাওয়ার নিয়ম নেই। কেউ খায় না বলেই হয়তো নিয়ম নেই। কে-ই বা খাবে? পুরুষমানুষ বলতে বিমলকান্তি সেন, কমলকান্তি সেন। আর দারোয়ান ভবানী। এরা কেউই ধূমপায়ী নয়। মেঘবতীর স্বামী জ্যোতিষ্ক সিগারেট খায় ঠিকই, কিন্তু এ বাড়িতে এলে খায় না। তার বউ কড়া নজর রাখে। সেন অ্যাসোসিয়েটসের অফিসার, কর্মচারীরা আসে। মালিকের বাড়িতে তাদের সিগারেট খাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ফলে গোটা বাড়িটাই নো স্মোকিং জোন। অর্চিনের ঘর একতলার পিছন দিকে। একসময় বাড়ির গেস্টরুম ছিল। পিছন দিয়ে যাতায়াতের পথ আছে। অর্চিন গত তিন বছর এখানেই রয়েছে। গেস্টরুমের ব্যবস্থা খুবই ভালো। দরজা বন্ধ করে সিগারেট খেলে কেউ বুঝতে পারবে না। বুঝলেও কোনও ব্যাপার নয়। বিমলকান্তিবাবু তাঁর স্ত্রীর কাছে খানিকটা রাগারাগি করতে পারেন এই পর্যন্ত। অর্চিনকে সরাসরি উনি কিছু বলবেন না। তিন বছরে এটা বোঝা হয়ে গেছে। বিমলকান্তিবাবু এই ছেলের সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না। দুজনেই একধরনের দূরত্ব বজায় রাখে। তবে কর্তব্যের ব্যাপারে বিমলকান্তিবাবু আর-পাঁচটা বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও সিরিয়াস। আড়ালে অর্চিনের খোঁজখবর নেন, মুখোমুখি হলে নিজেই জানতে চান।

'কেমন আছ অর্চিন?'

অর্চিন মাথা নামিয়ে বলে, 'ভালো আছি।'

'পড়াশোনা কেমন চলছে?'

অর্চিন ঘাড় কাত করে বলে, 'ঠিক আছে।'

'ভেরি গুড। অন্য কোনও অসুবিধে নেই তো? খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে? রাতে ঘুম?'

অর্চিন খানিকটা লজ্জা পেয়েই বলে, 'সব ঠিক আছে।'

'অসুবিধে হলে তোমার মাসিকে বলবে।'

অর্চিন কোনও কথা না বলে ঘাড় কাত করে। মণিকুন্তলা সেন তার মাসি ঠিকই, তবে অনেকটা দূরসম্পর্কের। অর্চিনের মা মণিকুন্তলার খুড়তুতো বোন। কাজিন। তাও প্রথম পক্ষের নয়, দ্বিতীয় পক্ষের। প্রথম স্ত্রী নি:স্তান অবস্থায় মারা গেলে, মণিকুন্তলাদেবীর কাকা আবার বিয়ে করেন। এবার তার মেয়ে হয়। একটা নয়, তিন বছরের ব্যবধানে দুটি মেয়ে হয়। বড় মেয়ে বাড়ির প্রবল আপত্তিতে এক যুবককে বিয়ে করে বিদেশ চলে গেছে। সে আর কোনও সম্পর্ক রাখেনি। ছোট মেয়ের একমাত্র সন্তান এই অর্চিন। প্যাঁচালো সম্পর্ক। আজকাল এই ধরনের সম্পর্ককে আত্মীয়তার মধ্যে ধরা হয় না। বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হলে, নেমন্তন্নর তালিকা থেকে অনায়াসে নাম বাদ দেওয়া যায়। তাই এই বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে অর্চিনের আচরণ যে খানিকটা ফর্মাল হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? উল্টোটাও সত্যি। বাড়ির লোকদেরও একটা বাধো বাধো ভাব আছে। অর্চিন যখন এ বাড়িতে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে সিদ্ধান্ত হয়, তখন অনেকেই অবাক হয়েছিল। বাড়ির ভিতের যেমন হয়েছিল, বাইরেও হয়েছিল। বারিধারা, মেঘবতী থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ভুরু কোঁচকায়। এই ছেলে কে যে তাকে একেবারে বাড়িতে এনে তুলতে হবে? ছেলের বাড়ি কলকাতা থেকে খানিকটা দূরে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় পড়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু তাতে কী হয়েছে? হস্টেল, মেস, পেয়িং গেস্ট নেই? বাইরের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে কলকাতায় থেকে কীভাবে পড়াশোনা করে? এই ছেলেকে বাড়িতে এনে তোলার কারণ কী?

boierpathshala.blogspot.com

বাইরের লোকের কথায় পাত্তা দেননি বিমলকান্তিবাবু। বাড়িরও নয়। শুধু বৃদ্ধ বাবাকে জানিয়েছিলেন। তাও দরজা বন্ধ করে।

'বাবা, একটা পারমিশন চাই।'

কমলকান্তি সেন বই পড়ছিলেন। মুখের সামনে থেকে বই না সরিয়ে বললেন, 'অফিস সংক্রান্ত কিছু হলে পাবে না। তুমি জানো, আমি অফিসের ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি।'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'না, অফিস নয়। বাড়ির বিষয়।'

কমলকান্তি বই সরিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের অনুমতি দিলাম।'

বিমলকান্তি বিরক্ত হলেন। এটা কোনও সিরিয়াস কথা হল? ঘটনা না শুনেই রায়! অন্য কেউ হলে ধমক দিয়ে বসতেন। বাবাকে ধমক দেওয়া যায় না। নিজেকে সামলালেন বিমলকান্তি।

'বাবা, তুমি কি আগে বিষয়টা শুনবে।'

কমলকান্তি সেনের হাতে রান্নার বই। এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। বয়েস বেশি হলে মানুষ সাধারণত হাতে ধর্মগ্রন্থ রাখে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চোখের কারণে পড়তে পারে না। তারপরেও রাখে। স্পর্শে যদি পুণ্যি হয়। কমলকান্তি সেনের ঘটনা অন্যরকম। কয়েকবছর হল বুড়োমানুষটা রান্নার বইতে মজেছে। রেসিপি পড়ে একইসঙ্গে প্রভূত আনন্দ পাচ্ছেন, আবার মুগ্ধও হচ্ছেন। একই জিনিস এতরকমভাবে রান্না করা যায়! সেসবের আলাদা আলাদা স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, চেহারা! কই এসব তো তাঁর জানা ছিল না। এ যেন ম্যাজিকের মতো। অথচ ম্যাজিক নয়। মানুষই মাথা খাটিয়ে বের করেছে! নিরন্তর করে চলেছে। রান্নাঘর যেন একটা বড় রসায়নাগার! পরীক্ষার পর পরীক্ষা, আবিষ্কারের পর আবিষ্কার! মজার কথা হল, এই গবেষণার কোনও নির্দিষ্ট ফর্মুলা নেই। কখনও ফর্মুলা তৈরি হচ্ছে, কখনও ভাঙছে। কখনও অনেক আয়োজন দিয়ে ছোটখাটো খাবার বানিয়ে ফেলা যাচ্ছে, কখনও সামান্য আয়োজন থেকে অসাধারণ কোনও 'ডিশ' হচ্ছে। এতদিন কমলকান্তি সেনের ধারণা ছিল খাবার শুধু পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। রান্নার বই পড়ে সেই ধারণা থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। এখন তাঁর বিশ্বাস, খাবার শুধু পেট নয়, মনের ক্ষুধাও মেটায়। তিনি নানা ধরনের দেশি-বিদেশি রান্নার বই কিনে আনাচ্ছেন। ফোন করে বইয়ের দোকান, পাবলিশার্সকে অর্ডার দিচ্ছেন। ছোট নাতনিকে দিয়ে অনলাইনে বই কেনাচ্ছেন। নিজে জীবনে কখনও রান্না করেননি। রান্নার ব্যাপারে তাঁর কোনও ইন্টারেস্টও ছিল না। বাড়িতে কখনও জানতে চাননি কী রান্না হচ্ছে। যেমন দেওয়া হত তেমনটাই খেয়ে নিতেন। রান্নার মধ্যে যে এত বিস্ময়, এত রহস্য লুকিয়ে আছে তাঁর জানা ছিল না।

সেদিনও কমলকান্তির হাতে রান্নার বই ছিল। বইয়ের নাম, 'দ্য নাইফ'। জেফরি কর্ড নামে এক ব্রিটিশ সেফের লেখা। প্রায় একশো বছর আগে লেখা। এটা ঠিক রেসিপির বই নয়। প্রাক রান্না প্রস্তুতি। জেফরি কর্ড দেখিয়েছেন, কীভাবে বিভিন্ন ধরনের আনাজপাতি বিভিন্ন মাপে, চেহারার কাটা যায়। এতে রান্নার স্বাদও বদলে দেওয়া যায়। আলু গোল করে কাটলে একরকম, চিরে কাটলে আরেকরকম। আবার মোটা করে চিরলে একরকম, সরু করে চিরলে আরেকরকম। ছুরি দিয়ে কাটাকুটির ব্যাপার বলে বইয়ের নাম 'দ্য নাইফ'। নাম শুনলে মনে হবে খুনের গল্প। কমলকান্তি সেন মন দিয়ে পড়ছিলেন। আচ্ছা, এই বই যদি বাংলায় লেখা হয় তাহলে নাম কী হবে? বঁটি? বঁটি নামে কোনও বই কি মানুষ আগ্রহ নিয়ে পড়বে?

খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই ছেলেকে বললেন, 'বলো শুনছি। কীসের ব্যাপারে অনুমতি চাই?'

বিমলকান্তিবাবু নীচু গলায় বললেন, 'একজন আমাদের বাড়িতে থাকবে।'

কমলকান্তি সেন বললেন, 'ভালো কথা, থাকবে। বাড়িতে লোক থাকা ভালো। বাড়ি হল ফুলদানির মতো। ফাঁকা মানায় না।'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'মণিকুন্তলার দূরসম্পর্কের এক বোনের ছেলে। বাইরে থাকে। আমাদের এখানে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে।'

boierpathshala.blogspot.com

'আরও ভালো কথা। বাড়িতে পড়াশোনা হবে। এর জন্য অনুমতি কীসের? তাছাড়া বাড়ি আমার একার নয়। বাড়ি সবার। মণিকুন্তলারও। আমার অনুমতির কী প্রয়োজন?'

বিমলকান্তিবাবু এবার দ্বিধার সঙ্গে বললেন, 'ছেলেটি অন্য কোথাও না থেকে আমাদের এখানে কেন থাকবে এই বিষয়ে কি তুমি কিছু জানতে চাও বাবা?'

'অবশ্যই চাই না। আমি চাই, এবার তুমি যাও। আমি একটা জরুরি বই পড়ছি।'

বিমলকান্তি গম্ভীরভাবে চাপা গলায় বললেন, 'তুমি না চাইলেও আমি বলব বাবা। বাড়ির আর কারও না হোক, তোমার জেনে রাখা দরকার।'

কথা শেষ করে বিমলকান্তি উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে এলেন।

এই ছেলের সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক যে গভীর হবে না সেটা বোঝাই যায়। খানিকটা ব্যতিক্রম বারিধারা। বয়েসে কাছাকাছি। বারিধারা 'অর্চিদা'র সঙ্গে মাঝেসাঝে গল্প টল্প করে, ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। মেঘবতীও হইচই করতে চেষ্টা করেছে। খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। শুধু সম্পর্কের দূরত্ব নয়, অর্চিন গোটানো ধরনের ছেলে। চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে। বাড়ির সকলেই এ কথা বুঝে গেছে। কেউ তাকে আগ বাড়িয়ে বিরক্ত করে না। সবথেকে বড় কথা হল, ছেলেটা ভালো। শুধু পড়াশোনায় নয়, স্বভাবেও ভালো। কোনও চাহিদা নেই। খাওয়া, পরা নিয়ে মাথা ঘামায় না। পেলেই হল। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে আগ বাড়িয়ে ব্যস্ততা দেখায় না, কিন্তু ঘরের বাইরে চুপ করে বসে থাকে। শান্তভাবে খোঁজ নেয়। রাত করে বাড়ি ফেরে না। বাড়িতে বন্ধুবান্ধব এনে আড্ডা দেয় না।

অর্চির সিগারেট খাবার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে। মেকানিক্যাল। তাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের নেশা করে। অর্চিন করে না। সে শুধু সিগারেট খায়। তবে বাড়িতে খায় না। রাতেও চেষ্টা করে না খেতে। তারপরেও কোনও কোনও রাতে খুব ইচ্ছে হলে পা টিপে টিপে ছাদে চলে যায়। সকালে কমলাদি চা এনে দরজা ধাক্কায়। তাকে বলা আছে, তিনবারের বেশি ধাক্কা দেওয়ার দরকার নেই। তিনবারেও যদি দরজা খোলা না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে, সে ঘুমোচ্ছে। কমলাদি এরপরেও দরজা ধাক্কা দিয়ে যায়। যতক্ষণ না দরজা খোলা হয় ততক্ষণ ধাক্কা চলে। অর্চিন বাধ্য হয়ে দরজা খুলে চা নেয়। চা খেয়ে অর্চিন বাড়িরে বাইরে বেরোয়। গলির মোড়ে আসে। বড় রাস্তা পার হলে ফুটপাথে পরপর চায়ের ঝুপড়ি। সেখানে বসলে খানিকটা আড়াল হয়। বাড়ির কেউ বেরোলে তাকে চট করে দেখতে পাবে না। সেখানে বসে অর্চিন খবরের কাগজ পড়ে, সিগারেট খায়।

মুখের তেতো স্বাদ নিয়ে গোড়ার দিকে ঋষা ঠাট্টা করত।

'ও তাই বল, এই কারণে তোর কথাগুলো দিন দিন এমন তেতো হয়ে যাচ্ছে।'

অর্চিন সহজভাবে বলেছে, 'হতে পারে। এবার পকেটে মধুর শিশি নিয়ে ঘুরব। কথা বলবার আগে পকেট থেকে বের করে কয়েক ফোঁটা খেয়ে নেব। তারপর তোর সঙ্গে কথা বলব। তখন কথাগুলো মিষ্টি লাগবে।'

ঋষা বলেছে, 'লাভ হবে না। তোর মুখের অন্য টেস্ট বাডগুলো নষ্ট হয়ে গেছে অর্চি। শুধু একটাই কাজ করছে। বিটার সেনসিটিভ পার্ট। তুই যা বলবি, সবই তেতো লাগবে। যাকে বইয়ের ভাষায় বলে তিক্ত।'

অর্চিন হাই তুলে বলল, 'তাহলে তো ভালোই হল। অনেককে বাধ্য হয়ে তিক্ত কথা বলতে হয়। এখন আর তার প্রয়োজন হবে না। যদি বলি, তুমি কী ভালো! তাহলেও তেতো শোনাবে। এটা একটা বিরাট সুবিধে।'

আজ আর বিষয়টাকে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে রাখল না ঋষা।

সকালেই ফোন করেছে। অর্চিন ঝুপড়িতে বসে আছে। তার পকেটের মোবাইল বাজল।

'কী করছিস?'

অর্চিন বলল, 'বসে আছি। ফোন করেছিস কেন?'

boierpathshala.blogspot.com

ঋষা বলল, 'সাতসকালের ব্যাপার বলে সাতসকালে ফোন করেছি। একটু আগে মনে হল, তোর রোজ সকালে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস করে জল খাওয়া দরকার।'

অর্চিন হেসে বলল, 'ডাক্তারি করছিস?'

ঋষা বলল, 'হ্যাঁ করছি। নিশ্চয় তোর অ্যাসিডের সমস্যা হচ্ছে। জল খেলে কমবে।'

অর্চিন বলল, 'হতে পারে। হলেও সকালে উঠে জল খেতে পারব না। এরপর তো বলবি, যোগাসন করতে। তারপর বলবি ছোলা সিদ্ধ খেয়ে মর্নিংওয়াকে যেতে।'

ঋষা বলল, 'দরকার হলে তাই যাবি।'

'সরি, পারলাম না। ছোট বিষয় নিয়ে এত চিন্তা করিস না। সময় নষ্ট হবে।'

ঋষা বলল, 'আমার সময় আমাকে বুঝতে দে। তুই ডাক্তার দেখা। মুখে সারাক্ষণ তেতো ভাব ঠিক নয়। অনেক সময় লিভার বা গলব্লাডার থেকেও প্রবলেম হতে পারে।'

অর্চিন বলল, 'বাদ দে। শরীর একসময় বিষয়টা মানিয়ে নেবে। সে জানবে তেতো স্বাদটা তার জন্য স্বাভাবিক। মানুষের শরীরের এটাই মজা ঋষা। সে ভালো এবং মন্দ দুটোর সঙ্গেই নিজেকে অ্যাডপ্ট করে নিতে পারে। যেমন ধর...যেমন ধর...যে মানুষ ঠিকমতো খেতে পায় না, তার শরীরও একটা পর্যায়ের পর থেকে মানিয়ে নিতে শেখে। আমরা যেমন খাবার থেকে ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, জল এসব বের করে নিই, না খেতে পাওয়া মানুষের শরীর অনাহার, অপুষ্টি থেকে তার নিজের মতো করে ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন সংগ্রহ করে। করতেই হয়। নইলে বাঁচবে কী করে?'

ঋষা বিরক্ত গলায় বলল, 'বাঁচে না। বাঁচলে ধুঁকতে ধুঁকতে বাঁচে।'

অর্চিন গম্ভীরভাবে বলল, 'বাঁচা অনেকরকম হয় ঋষা। মরাই বরং একরকম। সবাই একরকমভাবে মরে। হার্ট বন্ধ। ধনী মানুষের যা, গরিবেরও তাই। কিন্তু বাঁচা একেকজনের কাছে একেকরকম। আমাদের বাড়িতে কমলকান্তি সেন একানব্বই বছর বয়েসে দুধে-ভাতে বেঁচে আছে। পৃথিবীর কোথাও আবার আট বছরের আদিবাসী ছেলে গাছের পাতা শিকড় খেয়ে বেঁচে আছে। সবটাই বাঁচা। একটা মানুষের বাঁচা, একটা পশুর।'

ঋষা একটু চুপ করে বলল, 'লেকচার স্টপ কর। আজ রেজাল্ট।'

এই কথার উত্তর দিল না অর্চিন। সে জানে এই সেমিস্টারেও সে ফার্স্ট হবে। তার কিছু এসে যায় না। সে ঠিক করে ফেলেছে, সে আর লেখাপড়া করবে না। লেখাপড়া করা মানে সময় নষ্ট। সে একজন পাতি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে পেটি বুর্জোয়া কেরিয়ার করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। তার জন্য অনেক বড় কাজ অপেক্ষা করছে।

সবার আগে মাসির বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

ছয়

'বাবা, কেমন আছ?'

কমলকান্তি সেন ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর চোখ বোজা। ছেলের প্রশ্নের তিনি জবাব দিলেন না। তিনি কি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছেন? অসম্ভব কিছু নয়। নব্বই পেরোনো একজন মানুষের ঘুম, জেগে থাকা সবসময় নিয়ম মেনে হয় না।

বিমলকান্তিবাবু একটু থমকে আবার ডাকলেন।

'বাবা, বাবা...।'

কমলকান্তি সেনের ইজিচেয়ারটা অ্যান্টিক। সেগুন কাঠ আর লেদারের। পালিশ করা কালো রং ঠিকরে বেরোয়। আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে পার্ক স্ট্রিটের অকশন হাউস থেকে কমলকান্তি নিজে দাম হেঁকে কিনেছিলেন। দরাদরির শেষ লড়াই হয় এক ফিরিঙ্গি সাহেবের সঙ্গে। কম্পিটিটরের গায়ের রং ফর্সা বলে

boierpathshala.blogspot.com

কমলকান্তির রোখ চেপে যায়। যে-কোনও বিষয়ে সাহেবদের হারাতে পারলে বাঙালির আলাদা আনন্দ হয়। তিনি হড়বড়িয়ে দাম তুলে দিয়েছিলেন। চেয়ার সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। তখনও অফিসে অ্যান্টি চেম্বারের প্রথা চালু হয়নি। বড় কর্তাদের ঘর ছিল একটাই। রাজকীয় চেয়ার-টেবিলে বসে তিনি কাজকর্ম করতেন। ঘরের একপাশে একটা করে ইজিচেয়ার রাখা থাকত। লাঞ্চ আওয়ারে বা কাজের ফাঁকে এই ইজিচেয়ারেই বিশ্রাম। কমলকান্তি যতদিন অফিস করেছেন এই ইজিচেয়ারেই বিশ্রাম নিয়েছেন। তার পুত্র কিন্তু অফিসে বা ওয়ার্কশপে বাবার ব্যবহার করা কোনও চেয়ারে বসেন না। মণিকুন্তলাদেবীর কারণেই এমনটা হয়েছে। কমলকান্তি সেন যেদিন থেকে ব্যবসার কাজে বেরোনো বন্ধ করলেন, সেদিনই মণিকুন্তলাদেবী তার স্বামীর সঙ্গে তর্ক করেন।

'অফিসে তুমি বাবার চেয়ারে বসবে না।'

বিমলকান্তি অবাক হয়ে বলেন, 'কেন? আজ থেকে আমাকে তো বাবার ঘরেই বসতে হবে।'

মণিকুন্তলাদেবী শান্তভাবে বললেন, 'ঘরে বসবে, কিন্তু চেয়ারে বসবে না।'

বিমলকান্তি বিরক্ত হলেন। কিন্তু বিরক্ত হলেও উপায় নেই। এই মহিলার তর্ক তিনি অ্যালাও করেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কারণটা কি জানতে পারি?'

'কারণ কিছুই নয়। তাঁর চেয়ারে না-বসা মানে মানুষটাকে সম্মান দেওয়া।'

বিমলকান্তি দু'পাশে হাত ছড়িয়ে ব্যঙ্গের হেসে বললেন, 'কী অদ্ভুত কথা! তাঁর অফিসে বসব, তাঁর ঘরে বসব, তার হয়ে কাজ করব—তাতে কিছু হয় না, চেয়ারে বসলে ক্ষতি?'

মণিকুন্তলাদেবী বলেন, 'ক্ষতি তো বলিনি। বলেছি, যে মানুষটা এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন, এতদিন ধরে সফলভাবে পরিচালনা করলেন, তাঁর চেয়ারটা দখল না করাই উচিত। থাকলই বা খালি, সমস্যা কী? চেয়ার খালি থাকলেও মনে হবে, তিনি সেখানে আছেন।'

বিমলকান্তি রেগে যান। বলেন, 'এ সব বস্তাপচা ভ্যালুজ আমাকে শেখাতে যেও না। আমি কি স্কুলের ছাত্র যে মাস্টারমশাইয়ের চেয়ারে বসব না? সব কিছু নিয়ে আর্গুমেন্ট করবে না। আমার অফিসের ব্যাপারে আমাকে বুঝতে দাও।'

মণিকুন্তলাদেবী হেসে ফেলেন। মহিলার এই একটা ক্ষমতা। স্বামীর রাগারাগির সামনে তিনি হাসতে পারেন।

'অবশ্যই তুমি ছাত্র। তোমার বাবার কাছ থেকে কাজ শিখেছ। তাই না? তাঁকে সম্মান জানানোটা বস্তাপচা ভ্যালুজও যদি হয়, লজ্জার কী আছে? হলে হবে। বুড়ো বাবা-মাকে না দেখাশোনা করাটা আজকাল খুবই আধুনিক একটা বিষয়। তাঁদের নিয়ে গিয়ে পাশের পাড়ার বৃদ্ধাশ্রমে পুরে দেওয়া আরও আধুনিক। আমারটা যদি বস্তাপচা হয়, এগুলো একেবারে খেতের তাজা তরকারি। পটল, ঝিঙে। তুমি কি তবে বস্তাপচা ভ্যালুজের বদলে পটল, ঝিঙে ভ্যালুজ মেনেই চলবে?'

বিমলকান্তি বলেন, 'পটল-ঝিঙে ভ্যালুজ! এসব কী কথা? তুমি কি রসিকতা করছ মণি?'

'রসিকতা করছি না, তবে একটা সহজ বিষয় নিয়ে তোমার মতো সিরিয়াস ভাবও করছি না।'

বিমলকান্তিবাবু বলেন, 'তর্ক কোরো না... তর্ক কোরো না মণি। এমনিতেই চিন্তায় আছি। এতদিন মাথার ওপর বাবা ছিলেন। এখন বলছেন, অবসর মানে ফুল অবসর। আর কাজের কোনও কথা শুনবেন না। ঝামেলায় পড়লেও নয়। আমাকে একা বিজনেস চালাতে হবে। কী যে করব বুঝতে পারছি না। তার ওপর তোমার তর্ক। উফ!'

মণিকুন্তলাদেবী এগিয়ে এসে স্বামীর গায়ে হাত রাখলেন। বললেন, 'মাথা ঠান্ডা করো। ঠিক পারবে। বাবার চেয়ার পাশে রাখলে সব ঝামেলা সামলাতে পারবে। বড় বড় রাজা-বাদশারাও বাবার সিংহাসন পাশে রেখে নতুন সিংহাসনে বসত। আজকালকার দু-চার আনার ছেঁদো বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আধুনিকতা নিয়ে মাথা ঘামিও না। যারা ছেঁদো ছেলেমেয়ে হয় তারা বাপ-ঠাকুরদার সম্পত্তি নেওয়ার ব্যাপারে আধুনিকতা দেখায় না।

boierpathshala.blogspot.com

সম্পর্ক বলে কিছু হয় না, কেরিয়ারের জন্য জন্মেছি, কেরিয়ারের জন্য মরব বলে বুক বাজিয়ে বেড়ায়, অথচ বাবা মরল কি মরল না, জমি-বাড়ির হিসেব নিতে ছুটে আসে। এরাই বুড়ো বাবা-মাকে সম্মান দেখাতে কুণ্ঠা বোধ করে। নীচু হয়ে প্রণাম পর্যন্ত করে না। পারলে বাবার সঙ্গে বিজয়ার হ্যান্ডশেক করে। এই যুগে নাকি মাথা নোয়ানো খারাপ। অথচ বাড়ির দলিল খুঁজতে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে যায়। এরা কী ভ্যালুজ ঠিক করে দেবে?'

বিমলকান্তি বলেন, 'তুমি থামবে মণি? আর লেকচার সহ্য হচ্ছে না।'

স্ত্রীর কাছে রাগ দেখালেও সেদিন অফিসে পৌঁছেই বিমলকান্তি প্রথমে বাবার চেয়ারটা সরিয়ে রাখলেন। নিজের জন্য অন্য চেয়ার এসেছে। সেদিনই বেলা তিনটের পর কোম্পানির ভ্যানে কমলকান্তি সেনের প্রিয় ইজিচেয়ার চলে এসেছে বাড়িতে। মণিকুন্তলাদেবী মুখ টিপে হেসেছেন। মুখে কিছু বলেননি। তিনি এতদিনে বুঝে গেছেন, তার স্বামী মানুষটা সিরিয়াস এবং ভালো। ভালো এবং ছেলেমানুষ।

বিমলকান্তি অফিসে বেরোনোর আগে রোজই একবার বাবার কাছে আসেন। খোঁজখবর নেন। আবার আসেন সন্ধেবেলা। অফিস থেকে ফেরবার পর। কোনও দিন অল্প কথাবার্তা হয়, কোনও দিন শুধু কেমন আছে জেনেই চলে যান। কথা হবে কিনা কমলকান্তির মুডের ওপর নির্ভর করে। তবে কথা হলেও সেখানে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ের প্রবেশ নিষেধ।

দু'বার ডাকাতেও বাবা চোখ না খোলায় বিমলকান্তিবাবু খানিকটা অস্বস্তি অনুভব করলেন। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। অফিসে জরুরি মিটিং আছে। একটা এলসি খোলা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। বাইরের বড় অর্ডার এসেছে। সাবান, ডিটারজেন্ট, টুথপেস্ট, ফিনাইল, রুমফ্রেশনার সবকিছুর অর্ডার হয়েছে। এইভাবে কোম্পানির সবক'টা প্রডাক্টের অর্ডার চট করে হয় না। প্রায় কোটি টাকার ব্যবসা। এই সময় কোনও সমস্যা হলে বড় লোকসান হয়ে যাবে। অন্য কেউ অর্ডার তুলে নেবে। এই ব্যবসার সব থেকে ঝামেলা হল নামি ব্র্যান্ডের সঙ্গে লড়াই। তারা যদি জানতে পারে সেন অ্যান্ড অ্যাসেসিয়েটস এলসির জটে পড়েছে, অর্ডার তুলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিষয়টা নিয়ে বিমলকান্তিবাবু চিন্তিত। তার ওপর প্রহ্লাদ নামের লোকটার ঘটনায় খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ করে নিজেকে অন্য একটা মানুষ মনে করা বিব্রত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। শুধু লোকটার মনের কথা নয়, লোকটার মতো পেট চুলকোনো, ঢেঁকুর সবই হয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দুম করে নিজেকে একটা অন্য মানুষ মনে হলে মন খারাপ তো হবেই। যে কারও হবে। তার ওপর প্রহ্লাদের মতো অধস্তন কর্মচারীর মতো। আপসেট হওয়ার পক্ষে এই ঘটনা যথেষ্ট। পরে অবশ্য সামলে নিয়েছেন। নিজেকে বুঝিয়েছেন, বয়স বাড়ছে। মস্তিষ্কের নানা কোষ যে মাঝে মাঝে নিয়ম ভেঙে নিজের ইচ্ছেমতো আচার-আচরণ করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? সেখান থেকে তৈরি হয় হ্যালুসিনেশন। কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রহ্লাদ নামের লোকটা হয়ে যাওয়া সেরকমই কিছু ছিল। সত্যি নয়, বিভ্রম। লোকটার ওপর বিরক্তি থেকেই হয়তো হয়েছে। এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। নিজেকে এই যুক্তিতে শান্ত করেছেন।

স্নান খাওয়া করে যখন ওপরে বাবার কাছে আসছেন, তখন ছোট মেয়ের সঙ্গে দেখা। বারিধারা সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। এই মেয়েটিকে নিয়ে বিমলকান্তিবাবু সব সময়ই চিন্তার মধ্যে থাকেন। কোনও মানুষ যে জীবনকে এমন হালকা চালে নিতে পারে, বারিধারাকে না দেখলে তিনি জানতেও পারতেন না।

এই মেয়ে যখন যা খুশি করতে পারে, বলতে পারে। ভয়ডর বলে কোনও ব্যাপারই নেই। সব থেকে বড় কথা, লোকে কী ভাববে তাই নিয়ে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না। তার ওপর বড্ড জেদি। অথচ লেখাপড়ায় অতি ভালো। ছবি আঁকতে পারে। স্কুলে পড়বার সময় গান শিখতে যেত। দুম করে একদিন দিল ছেড়ে। বাড়ি এসে বলল, 'আমি আর গান শিখতে যাব না। ওখানে পরীক্ষা হবে। আমি পরীক্ষা দেব না। গান কোনও পরীক্ষা নয়, গান হল পরীক্ষার পর ছুটি।'

স্ত্রীর কাছে ঘটনা শুনে বিমলকান্তিবাবু মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। যত্ন করে মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। 'এটা ঠিক নয় বৃষ্টি। জীবনের সব কিছুই সিরিয়াস ভাবে দেখতে হয়। গানটাও একটা সিরিয়াস

boierpathshala.blogspot.com

বিষয়। আর পাঁচটা সিরিয়াস বিষয়ে যেমন পরীক্ষা আছে, গানের বেলাতেও আছে। পরীক্ষা না দিলে বুঝবে কী করে, তুমি কতটা শিখেছ? তা ছাড়া তুমি তো গান খুব খারাপ করোও না। তোমার ভয় কীসের? পরীক্ষায় তুমি বেশি নম্বর পাবে।'

মেয়ে মুখ গোঁজ করে বলেছিল, 'আমি জানি গান, আমি খারাপ করি। গানে আমার নম্বর দরকার নেই বাবা, আনন্দ দরকার। আমি গান শিখব না, আমি গান গাইব।'

সেদিনই বিমলকান্তি বুঝেছিলেন এ মেয়ে পরে গোলমাল করবে। তিনি মণিকুন্তলাদেবীকে সাবধানও করেছিলেন।

'ছোট মেয়েকে মানুষ করতে পারছ না মণি। মেয়ে বেয়ারা হয়ে যাচ্ছে। পাকা পাকা কথা বলতে শিখেছে। জীবনটা লম্বা। এক লাফে পাকা হওয়ার দরকার নেই। কাঁচা থেকে ধাপে ধাপে পাকার দিকে যেতে হয়। মেয়েকে কন্ট্রোল করো।'

মণিকুন্তলাদেবী বারিধারাকে বকাঝকা করে গানের পরীক্ষায় বসালেন। বারিধারা বেসুরো গান গেয়ে পরীক্ষায় ডাহা ফেল করে এবং হাসতে হাসতে বাড়ি ফেরে। এই ঘটনায় বিমলকান্তি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সিঁড়িতে মেয়েকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন বিমলকান্তি।

'কোথায় চললে? ইউনিভার্সিটি?'

বারিধারা এমনভাবে মাথা নাড়ল, যার মনে হ্যাঁও হয়, নাও হয়। বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমায় ড্রপ করে দেব।'

বারিধারা হেসে বলল, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করা যাবে না বাবা। আর্জেন্ট কেস।'

বিমলকান্তি বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি ছোট গাড়িটা নিয়ে যাও। নন্দ এসে গেছে।'

বাড়িতে দুটো গাড়ি। একটা বিমলকান্তিবাবুকে নিয়ে যাতায়াত করে, দ্বিতীয়টি বাড়ির অন্য সবার। এই গাড়ি চেহারায় প্রথমটির থেকেও বড়। তার পরেও গাড়ির নাম ''ছোট গাড়ি''।' বারিধারা, মেঘবতী ছোটবেলায় এই বিষয়ে তাদের মাকে প্রশ্ন করত।

'মা, গাড়ি বড় কিন্তু নাম ''ছোট গাড়ি'' কেন?'

মণিকুন্তলাদেবী হেসে বলতেন, 'তোমরা ছোটরা এই গাড়িতে চড়ো বলে গাড়ির নাম ''ছোট গাড়ি''।'

বারিধারা বলত, 'আমরা বড় হলে কি গাড়ির নাম বদলে যাবে?'

মণিকুন্তলাদেবী উৎসাহ নিয়ে বলতেন, 'অবশ্যই যাবে।'

বারিধারা হাততালি দিয়ে বলত, 'খুব মজা হবে, আমরা তখন বড় গাড়িতে চড়ব।'

বারিধারা, মেঘবতী বড় হয়ে গেছে। এর মধ্যে তিনবার গাড়ি বদলেছে। নতুন গাড়ি এসেছে। কিন্তু গাড়ির নাম বদলায়নি। সেই 'ছোট গাড়ি'ই রয়ে গেছে। বারিধারা, মেঘবতীরা এই নিয়ে কথা বলে না। সম্ভবত 'ছোট গাড়ি'তে চাপলে তারা এখনও ছোটবেলার মজা পায়। সামান্য নাম বদলে এই অসামান্য মজা তারা নষ্ট করবে কেন? ছোট গাড়ির চালক নন্দ। গত তিরিশ বছর এ বাড়িতে গাড়ি চালাচ্ছে। আগে অফিসের গাড়ি চালাত। পরে বাড়ির গাড়িতে পদোন্নতি হয়েছে। বারিধারা, মেঘবতী ডাকে 'নন্দকাকা'। বয়স্ক এই মানুষটি বহুবিধ গুণের অধিকারী। সৎ, প্রখর সময়জ্ঞান, দায়িত্ব সম্পর্কে অতি সচেতন। তেল চুরি, মেরামতি থেকে কমিশন, গ্যারেজ থেকে দু'নম্বরী পার্টস কেনা ধরনের কোনও বদভ্যাস তার নেই। বরং অনেক সময় নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে গাড়ির কাজ করিয়ে নেয়। এমন পাংচুয়াল ড্রাইভার খুব কমই দেখা যায়। ভোর সাড়ে তিনটে বললেও এক মিনিট নড়চড় হবে না। তিনটের সময় এসে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে, তেল মবিল চেক করে, টায়ারের হাওয়া টিপেটুপে, ধুলো ঝেড়ে রেডি হয়ে যাবে। দায়িত্বজ্ঞানও মারাত্মক। ছোটবেলোতেও বারিধারা, মেঘবতীকে কোথাও নিয়ে গেলে বাড়ির লোক নিশ্চিন্ত থাকত। নন্দ যখন গেছে চিন্তা নেই। মানুষটার একটাই দোষ। যে দোষ আর সবার থাকলে মেনে নেওয়া যায়, গাড়ির চালকের থাকলে

boierpathshala.blogspot.com

মানা যায় না। অতি অল্প দিনে চাকরি নট হয়ে যায়। গাড়ি চালাতে গিয়ে নন্দ প্রায় সব সময়েই রাস্তা ভুল করে ফেলে। অতি চেনা রাস্তাও সে অতি সহজে গুলিয়ে ফেলে। হাজারবার যে পথে সে গেছে, হাজারবার সেই পথ হারিয়ে ফেলতে পারে। মজার কথা হল, পথ গুলিয়ে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। মথা চুলকে, লজ্জা লজ্জাভাবে হাসে। যেন ভুল পথে চক্কর কাটা একটা আনন্দের বিষয়। পিছনে বসা যাত্রীদের উদ্দেশে বলে, 'পথ ব্যাপারটাই গোলমেলে। বার বার হারিয়ে যায়। অবার বার বার ফিরে আসে। এই কারণে পথ হারালে বেশি চিন্তা করতে নাই। পথ নিজে ফিরে আসে।'

নন্দর এই দার্শনিক বোধে বাড়ির সকলে একই সঙ্গে বিরক্ত এবং মুগ্ধ। ফলে বিভ্রান্ত। সম্ভবত এই বিভ্রান্তির কারণেই এই লোকের চাকরি নট হয় না।

'থ্যাঙ্কু বাবা। তা হলে নন্দকাকার সঙ্গেই চললাম। বাই।'

বারিধারা ফড়ফড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। বিমলকান্তি ভুরু কোঁচকালেন। তিনি তার ছোট মেয়েকে এত ভালোবাসেন কেন? গোলমেলে বলে? এটা কোনও কাজের কথা নয়। কোঁচকানো ভুরু নিয়েই বাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন বিমলকান্তি।

দু'বার ডাকার পরও কমলকান্তি সেন চোখ খোলেননি। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? ঘুমিয়ে থাকলে বিরক্ত না করাই ভালো। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎই বিমলকান্তিবাবুর শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। তিনি চমকে উঠলেন।

এ কী! কী হচ্ছে এ সব?

সাত

আলমারি থেকে ঝুপ ঝুপ করে দুটো বই মাটিতে পড়ে গেল।

বিমলকান্তিবাবু চমকে উঠে আলমারিটা ধরেছিলেন। সেই নাড়াতেই বই পড়েছে। এটা ঠিক বইয়ের আলমারি নয়, চারটে খোলা তাক। অর্ডার দিয়ে বানানো। বুক সমান হাইট। একেবারে নীচের তাকটা বেশ খানিকটা উঁচুতে। বই নেওয়ার জন্য যাতে কোমর ভেঙে খুব নীচু হতে না হয়। ঠাকুরদার অবসর উপলক্ষ্যে দুই নাতনি এই বইয়ের তাক উপহার দিয়েছিল। দুটো-একটা করে বই জমতে জমতে এখন তাক উপচে পড়বার মতো অবস্থা।

বিমলকান্তিবাবু শুধু চমকাননি, ভয়ও পেয়েছেন। ভয় পাওয়ার মতোই ঘটনা। সেদিন প্রহ্লাদ নামের লোকটার সঙ্গে যেমন হয়েছিল, আবার সেই একই ঘটনা ঘটেছে। মুহূর্তের জন্য মনে হল, তিনি বিমলকান্তি নন, তিনি অন্য মানুষ। শরীর, মন সব অন্য মানুষের। তবে এবার আর অধস্তন, দরিদ্র কর্মচারী নয়, এবার তিনি হয়ে গেছেন সেন অ্যাসোসিয়েটসের কমলকান্তি সেন!

কী ভয়ংকর!

বাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিমলকান্তিবাবুর মনে হল, এক ঝটকায় বয়স তিরিশ বছর বেড়ে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে নেই। চোখ বুজে আধশোয়া হয়ে আছেন ইজি চেয়ারে। হাতদুটো হাতলে রাখা। বাঁ পায়ের পাতাটা ভারী। গায়ে ফতুয়া জামা আর লুঙ্গি। পায়ে ঘরে পরবার স্লিপার। ডান পায়ের স্লিপারের তলায় কিছু একটা আটকে গেছে। মেঝেতে পড়ে থাকা সেলোটেপ? চুইংগাম? নাকি কাগজ জড়িয়েছে? বাঁ-হাতের কনুইয়ের কাছটা একটু জ্বালা করছে। সকালে বাথরুমের দেওয়ালে ঘসা লেগেছিল। বিমলকান্তিবাবু বুঝতে পারলেন, তিনি চোখ বুজে মনে মনে কারও সঙ্গে কথা বলছেন। কোনও মহিলার সঙ্গে। মহিলার গলা ভারী। বয়স্ক? মহিলার কণ্ঠস্বরে অনুযোগ। বললেন, 'তুমি এখনও কিছু করলে না?'

'করব। অবশ্যই করব।'

boierpathshala.blogspot.com

এবার মহিলার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি। বললেন, 'আর কবে করবে? এবার তো ফট করে একদিন মরে যাবে। বয়স কত হল খেয়াল হয়েছে? একানব্বই কোনও সহজ বয়স নয়।'

চিন্তা কোরো না, চট করে মরছি না। শরীরের কলকবজা বিগড়োয়নি। আসলে ঠিক কী করা উচিত, কোনটা করলে ভালো হয়, কোনটার বেশি প্রয়োজন, তাই নিয়ে একটা দোনামোনার মধ্যে ছিলাম।'

মহিলা কণ্ঠস্বর বললেন, 'দোনামোনা বন্ধ করো। দোনামোনার কারণে বেশিরভাগ সময়ে ভালো কাজ করে ওঠা হয় না। সময় ফুরিয়ে যায়।'

'ঠিকই বলেছ। সময় কমে আসছে। কাজটার শেষ দেখে যেতে পারব না।'

মহিলা কণ্ঠস্বর চাপা ধমক দিয়ে বলল, 'শেষ দেখবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি কি উদ্বোধন করে কাগজে ছবি ছাপাতে চাও। পাশে মন্ত্রীসান্ত্রীরা দাঁড়িয়ে থাকবে? ছি:। তোমার কাজ তুমি করবে। শুরু করবে। বিমল আছে, সে বাকিটা সামলাবে। সে খুবই কাজের ছেলে।'

'বিমল কাজের ছেলে, কিন্তু বোকা। বেশি সিরিয়াস বলেই বোকা। এই কাজে সিরিয়াস হওয়ার থেকে অনেক বেশি আবেগ দরকার। আমি অন্যরকম ভেবেছি। কাজটার দায়িত্ব অন্য একজনকে দেব। আমার বিশ্বাস, সে-ই সব থেকে ভালোভাবে করবে। সে বড় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দেরি হওয়ার পিছনে এটাও একটা কারণ।'

ব্যস এখানেই শেষ। কথাবার্তা যেমন দ্রুত এলও, মিলিয়েও গেল দ্রুত। মহিলা কণ্ঠস্বর চেনা চেনা লাগলেও বিমলকান্তিবাবু ঠিক ধরতে পারলেন না। হয়তো ঘোরের মধ্যে ছিলেন বলেই ধরতে পারেননি। আবার এমনটাও হতে পারে, এইমুহূর্তে তিনি ছিলেন কমলকান্তি। কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন। আলাদা করে কণ্ঠস্বর চেনবার প্রয়োজন হয়নি। সেই কারণেই মাথাও কাজ করেনি। নিজের মধ্যে ফিরে আসবার পর অস্বস্তি হচ্ছে।

অস্বস্তির সঙ্গে ভয়। প্রহ্লাদের ঘটনার থেকে অনেকটা বেশি ভয়। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা ভয়। মাত্র কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে দু'বার এক ঘটনা কী করে ঘটল! এক ভুল! বাবার কনুইয়ের জ্বালা তিনি অনুভব করবেন কেন? গায়ের ফতুয়াটা না হয় চোখে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু লুঙ্গির আড়ালে থাকা পা? সেটা যে ফুলে ভারী লাগছে, এটা তো বোঝা সম্ভব নয়। চটির নীচে আটকে থাকা সেলোটেপ? তার খবর জানবেন কী করে? বাবার পায়ের চটি তো উলটনো নেই। তার ওপর কথা। দুজনের কথা শুনতে পেয়েছেন। যা অসম্ভব। হতেই পারে না। যার সঙ্গেই বাবা কথা বলুন না কেন, মুখে বলেননি, মনে মনে বলেছেন। শুনতে পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবু শুনেছেন। সবমিলিয়ে ঘটনা বেশ কয়েক মিনিটের। সকালের মতো পনেরো-বিশ সেকেন্ডে শেষ হয়ে যায়নি। নরমাল অবস্থায় ফিরতে সময় লেগেছে। নরমাল হয়ে কোট প্যান্ট পরে বাবার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ফের। অফিসে বেরোবার সময় রোজ যেমন দেখা করতে আসেন।

কী হচ্ছে এসব! এ কী জটিল সমস্যায় পড়তে হল? একই ভুল বারবার হবে কেন? হতেই পারে না। সমস্যা অন্য কোথাও হচ্ছে।

বই পড়বার শব্দে কমলকান্তি সেন চোখ খুললেন। বিমলকান্তি তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে বই দুটো তুলে আলমারির তাকে রাখলেন। নিজেকে সামলে বললেন, 'সরি বাবা, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।'

কমলকান্তি সেন আধশোওয়া অবস্থা থেকে সোজা হলেন। ছেলের 'সরি' পাত্তা দিলেন না। বললেন, 'তাক থেকে কী বই পড়ল?'

আলমারিতে রেখে দেওয়া বই দুটো আবার টানলেন বিমলকান্তি। একটা পড়ল হ্যামলিনের রোমান মিথলজি, আর একটা শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প। শিবরাম চক্রবর্তীর নাম শুনে কমলকান্তি সেনের মুখ উজ্জ্বল হল। বললেন, 'গল্পের বইটা আমার হাতের কাছে এই টেবিলে রাখো। এটা একটা ওয়ান্ডারফুল বই। এতে রেসিপির ওপর দুর্দান্ত একটা গল্প আছে। পড়বার সময় এত হেসেছিলাম যে, পেটে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। বুঝলে বিমল, বয়সকালে এইসব গল্পের কথা আমি কিছুই জানতাম না। এটা একটা আপশোসের ব্যাপার।

boierpathshala.blogspot.com

আগে শুরু করলে আরও অনেক কিছু পড়তে পারতাম। তবে এখন যে পারছি, এটাও বিরাট সৌভাগ্যের। যাক, গল্পটার কথা বলি। আমি ঠিক জানি না, রান্না নিয়ে এমন ভালো গল্প পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় লেখা হয়েছে কিনা। আমার বিশ্বাস, হয়নি। গল্পটার নাম ''পাক প্রণালী বিপাক''। তুমি কি গল্পটা জানো?'

বিমলকান্তিবাবু এমনিতেই খুব থতমত অবস্থায় আছেন। এই প্রশ্নে আরও থতমত খেয়ে গেলেন।

বিমলকান্তিবাবু বইটই পড়বার মধ্যে বিশেষ নেই। গল্প উপন্যাস তো একেবারেই নয়। মোটে ভালো লাগে না। গল্প উপন্যাস বানানো ব্যাপার। সিরিয়াস ভাবনাচিন্তার অভাব। লেখকরা যা খুশি লেখেন। লেখালেখির ব্যাপারে কোনও নিয়মকানুন, নিষেধাজ্ঞা নেই বলেই এই হাল। ক'দিন আগে বারিধারার ঘরে একটা গল্পের বই দেখেছিলেন। অন্যমনস্কভাবে সেই বইয়ের কয়েকটা পাতা উলটেও ফেলেন। মাথায় আগুন ধরে যায়। মনে হচ্ছিল, এই বই এখনই জানলা দিয়ে নীচে ফেলে দেওয়া দরকার। ফেলবার আগে পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে, যাতে কুড়িয়ে নিয়েও কেউ পড়তে না পারে। এটা একটা বই! এ তো ফাজলামি! শব্দ ন্যালবেলে, বাক্য নড়বড়ে। ঘটনার বাস্তব ভিত্তি নেই। ভাবনায় শিক্ষার ছাপ নেই। গভীর কথা নেই। বারিধারাকে পরদিন বলেও ছিলেন।

'এসব কী পড়িস বৃষ্টি? এ তো খুবই সাবস্ট্যান্ডার্ড লেখা। অতি নিম্নমানের।'

বারিধারা হেসে বলল, 'খেপেছ বাবা? এই বই কি আমি পড়বার জন্য এনেছি? আমার পড়ার টেবিলের পায়ার নীচে রাখবার জন্য এনেছি। পায়া নড়বড় করছে। শুনলে তুমি খুশি হবে বাবা, বই এত খারাপ যে টেবিলও রিফিউজ করছে। এই বই দিলে আরও নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা, গাছের মতো টেবিলেরও প্রাণ থাকে। পড়ার টেবিল বই পড়তে পারে, খাবার টেবিল খেতে পারে, অফিসের টেবিল ফাইলে নোট দিতে পারে, হসপিটালের অপারেশন টেবিল রোগীর পেট কাটতে পারে। এই কারণেই আমার পড়বার টেবিল এই জঘন্য বই পড়তে পেরেছে এবং ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে।'

বিমলকান্তিবাবু সিরিয়াস মুখ করে বললেন, 'এসব কী কথা! টেবিলের পায়া গোলমাল করছে বলে তুমি এই ধরনের নিম্নমানের বই বাড়িতে নিয়ে আসবে? আজই নতুন টেবিল কিনে নাও।'

এরপরেও বিমলকান্তিবাবু মাঝে মাঝে যেটুকু পড়েন, তার বেশিটাই বিজ্ঞান, ইতিহাস বা জীবনীগ্রন্থ। তা-ও বিশেষ পড়া হয় না। সত্যি কথা বলতে বই পড়ার প্রতি তার টান নেই। বাবার প্রশ্নে আমতা আমতা করে মাথা চুলকোতে থাকেন। চোখ মুখ দেখে কি বোঝা যাচ্ছে, তিনি নার্ভাস? বাবা সম্পূর্ণ অন্য একটা বিষয় নিয়ে মেতে গেছেন। অপ্রয়োজনীয়, ফালতু একটা বিষয়। ছেলের দিকে খেয়াল করবার অবকাশ নেই। এটা ভালো হয়েছে। আজ অফিস বাদ দিলে কেমন হয়? বাড়িতে বসে বিষয়টা নিয়ে ভাবা উচিত। কেন এমন হচ্ছে? একটা মানুষ কখনোই আর একটা মানুষ হয়ে যেতে পারে না। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও নয়, অনেক বেশি সময়ের জন্য হলেও নয়। অলৌকিক ব্যাপার বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। সবকিছুর পিছনে কারণ আছে। বিজ্ঞান, যুক্তি আছে। এই ঘটনার পিছনেও আছে। সেটা হল ভুল। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। মনের ভুল। একবার পর্যন্ত মনের ভুল বলে এড়িয়ে থাকা যায়। বারবার হলে কীভাবে এড়ানো সম্ভব? নাকি সেটা উচিত। ভাবতে হবে। কাজকর্ম বাদ দিয়ে সিরিয়াস ভাবনা চাই। আজ অফিস বাদ দেওয়া ভালো।

কমলকান্তি সেন ইতিমধ্যে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ফেলেছেন এবং বেশ জমিয়ে হাসি হাসি মুখে শিবরাম চক্রবর্তী গল্প বলতে শুরু করেছেন। এত উদ্বেগের মধ্যেই বিমলকান্তিবাবু দেখলেন, তার বাবা এই বৃদ্ধ বয়েসেও কত তুচ্ছ অহেতুক বিষয় নিয়ে খুশি।

'গল্পটা এরকম...শিবরামবাবুর বোন বিনু ক'দিনের জন্য গেছে বাইরে...যাবার আগে দাদাকে একটা রেসিপির বই দিয়ে গেছে। প্রাক প্রণালী। ক'দিন বই দেখে নিজে রান্না করে খেতে হবে। শিবরামবাবু বললেন, এ তো কোনও ব্যাপারই নয়, রান্নার বই যখন আছে রান্না করা অতি সহজ হবে...হা হা...বই দেখে ঠিক করলেন পেঁয়াজের স্যুপ বানাবেন। বইতে লেখা আছে। প্যানে জল গরম করে দিতে হবে আলু, পেঁয়াজ, গোলমরিচ। মজা শুরু হয়েছে খোসা ছাড়ানো আলু থেকে। লেখক বাড়িতে খোসা ছাড়ানো আলু

boierpathshala.blogspot.com

খুঁজে পাচ্ছে না। সব আলুতেই নাকি খোসা...হা হা...তারপর পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে কান্নাকাটি অবস্থা। বইয়ে লেখা রেসিপি হল, পিঁয়াজ দিতে হবে ফুটন্ত জলে। দিতে হবে ছুড়ে। লেখক দূর থেকে পিঁয়াজ ছুড়লেন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছেন বার বার...হা হা...একসময় স্যুপ প্যান ছাপিয়ে...স্টোভ ছাপিয়ে এসে লেখককে তাড়া করল। লেখক স্যুপে পা পিছলোলেন। লাফিয়ে উঠলেন খাটে...হা হা...।'

এত পর্যন্ত বলে দম নেওয়ার জন্য থামলেন কমলকান্তি সেন। হাসির চোটে ফর্সা মানুষটার চোখ-মুখ লালচে হয়ে গেছে। বিমলকান্তি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। তারও কি হাসা উচিত? মনের এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় হাসবেন কী করে? তারপরেও বানিয়ে হাসবার চেষ্টা করলেন বিমলকান্তি। হাসি হল না।

কমলকান্তি সেন বললেন, 'বুঝলে বিমল এই গল্পটাকে নিছক হাসির হলেও, আসলে একটা দর্শন। ফিলসফি। লিখে রাখা নিয়ম, পদ্ধতি, কারিকুরিতে যে স্বাদু জীবন তুমি তৈরি করতে চাইবে, সে জীবন যে বইয়ের কথামতো নিয়ম মানবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সে জীবন এখন কাণ্ড করতে পারে যা তুমি কল্পনাও করতে পারোনি। সে হাসাবে, কাঁদাবে। উপচে পড়ে ভাসিয়ে দেবে। কখনও পিছনে তাড়া করবে, কখনও ফেলেও দেবে ধাক্কা দিয়ে। শিবরাম চক্রবর্তী খুব বড় লেখক বলে হাসতে হাসতে এই দর্শনের কথা বলেছেন। আবার যদি মনে করো ওসব কিছু নয়, শুধুই হাসাতে চেয়েছেন, প্রাণখোলা হাসি, তাতেও কোনও সমস্যা নেই। তুমি যদি চাও এই গল্পটা পড়তে পারো। আমার মনে হয়, লেখাপড়া জানা বাঙালির এইসব গল্প না-পড়াটা একটা লজ্জার।'

বিমলকান্তিবাবু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন, না অফিসে যাবেন। এখন যদি ঘরে গিয়ে কোট প্যান্ট ছেড়ে ঘরের পোশাক পরে খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন, একটা বিচ্ছিরি হইচই শুরু হয়ে যাবে। বাড়ির সবাই লাফালাফি শুরু করবে। কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে? পেট ব্যথা? মাথা ঘুরছে? বুক ধড়ফড়? প্রেসার? হয়তো ডাক্তারও ডেকে আনবে। হয়তো কেন, অবশ্যই আনবে। কী বলবেন? আমার কিছু হয়নি? তোমরা চিন্তা কোরো না। আমি একটা ভুল নিয়ে গোলমালে পড়েছি। ঠান্ডা মাথায় ভুলটা ভাবতে চাই। বাড়ির লোক সে কথা মেনে নেবে? অসম্ভব। আরও উত্তেজনা তৈরি করবে। না, তার থেকে অফিসে চলে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের। জীবন কি লেখার নিয়ম মেনে তৈরি করা যায়? সে হাসায়, কাঁদায়, উপচে পড়ে, তাড়াও করে। অন্য মানুষ হওয়ার ভুলটা কি সেরকম কিছু? তাড়া করছে?

'বাবা, গল্পটা আমি পড়ব। আজ অফিসে চললাম।'

কমলকান্তি সেন খুশি হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, বইটা তোমার ঘরে পাঠিয়ে দেব।'

বিমলকান্তিবাবু ঘুরতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। একটু থমকে থেকে বললেন, 'বাবা, তোমার কি হাতে ছড়ে গেছে? হাতের কনুই?'

কমলকান্তি সেন ছেলের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন।

'কে বলল?'

বিমলকান্তিবাবু লজ্জা পেয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'কে যেন বলল...।'

কমলকান্তি সেন ঠান্ডা গলায় বললেন, 'ভুল বলেছে। অথবা তুমি গুলিয়ে ফেলছ। আমার এরকম কিছু হয়নি।'

বিমলকান্তি স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। না, তাহলে সবটাই ভুল। জিগ্যেস করলে হয়তো জানা যেত, বাবার পায়েও কোনও সমস্যা হয়নি।

ছেলে ঘর থেকে বেরোনোর পর কমলকান্তি আবার ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। ছেলেকে একটা মিথ্যে বললেন। আজ সকালে স্নান করবার সময় তার বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছটা ছড়ে গেছে। খুবই সামান্য। তবে এখনও জ্বালা জ্বালা ভাবটা রয়েছে। কিন্তু বিমল জানল কী করে? কোইন্সিডেন্স? তাই হবে।

কমলকান্তি মনে মনে তিরিশ বছর আগে মারা যাওয়া স্ত্রীর সঙ্গে ফের কথা বলা শুরু করলেন। এটা উনি মাঝে মাঝেই করে থাকেন।

boierpathshala.blogspot.com

আট

শ্রবণ পড়েছে মুশকিলে। সে আজ বাড়ি থেকে পালাবে, কিন্তু কী ধরনের ব্যাগ নেবে বুঝতে পারছে না। বাড়ি থেকে পালানোর সঙ্গে কোন ধরনের ব্যাগ মানায়? চাকা লাগানো ঢাউস ট্রলি ব্যাগ? নাকি পিঠে ঝোলানো রুকস্যাক? নাকি পুরোনো আমলের ট্র্যাঙ্ক, বেডিং? ব্যাগ কোম্পানিরা কত ধরনের ব্যাগ, সুটকেস বের করেছে। ট্র্যাভেল ব্যাগ, অফিস ব্যাগ, ট্রেকার্স ব্যাগ, হানিমুন ব্যাগ, ফ্যামিলি ট্যুর ব্যাগ। পালানোর জন্য কোনও ব্যাগ কি তারা তৈরি করেছে? শ্রবণ কি দোকানে গিয়ে জিগ্যেস করতে পারে? আজকাল সব কিছুই কাচঘেরা বড় বড় দোকানে বিক্রি হয়। যদিও এখন আর দোকানকে দোকান বলা যায় না, দোকান বললে প্রেস্টিজে লাগে। বলতে হয় শোরুম, আউটলেট। জামাকাপড়, জুতো, ব্যাগ, টিভি, কম্পিউটার থেকে শুরু করে ভেলি গুড়, ঘুঁটে, হ্যারিকেন, চরণামৃত পর্যন্ত সব কিছুর শোরুম হয়ে গেছে। কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেই এয়ারকন্ডিশন মেশিনের ফিনফিনে ঠান্ডা বাতাস দেয়। শার্ট-প্যান্ট-টাই পরা স্মার্ট ছেলেমেয়েরা স্মিত হেসে এগিয়ে আসবে।

'বলুন স্যার।'

শ্রবণকে হাসি পাত্তা না দিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলতে হবে, 'ব্যাগ দেখান।'

বিক্রেতা অতিরিক্ত স্মার্ট হওয়ার জন্য গলা নামিয়ে বলবে, 'ধন্যবাদ স্যার। আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি। আপনি একজন ব্র্যান্ড কনসাস মানুষ। নামীদামি কোম্পানির প্রতি আস্থাশীল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের বহু কাস্টমার আজও ব্র্যান্ড ব্যাপারটা বুঝতে চান না। তাঁরা প্রোডাক্টের ভ্যালু দেখেন, ব্র্যান্ডভ্যালু দেখেন না। এঁদের নিয়ে আমরা খুবই সমস্যায় পড়ি। কিছুতেই বোঝাতে পারি না, জিনিস সস্তা বা টেকসই বলে কথা হয় না। কথা হয় ব্র্যান্ডের। জাপানের নিকিতানি, আমেরিকার ভিলাইস, হনলুলুর টিকিমাটা কোম্পানির জিনিস বাড়িতে পৌঁছোনোর আগেই ছিঁড়ে, ভেঙে বা রং চটে যাওয়াও একটা আনন্দের ঘটনা। গর্ব করে পাঁচজনকে বলা যায়। সস্তা বা টেকসই জিনিসে এই গর্ব নেই। কথাটা কে বুঝবে বলুন স্যার? সবথেকে বড় কথা কী জানেন স্যার? সব থেকে বড় কথা হল, ব্র্যান্ড আপনার সব প্রয়োজন মেটাতে পারে। অল পারপাস।'

এই সময়ে শ্রবণকে হয়তো হাত নেড়ে বলতে হবে, 'চিন্তা করবেন না। এ সমস্যা থাকবে না। আমার কাছে খবর আছে, খুব শিগগিরই স্কুল সিলেবাসে ব্র্যান্ড বিষয়টা ঢোকানো হচ্ছে। ইংরেজি, অঙ্ক, ফিজিক্সের সঙ্গে ব্র্যান্ড পরীক্ষায় পাস করতে হবে। দেরিতে হলেও আমাদের দেশের বড় বড় মানুষজন পেরেছেন, ছোটবেলা থেকে ব্র্যান্ড সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বাড়ানো প্রয়োজন। যাকে বলে ব্র্যান্ডজ্ঞান। মানবজীবনের একটা বড় অংশ বেচাকেনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্য ব্র্যান্ডজ্ঞান থাকতে হবে। সমস্যা একটাই। সিলেবাসে নতুন বিষয় ঢোকাতে হলে কিছু বাদ দিতে হয়। নইলে ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে সিলেবাস কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে ইতিহাস বই থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের খানিকটা বাদ দেওয়া যেতে পারে। বিদেশের ব্র্যান্ড আগে না দেশের স্বাধীনতা আগে? অবশ্যই ব্র্যান্ড আগে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়! যাই হোক, আমাকে ব্যাগ দেখান।'

বিক্রেতা এবার স্তূপাকৃত ব্যাগের সামনে দাঁড় করাবে। হাত পাশে ছড়িয়ে বলবে, 'দেখুন, কোনটা আপনার পছন্দ। আমাদের প্রায় আড়াইশো রকমের ভ্যারাইটি আছে। সাইজ আছে দেড় হাজার রকমের।'

ভুরু কুঁচকে বলতে হবে, 'না না, এ সব নয়। এ সব আমি জানি। বেড়ানোর ব্যাগ, অফিসের ব্যাগ... এ সব আমার জানা আছে...আপনার কাছে পালানোর কোনও ব্যাগ আছে?'

'সরি, আমি ঠিক শুনতে পেলাম না। কী বলছেন স্যার?'

boierpathshala.blogspot.com

এবার শ্রবণকে একটু গলা তুলে বলতে হবে, 'বলছি, আপনাদের কোম্পানি বাড়ি থেকে পালানোর সময় নেওয়া যায় এমন কোনও ব্যাগ কি বের করেছে?'

বিক্রেতা ঢোঁক গিলবে। বলবে, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। পালানোর ব্যাগ! সে আবার কী জিনিস?'

এবার একটু রাগ দেখালে কেমন হয়?

'কী জিনিস মানে! পালানো কাকে বলে জানেন না? পৃথিবীর বড় বড় মানুষ ঘরসংসার, রাজ্যপাট ছেড়ে পালিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধর নাম শোনেননি? সম্রাট অশোক? হিউয়েন সাঙ? কেউ চুপিচুপি পালিয়েছেন, কেউ ঘোষণা করে বাড়ি ছেড়েছেন। কেউ ধর্মপ্রচারে, কেউ বিশ্বভ্রমণে। আসলে সবই পালানো। পৃথিবীতে রোজ কত মানুষ পালায়, তার হিসেব রাখেন? আমি রাখি। প্রতি সেকেন্ডে আড়াইজন। আপনি বলছেন কিনা, পালানো কী জিনিস!'

বিক্রেতা রুখে দাঁড়াতে পারে। বলবে, 'সরি। এ ধরনের কিছু আমাদের স্টকে নেই। আপনি অন্য কোথাও খোঁজ করুন।'

এই রুখে দাঁড়ানো দেখে ঘাবড়ালে চলবে না। গলা চড়িয়ে বলতে হবে, 'নেই বললেই হবে? জাপানের নিকিতানি, আমেরিকার ভিলাইস, হনলুলুর টিকিমাটা কোম্পানি নিয়ে এত দরদ দেখালেন আর কাজের সময় লবডঙ্কা? এই তো এতক্ষণ ব্র্যান্ডের জয়গান করছিলেন। করছিলেন কিনা? বলছিলেন, তারা নাকি সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। ঘোড়ার ডিম দেয়। ওদের বলুন, পালানোর জন্য আলাদা ব্যাগ চাই।'

চেঁচামেচির কারণে শোরুমের আরও পাঁচজন কর্মী এগিয়ে আসতে পারে। পারে কেন, অবশ্যই আসবে। হয়তো ম্যানেজারও আসবে। সিকিউরিটিকে নিয়ে আসবে। এতেও ঘাবড়ালে চলবে না। তর্ক চালিয়ে যেতে হবে। এতে দু ধরনের এফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা। এক, ওরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাথা ঠান্ডা করাবে। দুই, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। দ্বিতীয়টাই ঘটবে। বোঝানো অনেক কঠিন কাজ। ঘাড়ধাক্কা অনেক সহজ ব্যাপার।

শ্রবণ এই সবের মধ্যে যাবে না। সে ঝামেলার মধ্যে নেই। সে ঠিক করল, রোজ যে ব্যাগটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ে, সেটাই নেবে। সেখানে ল্যাপটপের পাশে কটা জামাকাপড় অনায়াসে ঢুকিয়ে নেওয়া যাবে। আর কী লাগবে? একটা ল্যাপটপ এবং কটা জামাকাপড় জীবন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পকেটে পয়সা থাকলে বাকি সব বাইরে পাওয়া যায়। সবথেকে বড় কথা, রোজকার ব্যাগ সঙ্গে নিলে বাড়ির কেউ সন্দেহ করবে না।

পঁচিশ বছরের শ্রবণ বাড়ি থেকে কেন পালাচ্ছে? বাবা-মা, বড়দা, বউদির সংসারে তার সমস্যা কী?

কোনও সমস্যা নেই। এমন নয় যে, সে কারও ঘাড়ে বসে খায়। নামকরা এক বিজ্ঞাপন সংস্থার কলকাতা শাখায় কাজ করে। তার কাজ কনসেপ্ট ডেস্কে। এই ডেস্কে বিজ্ঞাপনের প্রাথমিক পরিকল্পনা তৈরি হয়। পত্রপত্রিকায়, টিভিতে, সিনেমা হলে, হোর্ডিংয়ে যেসব বিজ্ঞাপন দেখা যায়, তার প্রথম কাজ কনসেপ্ট ডেস্কেই তৈরি হয়। ছবি আঁকা, ফটো তোলা, কপি লেখা হয়। সেই ভাবনা দেখে বিজ্ঞাপন চূড়ান্ত হয়। শ্রবণ কপি লেখে। কখনও কখনও বিজ্ঞাপন কেমন হবে, সে পরিকল্পনাও দেয়। তবে তার চাকরি পাকা নয়। ফ্রিলান্স। আজকের দিনে বেশিরভাগ চাকরিই পাকা হয় না। টাকাপয়সা যদিও খারাপ পায় না শ্রবণ। ভালোই পায়। এদিক-সেদিক আরও কিছু কাজ করে। মাস গেলে বাড়িতে টাকাও দিতে চেয়েছিল সে। বাবা, দাদা, বউদি কেউই রাজি হয়নি। উলটে ধমক-ধামক দিয়েছে এবং ঠাট্টা করেছে। আসলে তারা শ্রবণকে এখনও সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে ধরে না। তার বুদ্ধি সম্পর্কেও ধারণা ভালো নয়। তার কাজকর্মকে এ বাড়ির কেউ মোটে গুরুত্ব দেয় না।

'বাবা, এ মাস থেকে আমি কিছু কিছু টাকা দিতে চাই।'

শ্রবণের বাবা দীপ্ততোষবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কাকে টাকা দিতে চাও?'

শ্রবণ বলল, 'বাড়িতে।'

boierpathshala.blogspot.com

দীপ্ততোষবাবু আরও অবাক হয়ে বললেন, 'কেন? বাড়িটা কি ব্যাঙ্ক, যে এখানে তুমি মাসে মাসে টাকা জমা করবে?'

শ্রবণ বলে, 'তা কেন? আমি খাওয়াদাওয়ার খরচ দিতে পারি না?'

দীপ্ততোষবাবু একটু চুপ করে থেকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'অবশ্যই পারো। হোটেলে পারো। তোমার কি ধারণা বাড়িটা হোটেল? তুমি সুটকেস নিয়ে সেখানে এসে উঠেছ?'

শ্রবণ বলল, 'হোটেল কেন হবে? বাড়িতে কি টাকাপয়সা দিতে নেই? সংসারে খরচ শেয়ার করা যায় না? তুমি দাও, দাদা দেয়। এবার থেকে আমিও দেব। আমিও তো এ বাড়ির একজন মেম্বার। খাইদাই, জল, ইলেকট্রিক খরচ করি।'

দীপ্ততোষবাবু বললেন, 'ও এই কথা। বেশ ভালো। সংসারের খরচ যদি তুমিও খানিকটা দিতে চাও দেবে। চাকরিবাকরি করে উপার্জন করো, তখন দেখা যাবে। এখন বিরক্ত করছ কেন?'

শ্রবণ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি তো এখনই উপার্জন করি বাবা।'

দীপ্ততোষবাবু ছোট ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলেন, 'উপার্জন করো? কীভাবে করো?'

'বা:, তুমি জানো না? আমি যে...আমি যে বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকি, কনসেপ্ট বানাই, কপি লিখি...তারপর ধরো...কিছু কিছু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করি...ভালোই তো টাকাপয়সা পাই।'

দীপ্ততোষবাবু হাত তুলে বললেন, 'চুপ করো। এসব যে কোনও চাকরি নয় এবং এগুলো যে কোনও উপার্জন নয় তুমি ভালো করেই জানো শ্রবণ।'

শ্রবণ অবাক হয়ে বলে, 'তাহলে এগুলো কী!'

'এগুলো...এগুলো মূলত ইয়ার্কি।'

শ্রবণ এই কথায় আকাশ থেকে পড়ে।

'বাবা, এ তুমি কী বলছ। তুমি জানো আজকাল কত ছেলেমেয়ে এই ধরনের কাজ করে? এইসব কাজই তো এখন ইনথিঙ্ক। ইনোভেটিভ কাজ সব। এখন কি আর আদ্যিকালের মতো দশটা-পাঁচটার অফিস বলে কিছু আছে? বগলে ছাতা আর টিফিন বাক্স নিয়ে ছুটতে হবে? এখনকার জেনারেশন ধ্যাড়ধ্যাড়ে চাকরি খোঁজে না, নিজের পছন্দমতো কাজ খোঁজে। যাদের একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, কল্পনাশক্তি আছে, ছবি আঁকতে পারে, ফিল্ম তুলতে পারে, গাইতে পারে, কম্পিউটার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, তারা কোথাও বাঁধাধরা কাজ করে না। আর তুমি বলছ এগুলো কাজ নয়, ইয়ার্কি!'

দীপ্ততোষবাবু ঠান্ডা অথচ কঠিন গলায় বলেন, 'তোমার লেকচার শেষ হয়েছে শ্রবণ?'

শ্রবণ ফোঁস ফোঁস করে বলে, 'হয়েছে।'

'তাহলে মন দিয়ে যা বলছি শোনো। আবার বলছি, এসব কোনও কাজ নয়, এসব হল ইয়ার্কি। ইয়ার্কি করে কিছু টাকাপয়সা রোজগার করা যেতে পারে কিন্তু তাকে উপার্জন বলা হয় না। তাকে বলা হয় কুড়িয়ে-বাড়িয়ে চলা। আমার সংসারে এখনও কুড়িয়ে-বাড়িয়ে চলা টাকার প্রয়োজন নেই। যখন প্রয়োজন হবে, অবশ্যই বলব। তুমি তখন দিও। এখন বরং মন দিয়ে ভদ্রলোকের মতো কোনও চাকরি-বাকরির চেষ্টা করো। তোমার দাদার মতো ব্যাঙ্কের অফিসার হতে তুমি পারবে না, সে যোগ্যতা তোমার নেই, অন্তত সরকারি অফিসে কেরানি হওয়ার চেষ্টা করো। তখন মাস গেলে উপার্জনের টাকা নিয়ে আসবে। আমি অবশ্যই নেব।'

অপমানিত শ্রবণ এর পর তার দাদা-বউদির কাছে যায়। দাদা বলে, 'এসব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল শ্রবণ। কম্পিটিটিভ পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্য কোনও একটা কোচিং-ফোচিংয়ে ঢুকে যা। ক'মাস পরেই রেলে আর পোস্টাপিসে লোক নেবে শুনছি। ভালো করে পরীক্ষাটা দে।'

বউদি হাসতে হাসতে বলে, 'ও রেলে কী কাজ করবে? রেল চালাবে?'

দাদা বলে, 'দরকার হলে তাই চালাবে? ক্রিম দিয়ে দাঁত মেজে ফর্সা হোন লেখার থেকে তো বেটার।'

boierpathshala.blogspot.com

বউদি চোখ বড় বড় করে বলে, 'হ্যাঁগো শ্রবণ, সত্যি সত্যি তোমাদের ওই ক্রিম দিয়ে দাঁত মাজলে ফর্সা হওয়া যায়?'

শ্রবণ রাগ দেখিয়ে বলে, 'আমি জানি না বউদি। আমি ওই ক্রিমের বিজ্ঞাপনের কপি তো লিখিনি। যে লিখেছে সে বলতে পারবে। দাদা, তাহলে সংসারে আমার টাকার শেয়ার তোরা নিবি না?'

দাদা বলে, 'কে বলেছে নেব না? অবশ্যই নেব। বড় হও, মানুষ হও, তবে নেব। এত হড়বড় করছিস কেন? টাকা দিস না বলে কি তোর কোনও সমস্যা হচ্ছে; খাওয়াদাওয়া কম দেওয়া হচ্ছে?'

মানুষ হও। পঁচিশ বছর শেষ হতে চলল, এখনও কি সে মানুষ হতে পারেনি! এরা তাকে মানুষ বলেই মনে করে না! তবে সে কী? এলেবেলে? এদের সঙ্গে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। শ্রবণ চুপ করে গেছে।

তারপরেও শ্রবণ বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে কেন?

পালাচ্ছে বাধ্য হয়ে। বারিধারা তাকে বলেছে। বলেছে, ভালোবাসার জন্য পৃথিবীতে মেয়েরাই শুধু বাড়ি থেকে পালায়। পালিয়ে বিয়ে করে। তা কেন হবে? ছেলেদেরও পালাতে হবে। এই কথায় শ্রবণ ঘাবড়ে যায়। বলে, 'আমাদের তো এখন বিয়ের কোনও ব্যাপার নেই বারি! খামোকা পালাতে যাব কেন?'

বারিধারা গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছে, 'টেস্ট করে দেখছি। এরকম সিচ্যুয়েশন হলে কী হবে, সেটা আগে থেকে দেখে রাখতে চাইছি। দেখছি, তুমি কি তখন পারবে?'

শ্রবণ বলে, 'পারবার প্রশ্ন উঠছে কেন? তোমার মতো চমৎকার একটা মেয়েকে বিয়ে করলে আমার বাড়ি থেকে আপত্তি করবে কেন?'

বারিধারা সহজভাবে বলে, 'আমার বাড়ি থেকে করবে। তোমার মতো বোকা ও বেকার ছেলের সঙ্গে আমার বাবা কিছুতেই বিয়ে দেবে না। আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর। পালানো ছাড়া আমার কোনও উপায় থাকবে না।'

শ্রবণ জোর করে হেসে বলে, 'যখন হবে তখন দেখা যাবে ধারা। এখন চাপ নিও না।'

বারিধারা মিটিমিটি হেসে বলে, 'কী দেখা যাবে? তখন আমি বাড়ি থেকে পালাব, তাই তো? যেমন সব মেয়েরা করে? সেটি হচ্ছে না চাঁদু, আগে তোমাকে পালিয়ে দেখাতে হবে। এবং সেটা এখনই দেখাতে হবে। আমি জানতে চাই ভালোবাসার জন্য ছেলেরাও বাড়ি থেকে পালাতে পারে কিনা। যদি দেখাতে পারো ভালো, নইলে গুডবাই।'

শ্রবণ এই মেয়েকে হাড়ে হাড়ে চেনে। এ হল ইয়েস-নো মেয়ে। একবার ইয়েস তো ইয়েস, একবার নো তো নো। নড়চড় নেই। বলতে লজ্জা করে, কিন্তু ঘটনা সত্যি যে, সেই এই মেয়েটিকে খুবই ভয় পায়। সকালে হুমকি দিয়ে ফোন বন্ধ করে দিয়েছে।

তাই কোনওরকম কারণ ছাড়াই শ্রবণ আজ বাড়ি থেকে পালাচ্ছে।

নয়

হাম্বা...হাম্বা...

বারিধারার মোবাইলে মেসেজ ঢুকল।

মেসেজ পাঠিয়েছে শ্রবণ। বারিধারা শ্রবণের মেসেজ অ্যালার্ট টোনে গরুর ডাক লাগিয়ে রেখেছে। রোগাভোগা গরুর ডাক নয়, যাকে বলে 'হৃষ্টপুষ্ট গাভি'র ডাক। গম্ভীর, বিজ্ঞ, খানিকটা দার্শনিক। বারিধারা এই কাজ লুকিয়ে করেনি, শ্রবণকে জানিয়েই করেছে। শ্রবণ কিন্তু কিন্তু করেছিল।

'আমার মেসেজ টোনে গরুর ডাক! এটা কি ঠিক হবে বারি?'

বারিধারা দেখতে সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। তার না-রোগা না-মোটা চেহারায় এক ধরনের স্মার্ট, ডোন্ট কেয়ার ব্যাপার আছে। মেয়েরা হিংসে করে, ছেলেরা তাকিয়ে দেখে। মুখের গড়নে তীক্ষ্ণ ভাব। চোখ দুটো

boierpathshala.blogspot.com

বড় এবং উজ্জ্বল। গায়ের রং কালোর দিকে। গায়ের রং কালোর দিকে হওয়ায় বারিধারা গর্বিত। সে মনে করে, যেসব মেয়ের গায়ের রং কালো বা কালোর দিকে, তাদের বুদ্ধি বেশি হয়। এই বিশ্বাসের পক্ষে তার কাছে কঠিন কোনও যুক্তি নেই। সে নাকি বিভিন্ন উদাহরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। তার দিদি মেঘবতী অতি ফর্সা একজন মেয়ে। স্বাভাবিকভাবেই বোনের এই উদ্ভট বিশ্বাসে তার বিরাট আপত্তি। স্কুলে পড়ার বয়সে ঝগড়া, মারপিটও হয়েছে। মেঘবতী বলত, 'তুই একটা উদাহরণ দেখা তো বৃষ্টি, কোন ফর্সা মেয়ের বুদ্ধি কম?'

বারিধারা গম্ভীর মুখে বলেছে, 'কেন! তোর।'

মেঘবতী প্রথমটায় হকচকিয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, 'আমি বোকা?'

বারিধারা বলে, 'অবশ্যই বোকা।'

মেঘবতী চোখ পাকিয়ে বলে, 'এবার পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছি জানিস? অঙ্কে নাইনটি সিক্স। বোকারা অঙ্কে এত নম্বর পায়?'

বারিধারা বলল, 'এই তো তোর বোকামির বড় উদাহরণ। অঙ্কের নম্বর দিয়ে বুদ্ধির বিচার করছিস। শেলি, কিটসের অঙ্কের নম্বর জানিস? খোদ আইনস্টাইন একবার অঙ্কে ফেল মেরেছিলেন জানা আছে তোর? সালভাদোর ঢালি ক্লাস এইটে অঙ্কে কত পেয়েছিলেন বলতে পারবি?'

মেঘবতী ভুরু কুঁচকে বলল, 'সালভাদোর ঢালি? সে কে?'

বারিধারা ফিক করে হেসে বলল, 'আমাদের ক্লাসের মোনালিসা ঢালির ছোটমামা। কুস্তিগির।'

মেঘবতী ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'রাখ তোর কুস্তিগির, আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল শিমলি ফর্সা টুকটুকে মেয়ে। গায়ে হাত দিলে মনে হয় খানিকটা সাদা রং আঙুলে উঠে আসবে। যেমন দেখতে, তেমন বুদ্ধি। জেনারেল নলেজে চ্যাম্পিয়ন। স্কুলের হয়ে যেখানে কুইজে যাবে প্রাইজ নিয়ে ফিরবে। ফর্সা শিমলি বোকা আর তুই কালো হয়ে বিরাট চালাক, না? তোর খালি উদ্ভট কথা।'

বারিধারা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, 'তোর বন্ধু বোকা কিনা বলতে পারব না, তবে জেনারেল নলেজ পারাকে যারা বুদ্ধি বলে তারা যে বোকা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাহলে তো গুগলস সব থেকে বেশি বুদ্ধি। কী বোর্ড টিপে খটাখট প্রশ্ন করবি, স্ক্রিনে ফটাফট উত্তর পেয়ে যাবি। তা বলে কম্পিউটার কি মানুষের থেকেও বেশি বুদ্ধি ধরে? জিকে পারাটাই বুদ্ধির পরিচয়?'

মেঘবতী বলল, 'অবশ্যই।'

বারিধারা বলল, 'এই জন্য তোকে বোকা বলি দিদি। অঙ্কে নাইনটি সিক্স কাজে লাগছে না। কম্পিউটারের যা থাকে, তা হল ডেটা, ইনফর্মেশন, মেমারি। একে বুদ্ধি বলে না। যাদের বুদ্ধি নেই তারা ডেটা, মেমারি এসব নিয়ে বড়াই করে। মানুষের বুদ্ধি আর মেশিনের ডেটার মধ্যে অনেক পার্থক্য। বুদ্ধি মানে দশটা দেশের নাম জানা নয়, অঙ্কের কটা ফর্মুলা মুখস্থ থাকা নয়, বুদ্ধি সামথিং ডিফারেন্ট। ওসব তো কম্পিউটারেই পাওয়া যাবে। আগেকার দিনে স্মৃতিধরকে বিরাট পণ্ডিত বলা হত। যার স্মৃতি বেশি, সেই নাকি বুদ্ধিমান! বোঝো ঠেলা! এখন স্মৃতির কোনও প্রয়োজন নেই, দামও নেই। একশো উনিশের নামতা খামোকা মুখস্থ রাখব কেন? হাতের মোবাইল ফোনেই তো ক্যালকুলেটর পাওয়া যায়। ফালতু ডেটা মাথায় রেখে অহেতুক ব্রেনকে ভারাক্রান্ত করে বোকারা। একশো বছর আগে এসব ধারণা ছিল।'

মেঘবতী বলে, 'তুই বেশি ফরফর করিস বৃষ্টি, বড্ড পাকা হয়েছিস। তাহলে বুদ্ধি কাকে বলে?'

বারিধারা হেসে বলল, 'ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক জেনে মানুষ যখন সেটাকে কাজে লাগায়, সেটাকেই বুদ্ধি বলে। কম্পিউটার তোকে ডেটা দেবে দিদি, কিন্তু কাজে লাগাতে পারবে না। কাজ তোকেই করতে হবে। তার জন্য যে জিনিসটা লাগে, সেটাই বুদ্ধি।'

মেঘবতী ঠোঁট উলটে বলে, 'কী কাজ? অঙ্কে ছিয়ানব্বই পাওয়াটা কাজ নয়? কুইজ কম্পিটিশনে ফার্স্ট হওয়াটা ফালতু?'

boierpathshala.blogspot.com

'ফালতু বলিনি, তবে বিরাট কোনও কাজ নয়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ হচ্ছে। রোজই কেউ না কেউ নম্বর পাচ্ছে, কুইজে প্রাইজ পাচ্ছে। তাতে কী হবে? আসলে নিজের জানাটাকে আর পাঁচজনের জন্য ব্যবহার করা গেলে তবেই সেটা কাজ। সেটা বিজ্ঞানের কোনও ইনভেনশান হতে পারে, ছবি আঁকা হতে পারে, স্টুডেন্টদের ভালো করে পড়ানোও হতে পারে। দেশের জন্য, সোসাইটির জন্য কিছু করাটা সবথেকে বড় কাজ। যাঁরা করেন, তাঁরা কতটা স্মৃতিধর আর অঙ্কে কত নম্বর পেয়েছিলেন কেউ ভাবে না। গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে, অভিনয় করে, কবিতা লিখে মানুষকে আনন্দ দেওয়াটা বা জীবনের কথা, সমাজের কথা বলাটা খুব কঠিন কাজ। এরা নিজের অনুভূতি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই কাজ যাঁরা ঠিকমতো পারেন, সবাই তাঁদের মাথায় তুলে রাখে। যুগে যুগে এটা হচ্ছে। এর জন্য ইচ্ছে লাগে, মনের জোর লাগে, কল্পনা লাগে, সাহস লাগে। আমাদের মায়ের মতো যেসব মহিলা চাকরিবাকরি বা অন্য কিছু করে না, কিন্তু সংসার সামলানোর মতো সব থেকে জটিল আর কঠিন কাজটা সামলায়, তাদের জানবি সব থেকে বেশি বুদ্ধি। সবার প্রয়োজন দেখতে হয়। মান অভিমান বুঝতে হয়। ভাব তো যে বাড়িতে টাকা-পয়সার টানাটানি, সে বাড়ির গৃহিণীকে কত অঙ্ক জানতে হয়! এই খরচ কমিয়ে, ওই খরচ সামলে, এটা এবার বাদ রেখে, ওটা সেবার দিয়ে...পারমুটেশন কম্বিনেশন করতেই থাকে। নইলে তো সংসারই চলত না। এদের তুই অঙ্কে কত দিবি? একশোয় তো দুশো দেওয়া উচিত। কেউ দেয় না। তাদের বুদ্ধির কোনও হিসেবও হয় না। এই যে বাবার মতো মানুষের সঙ্গে মা এতদিন টিকে আছে, তার জন্যও তো বিরাট বুদ্ধি লাগে। আমি হলে কবে ডিভোর্স নিতাম। আসলে সব মিলিয়ে বুদ্ধির বিচার হয়। স্কুল কলেজের পরীক্ষার নম্বর দিয়ে বড় চাকরি হতে পারে, আর কিছু হয় না। চাকরি চলে যাওয়ার পর তাদের কেউ পাত্তাও দেয় না।'

মেঘবতী বলল, 'ইচ্ছে করে তুই বিষয়টা গুলিয়ে দিচ্ছিস বৃষ্টি। বড় চাকরি মানে বড় কাজ নয়? এই যে একজন ইঞ্জিনিয়ার নদীতে ব্রিজ বানান, এটা বড় কাজ নয়?'

বারিধারা বলল, 'অবশ্যই বড় কাজ। খুব ইমপর্টান্ট। তবে জানবি সব পেশাই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি অঙ্কে একশোতে একশো পেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ব্রিজ বানাচ্ছেন, তিনি খুব জরুরি কাজ করছেন। ব্রিজ না থাকলে মানুষ নদীটাই পেরোতে পারত না। নদীর ধারে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হত কখন নৌকা আসবে আর গান গাইতে হত, নদী আপন বেগে পাগলপারা...। আবার যিনি জীবনে এক ফোঁটা পড়াশোনা না করে রোজ সকালে এসে আমাদের বাড়ির ময়লা নিয়ে যান, তিনিও জরুরি কাজ করেন। তিন দিন ময়লা না নিয়ে গেলে অবস্থা হাঁড়ির হাল হয়ে যাবে। বাড়ি থেকে পালিয়ে নদীর ব্রিজে উঠে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে হবে আর অঙ্ক চিবিয়ে খেতে হবে।'

মেঘবতী বলল, 'উইক লজিক। তবু তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম। কিন্তু এসবের সঙ্গে গায়ের রঙের কী সম্পর্ক?'

বারিধারা বলে, 'অবশ্যই আছে। যেমন ধর, আমি বুদ্ধি বিষয়টা কেমন সুন্দর বুঝি, আর তুই তোর ক্লাসের শিমলিকে বিরাট বুদ্ধিমতী ধরে বসে আছিস। তার কারণ তুই বোকা... আমার ধারণা, ফর্সা না হলে এতটা বোকা হতে পারতিস না।'

হেসে ওঠে বারিধারা। মেঘবতী বারিধারার প্রায় গায়ের ওপর উঠে পড়ে। চড়, কিল মারতে থাকে। আদরের মার।

বারিধারা হো হো করে হাসতে হাসতে বলে, 'এই দেখ তুই কত বড় বোকা! বোকা না হলে কেউ গায়ের রং নিয়ে রাগারাগি করে? আহা, ফর্সা বলে তোর তো কোনও দোষ নেই। তুই কেন রাগ করবি? গায়ের রং কি কারও হাতে থাকে রে দিদি? এ হল জিনঘটিত ব্যাপার। জিন যদি না বুঝিস, তাহলে জানবি, ভগবানের হাত। ফর্সা হয়ে জন্মেছিস যখন মেনে নিতে হবে, তাই নিয়ে মাথা কুটে লাভ কী?'

boierpathshala.blogspot.com

কথা শেষ করে বারিধারা আরও জোরে হেসে উঠত। মেয়েদের ফর্সা হওয়াটা যে দু:খের ঘটনা, এই অভিনব তত্ব পেশ করতে পেরে সে খুবই আহ্লাদিত। মেঘবতী বলত, 'তোকে আজ মেরেই ফেলব।'

মেঘবতী বোনের ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। বারিধারা চিৎকার করে ওঠে, 'ওরে বাবা মরে গেলাম রে...।'

এই ঝগড়া দুই বোন অনেকদিন পর্যন্ত চালিয়েছে। কোনও মীমাংসা হয়নি। তবে এটা সত্যি যে বারিধারার সৌন্দর্যে এক ধরনের বুদ্ধির ছাপ আছে। সেটা তার গায়ের রং কালোর দিকে বলে না উজ্জ্বল চোখের জন্য, নাকি লেখাপড়া, আচরণ সবটা মিলিয়ে কে জানে! এসব সঠিকভাবে বলবার মতো কোনও অঙ্কের ফর্মুলা নেই, জেনারেল নলেজও নেই। প্রেমিকার বুদ্ধির এই ছাপকে শ্রবণ অবশ্য 'রাগ' ভাব বলে মনে করে। তার ধারণা, বারিধারা তার ওপর বেশিরভাগ সময়েই রেগে থাকে। যে-কোনও সময় বকাবকি শুরু করে দেবে। প্রেমিকার বকাবকিতে তার কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা হল, কেন রাগ, সেটাই বেশিরভাগ সময় বোঝা যায় না। সে কি বোকা প্রেমিক? নার্ভাস? নাকি গদগদ টাইপ? মনে হয় শেষেরটাই হবে। এই যুগে একজন স্মার্ট, বুদ্ধিমান ছেলের গদগদ টাইপ প্রেমিক হওয়া খুবই দু:খের ঘটনা। একথা শ্রবণ জানে না এমন নয়, জানে, তবু নিজেকে বদলাতে পারে না। বারিধারাকে দেখলে বা কথা বললে তার যেমন নার্ভাস লাগে, তেমন প্রেমও উথলে ওঠে। মোবাইল মেসেজে হাম্বা রবের ঘটনাটাই ধরা যাক না কেন। এই ব্যাপারে তার আপত্তি হওয়া উচিত ছিল জোরালো। কিন্তু পারেনি। মৃদু আপত্তিতেই বারিধারা ধমক দিয়েছিল।

'কেন? ঠিক হবে না কেন?'

শ্রবণ আমতা আমতা করে বলল, 'না, কোনও কারণ নেই, তবে একেবারে গরু?'

বারিধারা চোখ পাকিয়ে বলল, 'গরুর ডাক খারাপ নাকি? তুমি জানো এই ডাক আমি কত কষ্ট করে খুঁজে বের করেছি? ইউ টিউব ঘেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাঘ, সিংহ সব পাই, গরু পাই না। শেষে অনেক কষ্টে পেয়েছি। তাছাড়া এটা তো এদেশের গরুর ডাক নয়, অস্ট্রেলিয়ার গরুর ডাক।'

শ্রবণ মাথা চুলকে বলে, 'অস্ট্রেলিয়ান হোক আর জাপানি হোক, ধারা, গরু তো গরুই...।'

বারিধারা খেপে যায়। বলে, 'তাহলে কি তোমার মেসেজে পাখির ডাক লাগাব? কোকিলের মতো কু কু করে ডাকবে? আর সত্যি কথা বলতে কী, তোমার মেসেজগুলোর সঙ্গে গরুর ডাক মানানসই বলে আমার মনে হয়।'

শ্রবণ হতাশ গলায় বলে, 'কেন?'

বারিধারা মুচকি হেসে বলল, 'সে বলা যাবে না।'

গাড়ির মধ্যে বারিধারা মোবাইল তুলে মেসেজ পড়ল। শ্রবণ লিখেছে—

'তোমার কথা শুনে বাড়ি থেকে পালালাম।'

বারিধারা হেসে ফেলল। এই কারণে ছেলেটাকে ভালো না বেসে পারা যায় না। তার কথা শোনে বলে নয়, ছেলেমানুষির জন্য। পাগল একটা। শ্রবণের নম্বর টিপতে গেল বারিধারা। মেসেজের টোনে গরুর হাম্বা ডাক রাখলেও, ফোনের লিস্টে শ্রবণকে সে রেখেছে 'চিরসখা' নামে। এটা কেউ জানে না। শ্রবণও না। এই নাম তার গোপন। রবি ঠাকুরের চিরসখা... গানটা তার মা বড় চমৎকার গায়। মায়ের গানের কোনও চর্চা নেই। কোনও দিন গুছিয়ে গান গাইতে বসেছে বলে মনে পড়ে না। যখন ইচ্ছে হয়, ছেঁড়া ছেঁড়াভাবে গান করে। কখনও রান্না করতে করতে, কখনও ঘর গোছাতে গোছাতে। দুই বোন চাপাচাপি করলেও লাভ হয় না। শুধু কমলকান্তি সেন ব্যতিক্রম। বুড়োমানুষটা বললে 'না' করতে পারে না। তবে তিনি বলেনও ন'মাসে, ছ'মাসে একবার। মায়ের গলায় বারিধারা এই গান প্রথম শোনে। শুনেছিল ঠাকুরদার ঘরে। মা মোড়ায় বসে খালি গলায় গাইছিল। কমলকান্তি তাঁর ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুনছিলেন। বারিধারার মনে হয়েছিল, কত স্বচ্ছন্দে মা গাইছে! যেন বাইরে কোথাও নয়, এই গান তৈরি হয়েছে মায়ের ভিতরে। শান্ত নির্জন দিঘিতে যেমন আপনমনে ঢেউ তৈরি হয়, কেন হল, কীভাবে হল তাতে কিছু যায় আসে না, যেমন

boierpathshala.blogspot.com

অল্প বাতাস কাউকে না বলে গাছের পাতা আলতো ছুঁয়ে দেয়, কেন ছুঁল কাউকে বলে না, অনেকটা সেরকম! বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। মা গাইল—

"চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।
সংসারগহনে নির্‌ভয়নির্‌ভর, নির্‌জনসজনে সঙ্‌গে রহো।।
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল।
জরাভারাতুরে নবীন করো ওহে সুধসাগর।।"

কমলকান্তি সেনকে সেদিন কাঁদতে দেখেছিল বারিধারা। গান শেষ হলে তিনি চোখ খুলে এবং জল না মুছে এক গাল হেসে মাকে বললেন, 'তোমার গান শুনে খুব আনন্দ পেলাম মণিকুন্তলা। দু:খে চোখের জল ফেলা বড় কথা নয়, আনন্দে চোখে জল আনা খুব কঠিন কাজ। তুমি সেই কঠিন কাজ পেরেছ।'

মা মুখ নামিয়ে বলেছিল, আমি পারিনি বাবা, রবি ঠাকুর পেরেছেন। সেদিনই বারিধারা তার মোবাইল ফোনে শ্রবণের নাম মুছে লেখে 'চিরসখা'।

বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া 'চিরসখা'কে ফোন করতে গিয়ে বারিধারা থমকে গেল। গাড়ির চালক নন্দকাকা যথারীতি দিদির বাড়ির রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছে। গাড়ি ঢুকেছে বালিগঞ্জের ভুল গলিতে। চক্কর খাচ্ছে।

দশ

'জ্যাতিষ্কদা, লোকটা কে?'

'ইনি একজন বংশীবাদক বারিধারা। বাঁশি বাজান।'

'বংশীবাদক তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু আপনি কোথা থেকে একে কালেক্ট করলেন?'

জ্যোতিষ্ক চোখমুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'রাস্তা থেকে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মূল্যবান জিনিসই রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। যদি চাও, আমি উদাহরণ দিয়ে এই সেটমেন্ট প্রমাণ করতে পারি। করব?'

বারিধারা কৌতুকভরা গলায় বলল, 'কোনও প্রয়োজন নেই। আমি আপনার কথা প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আপনি এই বংশীবাদককে কোন রাস্তা থেকে এনেছেন? গ্রামের রাস্তা? গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ?'

জ্যোতিষ্ক গদগদ ভঙ্গিতে বলল, 'না, ঠিক রাস্তা নয়, জগুবাবুর বাজার। বাজারের পাশে চায়ের দোকান...সেখানে উনি বসেছিলেন।'

বারিধারা গুছিয়ে বসল। ঘটনা মনে হচ্ছে চমকপ্রদ। জামাইবাবু মানুষটাকে বারিধারার খুবই ইন্টারেস্টিং লাগে। সরকারি অফিসে বড় পোস্টে চাকরি করে। সেই চাকরিতে যথেষ্ট যুক্তি-বুদ্ধি এবং হিসেব লাগে। কিন্তু মানুষটা মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে বসে যে, আঁতকে উঠতে হয়। সেই সব 'কাণ্ড' যুক্তি-বুদ্ধি বা হিসেবের ধারপাশ দিয়ে যায় না। প্রথমে মনে হয়, লোকটা কি পাগল! নাকি বোকা? গরু-গাধারাও তো আজকাল হিসেব করে চলে। হিসেব করে ঘাস খায়, হিসেব করে ডাকে। হিসেব করে বাঘের চামড়া পরে, তারপর বাঘ সেজে হিসেব করে হালুম-হুলুম করে অন্যকে ভয় দেখায়। চারপাশে গরু-গাধা ভালো, কিন্তু শুধু গরু-গাধা ভালো নয়, বাঁচতে গেলে কিছু মানুষও লাগে। বারিধারার মতে তার জামাইবাবু একজন চমৎকার মানুষ। একটু যা 'আউট অফ সিলেবাস'। জানার বাইরে। তার দিদি এই মানুষটার জন্য মাঝে মাঝে কঠিন ঝামেলায় পড়ে। ঝামেলা নয়, বলা উচিত যন্ত্রণা। সে তো পড়তে হবেই। আউট অব সিলেবাস মানুষের সঙ্গে ঘর করতে গেলে যন্ত্রণায় পড়তে হবে না? মা-বাবাও জামাইয়ের কীর্তি অনেক সময় নিতে

boierpathshala.blogspot.com

পারে না। বিরক্ত হয়ে যায়। আবার কিছু বলতেও পারে না। কিছু বলতে গেলে বড় মেয়ে রাগারাগি করবে। প্রথমে রাগারাগি, তারপরে কান্নাকাটি। বারিধারার কাছে এটাও মজার। সেরকম কিছু ঘটলে দিদি বাড়িতে চলে আসে। এসে বলে, 'মা, তুমি আর বাবা নাকি আজ সকালে জামাইকে ফোন করেছিলে?'

মা বলে, 'অবশ্যই করেছিলাম। চেনে না জানে না একটা লোককে মেয়ের বিয়ের জন্য গাদাখানেক টাকা দিয়ে বসেছে, তার পরেও তাকে ফোন করব না? পরে দেখা গেল, লোকটার কোনও মেয়েই নেই। কত বড় চিটিংবাজ! জ্যোতিষ্কর এই পাগলামি এবার বন্ধ করা দরকার।'

যে মেয়ে গতকাল বরের ওপর রেগে কাঁই হয়েছিল, সে আজ পুরো ডিগবাজি খায়। বরকে ডিফেন্ড করবার চেষ্টা করে। শান্তভাবে বলে, 'মেয়ে নেই তো কী হয়েছে মা? হয়তো ভাইঝি আছে, ভাগনি আছে। হয়তো তাদের কারও বিয়ের জন্য তোমাদের জামাইয়ের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল। মেয়ের বিয়েতে টাকা লাগে আর ভাইঝি, ভাগনির বিয়েতে লাগে না, এমন তো কোথাও লেখা নেই মা।'

মা অবাক হয়ে বলল, 'হয়তো! এতগুলো হয়তো মানে কী? হয়তোর ওপর দাঁড়িয়ে জ্যোতিষ্ক একটা লোককে অতগুলো টাকা দিয়ে দিল! ও কি পাগল?'

দিদি শান্তভাবে বলল, 'অচেনা মানুষ তাই হয়তো বলছি মা। আমার তো তার গুষ্টির খবর জানা নেই। চেনা হলে মেয়ে না ভাইঝি না ভাগনি সিওর বলতে পারতাম।'

দিদির এই উদ্ভট যুক্তিতে মা খুবই অবাক হয়। বারিধারা হেসে ফেলে। বরকে সমর্থন করতে গিয়ে দিদি যা খুশি বলছে!

মা বলল, 'এটা কোনও কথা হল মেঘ?'

দিদি বলল, 'কথা হবে না কেন। অবশ্যই হল। তোমাদের কথা কথা আর তোমাদের জামাইয়ের কথা কথা নয়। সে কি কচ্ছপ? বোবা হয়ে জন্মেছে?'

মা কঠিন গলায় বলল, 'তাহলে তুই কাল আমাকে বললি কেন? বললি কেন, জ্যোতিষ্ক কাকে না কাকে টাকা দিয়েছে... বল বললি কেন?'

'বা:, আমার একটা সমস্যার কথা তোমাদের বলতে পারব না? বিয়ে হয়েছে বলে আমি কি তোমাদের কেউ নই?'

বারিধারা বুঝতে পারে, দিদি এবার সম্পূর্ণ অন্য কথায় চলে গেছে। ঠোঁট ফোলানো ধরনের কথা, কান্নার প্রিপারেশন।

মা নরম গলায় বলল, 'আমি কি সে কথা বলেছি? কাল রাতে তোর বাবাকে ঘটনাটা বললাম। বললাম, জ্যোতিষ্কর এইসব খ্যাপামি এবার বন্ধ করা উচিত। তোর বাবাও গেল রেগে। বলল, ওই ছেলের মধ্যে সিরিয়াস বোধের খুব অভাব। আমি কাল সকালে কথা বলব। তারপর আজ সকালে ফোন করেছে। তখন আমিও জ্যোতিষ্কর সঙ্গে কথা বলেছি।'

দিদি ধরা গলায় বলল, 'কথা বলেছি বলছ কেন মা? ধমক দিয়েছি বলো। তোমরা ওকে ধমক দিয়েছ।'

মা ভুরু কুঁচকে মেয়েকে বলল, 'ধমক দিয়েছি কে বলল? জ্যোতিষ্ক নালিশ করেছে?'

বৃষ্টির আগে মেঘ যেমন গুড়গুড় করে ওঠে, দিদিও নাক টানল। কান্নার পূর্বাভাস। বলল, 'আমার স্বামী যদি আমাকে কিছু বলে, সেটা নালিশ করা হল? বাবা যে তোমাকে কতকিছু বলে, সেটা কি নালিশ? জ্যোতিষ্ক কি নালিশ করবার মতো ছেলে? তাকে তোমরা এতদিনে এই চিনলে মা? সে আমাকে বলল, তোমার বাবা-মা আমাকে ফোন করেছিল। তাতেই আমি ধরে নিয়েছি।'

মা খেপে যায়। বড়মেয়েকে বলে, 'অ্যাই তুই ফ্যাচফ্যাচানি বন্ধ কর তো। জ্যোতিষ্ক ছোট বাচ্চা নাকি যে তাকে ধমক দেব? যদিও তাই উচিত ছিল। এরপর থেকে তাই করব। তোর পছন্দ না হলে জ্যোতিষ্কের পাগলামি নিয়ে আর কোনওদিন আমাকে বলতে আসবি না। বর তোর, তোর পাগলামি, বোকামিও তোর। তুই সামলাবি।'

boierpathshala.blogspot.com

'আমি কি তোমাদের সামলাতে বলেছি?'

মা এবার জোরে ধমক দেয়।

'চুপ কর। একদম চুপ কর। যেমন বর তেমন তার বউ... একজন দানছত্র খুলে বসেছে, অন্যজন তাতে হাততালি দিচ্ছে... দুটোতে ভালো জুটেছে...। আমার চোখের সামনে থেকে যা এখন।'

এই ঘটনার অবধারিত ফলাফল হল, দিদি ওপরের ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ ফিচফিচ করে কাঁদবে। তারপর চোখের জল মুছে, গালে হালকা পাউডার দিয়ে গুনগুন করে গান করতে করতে নীচে যাবে। মায়ের কাছে আমের আচার খেতে বসবে। আচার খেতে খেতে দুজনে নীচু গলায় হেসে হেসে গল্প শুরু করবে। এই সময় বারিধারাকে তাদের ধারেকাছে ভিড়তে দেওয়া হবে না। গেলে তাড়া খাবে।

'এখানে তোর কী চাই?'

'কী চাই মানে! আমার বাড়িতে আমি যেখানে খুশি যাব।'

'না, এখন যাবি না। এখন আমি আর মা গল্প করব। তুই তো সারাদিনই মাকে পাস। এই একঘণ্টা আমার। যা ভাগ।'

মা বলবে, 'দিদি ঠিকই তো বলছে। তুই আর দিদি যখন আড্ডা মারিস, আমাকে ঘরে ঢুকতে দিস? এখান থেকে তুমি এখন যাও বৃষ্টি। যাওয়ার আগে খানিকটা আচার নিয়ে যাও।'

বকুনি, চোখের জল অতি দ্রুত গভীর ভাব-ভালোবাসায় ট্রান্সফার হয়েছে। বারিধারা মজা পায়। সে মুখ ভেংচে বলে, 'বয়ে গেছে তোমাদের আচার খেতে, বয়ে গেছে তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে।'

জ্যোতিষ্কদার বেহিসেবি কাণ্ড, দিদির যন্ত্রণা, বাপেরবাড়িতে দিদির অভিযোগ, জামাইকে বাবা-মায়ের ধমক, দিদির কান্না, মায়ের সঙ্গে আচার ভক্ষণ—সবটাই বারিধারা খুব এনজয় করে। নাটকের মতো। একটার পর একটা সিকোয়েন্স।

এখন যেমন নতুন সিকোয়েন্স শুরু হয়েছে।

মেঘবতী সোফায় চুপ করে বসে আছে। তার মুখ থমথমে, চোখ ছলছল। চোখ ছলছল দুটো কারণে হয়। এক, কান্না হবে, দুই, কান্না হয়ে গেছে। মেঘবতীর বেলায় একই সঙ্গে দুটো কারণ কাজ করছে। সে খানিক আগে কেঁদে উঠল এবং সে যে-কোনও মুহূর্তে আবার কেঁদে ফেলতে পারে। স্বামী জগুবাবুর বাজার থেকে একজন ভিখিরিকে যদি বাড়িতে তুলে নিয়ে আসে, তাহলে অতি বড় কঠিন স্ত্রীও চোখ ছলছল করে বসে থাকবে। মেঘবতী একই সঙ্গে চিন্তিত, ক্র[illegible]দ্ধ এবং অপমানিত। স্বামীর মাথায় যে কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে, সেটা বিয়ের পর পরই মেঘবতী বুঝতে পেরেছিল। রাস্তাঘাটে 'সমস্যায় পড়া' কাউকে দেখলে এই লোক নিজেকে সামলাতে পারে না। অস্থির হয়ে পড়ে। 'কিছু একটা' করতে চায়। এসব ক্ষেত্রে সমস্যা সত্যি কিনা সে বিচারও করে না। গোড়ার দিকে মেঘবতী তার সঙ্গে ঝগড়াও করেছে। একবার রাস্তায় দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সাহায্য করতে গিয়ে ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনা ছিল এরকম—

'তুমি কী করে বুঝতে পারছ যে উনি সমস্যায় পড়েছেন?'

জ্যোতিষ্ক শান্তভাবে স্ত্রীকে বলে 'বোঝাবুঝির কী আছে মেঘ? সমস্যা দেখতে হয়, বুঝতে হয় না। এটাই তো আমাদের দেশের সিস্টেমে সব থেকে বড় অসুখ। সিস্টেম মানুষের সমস্যা দেখতে পায় না, বুঝতে চেষ্টা করে। বুঝতে বুঝতে সময় চলে যায়। সমস্যা বাড়তে থাকে... বাড়তে থাকে... বাড়তেই থাকে। তখন নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হয়। একটা সমস্যা আর একটার সঙ্গে গিঁট পাকিয়ে যায়। সেই গিঁট বেশিরভাগ সময়েই খোলা যায় না। মানুষ বাধ্য হয়ে সমস্যার মধ্যে পড়ে থাকে। সরকারি কাজে এটাই কমন প্র্যাকটিস মেঘ। কোনও সমস্যা হলে আগে ফাইল চালু করো। তারপর মিলিয়ে দেখো, খাতায়-কলমে যাকে সমস্যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে ফাইলের সমস্যা মিলছে কিনা। যদি মেলে, তখন সিস্টেম ঢুকবে পরবর্তী পর্যায়ে। বুঝতে হবে, এই সমস্যা সমাধানে টাকা পেতে সমস্যা আছে কি না। সমস্যা থাকাটাই স্বাভাবিক। গরিব দেশে টাকার সমস্যা থাকবে না, তো কী থাকবে? তাহলে চালু হবে নতুন সমস্যার ফাইল।'

boierpathshala.blogspot.com

মেঘবতী তার স্বামীকে থামাতে চায়।

'তুমি ভাষণ বন্ধ করো। এটা তোমার সরকারি দপ্তর নয়, আমি তোমার দপ্তরের কর্মী নই। আমার বিরক্ত লাগছে।'

জ্যোতিষ্ক থামে না। বলে, 'যখন শুরু করেছি, তখন শেষ করতে দাও প্লিজ। এটা তোমার জানা উচিত। শুধু তোমার কেন, সবার জানা উচিত।'

মেঘবতী হতাশ গলায় বলে, 'আচ্ছা বল, আমি কান বন্ধ করে রাখছি।'

জ্যোতিষ্ক বলে, 'সমস্যা ফাইলে যদি ডাউট দেখা যায়, তাহলে গেল। সমস্যা গিয়ে পড়বে বিশবাঁও জলে। ডিপার্টমেন্টে পাঠাও। ক্ল্যারিফিকেশন চাই। সেখান থেকে আরেক ডিপার্টমেন্ট...সেখান থেকে আরেক ডিপার্টমেন্ট...সেখান থেকে আরেক...মানুষের সমস্যা ফাইলের তলায় চাপা পড়তে থাকে। পড়তেই থাকে। যে বেচারি সমস্যায় পড়েছে, সে একবার এই টেবিল একবার ওই টেবিলে মাথা কুটে মরে। তাকে বলা হয়, আরে মশাই, আপনি যে খেতে পাচ্ছেন না সে তো আপনার চেহারাতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেখলে তো হবে না, বুঝতে হবে। আপনার পেটে খেতে না পাওয়া আর আমাদের নিয়মে খেতে না পাওয়া এক কিনা বুঝতে হবে না? তবেই আপনার পাওনা টাকা-পয়সা দিতে পারব। চিন্তা করবেন না, মাস ছয়েক আরও কষ্ট করুন। প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে।'

মেঘবতী কড়া গলায় বলে, 'তুমিও তো এই সিস্টেমে কাজ করো। তুমিও দায়ী।'

জ্যোতিষ্ক হেসে বলে, 'অবশ্যই দায়ী। দায়ী বলেই তো ব্যক্তিগতভাবে প্রায়শ্চিত্ত করে বেড়াই মেঘ। সিস্টেম ভাঙি। ফাইল ছুড়ে ফেলে দিই। মিটিং ডাকি না। বোঝার বদলে মানুষের সমস্যা দেখে রিঅ্যাক্ট করি। চাকরিতে যে কাজ পারি না, বাইরে সেই চেষ্টা করি। আমার আর কতটুকু সাধ্য বলো।'

মেঘবতী স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, 'ও, এই তোমার পালামির কারণ?'

জ্যোতিষ্ক বলে, 'পাগলামি?'

মেঘবতী কড়া গলায় বলে, 'অবশ্যই পাগলামি। পাগলামি ছাড়া কী? মানুষের সমস্যা মনে হলেই লাফিয়ে গিয়ে পড়ছ, সেটা পাগলামি নয়? তুমি কি রাজাবাদশা? টাকার কুমির?'

জ্যোতিষ্ক মুচকি হেসে বলে, 'আমি টাকার কুমির নই মেঘ। সামান্য সরকারি কর্মচারী। সমস্যায় পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে সব সময় টাকা লাগে না। তার পিঠে হাত রাখলেও অনেকটা করা হয়। কতটুকুই বা আমি করতে পারি? কিছুই নয়। মানুষের কত বড় বড় সব সমস্যা... আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী যাতায়াতের পথে যতটুকু দেখি... বললাম তো এটা খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত বলতে পারো, শখ বলতে পারো, বদভ্যাস বলতে পারো। সকলেরই তো কত বদভ্যাস থাকে...।'

কথা শেষ করে জ্যোতিষ্ক আওয়াজ করে হেসে ওঠে। মেঘবতীর গা জ্বলে যায়। সে বলে, 'হাসছ কেন? একদম হাসবে না। তারপর গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওই লোক যে সমস্যায় পড়েছে বুঝতে পারছ কী করে?'

জ্যোতিষ্ক গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। স্ত্রীর সঙ্গে বক বক করলেও, তার চোখ রাস্তার উলটোদিকে।

'তুমিও বুঝতে পারবে। এত রাতে একজন বৃদ্ধ মানুষ হাতে ঢাউস একটা সুটকেস নিয়ে রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাসে উঠছেন না, ট্যাক্সিও ডাকছেন না। তার মানে কী? মানে একটাই। উনি সমস্যায় পড়েছেন। অত বড় সুটকেস নিয়ে বাসে উঠতে পারছেন না। অথবা ট্যাক্সি ভাড়া নেই। আমি ঘটনাটা দেখেই গাড়ি দাঁড় করিয়েছি।'

মেঘবতী রাগী গলায় বলল, 'তুমি এখন কী করবে? গিয়ে ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে আসবে? নাকি আমরা সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?'

boierpathshala.blogspot.com

জ্যোতিষ্ক খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'টাকা-পয়সা দিতে গেলে অপমানিত হতে পারেন। আমি বরং...দাঁড়াও গিয়ে কথা বলি। কাছাকাছি কোথাও যেতে চাইলে একটা লিফট দিতে পারি।'

জ্যোতিষ্ক গাড়ির দরজা খুলে নামল। খানিকটা হেঁটে বৃদ্ধ মানুষটির কাছে গেল এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে জ্যোতিষ্ককে ধরল।

এগারো

অপকারীর বিপদ আসে যেচে, পরোপকারীর বিপদ আসে নেচে।

এই প্রবাদ কোনও সত্যি প্রবাদ নয়, মেঘবতীর বানানো। বরের জন্য বানিয়েছে। এর মানে হল, কারও অপকার করলে বিপদ নিজে থেকেই ডেকে আনা হয়, কিন্তু কারও উপকার করলে উপকারীর কাছে বিপদ আসে নাচতে নাচতে।

বিপদ কেমন নাচতে নাচতে আসে সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল মেঘবতী। বরের পাগলামির জন্য আর একটু হলে পুলিশ ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল। অহেতুক কারণে কাঁদতে ভালোবাসলেও, কঠিন পরিস্থিতিতে মেঘবতী কখনও কান্নাকাটি করে না। নার্ভাস হয় না। অন্য যে-কোনও মেয়ে এই ঝামেলায় পড়লে আগে 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলত। মেঘবতী সেদিন ঠান্ডা মাথায় ঝামেলা সামলেছে।

ঘটনা ছিল এরকম—

রাস্তায় ঢাউস সুটকেস হাতে 'অসহায়' বৃদ্ধ মানুষকে দেখে 'প্রাণ কেঁদে উঠেছিল' জ্যোতিষ্কর। আহারে, মানুষটা নিশ্চয় সমস্যায় পড়েছে! হয়তো ট্যাক্সির ভাড়া পকেটে নেই। এদিকে অতবড় সুটকেস নিয়ে বাসেও উঠতে পারছেন না। অন্তত খানিকটা পথ গাড়িতে এগিয়ে দিলে উপকার হবে। এই ভেবে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে গিয়েছিল জ্যোতিষ্ক। বুঝতে পারেনি, একটু পরে গাড়ি থেকে মেঘবতীও নেমে এসেছে। পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। সম্ভবত, তার স্বামী ভদ্রলোকটি বাড়াবাড়ি কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন, সেটা আরও একবার নতুন করে জানবার কৌতূহল হয়েছিল।

'নমস্কার, আপনাকে আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি।'

বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ান। জ্যোতিষ্কর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলেন, 'কে আপনি?'

জ্যোতিষ্ক নাটকীয়ভাবে বলে, 'কেউ নই। একজন পাসারবাই। পথচলতি মানুষ বলতে পারেন।'

বৃদ্ধ সন্দেহ ভরা গলায় বলেন, 'আমাকে লক্ষ করছেন মানে!'

জ্যোতিষ্ক হেসে হাত তুলে বলল, 'টেনশনের কিছু নেই মেসোমশাই। আপনাকে আমি আর আমার স্ত্রী গাড়ি থেকে লক্ষ করছিলাম। মনে হল, নিশ্চয় আপনি কোনও সমস্যায় পড়েছেন। তাই গাড়ি থেকে নেমে আপনার কাছে এসেছি। মে আই হেল্প ইউ?'

বৃদ্ধ এবার অবাক হয়ে, চোখ বড় করে বললেন, 'আমি সমস্যায় পড়েছি! কীসের সমস্যা?'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'মেসোমশাই, আপনি লজ্জা পাবেন না। এত বড় একটা সুটকেস নিয়ে ট্যাক্সির জন্য ছোটাছুটি করছেন, এটা একটা সমস্যা নয়?'

বৃদ্ধ চোখ কপালে তুলে বললেন, 'ট্যাক্সি! ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে যাব কেন!'

এবার জ্যোতিষ্কর অবাক হওয়ার পালা।

'তবে কি বাস? এই সুটকেস নিয়ে বাসে উঠবেন কী করে? রাতের দিকে বাস কমে যায়। তাই ভিড় থাকে খুব।'

বৃদ্ধ তেড়েফুঁড়ে বললেন, 'বাসে উঠব, কে বলল আপনাকে?'

জ্যোতিষ্ক থতমত খেয়ে বলল, 'ট্যাক্সি, বাস কিছুই নয়! রিকশা খুঁজছেন? রিকশায় বাড়ি ফিরবেন? এই বড় রাস্তায় কি রিকশা পাবেন? তাও আবার এত রাতে... গলিটলিতে ঢুকে যদি...।'

boierpathshala.blogspot.com

বৃদ্ধ গম্ভীর গলায় বললেন, 'ট্যাক্সি, বাস, রিকশা আমার কিছুই লাগবে না। আমার ছেলে এখনই গাড়ি নিয়ে আসছে। আমি এগিয়ে গিয়ে সেটাই দেখছি। ছোটাছুটি কিছু করিনি। আপনি ভুল বুঝেছেন।'

জ্যোতিষ্ক থমকে যায়। তাহলে সমস্যা নয়! স্মার্ট হাসবার চেষ্টা করে সে। মাথা চুলকে, আমতা আমতা করে বলল, 'ও হো, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, আপনি প্রবলেমে পড়েছেন। সরি মেসোমশাই।'

বৃদ্ধ হাত নেড়ে তাড়াবার ভঙ্গিতে বললেন, 'এবার তো বুঝেছেন, তাহলে যান। নিজের কাজ করুন গিয়ে। আর আমাকে মেসোমশাই ডাকছেন কেন? আমি তো আপনার মেসোমশাই নই।'

জ্যোতিষ্ক দু পা এগিয়ে গিয়ে গদগদ ভঙ্গিতে বলল, 'সরি স্যার... আপনি বরং সুটকেসটা আমাকে দিন। অত ভারী জিনিস...যতক্ষণ না আপনার ছেলের গাড়ি আসে আমি ওটা ক্যারি করছি। নো প্রবলেম। দিন আমাকে।'

কথা শেষে জ্যোতিষ্ক হাত বাড়ায়। বৃদ্ধ চমকে ওঠেন। আঁতকে ওঠেন বলা যায়। লাফ দিয়ে পিছিয়ে যান কয়েক পা। ধড়ফড় করে বলে ওঠেন, 'না না, আপনি আমার সুটকেসে হাত দেবেন না। মোটে হাত দেবেন না। খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

জ্যোতিষ্ক অবাক হয়ে বলে, 'কেন স্যার, এনি প্রবলেম?'

বৃদ্ধ চিৎকার করে বলেন, 'এ কী কথা। আপনি আমার সুটকেস চাইছেন কেন? আমি পুলিশ ডাকব...।'

জ্যোতিষ্ক বলে, 'পুলিশ! পুলিশ ডাকবেন কেন? সমস্যা কী?'

কথার ফাঁকেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। জানলার কাচ নামিয়ে কেউ একজন ডাকল, 'বাবা, চলে এসো।'

বৃদ্ধ যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বাসস্টপ থেকে লাফ মেরে রাস্তায় নামেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'ভলু...ভলু...তাড়াতাড়ি দরজা খোল ভলু...লোকটা আমার সুটকেস কেড়ে নিতে চাইছে...ছিনতাই...।'

'ভলু'র দামি, বিদেশি গাড়ির দরজা খুলে যায়। আতঙ্কিত বৃদ্ধ নিমেষে সুটকেস সমেত সেঁধিয়ে যান ভিতরে। হতভম্ব জ্যোতিষ্ককে ফেলে গাড়ি চলে যায় ভুস করে। মেঘবতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার স্বামীর পাশে এসে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'হল তো?'

বউয়ের গলা শুনে জ্যোতিষ্ক একটু চমকে যায়। নিজেকে সামলে, পাশ ফিরে বলে, 'তুমি! কী হল মেঘ?'

মেঘবতী চাপা গলায় বলল, 'শিক্ষা হল না? আমি তো সেই কারণেই গাড়ি থেকে নেমে এসেছি। পরোপকরের লেসন তোমার কেমন হয় দেখব বলে।'

জ্যোতিষ্ক অবাক হয়ে বলল, 'কীসের শিক্ষা!'

মেঘবতী ক্রোধ ও বিস্ময় মেশানো গলায় বলল, 'এর পরেও বলছ কীসের শিক্ষা! রাস্তার একজন অপরিচিত কে না কে, একটা বুড়ো, তোমাকে ছিনতাইবাজ বলে চলে গেল। তার পরেও বলছ কীসের শিক্ষা! তোমার লজ্জা করছে না? পরোপকার করতে গেলে কীভাবে অপমানিত হতে হয়, এখনও বুঝতে পারছ না?'

জ্যোতিষ্ক হেসে বলল, 'দুর এসব ছোটখাটো মান-অপমান গায়ে মাখলে চলে? বৃদ্ধ মানুষটি যে আসলে কোনও সমস্যায় পড়েননি, এটাই তো আনন্দের কথা মেঘ। আমরা ভুল ভেবেছিলাম জেনে ভালো লাগছে। আমি আশা করব, এভাবে বার বার আমাদের ভুল ভাঙুক। চলো এবার ফেরা যাক। রাত হতে চলল। খিদে পাচ্ছে। আজ ডিনারে স্পেশাল আইটেম কী?'

মেঘবতী বলল, 'আচ্ছা মানুষ তো তুমি? এতবড় অপমানের পর নির্বিকারভাবে বলছ ডিনার কী!'

জ্যোতিষ্ক 'হো হো' আওয়াজে হেসে উঠল। মেঘবতী বলল, 'চুপ করো। একদম চুপ করো। এরপর থেকে তুমি যখন মাঝরাস্তায় গাড়ি থামিয়ে কাউকে উপকার করতে যাবে, দয়া করে আমাকে একটু আগে জানাবে।'

জ্যোতিষ্ক মুচকি হেসে বলল, 'কেন? তুমি কী করবে?'

মেঘবতী বলল, 'গাড়ি থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাব। কেউ আমার হাজবেন্ডকে ছিনতাইবাজ বলবে আর আমি দাঁড়িয়ে থেকে সেটা শুনব, এটা টু মাচ। আমি মেনে নিতে পারছি না। আজ

boierpathshala.blogspot.com

ছিনতাইবাজ বলছে, কাল চোর বলবে, পরশু ডাকাত বলবে।'

জ্যোতিষ্ক হাসতে হাসতে গাড়ির দরজা খুলল। আর তখনই সামনে পথ আটকে একটা পুলিশ জিপ এসে থামে। টহলদার পুলিশের জিপ। টক করে একজন উর্দি পরা অফিসার ধরনের যুবক এগিয়ে এল।

'এই যে মিস্টার এক মিনিট দাঁড়াবেন।'

জ্যোতিষ্ক ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমাকে বলছেন! কী হয়েছে?'

পুলিশ অফিসার বলল, 'হয়নি কিছু। আপনাদের নামে একটা কমপ্লেইন পেলাম, সেটাই ভেরিভাই করতে এসেছি।'

মেঘবতী বিড়বিড় করে বলল, 'কমপ্লেইন! আমাদের নামে!'

ততক্ষণে অফিসার গাড়ির পাশে চলে এসেছে। হেসে বলল, 'হ্যাঁ ম্যাডাম। সিরিয়াস কমপ্লেইন। মোড়ে ডিউটি দিচ্ছিলাম, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তার ছেলে গাড়ি থামিয়ে বলে গেল আপনারা নাকি তাদের সুটকেস কেড়ে নিতে গিয়েছিলেন।'

মেঘবতীর কান, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। তারা ছিনতাই করছে! এ কী কথা! মনে হল, শরীর কাঁপছে। গাড়ির দরজা ধরে কোনও রকমে নিজেকে সামলাল সে। বলল, 'আপনি এসব কী বলছেন অফিসার! আমরা কেন সুটকেস কেড়ে নিতে যাব।'

অফিসার ছেলেটি বলল, 'আমরা কিছু বলিনি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেছেন। এবার বলুন, আপনারা কারা এবং এত রাতে এখানে গাড়ি থামিয়ে কী করছেন?'

জ্যোতিষ্ক রাগ সামলে চাপা গলায় বলল, 'রাতে রাস্তায় বেরোনো বারণ নাকি?'

অফিসার ঠোঁটের কোণায় মিচকে হেসে বলল, 'না নিষেধ নয়, তবে সময়টা ভালো নয়। কদিন ধরে শহরের এদিকটায় ফ্লাইং ছিনতাই হচ্ছে। একটা গ্যাং গাড়ি নিয়ে ঘুরছে আর সুযোগ বুঝলেই এর-তার ব্যাগ, গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়ে চম্পট দিচ্ছে। আমরা গ্যাংটাকে ধরবার চেষ্টায় আছি।'

মেঘবতী কঠিন গলায় বলল, 'আপনারা ভুল করছেন অফিসার। হ্যারাস করছেন।'

অফিসার ছেলেটি আর একটু এগিয়ে এসে বলল, 'সেটা হলেই খুশি হব ম্যাডাম। আপনাদের দেখে এবং কথাবার্তা শুনে ভদ্রলোক মনে হচ্ছে। ছিনতাইয়ের ব্যাপারটা ভুল প্রমাণিত হলে খুশি হব। যাক, সরুন, গাড়ি সার্চ করব।'

ততক্ষণে একটু একটু করে ভিড় জমতে শুরু করেছে। জ্যোতিষ্ক তেড়ে যেতে গেল। মেঘবতী দ্রুত হাতে তাকে আটকে পুলিশ অফিসারের কাছে এগিয়ে যায়। নীচু গলায় আসল ঘটনা বোঝাতে চেষ্টা করে। তাতে খুব লাভ হয় না, কিন্তু জ্যোতিষ্ক সরকারের কত বড় পদে কাজ করে সেই পরিচয় পাওয়ার পর তরুণ অফিসার থতমত খেয়ে যায়। এটাই মজা। এ দেশে পদ, অর্থাৎ চেয়ারের মহিমা অতি গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্রও বলা যায়। ঘটনার থেকে চেয়ারের ওজন সবসময় বেশি। কী ঘটল, কেন ঘটল সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, ঘটনা যে ঘটিয়েছে সে কোন চেয়ারে বসে? তার স্ট্যটাস কী? নড়বড়ে টুলে বসলে নেংটি ইঁদুর, সিংহাসনে বসলে সিংহ। আরও মজা হল, সিংহাসন ত্যাগ করলে সিংহ হয়ে যায় নেংটি ইঁদুর। বেচারি! যাই হোক, জ্যোতিষ্কর চাকরির কথা শুনে অফিসারের টনক নড়ল। স্যালুট ট্যালুট করে একসা কাণ্ড।

'সরি স্যার...ভেরি সরি স্যার...আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি...আসলে স্যার কমপ্লেইন পেলাম...আপনার মতো অন্যের সমস্যায় ব্যস্ত হয়ে ওঠা মানুষ তো আজকাল দেখা যায় না...মানুষ ভুল বোঝে...কিছু মনে করবেন না স্যার...আজকের দিনে আপনার মতো মানুষ অতি বিরল...আমি স্যার ওই বুড়োর ফোন নম্বর নিয়ে রেখেছি...থানায় গিয়েই ধরব...মিথ্যে অভিযোগের ধমক কাকে বলে দেখবে...হারামজাদা...সরি স্যর...।'

বাড়ি ফিরেই মেঘবতী ঘোষণা করেছিল, পরদিনই সে তার বাবা-মায়ের কাছে চলে যাবে। খুব বেশি হলে একদিন অপেক্ষা করতে পারে। তারপর আর নয়। জ্যোতিষ্কের এই পাগলামি সে কিছুতেই মেনে নেবে না। তাকে যদি পাগলামি করতেই হয়, তাহলে একা করুক, বউ নিয়ে নয়। অন্যদিকে জ্যোতিষ্কও ঘোষণা করল,

boierpathshala.blogspot.com

মানুষ যতই সমস্যায় পড়ুক, সে আর কখনও এভাবে রাস্তায় গাড়ি থামাবে না। মেঘবতীকে পুলিশের বিড়ম্বনায় ফেলার জন্য সে 'সরি'। মেঘবতীর উচিত তার এই ঘোষণাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে বাবা-মায়ের কাছে চলে যাওয়ার কথা একবার বিবেচনা করে দেখা। ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা প্রয়োজন। জ্যোতিষ্ক বলল, যা ঘটেছে তার জন্য সে দায়ী নয়। বৃদ্ধ এবং পুলিশের বোঝাবুঝির দায় তার ঘাড়ে ফেলা অনুচিত। মুখে যাই বলুক এবং যতই ঝামেলা ঘাড়ে এসে পড়ুক, মেঘবতী আসলে তার স্বামীর পক্ষে। এই যুক্তি সে ফেলতে পারল না। ফলে বাবা-মায়ের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখল। কিন্তু দুদিন পরেই আবার এমন ঘটনা ঘটল যে, মেঘবতী সত্যি সত্যি সুটকেস গুছিয়ে চলে যায়।

সেদিন পুলিশ নয়, ঝামেলার কেন্দ্রে ছিল নারকোল। খান বারো নারকোল। তার আবার বেশিরভাগই শুকনো।

দিনটা ছিল রবিবার। টিপটিপ করে সকাল থেকে বৃষ্টি। ছুটির দিনে জ্যোতিষ্ক আস্তে ধীরে বাজারে বেরোয়। আলিস্যি লাগে। অন্যদিনের তুলনায় একটু বেলাই করে ফেলে। তার ওপর সেদিন ছিল স্যাঁতস্যাঁতে একটা দিন। বাজারে ঢোকবার অনেক আগেই দেখল, এক বালিকা প্লাস্টিক পেতে কতগুলো নারকোল নিয়ে বেজার মুখে বসে আছে। বালিকার বয়স কিছুতেই দশ-এগারোর বেশি হবে না। মাথায় একটা গামছা। গামছা দিয়ে বৃষ্টির জল আটকাতে চেষ্টা হয়েছে, লাভ হচ্ছে না। মলিন ফ্রক ভিজছে। প্রতিটা ক্রেতার দিকে বালিকা তাকিয়ে আছে অতি আগ্রহ নিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে, তার নারকোল বিক্রি নেই। বিক্রি নেই বলে উঠতেও পারছে না। বৃষ্টিতে ভিজছে। কে জানে, হয়তো বেচারিকে তার বাড়ির লোক হুমকি দিয়ে বসিয়ে রেখেছে। জ্যোতিষ্ক সামনে দিয়ে যেতে মেয়েটি নীচু গলায় বলল, 'নারকোল লাগবে?'

জ্যোতিষ্ক থমকে দাঁড়াল। মায়াভরা গলায় বলল, 'নারে মা, আজ আর নারকোল লাগবে না। অন্যদিন নেব।'

মেয়েটি এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'সবাই যদি অন্যদিন কয় আমার কী হবে? আমি এগুলান নিয়ে কী করব?'

ছাতা হাতে জ্যোতিষ্ক থমকে দাঁড়ায়। মেয়েটি বলল, 'দাঁড়ায়ে দেখেন কী? আমি জলে ভিজি এইডা দেখেন?'

নিমেষের জন্য জ্যোতিষ্কর মনে হল, মেয়েটির চোখে জল। কান্না? নাকি দুনিয়ার প্রতি রাগ? ঘেন্না?

জ্যোতিষ্ক বারোটা নারকোল কিনে হাসিমুখে বাড়ি ফিরেছিল সেদিন। বারোটাই তাকে কিনতে হয়নি। মলিন ফ্রকের মেয়ে তাকে একটা বিনি পয়সায় দিয়েছে।

'এইডা আপনারে ফিরি কইর‍্যা দিলাম, টাকা লাগব না।'

মেঘবতী দুপুরের একটু পরেই বাপের বাড়ি চলে গেল। নারকোল-যন্ত্রণা সে মেনে নিতে পারল না।

বারো

বারিধারা উত্তেজিত। সে তার জামাইবাবুর কাছে গল্প শুনছে। এক হতদরিদ্র বংশীবাদককে বাড়ি নিয়ে আসার গল্প। দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের গল্প সবসময়েই ইন্টারেস্টিং। পাথরের স্কন্ধকাটা মূর্তি, মাটিতে পুঁতে রাখা ঘড়াভর্তি মোহর, পিকাসোর তুলি, কয়েক হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া টেরোডাকটিল পাখির ডিম সংগ্রহের গল্প যে গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন বংশীবাদক সংগ্রহের গল্প যে এতটা ইন্টারেস্টিং হবে, কে ভাবতে পেরেছিল? বারিধারা পারেনি। সে অভিভূত।

মেঘবতী 'যে-কোনও সময়ে কেঁদে ফেলব' ধরনের মুখ করে পাশে বসে আছে। থাকুক। বারিধারা সেদিকে তাকাচ্ছে না। দিদি কাঁদুক, কাঁদতে কাঁদতে গড়াগড়ি দিক, তাতেও কিছু এসে যায় না। খ্যাপা জামাইবাবুর গল্প ছেড়ে এখন অন্যদিকে মন দেওয়া যাবে না। গল্প বলতে পেরে জ্যোতিষ্কও খুশি। শালিকে সে পছন্দ

boierpathshala.blogspot.com

করে। তার বিবিধ পাগলামির প্রতি মেয়েটির বিশেষ আগ্রহ আছে। হাবিজাবি আগ্রহ নয়, এক ধরনের অ্যাকাডেমিক আগ্রহ। জ্যোতিষ্কর মনে হয়, মেয়েটা তার কর্মকাণ্ড নিয়ে হয়তো একদিন গবেষণা শুরু করবে। এই মেয়ে অতি বুদ্ধিমতী। তার কাছে গোপনে খবর এসেছে, বারিধারা তার একানব্বই বছরের ঠাকুরদার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা লিস্ট বানাচ্ছে। বোকাদের লিস্ট। লিস্টের নাম উলটো। মোস্ট ইনটেলিজেন্ট। লিস্টের মাথায় রেখেছে নিজেকে। সেই লিস্ট অবিরত বদল হয়। নাম ওপর-নীচে ওঠানামা করে। একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে ছাড়া এই কাজ করা অসম্ভব। সেই মেয়ে তার পাগলামিতে প্রশ্রয় দিচ্ছে, এটা কম কথা নয়। জ্যোতিষ্ক স্ত্রীকে একথা বলেছে। মেঘবতী বলে, 'এটা কোনও ব্যাপার নয়। পাগলার সবসময় অন্য পাগলকে পছন্দ করে। পাগলদের মধ্যে ইউনিটি থাকে।' জ্যোতিষ্ক স্ত্রীর এই মন্তব্যে গা করে না। বারিধারাও করে না। 'আউট অব সিলেবাস' মানুষকে তার সবসময়েই পছন্দ। শ্রবণকেও তার একই কারণে পছন্দ। জামাইবাবুর মতো অতটা না হলেও, শ্রবণও অন্যরকম। এখনকার আর পাঁচটা গাধা ছেলেমেয়েদের মতো জীবনটাকে দাঁড়িপাল্লায় তুলে বেতনের বাটখারা দিয়ে মাপামাপি করে না। সবাই জানে টাকার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তার মানে এই নয়, একজন মানুষের জীবন কতটা জরুরি, সে জীবনের কাছে কতটা যোগ্য—সে বিচার আয়ের পরিমাণ ঠিক করে দেবে। জীবনকে ওজন করবার জন্য বাটখারা শুধু উপার্জনের হয় না। পৃথিবীতে বহু বড় মানুষ খুব কম উপার্জন করেছেন। একবেলা ভালো করে খেতেও পাননি। মজার কথা হল, তাঁদের অনেকেই মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মান পেয়েছেন। শ্রবণ এখনও সম্মান না পাক, উপার্জন আর উপার্জনের নিরাপত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। সে নিজের পছন্দমতো কাজকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাতে রোজগার কম, নিরাপত্তাও নেই। কিন্তু আনন্দ আছে।

এক রাউন্ড চা শেষ হয়েছে। তার পরেও গুপির মাকে চা করতে বলা হয়েছে। মেঘবতী কাঁদো কাঁদো মুখেই বোনের জন্য মাছের ডিমের বড়া করে এনেছে। সেই বড়ায় জ্যোতিষ্কও ভাগ বসাচ্ছে। সে আজ অফিসে দেরি করে যাবে। বাড়িতে অতিথি এসেছে। তাকে সেটল করবার একটা দায়িত্ব আছে না?

বারিধারা বলল, 'ঘটনা আপনি ডিটেলসে বলুন জ্যোতিষ্কদা। একটা পয়েন্টও বাদ দেবেন না।'

জ্যোতিষ্ক নীচু গলায় বলতেও শুরু করল।

'বহুদিন পর জগুবাবুর বাজারে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম তোমার দিদির জন্য। সে কোথা থেকে খবর পেয়েছে, উৎকৃষ্ট মানের মাছের ডিম নাকি ওখানেই পাওয়া যায়। এটা একটা জটিল কথা। মাছ এক বাজারে ভালো, মাছের ডিম আরেক বাজারে ভালো, এটা কী করে সম্ভব? তাও আমি ভাবলাম, একবার ঢুঁ মেরে আসি। যাই হোক, বাজারটাজার করে বেরিয়ে ভাবলাম, ফুটপাথের চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা খাই। চা খাওয়ার থেকে বড় কথা হল, বহুদিন ফুটপাথে বসা হয় না। ফুটপাথে বসার আলাদা মজা। কলেজ, ইউনিভার্সিটি জীবনে তো কম বসিনি। এখন আর পারি না। এখন বিদঘুটে একটা চাকরি করি যে, যেখানে-সেখানে লোকজন চিনে ফেলে আর স্যার স্যার করে। নিজের পাড়ায় তো একেবারেই পারি না। তাও লুকিয়েচুরিয়ে যে দু-একবার বসিনি এমন নয়। তোমার দিদি একবার দেখে ফেলে বিরাট ঝামেলা করল। আমার মতো অফিসারের নাকি...।'

মেঘবতী থমথমে গলায় বলল, 'আলোচনা কাকে নিয়ে হচ্ছে? বাঁশিওলাকে নিয়ে, না আমাকে নিয়ে? আমি কোন মাছের ডিম পছন্দ করি, ফুটপাথে বসলে কেন রাগারাগি করি—এই সব প্রসঙ্গ এখানে আসছে কেন। আমাকে যদি তোমার এত অপছন্দ, তাহলে বলে দিলেই তো পারো। আমি বৃষ্টির সঙ্গে ও-বাড়ি চলে যাই। ওর সঙ্গে তো গাড়ি আছে। তোমার গাড়িও লাগবে না। তুমি বাঁশিওলাকে নিয়ে থাকো। রোববার রোববার সকালে ওকে নিয়ে ভিক্ষে করতে বেরিয়ো।'

বারিধারা আরও একটা ডিমের বড়া মুখে ফেলল, 'খুব ভালো আইডিয়া দিয়েছিস দিদি। জামাইবাবু যদি সত্যি ভিক্ষেতে বেরোয়, তাহলে আমিও মাঝে মাঝে সঙ্গে যাব। আসলে আমরা তো সারাজীবন ভিক্ষে করেই বেড়াই। একবার এর কাছে গিয়ে হাত পাতি, একবার তার কাছে গিয়ে হাত পাতি। কখনও চাইছি

boierpathshala.blogspot.com

পরীক্ষার নম্বর, কখনও চাকরি, কখনও প্রোমোশন, কখনও বিজনেসের অর্ডার, কখনও খ্যাতি, কখনও প্রেম, কখনও সংসারের কাছে চাইছি শান্তি, প্রশংসা, কখনও চাইছি সমঝোতা। সবই চেয়ে বেড়াচ্ছি। আর মুখে বড়াই করছি। এই চান্সে নাহয় ডাইরেক্ট ভিখিরি হয়ে দেখব। বড়াটা ভালো করেছিস দিদি। না, জগুবাবুর বাজারে মাছের ডিম সত্যি ওয়ান্ডারফুল। তোর ইনফর্মেশন ঠিক।'

মেঘবতী এবার চোখ পাকিয়ে বোনকে বলল, 'ই: উনি ভিক্ষে করবেন... একটা চড় মারব। খালি পাকা পাকা কথা। এইটুকু মেয়ে বেশি ফিলজফি শিখেছে। ডায়লগ দিচ্ছে দেখ...আমরা সবাই ভিক্ষে করি...ইস মজা আর কী!'

বারিধারা মুখ ঘুরিয়ে হেসে বলল, 'এটা ফিলজফি নয় দিদি, ফিলজফির ভান। আমার মতো যাদের পেটে সত্যিকারের বিদ্যে নেই, তারা এইসব ভান করে। গল্প উপন্যাসেও পাবি। লেখকমশাই ফিলজফির ভানভণিতা ক্যারেক্টরের মুখে বসিয়ে দেন। ক্যারেক্টরগুলো ঘ্যান ঘ্যান করে বলতেই থাকে। অসহ্য। প্রপার শিক্ষিত মানুষ ভানভণিতা ধরে ফেলে। তারপর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ে।'

মেঘবতী কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'চুপ করবি? নইলে সত্যি সত্যি কিন্তু এবার মারব বৃষ্টি।'

জ্যোতিষ্ক হাত তুলে বলে, 'দুই বোনে মারপিট করবে পরে। আগে বংশীবাদকের ঘটনা শোনো।'

বারিধারা বলল, 'সরি জ্যোতিষ্কদা। আপনি আবার শুরু করুন। অ্যাই দিদি, হয় চুপ করে বসে শোন, নয় আরও খানকতক মাছের ডিম ভেজে আন। বেশি করে লঙ্কা দিবি।'

মেঘবতী উঠল না। আরও গ্যাঁট হয়ে বসল। জ্যোতিষ্ক ফের বলতে শুরু করল। শুনতে শুনতে বারিধারার চোখ আরও বড় হয়ে গেল। যতটা ভাবা গিয়েছিল, ঘটনা তার থেকে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।

ফুটপাথ হলে কী হবে, চায়ের দোকানটা বেশ বড়। ভিড়ও ছিল। জ্যোতিষ্ক নড়বড়ে বেঞ্চে বসে এক ভাঁড় চা নিয়েছে। হঠাৎই ঝগড়া কানে এল। দোকানদার কোনও খদ্দেরের সঙ্গে চাপা গলায় ঝগড়া করছে। জ্যোতিষ্ক প্রথমটায় কথা কানে নেয়নি। চায়ের দোকানে ঝগড়া, তর্কবিতর্ক লেগে থাকেই। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো। খানিকক্ষণের মধ্যেই এমন সব কথা কানে আসতে লাগল যে, জ্যোতিষ্ক মুখ না ঘুরিয়ে পারল না।

'তুমি মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করো কেন?'

'বিরক্ত করবার কী আছে? আপনি চায়ের দোকান দিয়েছেন, আমি চা খেতে আসি। চায়ের দোকান না দিয়ে যদি লোহালক্কড়ের দোকান দিতেন, তাহলে কি আসতাম? বয়ে গেছে।'

'তুমি বড্ড বাজে বকো।'

'আপনিও বড্ড বাজে বকেন। তা ছাড়া আপনি আমাকে তুমি তুমি করে বলছেন কেন?'

দোকানওলা এবার তেড়েফুঁড়ে বলল, 'তাহলে কী বলব? আপনি-আজ্ঞে করব?'

জ্যোতিষ্ক এবার লোকটাকে পুরোপুরি দেখতে পায়। গায়ে ধুতি-ফতুয়া। ফতুয়ার রং গেরুয়া। বড় বড় চুল। একটা বাউল বাউল ভাব। পোশাকের অবস্থা অতি মলিন। কাঁধে যে ঝোলাটা রয়েছে, সেটায় নানা রঙের কাপড় দিয়ে তাপ্পি। ঝোলা থেকে লাঠির মতো একটা কিছু উঁচু হয়ে আছে। সম্বোধন নিয়ে ঝগড়া শুনে জ্যোতিষ্কর উৎসাহ বাড়ল।

মলিন ধুতি-ফতুয়া বলল, 'আপনি-আজ্ঞে না করুন, সম্মান দিয়ে কথা বলুন।'

দোকানদার বলল, 'কেন? তোমাকে সম্মান দেব কেন? রোজ সকালে এসে ভিক্ষে চাও।'

মলিন ধুতি-ফতুয়া বলল, 'আবার আপনি বাজে কথা বলছেন। রোজ আমি আসি না। আপনার এখানে আসার পালা যেদিন পরে, সেদিনই শুধু আসি। তাছাড়া আমি মোটেও ভিক্ষে করি না। আর যদি করতাম, তাতে খারাপটা কী হত? আপনি চায়ের দোকান দিতে পারেন, আমি ভিক্ষে করতে পারি না?'

দোকানদার হাত জোড় করে বলল, 'আচ্ছা বাবা, আমারই ভুল হয়েছে। এবার চা খেয়ে বিদায় হন।'

মলিন ধুতি-ফতুয়া বলল, 'চা আমি এমনি খাই না আপনি জানেন।'

boierpathshala.blogspot.com

দোকানদার হতাশ হয়ে বলল, 'এ তো মহাঝামেলা করে। ব্যস্ত সময় ভ্যানভ্যানানি। বলছি তো, এখন আমার বাঁশি শোনবার টাইম নেই...দোকান ভর্তি খদ্দের। চা খেতে হলে খান, নইলে বিদায় হন।'

মলিন ধুতি-ফতুয়া এবার বেঞ্চ থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'তাহলে আমারও চা খাওয়া হবে না। আমি চললাম।'

এই পর্যন্ত বলে জ্যোতিষ্ক থামল। মেঘবতী বলল, 'এসবের মানে কী! চায়ের সঙ্গে বাঁশির কী সম্পর্ক! লোকটা পাগল নাকি?'

জ্যোতিষ্ক সোফাতে হেলান দিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'প্রথমটায় আমিও তাই ভেবেছিলাম। পরে জানলাম ঘটনা অন্য।'

বারিধারা বলল, 'কী ঘটনা?'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'আমি তখন মানুষটাকে ডাকি। ডেকে পাশে বসাই। দু-একটা এদিক-সেদিক কথার পর আসল ঘটনা জানতে পারি। মানুষটা বাঁশি বাজান। বর্ধমান না বীরভূমের কোনও গ্রামে গরিব চাষির বাড়িতে জন্মেছে। কাজেকর্মে মন ছিল না। ছোটবেলা থেকেই বাঁশির নেশা। নিজে নিজেই শিখেছে। বাঁশিতে গান, সুর, রাগ-রাগিণীও বাজাতে পারে। কাজ করে না বলে, বাবা একদিন বাড়ি থেকে দিল তাড়িয়ে। তখন বালক বয়স। ঠিকই করেছে। গরিবের ঘরে কাজকম্ম না করে বাঁশি বাজালে কতদিন সহ্য করবে? তারপর থেকেই ভদ্রলোকের জীবিকা মাধুকরী। মাধুকরী জানো তো?'

বারিধারা বলে, 'জানি, ভিক্ষে।'

জ্যোতিষ্ক বলে, 'ঠিক। মানুষটা ভিক্ষেই করেন। তবে টাকাপয়সা নেন না, পেট ভরে খাওয়াতে হয়। যখন খিদে পায়, তখন কোথাও একটা হাজির হয়ে বাঁশি বাজান। কেউ খুশি হয়ে খাওয়ালে ভালো, না খাওয়ালেও ঠিক আছে। সে সকালবেলার চা-ই হোক আর দুপুরের ভাত ডাল বা বিকেলের মুড়ি বাদামই হোক। উনি এমনি এমনি কারও কাছ থেকে খান না। বাঁশি শোনানোর পারিশ্রমিক হিসেবে খান। তবে শুধু তো পেটপুরে খেলেই একটা মানুষের জীবন চলে না। জামাকাপড়, চটি কিনতে পয়সা লাগে। এদিক-ওদিক যেতে ট্রেন, বাসের ভাড়া লাগে। এই কারণে উনি মাঝে মাঝে বাঁশি বানিয়ে হাটে, মেলায় বিক্রি করেন। সেদিক থেকে বলতে গেলে ভদ্রলোক শুধু বাঁশি বাজান না, বাঁশির মতো মধুরতম একটি বাদ্যযন্ত্রের প্রচারকও বটে।'

বারিধারা বিড়বিড় করে বলল, 'উনি খিদে না পেলে কাউকে বাঁশি শোনান না?'

জ্যোতিষ্ক বলল, কেন শোনাবেন না? অবশ্যই শোনাবেন। তবে নিজের মুডের ওপর নির্ভর করেন। আর পাঁচজন শিল্পীর মতো। এবার বলো, এই ভিক্ষুক ভদ্রলোককে বাড়ি নিয়ে এসে কি আমি অন্যায় করেছি? আচ্ছা বৃষ্টি তোমায় বলতে হবে না। মেঘ তুমি বলো, আমার ভুল হয়েছে?'

মেঘবতীর চোখে জল টলটল করছে। সম্ভবত গল্প শুনে তার মন বদলেছে। স্বামীকে এখন পাগলের বদলে মহানুভব বলে মনে হচ্ছে। সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছে। হাতের পিঠে চোখের জল মুছে নীচু গলায় বলল, 'এসব তো আমাকে আগে বলোনি!'

জ্যোতিষ্ক হেসে বলল, 'বলব কখন? তুমি তো রাগারাগি শুরু করে দিলে।'

বারিধারা বলল, 'ভদ্রলোকের নাম কী?'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'এ-ও এক মজার কথা। আমি নাম জিগ্যেস করায় বললেন, নাম দিয়ে কী হবে? নামে কি একটা মানুষের পরিচয় হয়? না তাকে চেনা যায়? মানুষ হল গানের মতো। সুর দিয়ে চেনা যায়। আপনার যা খুশি নামে ডাকতে পারেন।'

বারিধারা বলল, 'আমরা বংশীবাদক বলেই ডাকব। আচ্ছা জ্যোতিষ্কদা, বংশীবাদক বাড়িতে আসতে আপত্তি করল না?'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'একেবারেই নয়। আমি প্রস্তাব দিতে বললেন, চলেন। আমার কোনও সমস্যা নেই। আমার কাছে চায়ের দোকানও যা, বাড়িও তাই।'

boierpathshala.blogspot.com

মেঘবতী বলল, 'কতদিন থাকবেন?'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'কী জানি। এসব লোক কোথাও বেশিদিন থাকতে পারে না। যাযাবর টাইপের হয়।'

বারিধারা ধড়ফড় করে উঠে কাকুতি-মিনতি করবার ভঙ্গিতে বলল, 'প্লিজ জ্যোতিষ্কদা, আপনি ওনাকে চলে যেতে দেবেন না। আমার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দেব। আচ্ছা, একবার দাদুর কাছে নিয়ে গেলে হত না?'

মেঘবতী বলল, 'দাঁড়া আগেই এত ছটফট করিস না। কটাদিন যাক।'

জ্যোতিষ্ক অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'না, অনেক কষ্টের মধ্যেও দেশটা বড় সুন্দর! সবথেকে সুন্দর আমার বাংলা। এখানে গানবাজনা করে একজন মানুষ তার খিদে মেটাতে পারে। ভাবা যায়!'

বারিধারা বলল, 'বিদেশেও আছে জ্যোতিষ্কদা। স্ট্রিট সিঙ্গার পথের ধারে গিটার বাজিয়ে গান করে। লোকে সামনে টাকাপয়সা রেখে যায়।'

জ্যোতিষ্ক জ্বলজ্বলে চোখে বলল, 'জানি। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সেরা হল শান্তিনিকেতন যাওয়ার ট্রেন। রবি ঠাকুরের গান শুনিয়ে দরিদ্র মানুষ উপার্জন করে। আহা! মানুষটা রাজার জন্য যেমন গান লিখেছে, দরিদ্রের জন্যও লিখেছে।'

এই সময় একতলার গেস্টরুম থেকে ভেসে আসা মায়াবী সুরে সবাই থমকে গেল। বাঁশি বাজছে।

তেরো

কর্ণিকা বুঝতে পারছে, আজ তার চাকরি চলে যাবে। গত তিন দিন ধরে তার প্রায়ই এরকম মনে হয়। কিন্তু আজ একেবারে নিশ্চিত। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আজ তার অপরাধ সীমাহীন।

চাকরি চলে গেলে কর্ণিকা খুবই সমস্যার মধ্যে পড়বে। বাড়িতে রোজগেরে মানুষ একমাত্র সে। বাবা অসুস্থ হয়ে গত তিন বছর ঘরে। একটা নড়বড়ে চাকরি ছিল, সেটাও গেছে। এখন যে বেরিয়ে নতুন করে আবার কাজ খুঁজবে, সে মনের জোর নেই। অনেক গোঁতাগুঁতির পর ক'দিন বেরিয়েছিল। ফিরে এসেছে। ভাই স্কুলে পড়ছে। মা কোনওদিন বাইরে কাজকর্ম করেনি। এই অবস্থায় তার চাকরি চলে যাওয়া একটা বড় ধাক্কা। কিন্তু কিছু করবার নেই। ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। কর্ণিকা জানে, লাঞ্চের পর সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের কর্মচারী বিষয়ক ম্যানেজার তাকে ঘরে ডেকে পাঠাবেন। তার পর কী কী ঘটবে, তা সিনেমার মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

'স্যার আমাকে ডেকেছেন?'

এই ম্যানেজার বয়স্ক এবং ভালোমানুষ। মনের ভাব গোপন রাখতে পারেন না। হাবভাবে দেখিয়ে ফেলেন। রাগ হলে রাগ, খুশি হলে খুশি। ভদ্রলোক থমথমে মুখে বললেন, 'হ্যাঁ ডেকেছি।'

কর্ণিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। ম্যানেজার মুখ না তুলে বলবেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।'

এই ভদ্রলোক অফিসের সবাইকেই 'আপনি' সম্বোধন করেন। শুধু বয়সে ছোট নয়, পদে ছোট হলেও তিনি সম্বোধনে ফারাক করেন না। অফিসারকে যা বলেন, পিওনকেও সেইভাবে কথা বলেন। কর্ণিকার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর দু'মাস। সে চাকরির প্রথম দিকে 'আপনি' সম্বোধন না করবার জন্য এঁর কাছে আবেদন জানিয়েছিল। আবেদন গ্রাহ্য হয়নি।

আজ ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে কর্ণিকা ভয় পাবে। অফিসের বসেরা যখন ঘরে ডেকে থমথমে মুখে বসতে বলেন, তখন বুঝতে হয় সমস্যা আছে। বিপদ আসছে। সে জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসবে। কর্মচারী বিষয়ক ম্যানেজার ভদ্রলোক হাতের ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করবেন, কম্পিউটারের কি-বোর্ড টিপবেন, তার পর কর্ণিকার চোখের দিকে তাকাবেন।

'একটা খারাপ খবর আছে কর্ণিকা।'

boierpathshala.blogspot.com

কর্ণিকা জানে কী খবর। তার পরেও চমকে উঠবে। কাঁপা গলায় বলবে, 'কী স্যার? কী খবর?'

ম্যানেজার খবর বলবেন না। তবে এই প্রথম সম্বোধন বদলাবেন। 'আপনি'র বদলে 'তুমি'। স্নেহের কারণেই করবেন। নরম গলায় বলবেন, 'চিন্তা কোরো না কর্ণিকা। তোমার বয়স কম। কেরিয়ার সবে শুরু করেছ। ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় কাজের অফার তোমার কাছে আসবে। রিলিজ অর্ডারে তোমার সম্পর্কে আমরা ভালো কথা লিখে দেব। শি ইজ এক্সেলেন্ট। কাজ পেতে অসুবিধে হবে না।'

কর্ণিকা অস্ফুটে বলবে, 'স্যার...স্যার...।'

ম্যানেজার ভদ্রলোক গলা খাকারি দিয়ে বলবেন, 'সরি কর্ণিকা। তোমাকে সেন অ্যাসোসিয়েটস আর কনটিনিউ করতে পারছে না। এটাই তোমার লাস্ট মান্থ। কাল থেকেই তুমি ছুটিতে চলে যাও। এ মাসের ফুল স্যালারি তুমি পাবে।'

কর্ণিকা কাতর গলায় বলবে, 'স্যার, চাকরি চলে গেলে আমি খুব বিপদে পড়ে যাব। বাড়িতে আমিই একমাত্র উপার্জন করি স্যার।'

ম্যানেজার একটু চুপ করে থেকে বলবেন, 'সরি কর্ণিকা, আমার কিছু করার নেই। দিজ ইজ হায়েস্ট লেভেল অর্ডার। তুমি বুঝতে পারছ?'

কর্ণিকা মাথা নামিয়ে বলবে, 'পারছি স্যার।'

চাকরি চলে যাওয়ার এই ভয়ঙ্কর কল্পনা কর্ণিকাকে মাঝে-মাঝেই করতে হয়। এক-একদিন এক-একটা কারণ থাকে। আজ কারণ হল ঘাম। কর্ণিকার মনে হচ্ছে, সে কুলকুল করে ঘামছে। এখনই কপাল থেকে সেই ঘাম টপ করে টেবিলের ওপর রাখা নোটখাতার ওপর পড়বে। এতক্ষণ ধরে ডিকটেশন শুনে যা লিখেছে, সব ঝাপসা হয়ে যাবে। বাইরে গিয়ে কিছুই পড়তে পারবে না। চিঠি ভুল টাইপ করবে এবং সেই অপরাধে তার চাকরি চলে যাবে।

কোম্পানির মালিকের ডিকটেকশন যদি তাঁর সেক্রেটারির ঘাম ঘুছে দেয়, তাহলে তার চাকরি থাকতে পারে?

যদিও ঘটনা একেবারেই ঠিক নয়। ঘরে এয়ারকন্ডিশন মেশিন চলছে। ফুসফুস করে আওয়াজ হচ্ছে। কড়া ঠান্ডা। ঘাম হাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কর্ণিকা আসলে নার্ভাস। এত নার্ভাস যে, এত ঠান্ডার মধ্যে তার গরমের বিভ্রম হচ্ছে। হ্যালুসিনেশন। আজ যদি ঘর গরম থাকত, তাহলে হয়তো মনে হত, শীতে কাঁপছে। হ্যালুসিনেশনের মাত্রা এতটাই বেশি যে, সে মনে মনে কর্মচারী বিষয়ক ম্যানেজারের ঘরে চলে গিয়েছে। চাকরি নট-এর গল্প শুনে এসেছে। নার্ভাস ভাব থেকে বিভ্রম এতটা হয় কি না তা মনোবিদরা বলতে পারবেন। কর্ণিকার সবটাই কল্পনা। ভয়ঙ্কর কল্পনা।

তিন মাস তেরো দিন হল, অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে বদলি হয়ে সে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পার্সোনাল সেক্রেটারি হয়েছে। এখনও শিক্ষানবিশ। সিনিয়ররা কাজ শিখিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা সারাক্ষণ ভয়ও দেখাচ্ছেন।

'এই যে মেয়ে, খুব সাবধানে থাকবে। বসের কঠিন সমস্যা আছে। সিরিয়াস সমস্যা। কাজে ভুল করলে রেগে যান না, কিন্তু কাজ যদি এলেবেলেভাবে ঠিক করো, রেগে আগুন হয়ে যাবেন। পান থেকে চুন কেন, সুপুরি, খয়ের, এলাচ খসলে ক্ষতি নেই। কিন্তু সিরিয়াস ভাব খসলে বিরাট ক্ষতি। তখন চাকরি গন হতে এক মিনিট।'

জটিল বিষয়। কাজ ভুল করলে ক্ষতি নেই, কাজ ঠিক করলে ক্ষতি! কর্ণিকা খুব ভয়ে ভয়ে আছে। কেন যে মরতে এই পোস্টে তাকে আনা হল। মনে হয় চাকরি থেকে নট করে দেওয়ার জন্যই হয়েছে। যদিও এখনও সে বড় দায়িত্ব পায়নি, চিঠি লেখালেখির কাজ করছে মাত্র। বস ডিকটেকশন দেন। সে শর্টহ্যান্ডে লিখে নেয়। পরে কম্পিউটারে টাইপ করে, প্রিন্ট বের করে দেখায়। সরাসরি ল্যাপটপেও ডিকটেশন নেওয়া যেত। বস পছন্দ করেন না। তিনি পুরোনো পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। যখনই কর্ণিকা বসের ঘরে ডাক পায়, তার

boierpathshala.blogspot.com

হাঁটু কাঁপতে থাকে। মনে হয়, আজ সে নিশ্চিতভাবে 'সিরিয়াস ভাব'-এ কোনও গোলমাল করে বসবে এবং চাকরি খোয়াবে।

ঘামে ডিকটেশন মুছে যাওয়াটা কি 'সিরিয়াস ভাব'-এর বড় গোলমাল নয়?

বিমলকান্তি সেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চিঠি ডিকটেশন দিচ্ছেন। কোটি টাকার চিঠি। কোটি টাকার অর্ডার যেখান থেকে পাওয়া গেছে, চিঠি তাদের উদ্দেশে। কোম্পানির সাবান, ডিটারজেন্ট, রুম ফ্রেশনার, টুথপেস্ট, পাউডার, পারফিউম পাঠানোর খুব বড় অর্ডার। প্রোডাক্ট বাইরে যাবে। সব মিলিয়ে বিজনেস প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি। সবই ঠিক আছে, কিন্তু এলসি খোলা নিয়ে একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। ফলে প্রোডাক্ট সাপ্লাইয়ের তারিখ পিছোনো ছাড়া উপায় নেই। সমস্যা হল, এসব ক্ষেত্রে অর্ডার বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এলসির সমস্যা সম্পূর্ণ গোপন রেখে তাদের জানানো হচ্ছে, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি নিয়ে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে। সংশয়টি খুবই সামান্য। মনে হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট ব্যাচের সাবানে সেন্টের পরিমাণ যথোপযুক্ত হয়নি। ওয়ার্কশপের চিফ কেমিস্টও সংশয়মুক্ত নন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানিয়েছেন, কোনও কোনও সাবানে গোলমাল থাকলেও থাকতে পারে। অন্য যে-কোনও প্রস্তুতকারক এই ত্রুটি অবজ্ঞা করত। কারণ, এই ত্রুটি ধরা পড়বার নয়। যে ক্রেতা এই সাবান ব্যবহার করবেন, তাঁর পক্ষে গন্ধের সূক্ষ্ম তারতম্য বোঝা অসম্ভব। যাকে অর্ডার সাপ্লাই করা হচ্ছে, সেই সংস্থার পক্ষেও এই খামতি যাচাই করা সম্ভব নয়। গন্ধের মানদণ্ড বিচার করবার মতো কোনও যন্ত্র নেই। সুতরাং, এই ত্রুটিকে গুরুত্ব না দিলেও অনায়াসে চলত। কিন্তু সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস সে কাজ করবে না। তারা নিজেদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত সংবেদনশীল এবং যত্নশীল। তারা মনে করে, প্রোডাক্টের কোয়ালিটির ওপর নজর দেওয়াটা কোনও প্রস্তুতকারক সংস্থার জন্য সব থেকে জরুরি। লাভ-লোকসান পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু একবার 'গুড উইল' নষ্ট হলে সে ক্ষতি মেরামত করা যায় না। তাই কোম্পানির মিটিংয়ে আজ সিদ্ধান্ত হয়েছে, যতই লোকসান হোক, সাবানের এই লট বাতিল করা হবে। নতুন প্রোডাকশন হবে। তার পর অর্ডার সাপ্লাই হবে। তাই ক'টা দিন সময় চাই। আশাকরি, সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেসের সদিচ্ছা এবং সততার প্রতি আস্থা রেখে অর্ডার সাপ্লাইয়ের জন্য আরও ক'টা দিন সময় পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ...

চিঠি এখনই মেইল করা হবে। যদিও ইতিমধ্যে মুখে কথা হয়ে গেছে। পার্টিকে টেলিফোন করা হয়েছিল। ওরা অভিভূত। সামান্য একটা ত্রুটির জন্য সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এতদূর যেতে পারে, তারা কল্পনাও করতে পারেনি। এত টাকা লোকসান। যে ত্রুটি ধরাই পড়ত না, তাই নিয়ে এত চিন্তা। ওরা টেলিফোনে বলেছে, আপনারা সময় নিন। ফর্মালি চিঠি মেইল করে দিন। আমরা আজই জবাব পাঠাব।

এই চিঠিটাই বিমলকান্তি সেন কর্ণিকাকে ডিকটেশন দিচ্ছেন। কর্ণিকা মেয়েটির কাজ বিমলকান্তি সেনের বিশেষ পছন্দ। মেয়েটি তাঁর কাছে এসেছে বেশিদিন হয়নি। কত দিন হবে? বড় জোর মাস তিনেক। মেয়েটির বয়স কম, অথচ কাজের ক্ষেত্রে খুবই সিরিয়াস। ডিকটেশনের একটা শব্দ বুঝতে না পারলে দশবার জিগ্যেস করে। চিঠির বাক্যে কোথাও জটিলতা থাকলে ঘরে এসে বলে। মাসখানেক আগে একটা চিঠিতে ভুল হয়েছিল। গ্রামারের ভুল। একটা ভুল নয়, দুটো ভুল। একটা ভার্বে, একটা প্রিপোজিশনে। মালিকের ভার্ব আর প্রিপোজিশন ভুল ধরার জন্য সাহস লাগে। সেই সাহস আসে কাজের প্রতি সিরিয়াস ভঙ্গি থেকে। কাজটা কোনও ব্যক্তি নয়, কাজটা শুধুই কাজ। কে রেগে গেল, কে খুশি হল তাই দিয়ে কাজের বিচার হয় না। দুভার্গ্যের বিষয়, বাঙালি কর্মজগৎ এটাই মেনে চলে। ব্যক্তির রাগ, ব্যক্তির খুশি এই জগতের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির কর্মকাণ্ডের সব থেকে বড় সাফল্য হল, উচ্চ আসনে বসা মানুষকে তোষামোদ করা। কাজের প্রতি সিরিয়াস হওয়ার থেকে, হাত কচলানোর প্রতি সিরিয়াস হওয়া তার কাছে অনেক বেশি স্বস্তিজনক। কর্ণিকা যে সাহস দেখিয়েছে, একশো কর্মীর মধ্যে একজনও এর ধারে-কাছে যেতে পারবে না। কাঁচুমাচু মুখ করে এসে ভুল ধরিয়েছে। ভাবটা এমন ছিল, যেন ভুল তার, এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। কর্ণিকার ব্যাপারে বিমলকান্তিবাবু একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্ত যে-কোনও সময় কার্যকর হতে পারে।

boierpathshala.blogspot.com

ডিকটেশন শেষ হলে বিমলকান্তি বললেন, 'যাও, ভালো করে টাইপ করে আমাকে দেখাও।'

কর্ণিকা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এখনও তার নোটখাতায় কপালের ঘাম ঝরে পড়েনি। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় কাত করে বলল, 'অবশ্যই স্যার।' তার পর নোটবই হাতে তাড়াহুড়ো করে দরজার দিকে যেতে গিয়ে চেয়ারে ধাক্কা খেল।

চিঠির পরিকল্পনা নিখিলেশ উপাধ্যায়ের। সেন অ্যাসোসিয়েটস কোম্পানির বয়োজ্যেষ্ঠতম কর্মী। অবসর নেওয়ার বয়স দশ বছর পেরিয়ে গেছে। তার পরেও চাকরি রয়েছে। কেন রয়েছে? কারণ খানিকটা জানা যায়, খানিকটা জানা যায় না। অফিসে, ওয়ার্কশপে নানা রকম ঘটনা। শোনা যায়, কোম্পানির গোড়ার দিকে কমলকান্তি সেন তাঁর এই কর্মচারীটির কাছ থেকে এমন কোনও উপকার পেয়েছিলেন, যা তিনি কখনও ভোলেননি। সেই কৃতজ্ঞতার কারণেই অবসরের বয়স হয়ে যাওয়ার পরও তাঁকে ছাড়া হয় না। আবার শোনা যায়, কমলকান্তি সেন সরে যাওয়ার পর নিখিলেশ উপাধ্যায়ও চলে যেতে চেয়েছিলেন। বিমলকান্তিবাবু কিছুতেই রাজি হননি। তিনি মনে করেন, সন্তান যদি পিতার পরিচয়, সম্মান, সম্পত্তি বহন করতে পারে, তাকে পিতার কৃতজ্ঞতাও বহন করতে হবে।

'উপাধ্যায়বাবু, আপনাকে অফিসে আসতে হবে না। কিন্তু আপনি আমাদের ছেড়ে যেতেও পারবেন না।'

'কী মুশকিল। এটা কখনও হয়? সবাই কী বলবে?'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'যা খুশি বলুক। আমরা আপনাকে ছাড়ব না। সেন অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে আপনাকে আজীবন যুক্ত থাকতে হবে।'

'আপনি তো একজন সিরিয়াস ধরনের মানুষ। আপনার বাবা যা করেছেন, আপনি কেন এসব পাগলামি করবেন? আপনার পিতা তো সরে গেলেন, এবার আমাকে ছুটি দিন।'

বিমলকান্তিবাবু হেসে বলেন, 'বাবা চলে গেলেন বলেই তো আরও আপনাকে ছাড়া যাবে না। উনি তো কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে যাননি। এখন জিগ্যেস করলে অফিসের বিষয়ে কোনও কথা বলেন না। আপনি যদি ওর ডিসিশন নিয়ে আসতে পারেন, আমি আটকাব না। আপনার ছুটি হয়ে যাবে।'

উপাধ্যায়বাবু বলেন, 'আমার শরীর ভালো নয়। মাঝে-মাঝে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়।'

বিমলকান্তিবাবু বলেন, 'আপনাকে তো অফিসে আসতে হবে না।'

উপাধ্যায়বাবু সাদা হয়ে যাওয়া ভুরু তুলে বলেন, 'সে কী! তা হলে বেতন নেব কেন?'

বিমলকান্তিবাবু ফের হেসে বলেন, 'বেতন তো নয়, আপনাকে এখানে আটকে রাখবার জন্য কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেবে।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় এবার কমলকান্তি সেনের সঙ্গে দেখা করতে চান। কমলকান্তি রাজি হননি। অনেক জোরাজুরির পর টেলিফোনে কথা বলতে রাজি হন। কী কথা হয় কেউ জানে না।

নিখিলেশ উপাধ্যায় অফিসে রয়ে গেছেন। আগে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, এখন ফ্রি। আবাধ গতি। কখনও আসেন, বেশিরভাগ সময়েই আসেন না। তবে দীর্ঘদিন থাকার কারণে এবং স্বভাব মধুর হওয়ায় সব ডিপার্টমেন্টেই চেনাজানা। ম্যানেজার থেকে পিওন—সকলেই পছন্দ করেন। কোম্পানির খবরাখবরও বলে। বেশিরভাগ সময়েই তিনি আগ্রহ দেখান না। হাসিঠাট্টা করে, খানিকটা সময় কাটিয়ে চলে যান। আবার কোনও কোনও খবরে তিনি নিজে থেকেই গভীর আগ্রহ দেখান। সেই খবর ঘুরে ঘুরে যাচাই করেন। খবরের শিকড় পর্যন্ত যান। তার পর কখনও দেখা করেন ম্যানেজারদের সঙ্গে, কখনও বিমলকান্তি সেনের সঙ্গে। এই কোটি টাকার অর্ডারের ব্যাপারেও করেছেন। বিমলকান্তিবাবুকে সময় বাড়াবার পরিকল্পনা বলে দিয়েছেন। পার্টিকে কীভাবে কোয়ালিটির প্রসঙ্গ তুলে চিঠি দিতে হবে, সে কথা বুঝিয়েছেন। বলেছেন, এটা মিথ্যে নয়, এটা ব্যবসার কৌশল। এই সময়ে জট খুলতে হবে। ফুটবল খেলায় যেমন প্রতিপক্ষকে আটকে রাখতে হয়, ব্যবসাতেও তাই।

boierpathshala.blogspot.com

লাঞ্চের পর সেন অ্যাসোসিয়েটসের অফিসে দুটো অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একটি ঘটল অফিসের অতি সামান্য এক কর্মচারী কর্ণিকার জন্য। বিকেল তিনটে নাগাদ কর্মচারী বিষয়ক ম্যানেজার ইন্টারকমে থমথমে গলায় তাকে ডেকে পাঠালেন। কর্ণিকার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিশ্চিয় আজ তার চাকরি চলে যাচ্ছে। সে কি কোটি টাকার চিঠি ভুল টাইপ করল? দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল অফিসের সব থেকে বড় পদের লোকটিকে ঘিরে। তিনি বিমলকান্তি সেন।

চোদ্দো

'তোর মুখ শুকনো কেন কনি?'

'কোথায় শুকনো মা।'

'আমাকে লুকোস না, আমি তোর মা, আমি সব বুঝতে পারি। অবশ্যই কিছু হয়েছে। কী হয়েছে বল?'

'উফ মা, তুমি বড্ড জ্বালাতন করো। বলছি তো আমার কিছু হয়নি।'

'আমাকে বলবি না, সেটা বল। রাগ দেখাচ্ছিস কেন?'

'কোথায় রাগ দেখালাম। মা, এক কথা বারবার বলছ কেন? আমার মাথা ধরেছে। অফিস থেকে ফিরেছি, আমাকে রেস্ট নিতে দাও।'

'আমি জানি, তোর মাথা ধরেনি। তুই আমাকে মিথ্যে বলছিস। যাক, যখন বলবি না ঠিক করেছিস বলতে হবে না। অফিসে গোলমাল হয়েছে?'

'জানি না। ঘ্যান ঘ্যান কোরো না মা। ভালো লাগছে না।'

'দেখিস কনি, অফিসে গোলমাল করিস না।'

'কেন? তোমার কী সমস্যা? তুমি তো আমার হয়ে অফিসে গোলমাল করতে যাবে না। গোলমাল করলে আমি করব।'

'এখন যদি তোর চাকরিবাকরি নিয়ে সমস্যা হয় আমরা বিপদে পড়ে যাব।'

'বলতে খারাপ লাগছে না? আর কতদিন আমাকে একা এতবড় সংসারের বোঝা টানতে হবে? বলো আর কতদিন?'

'ভাইটাকে একটু বড় হতে দে।'

'কেন? বাবা? বাবা কী করছে? কিছু টাকাপয়সা রোজগার করবার মতো ক্ষমতা কি তার নেই? সে কেন চেষ্টা করে না? তাকে কেন তুমি বলছ না মা? কেন বলছ না মেয়ের ঘাড়ে সবটা ফেলে দেওয়া ঠিক নয়?'

'তুই তো তোর বাবাকে চিনিস কনি। সে বেরোতে চায় না। অসুখের পর নড়বড়ে হয়ে গেছে...কিছু করতে চায় না।'

'তুমি আর বাবার হয়ে কথা বোলো না মা। চুপ করো।'

'চুপই তো করে আছি। সারাটা জীবন চুপ করে থেকেছি বলেই তো আজ এই অবস্থা। কখনও স্বামীর ধমক খাচ্ছি, কখনও মেয়ের ধমক খাচ্ছি।'

'আবার প্যানপ্যানানি শুরু করলে? আমার ভালো লাগছে না মা। বলছি তো আমার ভালো লাগছে না। কান্নাকাটির অনেক সুযোগ পাবে। এখন আমি তোমাকে এমন খবর দেব যে তোমাকে ডাক ছেড়ে কাঁদতে হবে।'

'কী খবর?'

'খুব ভালো খবর। যাকে বলে সুসংবাদ। সুসংবাদ কাকে বলে জানো?'

'হাসছিস কেন? কী খবর বল। আমার হাত-পা কাপছে।'

boierpathshala.blogspot.com

'আমার চাকরিটা চলে গেছে মা। আজ থেকে আমি বেকার। সংবাদ কেমন? যাও তাড়াতাড়ি বাবাকে গিয়ে দাও। বাবা যদি সুসংবাদ শুনে নড়েচড়ে বসে।'

এই কাল্পনিক কথোপকথন চালাতে চালাতে কর্ণিকা অফিসের করিডোর দিয়ে হাঁটছে। সে যাচ্ছে কর্মচারী বিষয়ক ম্যানেজারের ঘরে। কর্ণিকা হাঁটছে এবং ঘামছে। এবার আর বসের ঘরে বসে ঘামের বিভ্রম নয়। সত্যিকারের ঘাম। কর্মচারী বিষয়ক ম্যানেজার যে কণ্ঠস্বরে তাকে ইন্টারকমে ডাকলেন তাতে ঘাম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কর্ণিকা মনে করার চেষ্টা করছে যে চিঠিতে কী ভুল করেছে। আচ্ছা, এমন নয় তো, একবার বসের ভুল ডিকটেশন ধরার জন্য আজ শাস্তির কোপে পড়ল? প্রতিশোধ? তখন বস চুপ করে ছিলেন। আজ সুযোগ বুঝে আউট করে দিচ্ছেন। হয়তো দেখা যাবে যে বসের যা যা ভুল ধরেছিল, সেগুলো সে নিজেই করে বসে আছে? অসম্ভব কিছু নয়। হতে পারে। এখন বুঝতে পারছে, সেদিনের কাজটা তার ঠিক হয়নি। হঠকারী হয়ে গেছে। মা যদি শোনে তাহলে ভীষণ রেগে যাবে। মা কেন যে-ই শুনবে সে-ই রেগে যাবে। 'পাকা মেয়ে' বলবে। বলবে, 'আমি হলেও তোমাকে ঘাড় ধরে বের করে দিতাম। তোমার অফিস কোনও স্কুল নয়। তুমি সেই স্কুলের হেডমিসট্রেস নয়। এবার ঠেলা বোঝো।'

ম্যানেজার স্যার হাতের কাজ সরিয়ে তাকে গম্ভীর মুখে বসতে বললেন। কর্ণিকা তার ভয়ঙ্কর কল্পনার মতোই জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসল।

ম্যানেজার স্যার বললেন, 'কেমন আছেন কর্ণিকা?'

কর্ণিকা ঢোঁক গিলে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'ভালো স্যার।'

ম্যানেজার টেবিলের ওপর রাখা একটা খাম তুলে বললেন, 'আপনার জন্য একটা খবর আছে।'

কর্ণিকার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে দুহাত দিয়ে চেয়ারের হাতল চেপে ধরল।

ম্যানেজার স্যার বললেন, 'আপনার একটা প্রোমোশন হয়েছে। আগামীকাল থেকে আপনি স্যারের মূল অ্যাসিসটেন্টদের একজন হলেন। এখন দুজন আছেন। তারা প্রোডাকশন এবং ফিনান্স দেখেন। আপনি দেখবেন কো-অর্ডিনেশন। কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে মনে হলে স্যারকে ইনফর্ম করবেন। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। স্বাভাবিকভাবেই আপনার স্যালারি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধের অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া হল। এখন যা পান তার থেকে দ্বিগুণের বেশি। কিন্তু রেসপনসিবিলিটি বাড়ল দশগুণ। বসবার জন্য আপনাকে আলাদা চেম্বার দেওয়া হবে। কাল থেকে অফিস যাতায়াতের জন্য আপনি গাড়ি পাবেন।' এতটা বলে ম্যানেজার স্যার খামটা এগিয়ে ধরলেন। বললেন, 'নিন ধরুন। আপনার প্রোমোশনের চিঠি।' তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'এই বয়সে এত বড় দায়িত্ব এর আগে সেন অ্যাসোসিয়েটসে কেউ পেয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না। এটা একটা খুব ভালো বিষয়। ইয়াং থটস যে-কোনও কাজেই খুব ইমপর্টান্ট। কনগ্রাচুলেশন।'

কর্ণিকার মনে হচ্ছে, তার চেয়ার কাঁপছে। সে এখনই দড়াম করে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে যাবে। সে কি ভুল শুনেছে? এও কি বিভ্রম? কোনও রকমে বললে, 'থ্যাঙ্কু স্যার। কিন্তু এতবড় দায়িত্ব কি আমি সামলাতে পারব?'

ম্যানেজার ভদ্রলোকের মুখ বলে দিচ্ছে তিনি খুব খুশি।

'না পারবেন না, ভুল করবেন।'

কর্ণিকা অবাক হয়ে বলল, 'সে কী!'

ম্যানেজার হেসে বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক তাই। ভুল করতে করতে ঠিক করবেন। আমরাও তাই করি। এবার তাহলে আসুন? আমি কয়েকটা কাজ সেরে ফেলি?'

কর্মচারী বিষয়ক ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কর্ণিকা নিজের টেবিলে না গিয়ে আগে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। এই জায়গাটা ফাঁকা। অফিসের কেউ চট করে এদিকটা আসে না। কর্ণিকা মায়ের মোবাইল নম্বর টিপল। ভাই ফোন ধরল।

boierpathshala.blogspot.com

কর্ণিকা অবাক হয়ে বলল, 'মানা তুই! স্কুলে যাসনি? মা কোথায়?'

ওপাশ থেকে চোদ্দো বছরের মানান বিরক্ত গলায় বলল, 'একসঙ্গে অতগুলো প্রশ্ন করছিস কেন দিদি? দুটো প্রশ্নের তো কোনও মানেই হয় না। গলা শুনেই তো বুঝতে পারছিস আমি। তারপরেও বলছিস মানা তুই! স্কুলে যে যায়নি তাও বুঝতে পারছিস। স্কুলে নিশ্চয় মোবাইল নিয়ে যাব না। লুকিয়ে নিয়ে গেলেও ক্লাসে তোর ফোন ধরব না। তিনটের মধ্যে একটা প্রশ্নই ঠিকঠাক। মা কোথায়? মা দোকান বাজার কোথাও একটা বেরিয়েছে। আমাকে বলে যায়নি। ফোন নিয়ে যায়নি।'

কর্ণিকা কড়া গলায় বলল, 'পাকা পাকা কথা বলবি না। স্কুলে যাসনি কেন?'

মানা শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'সমস্যা আছে।'

চোদ্দো বছর বয়সে কেউ দিদির সঙ্গে এভাবে কথা বলে? ছেলেটা বখে যাচ্ছে। লেখাপড়ায় মন নেই। পাড়ায় টই টই করে বেড়ায়। যখন-তখন স্কুল কামাই করে। এক সময় বাড়ির দায়িত্ব যে তাকেই নিতে হবে সে ব্যাপারে কোনও হুঁশ নেই। কর্ণিকা জোর ধমক দিতে গিয়ে নিজেকে সামলাল। আজকের দিনটা মন খারাপ করবে না।

'মা এলে আমাকে মিসড কল দিতে বলবি। স্কুলে যাসনি কেন?'

বাপ্পা নীচু গলায় বলল, 'বললাম তো সমস্যা আছে। বাড়িতে আয় বলব।'

কর্ণিকা ফোন কেটে দিল। নিশ্চয় বানিয়ে বানিয়ে কিছু একটা বলবে। কর্ণিকা মুখ তুলে সামনে তাকাল। এখান থেকে অনেকটা আকাশ দেখা যায়। অনেকদিন আকাশের দিকে তাকানো হয়নি। আজ আকাশটা যেন বেশি নীল। রোদ ঝলমল করছে। কী অদ্ভুত! খানিক আগে একরকম ভেবে ভয় পাচ্ছিল, হল একদম উলটো। চাকরি নট হবার বদলে প্রোমোশন। জীবনের এটাই মজা। যা ভাবা হয় সবসময় তা ঘটে না। কোন দার্শনিক যেন বলেছিলেন, 'লাইফ ইজ আনপ্রেডিকটেবল, বিকজ ইট ইজ লাইফ।' জীবনের এই রহস্য যেমন মজার, তেমনই মনখারাপের। অর্চিনকে নিয়ে সে কত কিছুই না গোপনে ভাবে। ভাবে জীবনের 'আনপ্রেডিকটেবল' নিয়মে সব একদিন উলটে যাবে। না, যাবে না। কারণ অর্চিন তাকে নিয়ে ভাবে না। তার ভাবনার মানুষ আলাদা। সেই মেয়ের নাম ঋষা। অর্চিনের মতো ঝকঝকে ছেলের জন্য ঋষাই উপযুক্ত মেয়ে। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। তার মতো নার্ভাস নয়। ঋষাকে যে কর্ণিকা খুব বেশি চেনে এমন নয়। তার আলাপ ফেসবুকে। ঋষা ফেসবুকে বেশি থাকে না। এলেও টুকটাক দু-একটা কথা বলে অফলাইন হয়ে যায়। সে ফাঁকা সময়ে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের থেকে বই টই নিয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে। নিজেই এই কথা ওয়ালে পোস্ট করেছে। কর্ণিকা এই মেয়েকে ঘাটায় না। তার ভয় করে। যদি অর্চিন জানতে পারে তাহলে নিশ্চয় রেগে যাবে। অর্চিন সব সময়েই তার সঙ্গে কেমন যেন রাগ রাগ করে কথা বলে। পাত্তা দিতে চায় না। অ্যাভয়েড করে। করুক। যত খুশি রাগ করুক। তবু সে এই ছেলেকে ভালোবাসে। নরমাল বুদ্ধির ভালোবাসা নয়, বোকার মতো ভালোবাসা। একটা ছেলে অন্য মেয়েকে ভালোবাসে, তাকে পাত্তা দেয় না, তারপরেও তাকে ভালোবাসার মানে কী? বোকামি ছাড়া আর কী? অর্চিন যখন তাকে হেলাফেলা করে, ফোন ধরে না, মেসেজের জবাব দেয় না, দেখা করে না খুব দু:খ হয়। মনে হয়, ঘরের দরজা আটকে একচোট কাঁদি। মনে হয়, আর কোনওদিন সে হ্যাংলার মতো অর্চিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাবে না। তার নিজের কি কোনও দাম নেই? ঋষার মতো ঝকমকে মেয়ে না হোক, সে কি এতটাই হেলাফেলার? তার কি কোনও আত্মসম্মান বোধ নেই? দুদিন পরেই সব জট পাকিয়ে যায়। মনে হয়, ভালোবাসায় কীসের আত্মসম্মান? কীসের অবহেলা? ধ্যুস। আমার ভালোবাসা আমার কাছে। সব মানুষকে যে সমান হতে হবে, এক ভাবে চলতে হবে তার কি মানে আছে? অর্চিন আলাদা। আলাদা বলেই তো তাকে এত ভালোবাসে। কিছুতেই বেরোনো যায় না। সবথেকে বড় কথা হল, অন্য মানুষটা কেমন ভাবে নিল তার ওপর ভালোবাসা নির্ভর করে না। ভালোবাসা সবসময়ই একা এবং স্বাধীন। তাই এত প্রিয়। এমন তো নয় যে সে অর্চিন আর ঋষার মাঝখানে ঢুকতে চাইছে। মোটেও না। তাছাড়া চাইলেও যে কোনও লাভ হবে না, তাও ভালো করে

boierpathshala.blogspot.com

জানা হয়ে গেছে। উলটে অর্চিন আরও সরে যাবে। এখন যেটুকু যা কথা বলে, যোগাযোগ করে তাও করবে না। ভালোবাসার কোনও পাওয়াই পূর্ণ হয় না, আবার অপূর্ণও হয় না। একটা সময় মনে হয়, আরও পেলে ভালো হত। একটা সময় মনে হয়, উফ এত পাওয়া তো কষ্টকর। দমচাপা। অল্প প্রেমের পরই প্রেমিক প্রেমিকারা ঘনিষ্ঠ হবার জন্য আকুলি বিকুলি করে। আবার দীর্ঘদিন প্রেমে ঘনিষ্ঠ থেকেও স্বামী স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়। এর কোনও নিয়ম নেই। নিয়মে ঢোকাও যায় না।

অনেকটা ভেবে ফেলল কর্ণিকা। তারপরেই মোবাইল তুলে অর্চিনের নম্বর টিপল। প্রোমোশনের খবরটা খুব জানাতে ইচ্ছে করছে।

'বলো' অর্চিনের গলা ভারী।

কর্ণিকা নীচু গলায় বলল, 'একটা খুব ভালো খবর আছে। ভাবলাম তোমাকে জানাই।'

অর্চিন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'বলে ফেলো।'

'অফিসে আমার একটা প্রোমোশন হয়েছে। খুব বড় প্রোমোশন।'

অর্চিন ওপাশে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভালো খবর।'

অর্চিনের প্রশংসায় কর্ণিকা উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আমাদের বস একজন দারুণ মানুষ।'

অর্চিন ঠান্ডা গলায় বলল, 'কেন? তোমাকে প্রোমোশন দিয়েছে বলে?'

কর্ণিকা হেসে বলল, 'না, তা নয়। আমার ধারণা, আমার এই প্রোমোশন হয়েছে, বসের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য।'

ওপাশে অর্চিন যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, 'কী বললে!'

কর্ণিকার উৎসাহ বেড়ে গেল। যে ছেলে তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য মোটে সময় পায় না, সে আজ এত প্রশ্ন করছে!

'সত্যি! আমি একদিন স্যারের চিঠির ভুল ধরেছিলাম, আমার ধারণা সেই কারণে আমি প্রাইজ পেলাম।'

অর্চিন একটা ছোট শ্বাস ফেলে বলল, 'তোমার বসের মনে হয় খানিকটা মাথার সমস্যা আছে।'

কর্ণিকা বলল, 'মোটেই না। উনি একজন সিরিয়াস মানুষ। বিমলকান্তি সেনের মতো মানুষ খুব কম পাওয়া যায়।'

অর্চিন একটু চুপ করে বলল, 'কী নাম বললে?'

কর্ণিকা বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, 'বিমলকান্তি সেন।'

কর্ণিকা কোথায় কাজ করে, কী কাজ করে সেসব নিয়ে কখনও উৎসাহ দেখায়নি অর্চিন। একটা চাকরি করে, ব্যস এইটুকুই জানে। আজ সে প্রথম জানল, কর্ণিকা কাজ করে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসে। বিমলকান্তি সেনের অফিস। যার বাড়িতে সে থাকে। আশ্চর্য!

ঠিক একই সময় আর একটা খুব আশ্চর্যের ঘটনা ঘটল। ঘটছে বিমলকান্তি সেনের চেম্বারে।

বিমলকান্তি নিখিলেশ উপাধ্যায় হয়ে গেছেন! আসল নিখিলেশ উপাধ্যায় বসে আছেন তার উলটোদিকের চেয়ারে। আওয়াজ করে চা খাচ্ছেন। বদলে যাওয়া বিমলকান্তি ভাবছেন—

'দায়িত্ব কি আমি ঠিকমতো পালন করতে পারছি? কমলকান্তিবাবু আমাকে তাঁর পুত্রকে গার্ড দিতে বলেছেন। অফিসে কোনও সমস্যায় পড়লে পরামর্শ দিতে বলেছেন। আমি কি এতদিন ধরে তা পেরেছি? যদি পেরে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই আমার ওপর তার বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এবার বড় কোপ মারতে হবে।'

বিমলকান্তিবাবুর বাঁ হাঁটুর কাছটা কনকন করে উঠল। এই ব্যথা তার নয়। এই ব্যথা নিখিলেশ উপাধ্যায়ের। তিনি চা খাচ্ছেন না, তবু জিভে চায়ের স্বাদ পেলেন।

সব মিলিয়ে একক মুহূর্ত। কয়েক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ। আবার সব নরমাল। বিমলকান্তিবাবু আবার বিমলকান্তি হয়ে গেলেন। তিনি চুপ করে বসে আছেন। তার মানে, উপাধ্যায়বাবুকে বাবাই এখানে

boierpathshala.blogspot.com

রেখেছেন! সমস্যায় পড়লে তাকে রক্ষা করবার জন্য! কী অদ্ভুত! এতদিনে কিছুই বোঝা যায়নি! বড় কোপ মানে কী?

কিন্তু সেসব পরের কথা। আসল কথা হল, আবার একই গোলমাল। প্রহ্লাদ দিয়ে যা শুরু হয়েছিল। তারপর বাবা হয়ে এখন উপাধ্যায়বাবু।

বিমলকান্তি সেন নিশ্চিত হলেন তার কোনও বড় গোলমাল হয়েছে। বড় গোলমাল ছাড়া একজন মানুষ অন্য মানুষ হয়ে যেতে পারে না। এই গোলমাল কি শুধুই বিভ্রম? মনের ভুল? নাকি অন্য কিছু? এমন কিছু যা বোঝা যায় না?

পনেরো

এতদিন আমরা আপনাদের শিখিয়েছি। এবার আপনাদের পালা। আপনারা আমাদের শেখাবেন। –যোশেফ স্টালিন।

অর্চিন দাঁড়িয়ে পড়ল। এই নিয়ে কতবার যে কথাটা সে পড়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। গত তিন বছর ধরে যখনই সে শেখর গুপ্তর বাড়িতে আসে তখনই একবার করে পড়ে। তার ভালো লাগে।

শুনলে মনে হচ্ছে, এটা কোনও পোস্টার বা দেওয়ালের লেখা। শেখর গুপ্ত নামে কারও বাড়ি যাতায়াতের সময় অর্চিনের চোখে পড়ে। ঘটনা সেরকম নয়। এটা পোস্টার নয়। দেওয়ালেও লেখা হয়নি। লেখা হয়েছে শেখর গুপ্তর বাড়ির দরজায়। একটা কাগজের টুকরোয় লিখে দরজার গায়ে লাগানো। কম্পিউটারে টাইপ করা কাগজ। চারপাশে যত্ন করে বাদামি রঙের সেলোটেপ। রোদে, জলে লেখা নষ্ট হলে আবার নতুন কাগজ লাগানো হয়। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, জীর্ণ রংচটা, পলকা দরজার গায়ে নেমপ্লেট। নাম, ঠিকানা লেখা আছে। কাছে গেলে ভুল ভাঙবে। প্রথম প্রথম সবাই অবাক হত। বাড়ির দরজায় এসব কী লেখা! হাসাহাসিও করত। শেখর গুপ্তকে জিগ্যেস করত।

'এর মানে কী!'

শেখর অবাক হয়ে বলত, 'কেন! সহজ বাংলায় লেখা আছে। মানে না বোঝার তো কোনও কারণ নেই। এতদিন আমরা শিখিয়েছি, এবার তোমরা শেখাবে।'

'এসব কাকে বলছ শেখর।'

শেখর বলছে, 'জনগণকে। নিজের বাড়ির দরজা দিয়ে শুরু করেছি।'

'চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম?'

রসিকতা। খানিকটা অপমান মেশানো রসিকতা। শেখর গুপ্ত চুপ করে থেকেছে। সে অপ্রয়োজনীয় কারণে রাগে না। ঠাট্টা, ব্যঙ্গ, অপমান অবজ্ঞা করতে পারে। মুখে বলে, অপমান করবার জন্য যোগ্যতা লাগে। যে যোগ্য নয়, তার অপমান গায়ে মাখবার কারণ নেই।

'তোমরা ক্ষমতা থেকে সরে গেছ বলে এসব লিখেছ নাকি শেখর?'

শেখর বলে, 'পুরোটা তাই না হলেও, খানিকটা তো তাই বটে।'

এরপরই প্রশ্নকর্তা ব্যঙ্গের সুরে হেসে বলত, 'এতে পাপ□□লন হবে? তোমাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ফিরবে?'

শেখরও মৃদু হেসেছে। বলেছে, 'পাপ□□লনের প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে? আমাদের পার্টিতে পাপ-পুণ্যের কোনও জায়গা নেই। একেকটা পরিস্থিতিতে একেকরকম শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হয়। বামপন্থায় সেটাই নিয়ম। তবেই এগিয়ে চলা যায়। নইলে তো থমকে থাকতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি যা, তাতে এভাবেই আমাদের চলা উচিত। মানুষের কথা শুনতে হবে। তাদের কাজ থেকে শিখতে হবে। আমাদের ঠিক, ভুল তারা বলবে।'

boierpathshala.blogspot.com

'তা বলে নিজের বাড়ির দরজায় নোটিস লাগিয়ে শিখতে হবে?'

শেখর আবার হাসে। বলে, 'অসুবিধে কী? আমি তোমার কাজ থেকে শিখব এটা প্রকাশ্যে বলায় কোনও লজ্জা আছে নাকি?'

তিন বছর ধরে দরজায় এই কাগজ সাঁটা। পার্টি ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই শেখর গুপ্ত এই কাণ্ড করেছে। বাড়িতে যাদের আসা-যাওয়া তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবে নতুন কেউ এখনও অবাক হয়। দরজায় স্ট্যালিনের বাণী সাঁটার ব্যাপারে তমসার আপত্তি ছিল। স্বামীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সে কখনওই নাক গলায় না। বহু বছরের অভ্যেস। একটা সময়ে সেও পার্টির খুব কাছে ছিল। মহিলা ফ্রন্টে। সমিতির ওপর দিকেই ছিল। পরে দু-একজনের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় সরে আসে। পার্টি অবশ্য তমসাকে ছাড়তে চায়নি। বোঝাতে চেষ্টা করেছিল।

'আদর্শ, বিশ্বাস, লক্ষ্য অনেক বড়। দু-পাঁচজনের সঙ্গে মতের অমিল অনেক ছোট জিনিস। তার জন্য দল থেকে সরে আসার কোনও কারণ নেই। আপত্তি, প্রশ্ন, প্রতিবাদ নিয়ে দলের ভিতর লড়তে হয়।'

তমসা সেই সময়কার পার্টি লিডারশিপকে বলেছিল, 'মতের অমিল যদি কোনও ইস্যু নিয়ে হত, তাহলে অন্য কথা ছিল। আমার বিশ্বাসে ধাক্কা লেগেছে। দলের মধ্যে যারা ক্ষমতাবানদের গা ঘেঁষে চলে তারা একরকমভাবে কাজ করবে, আর যারা দূরে দূরে থাকে তারা অরেকরকম কাজ করবে, এই নীতি আমি মানতে পারছি না।'

'বসে মিটিয়ে নাও তমসা। কথা বলো।'

তমসা বলেছিল, 'অনেকবার বসেছি। আশ্বাস পেয়েছি, কাজ পাইনি।'

'এত ছোট কারণে এত বড় একটা স্বপ্ন বাতিল করে দেবে। তুমি তো আর নেতানেত্রীর মুখ দেখে পার্টি করতে আসোনি, মানুষদের মুক্তির স্বপ্ন দেখে এসেছ।'

তমসা এরপরেও রাজি হয়নি। বলেছিল, 'আমি স্বপ্নকে বাদ দিচ্ছি না। পার্টিকেও না। আমার আজও বিশ্বাস এই পার্টি পারবে সমাজ বিকাশের মধ্যে দিয়ে মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে। আমি পার্টির সঙ্গে ঝগড়া করছি না। শান্তিপূর্ণভাবে বিচ্ছেদ নিচ্ছি। এখনও মেম্বারশিপ পাইনি। ফলে জটিলতা কিছু নেই। তাছাড়া আমার ছেলেটা খুব ছোট। তাকে বাড়িতে ফেলে প্রোগ্রামে আসতেও পারি না। এখন তো সমিতিতে লোকের অভাব হবে না। আমার মতো দু-পাঁচজন কে থাকল কি না থাকল তাতে কিছু এসে যায় না। আবার যখন প্রয়োজন মনে করব নিশ্চয় ফিরে আসব।'

এরপর আর তমসাকে নেতৃত্ব কিছু বলেনি।

মহিলা ফ্রন্টে কাজ করতে করতেই শেখরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তমসার। শেখর তখন ব্রাঞ্চের সেক্রেটারি। রাতদিন পার্টি অফিসে পড়ে থাকে। একনিষ্ঠ, সিরিয়াস, সৎ নেতা। পরিশ্রম করে খুব। তার হাবভাব আচার আচরণ দেখলে বোঝা যেত না পার্টি সরকারে আছে। কেউ কখনও তার দিকে আঙুল তুলতে পারেনি। সংগঠনে খুব জোর দিত। মাঝে মাঝেই মহিলা, ছাত্র, যুব শাখার সদস্যদের ডেকে বকাবকি করত।

'কমরেড আপনারা কী চান? পার্টিটা উঠে যাক? আমরা সবাই মিলে সরকারে চলে যাই? মন্ত্রী হয়ে রাইটার্স বিল্ডিয়ে গিয়ে বসি? সরকারটা কীসের জোরে দাঁড়িয়ে আছে আপনারা জানেন না? দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সংগঠনের জোরে। ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন যদি অ্যাক্টিভ না থাকে, পার্টিও চলতে পারে না। সরকারও টিকতে পারে না। আপনাদের দেখে অবাক লাগে। আপনারা যেন বুঝে গেছেন, গণসংগঠন করবার জন্য পরিশ্রম করতে হবে না। পার্টি গভর্নমেন্টে রয়েছে, সেই লোভে সবাই ছুটে আসবে। ছাত্র, যুব, মহিলাদের মিটিং-মিছিলে ভিড় হবে। তাই হচ্ছেও। ভিড় দেখেই আপনারা খুশি। অথচ আপনারা জানেন, এর মধ্যে অনেকটাই ভুষি। বেনোজল। কিছু পাওয়ার জন্য ভিড় করে। সরকারি সুবিধে, চাকরি, কন্ট্রাক্টরি, বদলি, প্রোমোশন। যদিও আমি তাদের এই ছুটে আসাটাকে অন্যায় বলে মনে করি না। এই দেশে একজন

boierpathshala.blogspot.com

দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের যা প্রাপ্য, তা সে পায় না। সে তার প্রয়োজন মেটাতে অসহায়ের মতো সর্বত্র ছুটে বেড়ায়। আমাদের কাছে রিলিফের জন্য আসে। যেহেতু আমাদের সরকার পার্টির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাই পার্টির কাছেই মানুষ আসবে। অনেকে সমালোচনা করেন, পার্টির ব্রাঞ্চ অফিস, লোকাল অফিস সরকার চালাচ্ছে। আমরা কেউ কেউ এই সমালোচনা শুনে মুষড়ে পড়ি। লজ্জা পাই। কারণ নিজেদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। আমরা কী, কেন সেটাই আমরা ভালো করে জানি না। আমার তো গর্ব হয়। দরিদ্র পার্টির সরকার তো এরকমই হবে। আমরা নীতি আদর্শ দিয়ে সরকার গড়েছি। মানুষ তো পার্টি অফিসে আসবেই। সাধারণ, গরিব মানুষের কাছে পার্টিই সরকার। আর আপনারা সকলে সরকারের একেকটা পার্ট, অংশ। এইসব সমালোচনায় মুষড়ে পড়বার কিছু নেই। নিজেদের মনকে পরিষ্কার রাখুন। নিজেরা কোনও লোভে জড়িয়ে পড়বেন না। আপনার কাছে যে আসছে তাকে নিয়ম মেনে সাহায্য করতে পারলে করবেন। বুক ফুলিয়ে করবেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাকে পার্টির আদর্শে, নীতিতে শিক্ষিত করবার চেষ্টা করতে হবে। গণসংগঠন এই কাজ করতে পারে। যারা ভুষি, বেনোজল তারা সরে যাবে। যাক। আপনারা দশ জনে একজনকে নিজেদের সংগঠনে আনুন। ভিড় বাড়াবার জন্য নয়, নীতি, আদর্শের জন্য। আপনারা এই কাজ সিরিয়াসলি করছেন না।'

তমসা মানুষটার প্রেমে পড়ে যায়। শেখর পার্টির হোলটাইমার। পার্টির দেওয়া লেভিটুকুই আয়। তমসা চাকরির জন্য উঠেপড়ে লাগল। সে লেখাপড়ায় ভালো। পরীক্ষা দিয়ে স্কুলে চাকরি পেয়ে গেল। অনেকে বেঁকাভাবে বলল, পার্টির কাছের লোক তাই চাকরি জুটে গেল। তমসা এসব কথায় পাত্তা দিল না। সে জানে, পার্টিতে এ ধরনের বেঁকা কথা বলার মতো মানুষ যেমন আছে, তেমন লেখাপড়ায় ভালো, কাউকে ধরাধরি না করে, পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার মতো লোকও প্রচুর আছে। এসব কথা গায়ে মাখবার কিছু নেই।

তমসাই বিয়ের জন্য শেখরকে প্রস্তাব দিয়েছিল।

'আমার সঙ্গে সংসার করতে পারবে?'

তমসা বলেছিল, 'জানি না সংসার কাকে বলে, তবে তোমার পাশে থাকাটা যদি সংসার করা হয়, তাহলে পারব।'

'আমি কিন্তু রাজনীতি নিয়েই থাকব।'

তমসা বলেছিল, 'সেই কারণেই তো তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'অনেক ঝামেলা। অনেক কষ্ট।'

তমসা বলেছিল, 'এটা আর নতুন কথা কী? ঝামেলার মানুষকে ভালোবাসলে কষ্ট তো পেতেই হবে।'

'পার্টি এখন পাওয়ারে। কিন্তু আমি কখনও কোনও সুযোগ-সুবিধের মধ্যে দিয়ে যাইনি, যাব না। আমি একা নই, আমার মতো এরকম বহু কমরেড আছে, তারা আমার থেকেও অনেক কষ্টে জীবনযাপন করে। তাদের কথা আমরা জানতে পারি না। গুটিকয়েক শহুরে সুবিধাভোগীকে দেখে পার্টির বিচার করি। আমি কিন্তু এই জীবন থেকে সরতে পারব না তমসা।'

তমসা বলে, 'জানি। জানি বলেই তোমার পাশে থাকতে চাই। একজন ভালো মানুষের সঙ্গে থাকবার আনন্দ টাকাপয়সার কষ্টের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আমি সেই আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাই না।'

বিয়ে হল। তারপর একসময় পার্টি থেকে দূরেও সরে গেল তমসা। এই নিয়ে শেখর তাকে জোর করেনি। তবে কেউ কেউ ফের বিদ্রুপ করেছে। বলেছিল, 'মেয়েটা চালু। চাকরি, বর জুটিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল।' তবে সেই কথা বেশি দূর এগোতে পারেনি। শেখরের মতো সৎ, স্বচ্ছ মানুষকে জড়িয়ে বেশিদিন খারাপ কথা চালানো মুশকিল। যারা প্রসঙ্গটা তুলেছিল, তারাই দ্রুত চুপ করে গেল। তমসাই দরজায় সাঁটা কাগজ নিয়ে স্বামীর কাছে আপত্তি তুলেছিল।

boierpathshala.blogspot.com

'এইসব বাড়ির দরজায় না লাগালেই নয়?'

শেখর বলেছিল, 'কেন নয়? না লাগালেও চলে।'

তমসা অবাক হয়ে বলল, 'না লাগালে যদি হত, তাহলে লাগিয়েছ কেন?'

শেখর বলল, 'দুটো কারণে। না, দুটো নয়, তিনটে কারণে তমসা। এক নম্বর হল, সরকার থেকে সরে গিয়েছি মানেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, আমরা সব গালে হাত দিয়ে বসে থাকব এটা একেবারেই ঠিক নয়। আমাদের নতুন করে কাজ শুরু হল, শেখবার কাজ। এতদিন যে কাজটা আমরা করতে পারিনি। পারা সম্ভবও ছিল না। এত বছরের একটা সরকার গন্ধমাদন পর্বতের মতো আমাদের ঘাড়ের ওপর বসেছিল। তাকে সামলাতেই গোটা পার্টিটার অনেক সময় চলে গেছে। দু-নম্বর কারণ, আমি।'

তমসা অস্ফুটে বলল, 'আমি।'

শেখর বলল, 'হ্যাঁ আমি। আমি নিজে যেন ঘরে ঢুকতে-বেরোতে কথাটা মনে রাখি। শুধু কমরেডদের বললাম, আর আমি নিজের মতো চললাম, তা যেন না হয়।'

তমসা বলল, 'তা হলে দরজার বাইরে? ঘরেও রাখা যেত। এটা কি বাড়াবাড়ি নয়?'

শেখর সামান্য হেসে বলেছিল 'অবশ্যই বাড়াবাড়ি তমসা। আমাদের এখন বাড়াবাড়িই করা দরকার। যা বলবার জোর গলায় বলতে হবে। আমি ভয় পাইনি, একথাটা পার্টি, সমর্থকদের জানাবার জন্যই নিজের বাড়ির দরজায় লিখে দিয়েছি। আমি জানি, এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে এর জন্য বাড়িতে হামলা হতে পারে। আমি সামান্য একটা কাগজ বাড়ির দরজায় সাঁটতে ভয় পাব? এটাই স্বাভাবিক তমসা। এতদিন একটা সিস্টেম চলছিল। সেটা নড়েছে। তার জন্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি তো হবেই।'

তমসা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আর তিন নম্বর কারণ?'

শেখর একটু চুপ করে থেকে হাসল। বলল, 'লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট। আমি কমরেড স্তালিনের প্রসঙ্গ এনে নতুনের একটু নাড়া দিতে চাইছি। এটা পার্টিতে সম্ভব নয়। পার্টি অ্যাপ্রুভ করবে না। তাই নিজেকে দিয়ে খুব ছোটভাবে শুরু করলাম। আমি বিশ্বাস করি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট নেতারা, বিভিন্নভাবে উন্মোচিত হন। যুগে যুগে হয়েছেন। কমরেড স্তালিনের কিছু কথা এখন খুব সময়োপযোগী। যেমন এই শিক্ষার প্রসঙ্গ।

তমসা অবাক হয়ে বলেছিল, 'তা বলে স্তালিন!'

শেখর বলেছিল, 'অবশ্যই। কমরেড স্তালিনের সাফল্যকে ছোট করে দেখবার ক্ষমতা কারও নেই। তাঁর নেতৃত্বেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে শ্রমিকের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা খুব বড় কথা। গণতন্ত্র কার হাতে থাকবে। এখানেই দেখো না। মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়া স্ট্রাকচার থেকে উঠে আসা অনেকেই পার্টিতে উচ্চস্থান পেয়েছেন। এটার ভালো দিক যেমন আছে, তেমন মন্দ দিকও আছে। আদর্শকে সরিয়ে ব্যক্তিপুজো বড় হয়ে ওঠে।'

তমসা নীচু গলায় বলে, 'এখানেও কি তা হয়নি? ব্যক্তি নিয়ে আমরা লাফালাফি করিনি?'

শেখর বলল, 'অস্বীকার করছি না। কিছু হয়তো হয়েছে। তবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এটা নতুন কিছু নয়। বারবার ঘটেছে। এই চ্যুতি শুদ্ধ মার্কসবাদের ছদ্মবেশে বহুবার আধিপত্য কায়েম করতে চেয়েছে। পেরেওছে। আসলে কী জানো তমসা, মার্কসবাদ চিরকালই আগুনের মধ্যে দিয়ে চলে। যাকে বলে অগ্নিপরীক্ষা। এক সময় যেটা ঠিক, সত্য, অন্য সময়ে সেটাই মিথ্যে ভুল হয়ে যায়। মার্কসবাদের এই দ্বন্দ্ব, দ্বিধা চিরন্তন। তার মধ্যে থেকেই অমৃতকে খুঁজে নিতে হবে। সেই অমৃতই হল মানুষের হাতে ক্ষমতা। আমাদের এখানে এটা সত্য। ব্যক্তির মূর্তি ভাঙা যায়। মানুষটাকে ভাঙা যায় না।

তমসা আর দরজায় সাঁটা কাগজ নিয়ে আপত্তি করেনি। বরং গত দুবছর হল সে আবার পার্টির কাজে খানিকটা করে সময় দিচ্ছে। বারো বছরের ছেলে শান্ত। তাকে সবসময় নজরে রাখতে হয় না। তমসা মনে করে, এখন শুধু ঘর-সংসার নয়, বাইরে বেরিয়ে কাজের সময় এসেছে।

boierpathshala.blogspot.com

অর্চিন তার 'শেখরদা'র দরজায় কড়া নাড়ল। সেও মনে করে, এখন শুধু নিজের কেরিয়ার গুছিয়ে 'গুডবয়' হওয়ার সময় নয়, মাঠে নেমে কাজ করবার সময় এসেছে। সে সব ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হতে চায়।

ষোলো

কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা-কর্মীর ঘরদোর কেমন হয়? ছন্নছাড়া? অগোছালো?

গল্প, উপন্যাস, সিনেমায় সেরকমই দেখানো হয়। দেওয়ালে বিপ্লবীদের ঝুললাগা ফটো, টেবিলে উপছে পড়া বই, চেয়ারে না-কাচা জামাকাপড় ডাঁই করে রাখা, খাটের ওপর বই, খাতা, লিফলেট, পোস্টার। ঘরের কোণে পতাকা, মেঝেতে চাটাই, চারপাশে ছড়িয়ে আছে মাটির ভাঁড়, বিড়ির টুকরো। ভাবটা এমন যেন, গোছগাছ পরিচ্ছন্নতায় কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের রুচি নেই অথবা সময় নেই। তারা সর্বদাই ভাবছেন কমিউনে রয়েছি। যে-কোনও সময় লড়াইয়ের জন্য ডাক পড়বে। টেবিলের পাশে দাঁড় করানো বন্দুক, খাটের ওপর রাখা লাল পতাকা, দরজার গায়ে ঝোলানো ওভারকোট আর টুপি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে।

এই ঘটনা যেমন সত্যি, আমার সত্যিও নয়।

কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের জীবনযাপনের যে ছবি বাঙালি মনে জমা রয়েছে, তা মূলত রুশ বিপ্লবের সময় থেকে ধার করা। রুশ সাহিত্য, সিনেমায় এই ধরনের ঘরবাড়ি, কমিউন, গোপন আস্তানা আকছাড় দেখা যেত। সেই দৃশ্যই মনে গেঁথে আছে। আবহমানকাল ধরে গল্পে, উপন্যাসে সেসবই বলা হচ্ছে। চিন, ভিয়েতনাম, কিউবা, চিলির বিপ্লবীদের জীবনচর্চার ছবিও এত জনপ্রিয় নয়। ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা কোন ধরনের ঘরে থাকতেন, সে বর্ণনা সহজে পাওয়া যায় না। এর কারণ এক সময় রাশিয়ার প্রচার ক্ষমতা ছিল তীব্র। সে কড়া প্রচারের মধ্যে দিয়ে বাঙালির মনে 'বিপ্লব থেকে বিপ্লবী' কর্মকাণ্ডের অনেকটাই দখল করে নিয়েছিল।

শেখর গুপ্ত ড্রইংরুম এই ধারণা ভেঙে দেবে।

তমসাকে বিয়ে করার আগে থেকেই অপরিসর এই ঘরটি পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন। খুবই সাধারণ আসবাব। তক্তাপোশের ওপর পাতলা তোষক পেতে 'ডিভান' বানানো হয়েছে। ওপরে বেডকভারটি সাধারণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। টেবিল, চেয়ার, মোড়া, বেতের বুকর‍্যাকের সঙ্গে আছে দেওয়ালে ঝোলানো তিনটে ফটো। একজন কার্ল মার্কস, অন্য দুজন শেখরের বাবা এবং মা।

শেখরের ড্রইংরুমের বুকর‍্যাকে লোক দেখানো কোনও বই নেই। সবই রোজ নাড়াঘাঁটা করার বই। পার্টির বই, কাগজপত্র বেশি। নীচের তাকে বেশ কিছু কবিতার বই আছে। শেখর কবিতা পড়তে ভালোবাসে। অর্চিনকে কবিতা পড়ার কথা সে-ই বলেছে।

'কবিতা পড়তে হবে অর্চিন। যারা সুন্দর, সমঅধিকারের পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখে, তাদের কবিতা পড়তে হয়। কবিতা না পড়লে স্বপ্ন দেখা যায় না। আর স্বপ্ন না দেখলে দু:খী মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করবে কী করে? মনে রাখবে, কবিতা পড়ার ব্যাপারে বাছবিচার রাখতে নেই। কবি কোন দলের সমর্থক, কবি বাজারি পত্রিকায় লেখে না লিটল ম্যাগাজিনে লেখে—এসব ভাবতে নেই। সাহিত্য, শিল্প নিয়ে ভাগাভাগি করতে গিয়ে আমাদের পার্টি একসময় ভুল করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশকেও আমরা বর্জন করতে গিয়েছিলাম। সেই ভুল আমরা শুধরে নিয়েছি। আমরাই পারি নিজেদের ভুল সংশোধন করতে। কবিতা পড়বে মন খুলে। পাবলো নেরুদা যেমন পড়তে হবে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও পড়তে হবে। নতুন নতুন কবিদের লেখা খুঁজে পড়তে হবে। কবিতায় শুধু লড়াই সংগ্রামের কথা লেখা থাকবে, এমনটা ভাবলে চলবে না। কবিতা মনের দু:খ, যন্ত্রণা, আনন্দ, চাওয়া-পাওয়া, জীবনের জটিলতার কথা বলে। অস্তিত্বের সঙ্কট নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কবিতাকে না ছুঁলে নতুন সমাজ গড়া যায় না অর্চিন।'

boierpathshala.blogspot.com

শেখরদার ঘরে ঢুকে অর্চিন বসেছে তক্তাপোশ ডিভানের ওপর। আজ ডিভানের ওপর তমসা একটা চওড়া বাদামি স্ট্রাইপের চাদর পেতেছে। অর্চিনের হাতে দুটো বই। একটি প্রবন্ধ সংকলন। নাম বামপন্থার ভবিষ্যৎ। সম্পাদক কল্যাণ দাশগুপ্ত। অন্যটি কবিতার বই। নাম জার্নি। কবির নাম তিলোত্তমা বসু। প্রবন্ধের বই শেখরদার। পড়বার পর ফেরত দিতে এনেছে। কবিতার বইটা তাকে দিয়েছে ঋষা। শেখরদা কবিতা পড়তে বললেও অর্চিন এ ব্যাপারে উৎসাহ পায় না। কবিতা মাথায় ঢোকে না। তাও কিছু কিছু চেষ্টা করে এবং ফেল করে। ঋষা একজন বিরাট কবিতাভক্ত মেয়ে। তাদের লিটল ম্যাগাজিন আছে। সে অর্চিনের মুখে শেখরদার কবিতা সম্পর্কিত কথা শুনে খুবই উৎসাহ পেয়েছে। সেও অর্চিনকে কবিতা পড়ানোর চেষ্টা করে। এই বইটা দিতে অর্চিন নাক সিঁটকেছিল।

'কবিতার বই আমাকে দিচ্ছিস কেন? আমি কবিতার কী বুঝি?'

এর উত্তরে ঋষা ছোটখাটো একটা লেকচার দিয়ে বসে।

'আহা, পড়েই দেখো না। বুঝতে হবে না। কবিতাগুলো আমার এক দিদির লেখা। তিলোত্তমা বসু। খুব শক্তিশালী কবি। আড়ালে, নির্জনে থেকে লেখালেখি করে। কবিদের যা মানায় আর কী। আজকাল কিছু কিছু কবির সম্পর্কে কত বাজেবাজে কথা শুনি। খারাপ লাগে। নিজেরা কাদা ছোড়াছুড়ি করে। একে অন্যকে হিংসে করে। অন্য কোনও কবির প্রশংসা শুনলে গলা ফোলায়। বলে, নিশ্চয় কোনও স্বার্থ আছে। কয়েকজন আবার নিজের ঢাক পেটাতে চাইলে আর কিছু চায় না। কবিতার মতো পবিত্র একটা বিষয় নিয়ে এমনটা কীভাবে হয় কে জানে? সত্যিকারের কবিরা কখনও আমাকে দেখ, আমাকে দেখ করে না। পাঠকরা তাঁদের খুঁজে দেখে নেয়। হাতে গোনা হিংসুটে, একজিবিশনিস্টদের দল অন্যদের নাম খারাপ করছে। তিলোত্তমাদি আমাদের ম্যাগাজিনে লেখে। আমরাই জোর করে লেখাই। কোনওদিন কাউকে বলে না, আমার লেখা ছাপো। এর মধ্যেই ভালো ভালো সব কবিতা লিখেছে।'

অর্চিন চুপ করে ঋষার লেকচার শোনে। প্রথমে ভেবেছিল, মাঝখানেই থামিয়ে দেবে। তারপর দেখল, ভালোই হয়েছে। কবিদের হালচাল সম্পর্কে খানিকটা জানা গেছে। এই বিষয়টা তার একেবারেই ব্ল্যাঙ্ক ছিল। নির্লিপ্তভাবে বলল, 'আমাকে কবিতা পড়তে দিয়ে বিরক্ত করিস না। আমার অনেক কাজ আছে।'

ঋষা হেসে বলল, 'আচ্ছা, পড়তে হবে না। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ফেলে দিস।'

বইটা ঘরে ফেলেই রেখেছিল অর্চিন। একদিন অন্যমনস্ক এবং অবহেলা ভরে পাতা উলটোতে গিয়ে ক'টা কবিতা ভলো লেগে গেল। ঠিক গোটা কবিতা হিসেবে নয়, আলাদা করে শব্দ, বাক্য মনে ধরল। উৎসাহ নিয়ে আরও ক'টা পড়ে ফেলল সে। একসময় বই শেষ করে অর্চিন অবাক হল। সব কথা বুঝতে পারল না, তার পরেও ভালো লাগছে। কবিতা কি তবে এরকমই? সব বোঝা-না-বোঝার জন্যই তাকে ভালো লাগে? কাছের মনে হয়? মনে হয়, এই তো আমার আশ্রয়? এই তো আমার শক্তি? এরপর অর্চিন একটা কাণ্ড করে বসল। তার মতো ছেলের পক্ষে যা অসম্ভব। বইয়ের পাতা খুলে 'ফেরার ভাড়া' নামে একটা কবিতা নিজের মনে অস্ফুটে আবৃত্তি করে উঠল—'হতাশার কবিতা থেকে দূরে আমার বাড়ি/ প্রেম ও ঘৃণার কবিতা থেকে ঘুর ঘুরপথ/ একা একা বাড়িতে ফিরছি...।'

বইটা শেখরদাকে পড়াতে এনেছে অর্চিন। তবে শুধু বই দিতে আসেনি ঃ শেখরদাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানাতেও এসেছে। ইতিমধ্যে জানিয়েও ফেলেছে।

শেখর গুপ্ত বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে সহজভাবে বলল, 'হঠাৎ হোলটাইমার হওয়ার ইচ্ছে হল কেন?'

অর্চিন অবাক হয়ে বলল, 'হঠাৎ কেন হবে? আমি তো পার্টির স্টুডেন্ট ফ্রন্টে কাজ করছি। এবার পুরোসময় দিতে চাই।'

শেখর বলল, 'তার জন্য লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হবে?'

অর্চিন গোঁ ধরা গলায় বলল, 'অনেক লেখাপড়া হয়েছে। আমি গ্রামে গিয়ে কাজ করব।'

boierpathshala.blogspot.com

শেখর হেসে ফেলল। মুখ তুলে বলল, 'অনেক লেখাপড়া হয়েছে মানে! পড়া শেষ করতে হবে না? ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিটা লাগবে না? তুই তো খুব ভালো রেজাল্ট করা ছেলে। তোর সামনে ব্রাইট ফিউচার।'

অর্চিন রাগ রাগ গলায় বলল, 'ডিগ্রি দিয়ে আমার কী হবে? আমি তো আর চাকরিবাকরি করব না। রাজনীতি করব। আমি ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি শেখরদা। আমি শুধু নিজের ফিউচার নিয়ে ভাবতে শিখিনি। তোমরাই শেখাওনি। অন্যের ফিউচার নিয়েও ভাবতে শিখেছি। মুখে বড় বড় কথা বলব, নিপীড়িত, নির্যাতিত, অসহায় মানুষের জন্য কাঁদব, আর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে আসলে নিজের কেরিয়ার গোছাব—এই হিপোক্রেসি আমার ভালো লাগছে না। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তুমি তো জানো, আমি ঘরে বসে বিপ্লব দেখানোকে ঘৃণা করি শেখরদা। মাঠে নেমে কাজ করতে হবে।'

শেখর আবার হাসল। বলল, 'বাপরে তুই তো খুব উত্তেজিত হয়ে আছিস দেখছি। হল কী তোর? আমিও তোর সঙ্গে একমত। তবে সবটা নয়। এ কথা সত্য, আজকাল খবরের কাগজে, টিভির খবর দেখে রিঅ্যাক্ট করা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। নিশ্চিন্ত নিরাপদ দূরত্ব থেকে বিপ্লবীয়ানা দেখাও। এটা বাম আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর। মিডিয়া যেখানে রিঅ্যাক্ট করতে বলছে, কেউ কেউ শুধু সেখানেই রিঅ্যাক্ট করছে। ভাবছে, আহা! বিরাট প্রতিবাদী হলাম। মূল ইস্যুর ধারেকাছে যেতে চাইছে না। দেশের মানুষ কত ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে আছে, সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। এসব নিয়ে মাথা ঘামালে যে নিজেকে অনেক স্যাকরিফাইস করতে হবে। একসময় পার্টির মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিল, এই ধরনের টিভি, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ প্রচারে কাজ দেবে। কনফারেন্সে সোশাল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলাও হয়েছিল। কিন্তু কার্যত সেটা আমাদের পক্ষে গেল না। গভর্নমেন্ট এবং শাসকদলের অনেক দোষ-ত্রুটি আমরা সোশাল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ভোটের সময় ফল পেলাম না। আর সত্যি কথা বলতে কী, যদি বা পেয়ে থাকি, তাদের বিশ্বাস করা যায় না। এদের বড় একটা অংশ এই সোশাল নেট-ওয়ার্কেই একসময়ে আমাদের তুলোধোনা করেছিল। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা, অপপ্রচারে ফেসবুক ভরিয়ে দিয়েছিল। একবারও যাচাই করেনি। আজ উলটো বলছে। কাল আবার উলটো বলবে। এই ধরনের প্রতিবাদীরা নিজেদের মিথ্যে বিচারকের আসনে বসাতে ভালোবাসে। এরা নিজেদের বাড়ি, পথেঘাটে, কর্মক্ষেত্রে অন্যায় দেখলে চুপ করে থাকে। এদের নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো অর্থহীন। তুইও ভাবিস না। যেটুকু নিজে থেকে হচ্ছে হোক।'

অর্চিন বলল, 'তাহলে তো আমার কথাটাই ঠিক শেখরদা। আমাকে সব ছেড়েছুড়ে পুরোপুরি রাজনীতি করার সুযোগ করে দাও।'

শেখর গুপ্ত দৃঢ় গলায় বলল, 'না, লেখাপড়া ছাড়লে চলবে না। শিক্ষার সঙ্গে পার্টির যোগ গভীর। পৃথিবীর বড় বড় নেতারা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছিলেন। সাম্যবাদী মতাদর্শে আপ্লুত হয়ে তাঁরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে অর্চিন, আমাদের পার্টিতে লেখাপড়ার বিশেষ প্রয়োজন। ফেসবুক, হোয়াটঅ্যাপ নয়, আমাদের দল দাঁড়িয়ে আছে দলিল, ইস্তেহার, প্যামফ্লেট, মুখপত্র, পত্রপত্রিকার ওপর। লেখাপড়া না শিখলে এসবের দায়িত্ব কারা নেবে? লেখাপড়া করতে হবে না, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙো ধরনের কাজ যারা অতীতে করেছে, এখন করছে, ভবিষ্যতে করবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে। আমরা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কথা বলি না। তোমাকেও বলব না। তুমি লেখাপড়া শেষ করো অর্চিন। যা শুরু করেছ তা শেষ করতে হবে। তারপর অবশ্যই হোলটাইমার হয়ে কাজ করবে। কেউ বাধা দেবে না। বিপ্লব কখন হবে, কবে শোষিত মানুষের মুক্তি ঘটবে, সেসব পরের কথা। দরিদ্র মানুষকে রিলিভ দিতে আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিলাম, ওই একই কারণে আবার আমাদের ক্ষমতায় ফিরতে হবে। নিজেদের আখের গোছাতে নয়। তখন আমাদের আরও বেশি বেশি করে শিক্ষিত মানুষের দরকার হবে। পার্টি থেকে বেনো জল বেরিয়ে যাচ্ছে, এবার তাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে।'

boierpathshala.blogspot.com

অর্চিন মন খারাপ করে বসে রইল। শেখর গুপ্ত উঠে তার কাঁধে হাত রাখল। হেসে বলল, 'হতাশার কবিতা থেকে দূরে আমার বাড়ি। তোর এই কবিতার বই-ই তো সেই কথা বলছে। তাই তো? আমাদের জার্নি অনেক দীর্ঘ। ম্যারাথন দৌড়ের মতো। মশাল হাতবদল হয়। কিন্তু নেভে না।'

সতেরো

চুমু কত প্রকার ও কী কী?

ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে জোর আলোচনা চলছে। টেবিল ঘিরে পাঁচজন বসে আছে। তিনজন মেয়ে, দুজন ছেলে। এর মধ্যে তিথি এবং স্বয়ংদ্যুতি কথা কম বলছে। তিথিকে লাজুক মেয়ে হিসেবে সকলেই কমবেশি মেনে নিয়েছে, কিন্তু হিস্ট্রির স্বয়ংদ্যুতি কেন এই আলোচনায় অংশ নিতে অস্বস্তি বোধ করছে, এটা বোঝা যাচ্ছে না। সে একজন লম্বা-চওড়া চেহারার ছেলে। দাড়ি-গোঁফ আছে। দাড়ি-গোঁফওয়ালা ছেলে লজ্জা পাবে না, এমন কোনও নিয়ম নেই। তার পরেও বাকিরা তাকে খেপাচ্ছে।

শমজিতা বলল, 'তোর লজ্জা পাওয়ার কী আছে? তোকে কি চুমু খেতে বলা হয়েছে? নাকি তোর চুমুর এক্সপিরিয়েন্স জানতে চাওয়া হয়েছে? তোর মতো হাঁদা ছেলের যে এই বিষয়ে কোনও এক্সপিরিয়েন্স থাকবে না, তা আমরা জানি। তুই খামোকা লজ্জা পাচ্ছিস। কাম আউট। আলোচনায় অংশ নে।'

স্বয়ংদ্যুতি ভুরু কুচকে বলল, 'আমি লজ্জা পাচ্ছি কে বলল?'

বারিধারা বলল, 'আলবাত পাচ্ছিস। আমাদের কথা শুনে তোর চোখমুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা কোনও অশ্লীল কথা বলছি না। চুমু কোনও অশ্লীল বা নিষিদ্ধ ব্যাপার নয় যে, তা নিয়ে কথা বলা যাবে না। চুমু একটা খুবই সুস্থ, সুন্দর বিষয়। অনেক সময় অতি পবিত্র। প্রেমের সবথেকে ভালো এবং সহজ এক্সপ্রেশন হল চুমু। অথচ সেই চুমুর কথা শুনে তোর মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। হোয়াই? সন্দেহ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সামথিং রং উইথ ইউ। চুমু নিয়ে নিশ্চয় তোর কোনও গোলমাল আছে স্বয়ং। আছে নাকি?'

স্বয়ংদ্যুতি এবার ছেলেমানুষের মতো রাগ দেখিয়ে বলল, 'বাজে কথা বলিস না। কোথায় আমার চোখ-মুখ লাল হচ্ছে?'

শমজিতা বলল, 'হচ্ছে, কিন্তু দাড়ি-গোঁফের জন্য বোঝা যাচ্ছে না। দাঁড়ি-গোঁফের অনেক সুবিধে। আমি যদি ছেলে হতাম, দাড়ি-গোঁফ রাখতাম। দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে ফিকফিক করে হাসা যায়, কেউ বুঝতে পারে না। এই তো ডিএনবি-র ক্লাসে আমার খালি হাসি পায়। কিন্তু হাসতে পারি না। উনি যেভাবে লেকচারের মাঝে মাঝে যাত্রাদলের বিবেকের মতো বয়েস অ্যান্ড গার্লস বলে হুঙ্কার মারেন যে, পেটে হাসি খিলখিল করে ওঠে। মুখে হাত ঢেকে বা রুমাল দিয়ে কত হাসব? দাড়ি-গোঁফ থাকলে নিশ্চিন্তে হাসতাম। কেউ দেখতে পেত না। মেয়েদের কত অসুবিধে। মনের এক্সপ্রেশন মুখে গোপন করা যায় না।'

অর্ণব বলল, 'অসুবিধেও আছে। দাড়ি-গোঁফ থাকলে ঠিকমতো রাগ, ভয়, হাসি দেখানো হয় না। সবসময় একই রকম মনে হয়। তুই হয়তো হাসলি, মনে হবে, গোঁফের ফাঁকে ভেঙাচ্ছিস। অথবা তুই যদি রাগ করে দাঁত কিড়মিড় করিস, তাহলে মনে হবে খুশি হয়ে হাসছিস। আমার এক কাকাকে নিয়ে এই অসুবিধে হত। রাগছে না হাসছে বুঝতে পারতাম না। কাকা যেত খেপে।' কথা শেষ করে অর্ণর হেসে উঠল।

শমজিতা বলল 'বাজে কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তো এত বড় দাড়ি ছিল, উনি যখন হাসতেন কী সুন্দর লাগত।'

বারিধারা বলল, 'ওনার হাসিমুখে ছবি আছে। কিন্তু উনি যে তখন হাসছিলেনই, এটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কোনও সাক্ষী নেই। হয়তো সকালবেলা বিরক্ত করতে আসা ফ্যানদের দেখে দাঁত কিড়মিড় করছিলেন, তখন কেউ ফটো তুলেছে। পরে সেটাই হাসির ফটো বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

boierpathshala.blogspot.com

অর্ণব সিগারেটে টান দিয়ে বিজ্ঞভাবে বলল, 'অত বড় মানুষদের কথা জানি না। তবে দাড়িটাড়ি বেশি থাকলে চুমু খাওয়ার সময় সমস্যা করে।'

শমজিতা চোখ পাকিয়ে বলল, 'তুই জানলি কী করে? তোর তো এখনও ভালো করে গোঁফই বের হয়নি। ফরফর করে সিগারেট টানিস বলে নিজেকে বেশি ভাবছিস নাকি? দে সিগারেটটা দে। অনেক টেনেছিস।'

শমজিতা হাত বাড়িয়ে অর্ণবের হাত থেকে সিগারেট কেড়ে টানতে শুরু করল। অর্ণব বলল, 'আমার মামাতো দাদা বিয়ের পর দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলেছিল।'

বারিধারা বলল, 'সেটা চুমুর জন্য কে বলল? হয়তো চোর-ডাকাতের মতো দেখাচ্ছিল বলে তোর বউদি জোর করেছে। কাউকে কাউকে দাড়ি-গোঁফে ফিদেল কাস্ত্রো অথবা অপরাজিত সিনেমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো রোমান্টিক লাগে, কাউকে আবার জগাই চোর, মাধাই ডাকাতের মতো দেখায়।'

অর্ণব গম্ভীরভাবে বলল, 'না, আমাদের কাছে ঠিক খবর আছে। দাড়ি-গোঁফের কারণে মামাতো বউদির সুড়সুড়ি লাগছিল। পরে আমরা দাদাকে চেপে ধরেছিলাম। সে আমতা আমতা করেছে।'

স্বয়ংদ্যুতি বলল, 'তোর এখনও গোঁফ গজায়নি বলে হিংসে করছিস। বানিয়ে বানিয়ে যা খুশি বলছিস।'

বারিধারা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কাপটা সরিয়ে রাখল। খানিক আগে সে একটা ভয়ঙ্কর কাজ করে এসেছে। কেউ তার মুখ দেখে বুঝতে পারছে না। ঘটনাটা কেউ জানে না। এমনকী তিনিও না। যদিও কাজটা তিথির। কাজ না বলে 'অ্যাসাইনমেন্ট' বলা ভালো। তিথির কাছে জোর করে নেওয়া অ্যাসাইনমেন্ট। কাজটা সে আজ করবে না ভেবেছিল। আজ সে ইউনির্ভাসিটি কামাই করবে ঠিক করেছিল। তারপরে পরিকল্পনা বদলেছে। দিদির বাড়িতে বংশীবাদকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার সময় তার মোবাইল 'হাম্বা হাম্বা' রবে ডেকে ওঠে। গৃহত্যাগী শ্রবণের মেসেজ। মেসেজ দীর্ঘ। বারিধারা দীর্ঘ মেসেজ মোটেও বরদাস্ত করতে পারে না। তবে আজকে পেরেছে। যতই হোক, ছেলেটা গৃহত্যাগী। শ্রবণের মেসেজটা এরকম—

'বারি, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন ক'টাদিন আত্মগোপন করে থাকব। বাড়ি থেকে যখন পালিয়েছি, তখন ভালো করেই পালানো উচিত। কারও সঙ্গে দেখা করব না। অফিসেও যাব না। সেখানে নিশ্চয় আমার সন্ধানে বাবা বা দাদা এসে বসে আছে। আমাকে ধরবার চেষ্টা করছে। পুলিশেও যেতে পারে। গেলে যাক। আমার আত্মগোপনের ঠিকানা তিন নম্বর কনকবালা লেন, কলকাতা নাইন। শাম্বদের চিলেকোঠা। আমি চাই না, এই ঠিকানা কেউ জানুক। এমনকী তুমিও না। তোমাকে কিছু লুকোতে চাই না। তাই বললাম, ধারা, তুমি পড়েই এই মেসেজ ডিলিট করে ফেলবে। গুড বাই।'

মেসেজ দেখে বারিধারা হেসে ফেলল। সে ঠিক করল, বিকেলের পর শ্রবণের আত্মগোপনের ডেরায় হানা দেবে। সেখান থেকে তাকে বের করে দুজনে মিলে খানিকটা ঘুরবে। কোথাও বসে খাবে। তারপর ট্যাক্সি ধরে শ্রবণকে বাড়ি পৌঁছে তবে নিজে ফিরবে। বাড়ি থেকে পালানো বোকা প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর নিশ্চয় একটা অন্য ধরনের স্বাদ আছে। সেই স্বাদ ঝাল না মিষ্টি দেখতে হবে। বারিধারা একই সঙ্গে ভাবে, সেই যখন বেরোবেই, তখন ইউনিভার্সিটিতে ঢুঁ মারা যেতে পারে। মধুজা রায়ের ক্লাসটা করা যাবে, লাইব্রেরির বইটাও বদলানো যাবে। নন্দকাকার গাড়ি নামিয়ে দিল। ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে ঢোকবার সময় তার তিথির কাজটা মনে পড়ে গেল। নিজে থেকে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই ধরনের কাজ ফেলে রাখা উচিত নয়। ফেলে রাখেওনি। বারিধারা ইউনিয়ন রুমের কাছে সুদর্শনকে একা পেয়ে যায়। নামটা সকালে মনে পড়ছিল না। এখন মনে পড়ে গেল। এটাই বোধহয় নিয়ম। এই ধরনের কাজের সময় মন অন্য সবকিছু ঝেড়ে ফেলে, কেবল দরকারি ইনফর্মেশনগুলো শরীরকে সাপ্লাই করতে থাকে। নাম, ঘটনা, রাগ। যদিও সুদর্শনের নাম না জানলে বারিধারার কিছু এসে যেত না। সে এই ছেলেকে চেনে। এর সম্পর্কে আগেও কমপ্লেন শুনেছে। শুধু অশ্লীল কথা নয়, সুযোগ পেলে ছলেবলে মেয়েদের গায়ে হাত দিতেও এই ছেলে পিছপা হয় না। প্রায়ই ইউনিভার্সিটি আর পাড়ার রোয়াক গুলিয়ে ফেলে। এর জন্য সাহস লাগে। মদত আছে বলেই এই ধরনের ছেলে 'বীরপুরুষ' হয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

করিডরের একপাশে দাঁড়িয়ে বারিধারা সুদর্শনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সুদর্শন সত্যি সুদর্শন। লম্বা, ফর্সা। কায়দা করা জামা-কাপড়। 'ভাই একটু শুনবে।'

সুদর্শন ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমাকে বলছ?'

বারিধারা সুন্দর করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ ভাই, তোমাকে বলছি।'

সুদর্শন খানিকটা অবাক এবং খুশি হয়েই এগিয়ে আসে। সুন্দর একটা মেয়ে মিষ্টি করে ডাকলে খুশি হওয়ারই কথা।

'কী হয়েছে?'

বারিধারা চাপা গলায় বলে, 'তুমিই তো সুদর্শন?'

সুদর্শন বলে, 'হ্যাঁ, তুমি বারিধারা না? হিস্ট্রি ফাইনাল?'

বারিধারা গদগদ গলায় বলল, 'তুমি আমাকে চেনো দেখে খুব ভালো লাগছে।'

সুদর্শন ঠোঁটের কোণে হেসে বলে, 'আমি এখানকার সব মেয়েকে চিনি।'

বারিধারা চোখ বড় করে বলে, 'বা: গুণী ছেলে। আচ্ছা, তুমি তিথিকে চেনো?'

সুদর্শন একটু থমকে, ভুরু কুঁচকে তাকায়। আগ্রহ আর সন্দেহ নিয়ে বলে, 'চিনি মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার বলো তো?'

'তেমন কিছু ব্যাপার না। ও একটা জিনিস তোমার জন্য পাঠিয়েছে। নিজে হাতে দিতে লজ্জা পাচ্ছে। আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। দিয়েছে বলাটা ঠিক হবে না। আমি নিয়েছি।'

সুদর্শন বলে, 'কী জিনিস?'

বারিধারা অনুরোধের ভঙ্গিতে বলে, 'একটু ওদিকে সরে যাবে? ওই যে পার্টিশানটার আড়ালে? আসলে তিথিকে আমি কথা দিয়েছি, জিনিসটা আড়ালে দেব।'

সুদর্শন বিরক্তির ভান করে বলে, 'ইউনিভার্সিটির মধ্যে এসব আবার কী? আড়াল-টাড়াল কী ব্যাপার? যা বলবার এখানে বলো।'

বারিধারা বলে, ইসস জোরে বোলো না। সবাই শুনতে পাবে। প্লিজ একটু এসো। অবশ্য তুমি যদি বলো, আমি এখানেই না হয়...।'

সুদর্শন বলে, 'আচ্ছা, এসো।'

পার্টিশানের আড়ালে যাওয়ার পর বেশিক্ষণ সময় নেয়নি বারিধারা। নেবেই বা কেন? ঠাসিয়ে একটা চড় মারতে কত সময় লাগে? ভীত, হতবাক সুদর্শন গালে হাত দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। বারিধারা শান্ত গলায় বলে, 'আজ আড়ালে মারলাম ভাই। দ্বিতীয় দিন যদি এই ধরনের অসভ্যতার কথা শুনি, তাহলে ইউনিভার্সিটির গেটের সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে সবার সামনে মারব। মনে থাকবে?'

যা কথা ছিল তাই করছে বারিধারা। বলেছিল, ওই বদ ছেলেকে চড় মারবার পর ক্যান্টিনে চা খাবে, তারপর ক্লাস করতে যাওয়া হবে। তাই এসেছে। এখন দুটো পিরিয়ড অফ। তারপর মধুজা ম্যাডামের ক্লাস। চুমু বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেছে শমজিতা। কাল রাতে তার মায়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে তার ঝগড়া হয়েছে। মা বলেছেন, আজকাল চুমু নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়। সিনেমা-টিনেমায় এমনভাবে দেখানো হচ্ছে, যেন কোনও ব্যাপার নয়। এ আবার কী! ছিছি! ছেলেমেয়েরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। এসব বিদেশ থেকে আসা ফ্যাশন। নোংরামি, অশ্লীলতা। শমজিতা আপত্তি করেছে। তার মতে, ভালোবাসার এমন সুন্দর প্রকাশকে নোংরা বলা মোটেও ঠিক নয়। জিনিসটাকে কেমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাই আসল কথা। আমাদের সমাজ প্রকাশ্যে চুমুকে মেনে নেয় না। সেই পরিস্থিতি এখন হয়নি। তার মানে, কোনও দিন হবে না, এমনটাও নয়। কদিন আগে তো ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে প্রেম করছে, এটাও মেনে নেওয়া হত না। এখন দুটো ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করে হেঁটে গেলে কেউ ফিরেও তাকায় না। ঘটনা অন্য কিছু না প্রেম, সেটা বোঝাই যায়। খারাপ কিছু হলে সব কিছুই খারাপ। চুমু খেলেও খারাপ, না খেলেও খারাপ। এসবের

boierpathshala.blogspot.com

মধ্যে যায়নি, এমন অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা চুলোচুলি করে। সেটা কম নোংরা? বউকে চুমু খায় না, কিন্তু পেটায়—এটা কম অশ্লীল? শমজিতার মা এসব মানতে চাননি। তিনি মনে করেছেন, এখনকার ছেলেমেয়েরা ঠিক করছে না। শমজিতা ক্যান্টিনে, বন্ধুদের কাছে সেই প্রসঙ্গ তুলেছে।

বারিধারা হেসে বলল, 'চুমু মানে তো শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার চুমু নয়, সন্তানকে বাবা-মায়ের চুমুও আছে। ঠাকুমা, দিদিমাকে নাতি-নাতনির চুমু আছে। ভাই-বোনের চুমু আছে। সবই ভালোবাসা। তাই আগে দেখতে হবে, চুমু কয় প্রকার ও কী কী? ভালোবাসার এই দিকটা নিয়ে অনেক রসাল আলোচনা হয়, কিন্তু অ্যাকাডেমিক চর্চা কখনও হয় না।'

অর্ণব বলে, 'আপত্তিটা সেক্সের প্রশ্নে। চুমু যখন সেক্স অ্যাক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়...।'

বারিধারা অবাক গলায় বলে, 'আপত্তি কেন? কে তার ব্যক্তিজীবনে কীসে তৃপ্তি পাবে, কীসে খুশি হবে, কেমন ভাবে তার ভালোবাসার মানুষকে স্পর্শ করবে—তাতে অন্যদের আপত্তি হবে কেন! ভালোবাসা শরীর বাদ দিয়ে হয় নাকি? শরীর ভালোবাসা বাদ দিয়ে হতে পারে। তবে সোসাইটি পারমিট না করলে সেটা খোলাখুলি না হওয়াই উচিত।'

এবার তিথি মুখ খোলে। বলে, 'বিষয়টা নিয়ে এত আলোচনার কী আছে? এত ঢাক পেটানোর তো কিছু নেই।'

বারিধারা বলে, 'এটা কী বলছিস তিথি! লেখাপড়া শিখে এরকম বোকার মতো কথা বলে নাকি? জীবনের সবকিছু নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এরপর তো বলবি, সেক্স এডুকেশনের কোনও প্রয়োজন নেই।'

তিথি বলল, 'আমাদের পুরোনো আমল কী খারাপ ছিল? তখন তো সেক্স এডুকেশন ছিল না?'

বারিধারা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'খারাপ ছিল না, তবে ন'-দশ বছরে মেয়েদের ধরে ধরে বিয়ে দেওয়ার হিড়িক ছিল। তারা এগারো, বারোতেই মা হয়ে যেত। বাধ্য হত। বুড়ো বরের কাছ থেকে একটা চুমুও পেত না। চুমুহীন মা সব। এখনও হয় না এমন নয়, হয়। সেটা ভালোই বলছিস? চুমু ব্যাপারটাকে খারাপভাবে না দেখে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে দেখলে অনেক ভুল ধারণা কেটে যাবে।'

এই আলোচনার ফাঁকেই হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের পিওন লব ক্যান্টিনে এসে উঁকি মারল। তারপর গুটি গুটি পায়ে টেবিলের কাছে এসে বলল, 'বারিধারাদি, তোমাকে মধুজা ম্যাডাম এখুনি ডাকছে। এখুনি।'

সবাই অবাক হয়ে দেখল, তাদের হাসিখুশি লবদার মুখ থমথম করছে।

আঠেরো

ইউনিভার্সিটির আর পাঁচজন ছেলেমেয়ের মতো বারিধারাও মধুজা ম্যাডামকে পছন্দ করে না। মধুজা রায়কে আড়ালে সবাই ডাকে 'শ্রীমতী ডিয়ার'। যারা জানে না তারা 'ডিয়ার' শুনলে ভাববে, প্রিয়। ঘটনা তা নয়। এই 'ডিয়ার' হল 'ডি' এবং 'আর'। শ্রীমতী ধান্দা রায়।

'শ্রীমতী ধান্দা রায়'-কে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে অনেক গসিপ। শুধু এই ইউনিভার্সিটিতে নয়, তাকে নিয়ে চর্চা অন্য ইউনিভার্সিটি, কলেজেও। কোথাও তিনি গেস্ট লেকচারার, কোথাও গভর্নিং বডির মেম্বার, কোথাও সিলেবাস দেখতে যান, কোথাও ইন্টারভিউ বোর্ডে নাম ঢোকানো আছে। এছাড়া আরও হাজারটা কমিটি তো আছেই । বারাসাতের ওদিকে কোনও কলেজে 'সাফসুতরো কমিটি'-তেও ঢুকে আছে। মাসে একদিন গাড়ি, আড়াইশো টাকা রেমুনারেশন। গাড়ি নেন, তবে বারাসাত পর্যন্ত যেতে হয় না। ছ'মাস, ন'মাসে একবার গিয়ে একসঙ্গে রেমুনারেশনের টাকা তুলে আনেন। মুখে বড় বড় কথা বলেন।

'পরিচ্ছন্ন কলেজই দিতে পারে পরিচ্ছন্ন শিক্ষা। সবাই যদি এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাই তা হলে কীভাবে চলবে? বইয়ের সঙ্গে ঝাঁটা বালতিও হাতে তুলতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে। আমি এগিয়ে এসেছি।'

boierpathshala.blogspot.com

তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন বছর বয়েসেও মধুজা রায় নিজেকে আকর্ষণীয় করে রেখেছেন। নিজেকে 'ফিটফাট, পরিচ্ছন্ন' রাখাটা কোনও দোষের নয়; কিন্তু মধুজা রায়ের সাজপোশাক, ভঙ্গি, আচরণ সব কিছুর মধ্যেই চড়া ভাবে 'আমাকে দেখো' ব্যাপার আছে। এই ব্যাপার আর পাঁচজন কলেজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক-অধ্যাপিকার থেকে আলাদা। তাদের মধ্যেও দেখানো ব্যাপার থাকে। কিন্তু সেটা নিজের শিক্ষা, বিবেচনা, বোধ। তারা নিজের গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকায় লেখা বইয়ের সমালোচনা ব্যাগে নিয়ে ঘোরেন। সুযোগ পেলেই বের করে দেখান। সেই দেখানোর মধ্যে এক ধরনের চাপা অহঙ্কার থাকে। লেখাপড়া জগতের মানুষ লেখাপড়া নিয়ে চর্চা, অহঙ্কার করবে না তো কী নিয়ে করবে? মধুজা রায়ের ব্যাপার অন্যরকম। নিজের গবেষণাপত্র নয়, তিনি আজকাল সকলকে দেখাতে চান, তাঁর বয়স কমছে। পেটে ভুঁড়ির ভাব হলে জিমে ছোটেন। তাতে যদি ক্লাস মিস হয় তো হবে। ক্লাস বড় না ভুঁড়ি বড়? ভুঁড়ি বড় হলে ক্লাসে গিয়ে সিলেবাসে মন দেবেন কেমন করে? সারাক্ষণই তো মন থাকবে অশান্ত। ছেলেমেয়েরা কি ভুঁড়ির বিষয়টা ধরতে পাচ্ছে? ধরতে পারলে কেলেঙ্কারি। লজ্জার একশেষ। ভুঁড়ির সঙ্গে মধুজা চুলও সামলান। চুলে নিয়মিত রং লাগান। কমবয়সি ছাত্রছাত্রীদের জন্য লাগান না, বেশি বয়সি 'ক্ষমতাবান'-দের জন্য লাগান। 'ক্ষমতাবান'-দের কাছে 'ম্যাডাম'-এর নিয়মিত যাতায়াত। তিন কারণে যাতায়াত। প্রোমোশন, অপারেশন, সাপ্রেশন। প্রোমোশন নিজের জন্য। অপারেশন বিবিধ কমিটি, সেমিনার, ট্যুরে নিজের নাম ঢোকানোর জন্য। আর সাপ্রেশন দরকার হয় যোগ্য লোককে অন্যায়ভাবে ঠেকানোর জন্য। এর জন্যে 'ক্ষমতাবান'-দের হাতে রাখতে হয়। তাদের সঙ্গে 'প্রেম প্রেম' ভাব করতে হয়। চুলে কালার টোন ঠিক থাকলে এই কাজ সহজ হয়। শুধু চুলে রং নয়, মধুজা রায় হাতে, মুখে, গলায় স্কিন ট্রিটমেন্ট করান। চামড়া যেন কুঁচকে না যায়। মাসে একবার বিউটি পার্লার মাস্ট। গায়ে তোয়ালে, মাথায় ক্যাপ, চোখে শসা চাপা দিয়ে বসে থাকেন ঘণ্টা চারেক। সেই সময় কেউ যদি তাকে দেখে কে বলবে, তিনি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। মনে হবে 'এমনটা তুমি করতে পারলে গো' মেগাসিরিয়ালের দজ্জাল শাশুড়ি। সাজগোজ শেষ হলে ফেসবুকে ফটো পোস্ট করেন মধুজা রায়। ফটোতে দেখা যায় কসবার দোতলা বাড়ির বারান্দায় হাসি হাসি মুখে বসে আছেন। পিছনে গদগদ মুখের স্বামী। তার মুখ দেখে মনে হয়, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্তিত স্ত্রী-শিক্ষার হাল, চুলের রং এবং বারান্দার চেয়ার নিয়ে গর্বিত। সেই ফটোতে ছেলেমেয়েদের ঝটাপট 'লাইক' মারতে হয়। কে রিস্ক নেবে? পরীক্ষায় সাজেশন পাওয়ার আছে। নোটস পাওয়ার আছে। পরের জীবনে গবেষণা আছে। তার জন্য পরীক্ষায় বসতে হবে। এ তো আর অঙ্ক বা কেমিস্ট্রি নয়। ঠিক হলে ঠিক, ভুল হলে ভুল। এমন কিছু বিষয় আছে যেখানে ঠিক, ভুলের পরে আছে মর্জি। পরীক্ষকের মর্জি। মধুজা রায়ের মতো মানুষ যদি পরীক্ষক হন, সেই মর্জি ঠিক রাখতে হবে? ফেসবুক ইগনোর করলে ভবিষ্যতে বড় ঝামেলা হতে পারে। চাকরি লগ্নে আসতে পারে নানা বিপত্তি। কমিটিতে কে থাকবে এখন বলা যায়? লাইক মেরে কমেন্টস লেখা বুদ্ধির কাজ। শোনা যায়, একটি ছেলে লিখেছে—

'ম্যাম একটা কথা না বলে পারছি না। আমাকে মার্জনা করবেন। আপনাকে দ্য স্প্রিং ছবির নায়িকা অড্রে হেপবার্নের মতো লাগছে। ওই সিনেমায় অড্রে হেপবার্ন এই ভাবে বসেছিলেন।'

এর উত্তরে মধুজা ম্যাডাম তার ছাত্রকে ফেসবুকেই লিখেছেন—'অরিত্র, তুমি একটা নটি বয়। তুমি কি মনে করো আমি দ্য স্প্রিং সিনেমাটা দেখিনি? অবশ্যই দেখেছি। সেখানে অড্রে হেপবার্নকে অত্যধিক সুন্দরী লেগেছে। আমার সঙ্গে কোনও তুলনা চলে না। তোমার লেখাপড়া কেমন হচ্ছে? স্পেশাল পেপারের জন্য নোটস লাগলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

অরিত্র এই ফেসবুকের কথা চালাচালি বন্ধুদের বলেছে। হাসতে হাসতে বিষম তুলেছে। দ্য স্প্রিং নামে অড্রে হেপবার্নের কোনও সিনেমাই নেই। তারপরেও ম্যাডাম খুশি হয়েছে।

মধুজা রায় একজন লেখাপড়া জানা মানুষ। স্কুল-কলেজে তেমন ফল করতে না পারলেও, এমএ পরীক্ষার নম্বর খুবই ভালো। ইউনিভার্সিটির দু-একজন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁকে হাত উপুড় করে নম্বর দিয়েছিলেন।

boierpathshala.blogspot.com

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোনও কোনও সময় এমন হয়। ছোটবেলার অচেনা পরীক্ষকরা ছেলেমেয়েদের প্রতিভা বুঝতে পারেন না। তাঁরা ভুল করেন। পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দিয়ে ফেলেন। মধুজা রায় নিজে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে আর ঝুঁকি নেননি। সম্ভাব্য প্রশ্নকর্তা এবং অবশ্যম্ভাবী পরীক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা করে নিয়েছিলেন। গাড়ি নিয়ে সটান বাড়ি চলে যেতেন। দোলের দিন পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম, পুরী থেকে ফিরে ঝিনুকের পেনদানি উপহার, বিজয়ার মিষ্টির প্যাকেট। এমএ পরীক্ষার পর তিনি খুব খাটাখাটনি করে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। গবেষণার বিষয়টা বেশ জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। তবে গবেষণাটি নিয়ে পরে কিছু বিতর্ক হয়েছে। তার মধ্যে একটির কথা বলতেই হয়। শোনা যায়, নিজের গবেষণাপত্রের শেষে সাহায্য নেওয়া বইয়ের যে দীর্ঘ তালিকা মধুজা রায় দিয়েছিলেন তাতে ভয়াবহ ধরনের গোলমাল ছিল। সেখানে এমন সব বইয়ের নাম ছিল যার সঙ্গে গবেষণার কোনও সম্পর্ক নেই। আবহাওয়া, সেলাই বোনা, আচার ও চাটনি প্রস্তুতি, মানুষ হইবার দশটি উপায়। বইয়ের নাম ও বিষয় দেখে গবেষক-পরীক্ষকরা বিস্মিত হয়েছিলেন। ভাইবা নেওয়ার সময় ক্যান্ডিডেটকে তাঁরা প্রশ্নও করেছিলেন।

'এসব কী! তোমার গবেষণার সঙ্গে সেলাই বোনা, আচারের রেফারেন্স বইয়ের নাম কেন?'

মধুজা রায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'সাবোটাজ! সাবোটাজ স্যার! আমি কিছু জানি না। আমি কিছু করিনি।' শোনা যায়, টেবিলের উলটো দিকে বসা দুই পরীক্ষক ক্ষোভে, দু:খে মাথা নাড়তে থাকেন। দুজনের একজন মধুজা রায়ের পুরোনো শিক্ষক। অন্যজন নাকি সেদিন সকালে 'ফোন' পেয়েছিলেন। 'বর' পাওয়ার মতো। তবে পরীক্ষক ভদ্রলোক কার 'ফোন' পেয়েছিলেন, সেই ফোনে তিনি কী বার্তা পেয়েছিলেন জানা যায়নি। কখনও জানা যাবেও না। গসিপের সবটা জানা যায় না। তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। সত্যি ঘটনা হলে একটা কথা ছিল। যাই হোক, ফোন পাওয়া পরীক্ষক বললেন, 'ছি ছি। একজন মেধাবী ছাত্রীকে এরকমভাবে হেনস্থা! ছি ছি। দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার এ কী বিশ্রি অবস্থা হল! এই ঘটনার ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত।'

তদন্তের কথা শুনে মধুজা রায় নাকি আরও জোরে কেঁদে উঠেছিলেন।

'ফোন' পাওয়া পরীক্ষক মধুজা রায়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কেঁদো না...কেঁদো না...কেঁদো না...আমরা তো আছি...তুমি এসো। তোমার ইন্টারভিউ শেষ।'

যারা এই গসিপ নিয়ে চর্চা করে তারা বলে, মধুজা রায় নাকি শেষ মুহূর্তে রেফারেন্স বইয়ের তালিকা অতিরিক্ত দীর্ঘ করবার জন্য কয়েকজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বানিয়ে বানিয়ে ক'টা নাম লিখে দিলেই চলবে। তারা লেখাপড়া লাইনের লোক নয়। হড়বড় করে মাসি, পিসির, দাদুর কাছ থেকে বইয়ের নাম জোগাড় করে লিখে দিয়েছে। তাতেই কেলেঙ্কারি। কেলেঙ্কারি নিয়ে নাড়াঘাঁটা হয়নি। তিনি ছিলেন পুরোনো গভর্নমেন্টের কাছের মানুষ। গভর্নমেন্ট বদলের সঙ্গে তিনি দল বদলেছেন। সবাই জানে আবার যদি গভর্নমেন্ট বদলায় আবার তিনি আগের পার্টি অফিসে ছুটবেন। গাড়ি রাখবেন দূরে। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠবেন দোতলায়। হাতে লাল গোলাপের স্তবক।

'এতদিন বুকের ভিতরে জ্বালা নিয়ে বসেছিলাম দাদা। আজ সেই জ্বালা জুড়োল। এই ফুলটুকু আমার বুকের রক্ত। আপনার পায়ে নিবেদন করতে নিয়ে এসেছি।'

আর্টস ডিপার্টমেন্টের চারতলায় মধুজা রায় একটা আলাদা ঘরে বসেন। সতেরোটা কমিটির কাজ তাঁকে করতে হয়। সবার সঙ্গে বসে অত কাজ হয়? তা ছাড়া বেশিরভাগ কাজই তো গোপন। এই কারণে ইউনিভার্সিটি তাঁকে ঘর দিয়েছে। সেই ঘরের দরজায় বারিধারা এসে দাঁড়াল।

'ম্যাডাম আসব?'

মধুজা রায় কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে বারিধারাকে দেখলেন। চোখ থেকে চমশা খুললেন।

'এসো, বারিধারা।'

boierpathshala.blogspot.com

যতই টিচার হোন না কেন, এই মহিলাকে বাকি ছেলেমেয়েদের মতো বারিধারাও পছন্দ করে না। 'শ্রীমতী ধান্দা রায়' তাকে আলাদা কারে ডাকলেন কেন! তার ওপর লবদার মুখও গম্ভীর। কী ঘটল? মধুজা রায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'পরীক্ষার প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে বারিধারা?'

বারিধারার ভুরু কুঁচকে গেল। হঠাৎ দরদ! এভাবে তো কখনও ডেকে জিগ্যেস করেন না। বরং পেয়ারের ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য কেউ কাছে গেলে হাত-টাত নেড়ে, 'ব্যস্ত আছি' বলে ভাগিয়ে দেয়।

'অল্প অল্প করে হচ্ছে ম্যাম।'

মধুজা রায় মাথা দুদিকে নাড়িয়ে বললেন, 'অল্প অল্প করলে তো হবে না বারিধারা। তুমি ভালো ছাত্রী। ভালো রেজাল্ট করতে হবে।'

বারিধারা আরও অবাক হল। পিওন পাঠিয়ে ক্যান্টিন থেকে ডেকে এনে উপদেশ! আসল কথাটা কী?

'পড়লেও সবসময় তো রেজাল্ট ভালো হয় না ম্যাম। হয়তো ঠিকমতো লিখতে পারি না।'

মধুজা রায় এবার স্মিত হাসলেন। বললেন, 'রেজাল্ট যাতে ভালো হয় তার জন্য তো আমি আছি। তোমাদের একটা পেপার আমার হাতেই আছে। আর একটার প্রশ্নও তো আমাকে সেট করতে হয়। এসব কথা বাইরে বলার মতো নয়। কনফিডেন্সিয়াল। তোমাকে বললাম, কারণ তুমি ভালো মেয়ে। গুড স্টুডেন্ট। ভালোদের যাতে আরও ভালো হয় সেটা দেখাই তো একজন টিচরের কাজ। তাই না?'

কথা শেষ করে আবার হাসলেন মধুজা রায়। বারিধারা চুপ করে রইল। ওনার এইসব কনফিডেন্সিয়াল কথা সবাই জানে। উনিই বলে বেড়ান। নইলে ছেলেমেয়েরা তাঁকে সমঝে চলবে কেন? বারিধারা চুপ করে রইল।

মধুজা রায় এবার মুখ থেকে হাসি মুছে বললেন, 'তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারলে বারিধারা?'

বারিধারা হালকাভাবে ঘাড় নাড়ল। মধুজা রায় বললেন, 'তোমার যদি কোথাও আটকে যায়...এই ধরো সাজেশনস, নোটস, বই... শুধু আমার পেপারের জন্য নয়...অন্য কারওটা আটকালেও আমাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পারো...।'

এত লোভ দেখাচ্ছে! ব্যাপারটা কী? বারিধারা অস্ফুটে বলল, 'বলব ম্যাম।'

মধুজা রায় টেবিলের ওপর খুলে রাখা চশমাটা তুলে চোখে দিলেন। বারিধারার চোখে চোখ রেখে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'সুদর্শনের সঙ্গে তোমার কী হয়েছে বারিধারা? এনি প্রবলেম?'

বারিধারা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কে সুদর্শন ম্যাম?'

'যাকে তুমি খানিক আগে চড় মেরেছ।'

বারিধারা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার সঙ্গে কোনও প্রবলেম হয়নি ম্যাম।'

মধুজা রায় বললেন, 'তা হলে তুমি তাকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে সবার সামনে চড় মারলে কেন?'

বারিধারা চুপ করে রইল। মধুজা রায়ের গলায় এবার রাগ জোরালো হল। হিসহিসিয়ে বললেন, 'যার সঙ্গে তোমার কোনও সমস্যা হয়নি তাকে তুমি কোন সাহসে এত বড় অপমান করলে বারিধারা?'

এতক্ষণে মধুজা রায়ের ডেকে পাঠানোর কারণ বুঝতে পারল বারিধারা। বারিধারা মনকে শক্ত করল।

'আমার এক বন্ধুকে ওই ছেলেটি বিশ্রী অপমান করেছে। অনেকের সামনেই করেছে।'

মধুজা দাঁতে দাঁত চেপে ধমকের ঢঙে বললেন, 'তোমার বন্ধুকে কী করেছে আমি জানতে চাই না বারিধারা, আমি জানতে চেয়েছি তোমাকে কিছু করেছে কি না। সুদর্শনের একজন রিলেটিভ কলেজে আমার ব্যাচমেট ছিল। আমার খুবই বন্ধু। সুদর্শনের দাদার সঙ্গে আমার সেই বন্ধুর বিয়ে হয়েছে। এ সবের থেকেও বড় কথা, এখন সে একজন খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লেডি। পলিটিক্যাল এবং সোশ্যাল কানেকশন হাইলি স্ট্রং। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বহু অফিসার তার হাতের মুঠোয়। সে অনেক গোলমাল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমাকে ফোন করেছিল। তুমি চড় মারবার পরই ওই ছেলে তার রিলেটিভকে ফোন করে।'

boierpathshala.blogspot.com

মধুজা রায় দম নেওয়ার জন্য চুপ করলেন। বারিধারার কাছে এখন সবটা জলের মতো স্পষ্ট হল। মধুজা রায় প্রথমেই তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, পরীক্ষার রেজাল্টের ব্যাপারে তিনি কত ক্ষমতাশালী। এখন ধমক দিচ্ছে।

'চুপ করে আছ কেন বারিধারা? স্পিক আউট। বলো, মানিনীর দেওর তোমাকে কী করেছে? গালাগালি দিয়েছে? ইনসাল্ট করেছে? মলেস্ট করেছে? রেপ করেছে? দেন?' একটু থমকালেন মধুজা রায়। হাঁপিয়ে নিলেন। বললেন, 'মানিনী এটা নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে চাইছে। ভিসির কাছে কমপ্লেইন তো বটেই, থানায় ডায়েরিও করতে চায়। যেহেতু সুদর্শন তোমাকে কিছু করেনি, খুব সহজেই তুমি ফাঁসবে। ইউনিভার্সিটি থেকে সাসপেন্ড তো হবেই, থানা-পুলিশও করতে হবে। পরীক্ষার আগে তোমার কেরিয়ারের পক্ষে একটা বিরাট ধাক্কা হবে। যদি তুমি ভাবো, অন্য ছেলেমেয়েদের তাতিয়ে হট্টগোল পাকাবে, লিডার হবে, সেটাও লাভ হবে না। কতদিন হট্টগোল চালাবে? সবাই কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। একটা সময় দেখবে, পলিটিক্যাল পার্টিগুলো তোমাকে ধরে নিজেদের ফায়দা করে নিয়েছে। তুমি ছিবড়ে হয়ে পড়ে আছ। চারপাশে দেখছ না? যদিও আমি চাই না এ সব হোক। ঘটনা এখানেই মিটে যাক। আমি যা বলব তাই করো বারিধারা। তোমার ভালোর জন্যই করো।'

বারিধারা মাথা নামিয়ে বলল, 'কী করতে হবে?'

মধুজা রায় খানিকটা শান্তভাবে বললেন, 'তুমি ওই ছেলের কাছে ক্ষমা চাইবে। কালই আমি তাকে ডাকব। মানিনীকেও আসতে বলব। তুমি প্রকাশ্যে অসভ্যতা করেছ। কিন্তু আমি এই ঘরের মধ্যেই বিষয়টা মিটিয়ে দিতে চাই। তোমার কথা ভেবেই চাই। এই ঘরে তুমি ওই ছেলের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে।'

বারিধারার শরীর কেঁপে উঠল। বলল, 'ম্যাডাম, ওই ছেলে তিথিকে খুব নোংরা কথা বলেছে। খুব নোংরা।'

মধুজা রায় শান্ত গলায় বললেন, 'কী কথা?'

'মুখে আনা যায় না।'

মধুজা রায় হিসহিসে গলায় বললেন, 'তা হলে বলছ কেন?'

বারিধারা বলল, 'আমি তো বলিনি। চড় মেরেছি।'

মধুজা রায় টেবিল চাপড়ে হুঙ্কার দিলেন, 'শাট আপ।' তারপরে নিজেকে সামলে বললেন, 'বুধবার তিনটের সময় এই ঘরে এসে তুমি ক্ষমা চাইবে। এটাই আমার শেষ কথা। এখন যেতে পারো।'

মধুজা রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে বারিধারার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। সে বুঝতে পারছে একটা বিরাট ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেল।

উনিশ

'অব ম্যায় কেয়া করু, কেয়া করু, কেয়া করু, কেয়াআআআ করু...'

বারিধারা গুনগুন করে গান গাইছে। গাইছে আর টকটক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। তার চোখমুখ দেখে কে বলবে, খানিকক্ষণ আগে সে এক বিরাট বিপদের মধ্যে পড়েছে? জীবন এক কঠিন সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে গুন্ডার পায়ে ধরে ক্ষমা, অন্যদিকে কেরিয়ার। তাকে দেখে বরং উলটোটাই লাগছে। মনে হচ্ছে, কোনও কারণে মেয়েটার অতি ফুর্তি হয়েছে। সেই কারণে গান ধরেছে। ফুরফুরে ভঙ্গিতে নিজেকে জিগ্যেস করছে, এখন আমি কী করব?

শাম্বদের চিলেকোঠায় তিন-চারজন বন্ধুর অবাধ গতি। অবাধ গতি বললে কম বলা হবে। তারা নিজের বাড়ির মতো করে চিলেকোঠা ব্যবহার করতে পারে। তাই করে। যখন খুশি আসে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে খাটে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। কখনও একটু ঘুমিয়ে নেয়। কখনও বই পড়ে, গান শোনে, আড্ডা দেয়,

boierpathshala.blogspot.com

ছবি আঁকে। কখনও লেখাপড়াও করে। এই বন্ধুদের মধ্যে একজনের বাড়ি কলকাতার বাইরে। ঝড়বৃষ্টি বা ট্রেনের গোলমালে আটকে গেলে সে চিলেকোঠায় শেল্টার নেয়। মজার কথা হল, চিলেকোঠার চাবি কারও কাছ থেকে নিতে হয় না। চাবি থাকে সিঁড়িতে। দোতলার ল্যান্ডিংয়ে পাথরের যে পরির মূর্তিটা আছে তার ডানার পিছনে। শাম্বর এই জনা চার বন্ধু ছাড়া কেউ জানে না। যারা জানে না তারা মাথা কুটলেও চাবি পাবে না। বারিধারা এসে চাবি নিয়ে সটান উঠে যায়। উত্তর কলকাতার এই বিশাল তিনতলা বাড়িতে শাম্ব তার মাকে নিয়ে থাকে। সে একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার। চকচকে কর্পোরেট অফিস, ভোঁ বাজানো কারখানা থেকে বোকা বোকা বিয়েবাড়ি—সব ধরনের ফোটো তোলে। বেশিরভাগ সময়ই তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। চিলেকোঠা কে খুলে দেবে? মা তো আর ওপরে উঠতে পারবে না। সেই কারণেই পরি সিস্টেম। পরির ডানায় চাবি রাখার পিছনে এক ধরনের মজাও আছে। উড়ে যাওয়ার মজা। চিলেকোঠার ঘরে যাওয়া মানে যেন গোলমালের পৃথিবী থেকে নিজের জগতে উড়ে যাওয়া।

গৃহত্যাগী শ্রবণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বারিধারা। তাকে নিয়ে বেরোবে। এমনটাই ঠিক করা ছিল। মাঝখানে ইউনিভার্সিটির ঘটনা এসে পড়ল। মধুজা রায়ের ঘর থেকে নেমে বারিধারা আর ক্যান্টিনে ফিরে যায়নি। ক্লাসও করল না। তিথিদের সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই ওদের সব বলতে হবে। লাভ কী? ওরা টেনশন করবে। কাল পর্যন্ত তো সময় আছে। সে মোবাইলে টেক্সট করে দিল।

'কেটে পড়ছি। নোটসটা রেখে দিস।'

ওদিক থেকে দ্রুত জবাব এল—'হোয়াই? হঠাৎ কী হল!'

বারিধারা লিখল—'শ্রবণ।'

'ফাইন। বাট ডিআর? ডেকেছিল কেন?'

বারিধারা লিখল—'পরে বলব। এখন ওনলি প্রেম আর প্রেম।'

'বেস্ট উইশেস।'

মেসেজের সঙ্গে তিথি স্মাইলি পাঠাল।

বিজ্ঞানের কী অগ্রগতি! এখন কত আয়েসে হাসি কান্না রাগ ভালোবাসা চালাচালি করা যায়। দূর থেকে মন বোঝানোর কী চমৎকার আয়োজন! অথচ কত সময় পাশের মানুষটার খুশি, দু:খ বোঝা যায় না। বারিধারার মনে হয়, এরকম কোনও ব্যবস্থা থাকলে বোঝা যেত। বিজ্ঞান প্রযুক্তি যেভাবে লাফাতে লাফাতে এগোচ্ছে, হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এরকম ব্যবস্থা এসে যাবে। মানুষের কপালে মোবাইল ফোনের মতো এলইডি স্ক্রিন থাকবে। তাতে সত্যি মনটা ধরা পড়বে। ধরা যাক, কেউ হয়তো মনে মনে রাগ করেছে, কিন্তু মুখে হাসছে। তখন কপালের এলইডি স্ক্রিনে 'লাল মুখ' ফুটে উঠবে। লাল মুখ হল রাগের চিহ্ন। আবার উল্টোটা হতে পারে। মুখ বেজার, কিন্তু ভেতরে গুরগুরিয়ে হাসি। স্ক্রিনে হাসিটাই দেখা যাবে। উল্টোদিকের মানুষটার মনের সত্যি অবস্থা ধরা পড়ে যাবে। মোবাইলের মেসেজে অবশ্য সত্যি মিথ্যে বোঝা যায় না। যাকে খুশি 'স্মাইলি' পাঠানো যায়। যাকে খুশি 'হার্ট'। যার সঙ্গে কোনও পরিচয় নেই, তার জন্যও দাঁত বের করতে হার্টের ছবি পাঠিয়ে 'ভালোবাসি' বলতে কোনও সমস্যা নেই। বারিধারা এইসব ব্যবহার থেকে যতটা পারে দূরে থাকে। যত দিন যাচ্ছে, এসব আর কেউ বিশ্বাস করছে না।

শাম্বদের চিলেকোঠার ঘরটা বাইরে থেকে ছবির মতো। মস্ত ছাদের এক কোনায় পাকা ঘর। মাথায় পুরোনো দিনের অ্যালুমিনিয়ামের অ্যান্টেনার খানিকটা এখনও তেরেবেঁকে রয়ে গেছে। শাম্ব ফেলতে দেয়নি। কাক বসলে নাকি ফোটোগ্রাফিক ডিজাইন তৈরি হয়। তখন শাম্ব ক্যামেরা বাগিয়ে ফটো তোলে। ঘরের ভিতরটা ঠান্ডা। বড় বড় দুটো জানলা। অনেকটা দূর পর্যন্ত পুরোনো কলকাতার স্কাইলাইন দেখা যায়। হাওড়া ব্রিজও। অবশ্য আজকাল মাল্টিস্টোরিড, হোর্ডিং, নিওন সাইনও উঁকি মারে। ঘরের একদিকে খাট পাতা। সেখানে শুয়ে জানলা দিয়ে আকাশ দেখে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। বারিধারার অবশ্য ভালোলাগা অন্য কারণে।

boierpathshala.blogspot.com

'তোদের এই ঘরটা ইন্টারেস্টিং। কিন্তু ইন্টারেস্টের কারণ ঘর নয়।'

শাম্ব অবাক হয়ে বলে, 'মানে! ঘরের কারণে ঘর ইন্টারেস্টিং নয় কথাটার মানে কী? পাগলের মতো কথা।'

বারিধারা হেসে বলল, 'ঠিকই বলছি। সি বিচ কি বিচের জন্য ভালো লাগে? সি বিচ ভালো লাগে সমুদ্রের জন্য। সমুদ্র যদি ভালো না লাগে, সমুদ্রসৈকতও ভালো লাগবে না। তোর এই চিলেকোঠার ঘরটাও তাই। ছাদটার জন্যই এত ইন্টারেস্টিং।'

সত্যি ছাদটা সুন্দর। পুরোনো দিনের উঁচু আর মোটা পাঁচিল। পাশে দাঁড়ালে বুক পর্যন্ত হয়ে যায়। শীতের সময় বা সন্ধের পর ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে থাক। আশেপাশে এর থেকে উঁচু কোনও বাড়ি নেই। কেউ যে ডিঙি মেরে দেখবে তার উপায় নেই। কত শীতের দুপুরে বারিধারা বই নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়েছে। একবার তো ঘুমিয়ে পড়ে কেলেঙ্কারি হয়েছিল। শাম্বদের নতুন কাজের মাসি বিকেলে ছাদে তালা দিয়ে নেমে পড়েছিল। বারিধারা ঘুম ভেঙে দেখে সন্ধে। বাড়ি ফিরতে হবে। শাম্বদের চিলেকোঠা এত মজার তার অন্যতম কারণ, এই জায়গার হদিশ চার বন্ধুর বাইরে কাউকে জানানোর নিয়ম নেই। এটা একটা গোপন ডেরা। বারিধারা দিদিকেও বলেনি। ঠাকুর্দা কমলকান্তি সেনকেও নয়। অতএব আটকা পড়ে যে বাড়ির কাউকে ফোন করবে সে পথ নেই। চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে শাম্বকে মোবাইলে ধরতে গেল বারিধারা। লাইন আউট অফ রিচ। নিশ্চয় কোথাও ছবি তুলতে গেছে। কলকাতা থেকে দূরে কোথাও। শ্রবণকে ফোন করল বারিধারা। লাভ হল না। সুইচ অফ। অফিসে মিটিং করছে? এখন কী হবে? বাড়িতে ফোন করা মানে 'নিয়ম ভঙ্গ'। বারিধারা ঠিক করল, যদি সারারাত চিলেকোঠার ঘরে থাকতে হয় তাহলেও চুক্তি ভঙ্গ করবে না। এদিকে শীত করছে। গায়ে একটা হাফ হাতা সোয়েটার। চাদর বলতে বিছানার চাদর। জানলা-দরজা বন্ধ করে সেই চাদর জড়িয়ে বসে রইল বারিধারা। ঝামেলার ব্যাপার হল, দুদিন আগেই ঘরের বাল্বটা গেছে কেটে। এই দুদিনের মধ্যে কেউ আসেনি। বাল্বও বদলানো হয়নি। অন্ধকার ঘরে মশার কামড় খেতে খেতে বারিধারা বুঝতে পারল তার খিদে পেয়েছে। মশা তাড়াবার জন্য মোবাইলের টর্চ জ্বেলে রাখল। একসময় মনে হল, খুব তেষ্টা পেয়েছে। সঙ্গে খিদে। ঘরে খাবার, জল কিছুই নেই। মোবাইল তুলে দেখল বারিধারা চার্জ শেষ। ঘড়িও দেখা যাচ্ছে না। একেই বলে বিপদ যখন আসে আটঘাট বেঁধে আসে। বারিধারা ঠিক করল, ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দরজায় ধাক্কা মারবে। নীচের লোকজন যদি শুনতে পায়। এই ভেবে যেই খাট থেকে নেমেছে, অমনি একটা আওয়াজ হল—ধুপ। কে যেন ছাদে লাফিয়ে পড়ল। সাহসী বারিধারা ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

'ওরে বাবারে।'

বলেই আবার লাফ দিয়ে উঠে পড়ল খাটে। ঘটনা শেষ হয়েছিল দারুণ মজার মধ্যে দিয়ে। বারিধারা তারপর থেকে এই চিলেকোঠার ঘরটাকে আরও ভালোবেসে ফেলেছে।

বারিধারা ছাদের মুখে এসে থমকে দাঁড়াল। শ্রবণকে কীভাবে চমকে দেওয়া যায়?

শ্রবণকে এখন যে-কোনওভাবেই চমকে দেওয়া যায়। সে খাটের ওপর বসে আছে। একটা লম্বা ঝুলের হাফ প্যান্ট আর কালো রঙের গেঞ্জি পরেছে। সামনে নোটখাতা খোলা। হাতে পেন্সিল। সে মন দিয়ে বিজ্ঞাপনের খসড়া তৈরি করছে। তার অফিস তাকে ছাতা বিষয়ে অ্যাড তৈরির অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে। স্টিল এবং মুভি দুটোই হবে। টাইট কম্পিটিশন। আরও দুটো ছেলেমেয়ে অফিসে ঘুরঘুর করে। তাদেরও রেডি করতে বলা হয়েছে। যারটা ভালো হবে বস তারটা নেবে। ক'দিন পরেই প্রেজেন্টেশন। এখন পর্যন্ত নোটখাতায় শ্রবণ তিন ধরনের প্ল্যান করছে।

১) খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ফুটপাথের ওপর একজন ছাতাসারাইওলা ছাতা মেরামত করছে। তার মাথা প্ল্যাস্টিকে ঢাকা। সামনে একজন মাঝবয়সি লোক ব্যাটারির খোলের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বৃষ্টিতে নির্বিকারচিত্তে ভিজছে। তলায় ক্যাপশন লেখা—এল সি দাসের ছাতা না পেলে ভিজব।

boierpathshala.blogspot.com

২) একটা দোকান। দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা এল সি পাল। বাইরে লম্বা লাইন। লাইনে কড়া রোদের মধ্যে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা কেউ ঘামছে, কেউ হাতপাখা নিয়ে খাওয়া খাচ্ছে। তলায় ক্যাপশন—রোদ তাড়াতে চাই এল সি দাসের ছাতা।

৩) এই থিমটা বেশ অ্যাডাল্ট। বড় হোটেলের সুইমিংপুলের পাশে একটা বড় রঙিন ছাতা। ছাতার আড়ালে সুন্দরী। মুখে দুষ্টু হাসি। হাত, পা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, মেয়েটি জামাকাপড় তেমন পরে নেই। তলায় ক্যাপশন—এল সি দাসের ছাতা, রোদ, বৃষ্টি আর লজ্জা ঢাকে।

তিন থিমের পাশে অল্প অল্প স্কেচ করেছে শ্রবণ। জিনিসটা ভিস্যুয়ালি দেখতে চাইছে। কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না। এই ধরনের প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনে বুদ্ধির থেকে চমক বেশি লাগে! সেটাই মিসিং।

হঠাৎ আওয়াজ—'ধুপ।'

শ্রবণ চমকে মুখ তুলল। বারিধারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ছোট লাফ দিয়ে সে-ই আওয়াজ করেছে। এখন দুই কানে হাত রেখে মুখ ভেঙাচ্ছে।

'আমাকে হনুমানের মতো দেখাচ্ছে? লেডি হনুমান?'

শ্রবণের মুখ থেকে বিজ্ঞাপনের চিন্তার ভাঁজ চলে গেল। সে গদগদ মুখে বলল, 'এসো বারি, ভিতরে এসো।'

'আগে বলো, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে। নইলে ঢুকব না।'

শ্রবণ হেসে বলল, 'কী ছেলেমানুষি করছ বারি।'

বারিধারা গম্ভীর গলায় বলল, 'ছেলেমানুষি নয় শ্রবণ, সিরিয়াস মানুষি। আমাকে হনুমানের মতো দেখানোর খুবই প্রয়োজন আছে। কিছুদিনের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড শুরু হবে। মেয়েরা হতে চায় রামায়ণের সীতার মতো। অশোকবনে বসে পুঁই পুঁই করে কাঁদতে চায়। আমি হব হনুমান। লেজে আগুন লাগিয়ে লঙ্কা ছারখার করব। সেই জন্য এখন থেকে প্র্যাকটিস করছি। হনুমানের মতো লাফ মারছি, দাঁত খিচোচ্ছি। ঠিক হচ্ছে কিনা বলো?'

শ্রবণ কেবলা মুখ করে বলল, 'কী সব বলছ ধারা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বারি।'

বারিধারা ঘরে ঢুকে ব্যাগটাকে ছুড়ে দিল খাটের ওপর। তারপর খাটের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে বলল, 'বুঝতে হবে না। যখন আগুন লাগাব তখন বুঝতে পারবে। তুমি কি কোনওদিনও একবার বারি, একবার ধারা বলা ছাড়বে না? যাক, যা খুশি করো। আপাতত খাট থেকে নেমে পড়ো সাহেব। আমি এখন শোবো। খুব টায়ার্ড লাগছে।'

শ্রবণ তাড়াতাড়ি খাতা, পেন, ব্যাগ সব মেঝেতে চালান করল। নিজেকেও। বারিধারা হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। কালো জিনসের ওপর সে একটা কুর্তি পরেছে। কুর্তির রং হলুদ। শ্রবণের মনে হল, ক্লান্ত হওয়ার পরও মেয়েটাকে খুব সুন্দর লাগছে।

শ্রবণ গদগদ ভঙ্গিতে বলল, 'আমি যে এখানে আছি তুমি জানলে কী করে?'

বারিধারা নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'হাত গুনে। তুমি জানো না, আমি অ্যাসট্রনমি শিখছি? তুমি নিজে যে মোবাইলে জানিয়েছ সেটা ভুলে গেলে?'

শ্রবণ লজ্জা পেয়ে বলল, 'ও হো, একদম ভুলে মেরেছি। বারি, আমি জানতাম তুমি আসবে।'

বারিধারা বড় বড় চোখ করে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'কী করে জানতে? তুমিও হাত গুনতে শিখেছ!'

শ্রবণ মেঝেতে বসেছে। সে এগিয়ে এল। খাটের ওপর থুতনি রেখে বলল, 'আমি তোমার কথা শুনেছি ধারা। বাড়ি থেকে পালিয়েছি।'

বারিধারা ডান পায়ের ওপর বাঁ পা তুলে নাড়তে নাড়তে বলল, 'আমি খুশি হয়েছি।'

শ্রবণ একটু চুপ করে থেকে গাঢ় স্বরে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি বারি।'

boierpathshala.blogspot.com

ফস করে কথাটা বলেই শ্রবণ লজ্জা পেল। বোকার মতো হয়ে গেল। অতি বোকার মতো। এমনিতে সে যথেষ্ট স্মার্ট। সে যে ধরনের কাজ করে তাতে স্মার্ট না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু বারিধারার সামনে তার কী যে হয়! অনেকবারই ভেবেছে ভেবেচিন্তে কথা বলবে। শেষ পর্যন্ত হয় না। ধেড়িয়ে ফেলে।

বারিধারা গম্ভীর গলায় বলল, 'ভুল করো।'

শ্রবণ বলল, 'বেশ করি বারি। তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ধারা?'

বারিধারা চিৎ অবস্থা থেকে পাশ ফিরল। বিকেলের আলো ছাদ ভেঙে ঘরে এসেছে। বারিধারার চোখেমুখে পড়েছে। এই আলোয় একই সঙ্গে তেজ আর স্নিগ্ধতা। বারিধারা বলল, 'না, বাসি না।'

এবার হাসতে হাসতে শ্রবণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বারিধারা। প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় ডান হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল। বাঁ হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরল জোর করে। তারপর তার নীচের কালো ঠোঁটটা নিজের মুখের ভিতর নিয়ে চোখ বুজল পরম তৃপ্তিতে।

দীর্ঘক্ষণ তারা এভাবেই রইল। তারপর যখন বিছানার ওপর এলো তখন দুজনেই পোশাকহীন।

কুড়ি

কমলকান্তি সেন মুগ্ধ এবং বিস্মিত।

শুধু মুগ্ধ এবং বিস্মিত বললে কম বলা হবে। তিনি অতিরিক্ত মুগ্ধ এবং অতিরিক্ত বিস্মিত। তার কারণ বড় কিছু নয়। কারণ দুটি রান্নার বই। প্রথমটি একটি সংকলন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দুই রান্না বইয়ের সংকলন। বাংলায় লেখা প্রথম রান্নার বই 'পাকরাজেশ্বর' ও 'ব্যঞ্জন রত্নাকর'। দ্বিতীয় বইটি মনিরা বেগমের লেখা 'বেগমের বাদশাহি রান্না'।

কিছুদিন হল কমলকান্তি সেনের সংগ্রহে বই দুটি এসেছে। রান্নার বই যে এমন হতে পারে, তাঁর জানা ছিল না। গোটা জীবন খাওয়াদাওয়া বিষয়ে তিনি নির্লিপ্ত থেকেছেন। নব্বই পার হয়েও কখনও ভাবেন না আজ কী খাব? তিনি মনে করেন, জৈবিক কারণে মানুষ খেতে বাধ্য হয়। কোনও বিকল্প নেই। এই কাজ নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামানো সময়ের অপচয়। কিন্তু রান্না একটি শিল্প। আর পাঁচটা বই পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই রান্নার বইয়ের প্রতি কৌতূহল বোধ করেছিলেন। কয়েকটি বই উলটেপালটে দেখার পর সেই কৌতূহল আগ্রহে পরিণত হয়, তার পর থেকেই তিনি দেশি-বিদেশি নানা ধরনের রান্নার বই সংগ্রহে আনাচ্ছেন। এই বই দুটি সেই পথেই হাতে এসেছে। বইদুটি শুধু রেসিপি নয়, গবেষণাগ্রন্থও বটে। কত পরিশ্রম! কত যত্ন! এক যুগের মানুষ পরের যুগের মানুষের জন্য তার জ্ঞান, কীর্তি, সংস্কৃতি, রুচি সম্পদ হিসেবে রেখে যায়। এটাই নিয়ম। রান্নার আদবকায়দা জানিয়ে যাওয়াও তাই। যুগের পর যুগ খাবারের স্বাদ ধরে রাখবার আয়োজন। বিভিন্ন দেশ, ধর্ম, জাতি নিজেদের খাবারের স্বাদ, রুচি, সংস্কৃতিকে পরম আদরে অন্য দেশ, ধর্ম, জাতির হাতে তুলে দিয়েছে। কমলকান্তি জানেন, কিছু ভুয়ো ইনটেলেকচ্যুয়াল মনে করে, পাকপ্রণালী নিয়ে আলোচনা, চর্চা অর্থহীন। খাওয়ার মতো হেঁশেল বিষয়টাই নিম্নবুদ্ধির। কমলকান্তি সেন তাদের জন্য করুণা বোধ করছেন। বোকার দল। তিনি ক্রমশ বুঝতে পারছেন, রন্ধনশিল্প একটি উঁচুদরের শিল্প তো বটেই, সেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সভ্যতা ও ইতিহাস ধরা আছে। গুহামানব এক সময় পশুর মতো কাঁচা মাছ মাংস খেত। বুনো গাছপাতা খেত। যত সে সভ্য হতে লাগল, বুঝতে পারল, সে পশু নয়, তার খাদ্যে স্বাদ প্রয়োজন। সেই স্বাদ তাকে তৈরি করে নিতে হবে। তাকে সভ্য হতে হবে। এই শিল্পে যে এতরকম মাত্রা আছে, তাঁর জানা ছিল না।

তবে শুধু বই নয়, আজ এই বয়সে কমলকান্তি সেনের মনে হচ্ছে, পৃথিবীর অনেক কিছু না জেনেই চলে যেতে হবে। সেটা একদিক থেকে যেমন দু:খের, তেমন আনন্দেরও। মৃত্যুর মুহূর্তে মনে হবে, আরও ক'টাদিন বেঁচে থাকলে ভালো হত। পৃথিবীর মতো সুন্দর আর বিস্ময়কর জায়গা থেকে কত কম জেনে

boierpathshala.blogspot.com

বিদায় নিতে হচ্ছে। এটা একটা মন খারাপের কথা। আর আনন্দের বিষয় হল, মনে হবে, ভাগ্যিস মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম। কোনও আপশোস নেই। যা পেয়েছি, তাই অনেক। এত পাবার কি আমি যোগ্য ছিলাম? না, ছিলাম না। পৃথিবী সুন্দর বলেই এই অকৃতী, অধমকে সে অনেক কিছু দেখাল, জানাল। তার কাছে আমি ঋণী রইলাম।

কমলকান্তি তাঁর ইজি চেয়ারে আয়েস করে বসেছেন। বাঁ হাতের কনুইয়ের জ্বালাটা কমেছে। খানিক আগে মণিকুন্তলা তার ঘরে চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বড় মগের লিকার চা। ছেলের বিয়ের পর পরই কমলকান্তি বলে দিয়েছিলেন শ্বশুরমশাইকে সেবা করবার জন্য তিনি ছেলের বিয়ে দেননি। বাড়িতে তিনি ছেলের বউ এনেছেন, তাঁর জন্য নার্স বা সেক্রেটারি আনেননি। সুতরাং চা, জল, খাবার, ওষুধ, চাদর, অফিসের ব্যাগ নিয়ে মণিকুন্তলা যেন তাঁর কাছে না আসে। এর জন্য নির্দিষ্ট কাজের লোক বাড়িতে আছে। তারা সেই কাজ করবে। এমনকী বিয়ের পর মণিকুন্তলা শ্বশুরমশাইয়ের খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

'কী চাই?'

মণিকুন্তলা থতমত খেয়ে বললেন, 'না, আপনি খাচ্ছেন...।'

কমলকান্তি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমি খাচ্ছি তো কী? তোমার তদারকিতে সবই তো সুন্দর করে গোছানো আছে। আমি চটপট খাব আর অফিসে ছুটব।'

মণিকুন্তলা আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'না, মানে যদি কিছু লাগে...।'

কমলকান্তি চাপা গলায় বললেন, 'কিছু লাগলে তুমি কী করবে? বীণার মা নেই? এটা তো তার কাজ।'

মণিকুন্তলা এবার নিজেকে সামলে নেন। মৃদু স্বরে বলেছিলেন, 'আমারও কাজ বাবা। আপনার খাওয়ার সময় পাশে থাকাটা এ বাড়ির বউ হিসেবে আমার কর্তব্য।'

কমলকান্তি বুঝতে পারলেন, এই মানসিকতা ভাঙতে গেলে কঠিন কথা বলতে হবে। তবে বিষয় কঠিন হলেও বলার ভঙ্গি যেন কড়া না হয়। মেয়েটি অতি ভালো। সে এতদিন যা জেনে এসেছে, সেটাই করছে।

কমলকান্তি মৃদু হেসে বললেন, 'শ্বশুরবাড়ির প্রতি বাড়ির বউয়ের কর্তব্য বিষয়ে সিলেবাস কে তৈরি করেছে মণিকুন্তলা? সেই সিলেবাস কমিটিতে কারা ছিল? পুত্রবধূরা কি কেউ ছিল? নাকি শুধুই শ্বশুরমশাইদের মেম্বার করা হয়?'

মণিকুন্তলাও হেসে ফেললেন। বললেন, 'আপনার খাওয়ার সময় আমি দাঁড়ালে আমার কোনও সমস্যা নেই বাবা। আমার তো এখন কোনও কাজ নেই। তাছাড়া আমার ভালো লাগবে।'

কমলকান্তি বললেন, 'আচ্ছা, দাঁড়াতে হবে না। তুমি ওই চেয়ারটায় বসো। বসে আমাকে বলো, তুমি কি কখনও তোমার বাবার খাওয়ার সময় পাশে গিয়ে দাঁড়াতে?'

মণিকুন্তলা মজা পেয়েছিলেন। এ কেমন মানুষ রে বাবা! চিরকাল সবার কাছ থেকে শুনে আসছেন, খাবার সময় শ্বশুর-শাশুড়ির পাশে হাজির থাকাটা অবশ্য কর্তব্য। তার বান্ধবী, আত্মীয়রা কতবার 'এই রে শ্বশুরমশাইয়ের খাবার টাইম হয়ে গেছে। আমি এবার পালাব'—বলে আড্ডা ভেঙে ছুটেছে। চাকরি করলে, ফাইল দেখতে দেখতে বা মিটিং করতে করতে, স্কুল-কলেজ হলে ক্লাসে পড়াতে-পড়াতে বা টিফিন খেতে খেতে বাড়িতে ফোন করেছে। চাপা গলায় কাজের লোকের কাছে থেকে রিপোর্ট নিয়েছে। 'হ্যাঁ গো রতনের মা, বাবা খেতে বসেছেন? ডালটা দিয়েছ তো...মুগ, মুসুর দুটোই দিয়েছ তো? ভেরি গুড। খান না খান, রোজ দুরকম ডাল দেবে...তরকারি ঠিক আছে?...অ্যাঁ! কী বলছ? একটু মুখে দিয়েই সরিয়ে রাখলেন...সর্বনাশ! কেন? কী হল আবার...ঝাল বেশি বলছে...উফ রতনের মা, তোমাকে না বারবার বলেছি...ঝাল কম দেবে, ঝাল কম দেবে...বাড়ি ফিরে আমাকে একচোট শুনতে হবে, বাবাও বলবেন, তোমাদের দাদাবাবুও বলবে...যাক, মাছ দুটো দিয়েছ তো? অ্যাঁ! দুটো দাওনি! করেছ কী! কেলেঙ্কারি করেছ...তোমাকে যে পইপই করে বলে এলাম, খাক না খাক দুটো মাছ দেবে...বাটিতে দুটো মাছ দেখলে

boierpathshala.blogspot.com

মানুষটা শান্তি পায়...ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে...এত বোঝো আর এটুকু বোঝো না? আমাকে বিপদে না ফেলে তুমি ছাড়বে না দেখছি রতনের মা...আমাকে চাকরিটা ছেড়ে হেঁশেল ঠেলতে হবে...টক দইটা দিয়েছ...খাবে না বলছে? কেন! দই আবার কী করল? তার ওপর রাগ কেন? সে তো আর তার ছেলের বউয়ের মতো চাকরি করতে যায়নি...গলা ব্যথা বলছে?...কী ঝামেলা...মানুষটা তো জ্বালিয়ে মারবে দেখছি...মতলব অন্য...চাইছে আমি কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ি বসে ওনার সেবা করি আর বলি, বাবা এটা নিন, বাবা ওটা নিন...ধ্যুস...'

এই মানুষটা তো একেবারে উলটোকথা বলছে!

কমলকান্তি বললেন, 'চুপ করে আছ কেন? উত্তর দাও। বিয়ের আগে তুমি কি খাবার সময়ে তোমার বাবার পাশে দাঁড়াতে?'

মণিকুন্তলা বললেন, 'রোজ পারতাম না। মাঝে মাঝে দাঁড়াতাম। মা থাকেন।'

কমলকান্তি বললেন, 'ভালো কথা। আমার এখানেও তাই হবে। মাঝে মাঝে আসবে। এসে গল্প করবে। খাবার টেবিলে গল্প হজমের জন্য ভালো। সাহেবরা করে। তবে অফিস বেরোনোর সময় গল্পের কতটা সময় থাকবে জানি না। একটা কাজ করা যাক, রাতে আমরা একসঙ্গে বসে খেতে পারি। তখন কথা হবে। কিন্তু নিয়ম করে আমার খাবার সময়ে এসে হাজিরা দেওয়া চলবে না।'

মণিকুন্তলা আর পারেননি। মুচকি হেসে ফেলেন। গলায় কৌতুক নিয়ে বলেন, 'খাবার সময় আমি থাকলে আপনার সমস্যা কী?'

কমলকান্তি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'একটাই সমস্যা। আমি জমিদার নই এবং তুমি জমিদারের পুত্রবধূ নও। তুমি যদি বলো, বাবাকে যত্ন করে খাওয়াতে আমার ভালো লাগে, আমি বলব এটা সত্য বলছ না। কম্পালসারি লাই। বাধ্যতামূলক মিথ্যে বলছ। লজ্জার কথা হল, আজও ছেলের বউদের শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে বানানো আদিখ্যেতা দেখাতে হয়। আমি এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে।'

'আপনি বেশি ভাবছেন বাবা। সত্যি খাবার সময় আপনার পাশে থাকতে আমার ভালো লাগছে। আপনার ঠিকমতো খাওয়া হয় না। মা থাকলে একটা কথা ছিল। আর একটু ভাত দিই বাবা?'

কমলকান্তি বললেন, 'তোমার বাবা-মাও তো এখানে নেই। তোমারও তো অভ্যেস বদলেছে। আমি কি তোমার খাবার সময় পাশে গিয়ে দাঁড়াই? বলি, আর একটু ভাত দেব মণিকুন্তলা? সবটাই পারস্পরিক হওয়ার কথা। ভালোবাসা, ভালোলাগা একতরফা হলেই সেটা বানানো, আদিখ্যেতা হয়ে যায়। হয় আদিখ্যেতা, নয় ফিউডাল অ্যাপ্রোচ। সুতরাং আর নয়। আমি কেমন খেলাম, কী খেলাম, আর খাব কিনা— এইসব নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখলে আমি বিরক্ত হব। অসুবিধে হলে তো তোমাকেই জানাব। তুমিও জানাবে।'

এই ঘটনার পর থেকে মণিকুন্তলা মানুষটাকে আরও বেশি পছন্দ করে ফেলেছিলেন। তিনি সামনে যেতেন না, তবে আড়াল থেকে কন্ট্রোল করতেন। এখনও করেন। আজও চা কাজের লোককে দিয়েই ওপরে পাঠিয়েছেন।

কমলকান্তি সেন বই খুললেন।

এই সব বই কি নিছকই সাজিয়ে-গুছিয়ে খিদে-তেষ্টা মেটানোর বই? এই বই কি ইতিহাস নয়?

বারিধারা ঘরে ঢুকে দাদুর ইজিচেয়ারের পাশে মোড়া নিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল। কমলকান্তি বই থেকে মুখ না সরিয়ে বললেন, 'কী বৃষ্টি দিদিমণি, আজ ইস্কুল যাওয়া নেই?'

বারিধারা ঘরে ঢুকে দাদুর গায়ে হাত দিয়ে রাগ রাগ গলায় বলল, 'না ইস্কুল যাওয়া নেই। আজ ইস্কুল ছুটি। আজ আমার ইউনিভার্সিটি যাওয়া আছে। তবে দেরিতে যাওয়া আছে।'

কমলকান্তি এবার মুখ ফেরালেন। হাত বাড়িয়ে নাতনির চুল ঘেঁটে হেসে বললেন, 'ইস্কুল, ইউনিভার্সিটি একই হল।'

বারিধারা বলল, 'দাদু তোমার সঙ্গে আমার ইমপর্ট্যান্ট কথা আছে।'

boierpathshala.blogspot.com

কমলকান্তি চোখ গোল গোল করে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার ভেরি ইমপর্ট্যান্ট কথা আছে বৃষ্টি।'

বারিধারা বলল, 'আমারটা আগে শুনতে হবে। লেডিস ফার্স্ট।'

কমলকান্তি ঝগড়ার অভিনয় করে বললেন, 'অসম্ভব। বুড়ো ফার্স্ট।'

বারিধারা বলল, 'উফ দাদু, ঠাট্টা নয়। আমার কথা শুনলে তুমি ঘাবড়ে যাবে।'

কমলকান্তি ইজি চেয়ারেই একটু ঘুরে বসলেন যেন। কোমর বেঁধে লড়াই করবার ঢঙে বললেন, 'আমার কথা শুনলে তোর চোখ কপালে উঠবে।'

বারিধারা বুঝতে পারল, দাদু এখন ঠাট্টার মেজাজে আছে। থামানো যাবে না। ফোঁস করে নি:শ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা, বলো। আগে তুমিই বলো। বুড়ো ফার্স্ট চান্স পাক।'

কমলকান্তি একটু চুপ করে বললেন, 'হ্যাঁ রে, বৃষ্টি, তোরা কুলফি খাস?'

বারিধারার চোখ চকচক করে উঠল। বলল, 'কী বলছ দাদু! কুলফি খাব না! বেস্ট ডেসার্ট ইন ওয়ার্ল্ড। ভালো রেস্টুরেন্টের কুলফি খেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে। খাবে?'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'ভাবছি খাব। তোর মা বানাতে পারবে?'

বারিধারা হেসে বলল, 'কেন পারবে না? তার ওপর তুমি খেতে চেয়েছ বলে কথা। খাওয়া নিয়ে যার কোনও চাওয়াচায়ি নেই, সেই মানুষটা মুখ ফুটে কিছু খেতে চাইলে মা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু এই কি তোমার ইমপর্ট্যান্ট কথা দাদু? কুলফি খাওয়া?'

কমলকান্তি বললেন, 'একেবারেই না। ইমপর্ট্যান্ট কথা অন্য। বৃষ্টি, তুই কি জানিস, এখন যেভাবে কুলফি বানানো হয়, সেই পদ্ধতি কে তৈরি করেছিল?'

বারিধারা বলল, 'ও তাই বলো। রেসিপি বুক পড়তে পড়তে তোমার মাথা গেছে। নিশ্চয় কোনও সাহেব বানিয়েছিল।'

কমলকান্তি ঘাড় নাড়িয়ে, গোয়েন্দা গল্প বলবার ঢঙে চাপা গলায় বলতে শুরু করলেন, 'একেবারেই নয়। নো সাহেব। মোগল সম্রাট আকবরের নাম শুনেছিস তো? সম্রাট জালাউদ্দিন মুহম্মদ আকবর? তাঁর ছিল বিশাল বাবুর্চিখানা। বাবুর্চিখানায় মেন শেফকে বলা হত মির বাকবাল। তাঁর আন্ডারে ছিল অসংখ্য বাবুর্চি। প্রতিটা খাবারের পাত্র কাপড় দিয়ে থাকত মোড়া। তার ওপর থাকত খাবারের নাম আর বাবুর্চির সিলমোহর। মানে, দিস ফুড ইজ সেফ। বৃষ্টি, তুই শুনলে এক্সাইটেড হবি যে আকবরের বাবুর্চিরা যে পদ্ধতিতে বাদশাহের জন্য কুলফি বানাত, আজও সেই একই টেকনিকে কুলফি বানানো হয়। এমনকী তোর জন্যও।'

বারিধারা চোখ বড় করে বলল, 'বলো কী দাদু! রিয়েলি?'

কমলকান্তি বই এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস না হলে এটা পড়ে দেখ।'

বারিধারা বলল, 'ইন্টারেস্টিং।'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'আর ইমপর্ট্যান্ট নয়?'

বারিধারা সুন্দর হেসে বলল, 'অবশ্যই ইমপর্ট্যান্ট। আজ যে আমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তার থেকে বেশি ইমপর্ট্যান্ট তো বটেই।'

একুশ

কমলকান্তি শান্তভাবে বললেন, 'কী করবি?'

বারিধারা বলল, 'দাদু, তুমি জানো, আমি কী করব।'

কমলকান্তি বললেন, 'আন্দাজ করতে পারছি। মোস্ট ইনটেলিজেন্ট লিস্টে এক নম্বরে যে বোকার নাম রয়েছে, এই ধরনের সিচুয়েশনে সে কী করতে পারে, তার একটা আন্দাজ হচ্ছে। তার পরেও বল। তোর মুখ থেকেই সরাসরি শুনি। অনেক সময় বোকার মুখ থেকে বোকামি শুনতে ভালো লাগে।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা বলল, 'আমি মধুজা রায়কে গিয়ে বলব, সরি ম্যাডাম, আমি আপনার আদেশ মানতে পারলাম না। আমি যা করেছি, ঠিক করেছি। ক্ষমা চাইবার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।'

কমলকান্তি একটু ভাবলেন। তার পর হালকা করে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমি আঁচ করছিলাম এই ধরনের কোনও কথাই তুই বলবি। আমি এখনকার সিস্টেমটা জানি না। আমাদের সময় স্কুল-কলেজে স্বদেশী করে অনেক দীপান্তরিত হত। এখন সম্মান বাঁচাতে গিয়ে কোন ধরনের সাজা হতে পারে, আমার জানা নেই। তুই তো জানিস বৃষ্টি খবরের কাগজ, টিভির সঙ্গে আমি নেই। ইন ফ্যাক্ট ওরাই আমার সঙ্গে নেই বলতে পারিস। এই ডিশিশনের কারণে তোর কী কী বিপদ হতে পারে আমি কি জানতে পারি?'

বারিধারা চুপ করে রইল। বিপদ যে অনেক রকম হতে পারে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মুখে যতই সাহস দেখাক, আজ সকাল থেকে তার নার্ভাস লাগছে। নার্ভাস লাগাটাই স্বাভাবিক। যত সময় যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে, সত্যি বড় ধরনের ঝামেলার মধ্যে সে জড়িয়ে পড়তে চলেছে। মধুজা রায় তাকে এমনি হুমকি দেয়নি। নিজের ক্ষমতা বুঝেই দিয়েছে। সব থেকে মুশকিল হয়েছে, ঘটনা কাউকে না বলায়। এতে বেশি অস্বস্তি হচ্ছে। বাড়িতে বলবার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কাকে বলবে? কে বুঝবে? এক দিদিকে বলা যেতে পারত। ক্রাইসিস সত্যি হলে দিদির মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে সে বংশীবাদককে নিয়ে নাজেহাল। বংশীবাদক বাঁশির অংশ বাদ দিয়ে নানাবিধ জ্বালাতন করছে। আজ নাকি ভোর চারটেতে উঠে বাঁশি বাজাতে শুরু করেছিল। জামাইবাবু ঘুম ভেঙে উঠে বলেছে, 'রোমাঞ্চকর'! অ্যালার্মের বদলে বাঁশি শুনে ঘুম ভাঙা রোমাঞ্চকর ঠিকই, কিন্তু সেটা একদিনের জন্য। রোজ ভোর রাতে যদি এই কাণ্ড হয়, তাহলে বিপদ। বাঁশি তখন বাঁশি থাকবে না। গুঁতো হয়ে যাবে। সবথেকে যেটা বিপজ্জনক সেটা হল, জামাইবাবু আজ ব্রেকফাস্ট টেবিলে ঘোষণা করেছেন, বাঁশি শিখবেন। দরকার হলে অফিস থেকে লম্বা ছুটি নেবেন। বাঁশি শিক্ষা ঠিকমতো হলে, চাকরিবাকরি ছেড়েও দিতে পারেন। তারপর বিবাগী হয়ে বংশীবাদকের মতো পথে পথে বাঁশি বাজিয়ে ঘুরবেন। জামাইবাবুর এই সিদ্ধান্ত দিদি মেনে নিতে পারছে না। বাঁশি শেখা খুবই সুন্দর একটা ব্যাপার, কিন্তু তা বলে ঘরসংসার ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছা ভয়ঙ্কর। সকালে বোনকে এই বিষয়ে টেলিফোন করে একপ্রস্থ বলা হয়েছে।

'আমার কী হবে বৃষ্টি?'

'কী আর হবে, তুইও জ্যোতিষ্কদার সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়বি। বাউলানির মতো তুই হবি বাঁশিয়ানী।'

দিদি কঠিন গলায় বলল, 'ফাজলামি করছিস? বাড়িঘর, সংসার ফেলে আমি তোর জামাইবাবুর সঙ্গে পথে ঘুরব?'

বারিধারা সামান্য হেসে বলেছে, 'বাড়িঘর, সংসার ফেলে ঘুরবি কেন! সঙ্গে নিয়ে ঘুরবি। বাউল ফকিরের ঘরসংসার তো তাদের পথ, তাদের মুক্তি। তারা ইটকাঠের ঘর সংসারের মায়ায় আটকে থাকে না। তুই এটা জানিস না?'

দিদি কান্নাভেজা গলায় বলছে, 'তোর জ্যোতিষ্কদাকে তুই তো জানিস বৃষ্টি। একবার যখন মাথায় পাগলামি ঢোকে, তখন সেটা কিছুতেই বেরোতে চায় না। চেপে বসে। সত্যি যদি এখন অফিস-টফিস ছুটি নিয়ে সে বাড়িতে বাঁশি শিখতে বসে, তাহলে কী হবে? আমার কান্না পাচ্ছে।'

বারিধারা বলল, 'জ্যোতিষ্কদার বাঁশি শেখাটা কোনও ব্যাপার নয় দিদি, বাঁশি বাজিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাই চিন্তার। বংশীবাদককে তো এখন আমার আরও ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে রে দিদি। ঠিক যেন হ্যামলিনের বাঁশিওলা। জ্যোতিষ্কদা, তুই, তোদের রান্নার মাসি, গাড়ির ড্রাইভার সবাইকে বাঁশি শুনিয়ে, মেসমারাইসড করে টেনে নিয়ে চলে যাবে।'

'চড় খাবি বৃষ্টি। আমি আর তোর সঙ্গে একটা কথা বলব না।'

দিদি রেগেমেগে ফোন কেটে দেয়। সম্ভবত কাঁদতে চলে যায়। এই মানুষকে এখন ইউনিভার্সিটির ঝামেলার কথা বলে কী হবে? মাথা কাজ করবে না। বারিধারা একবার ভেবেছিল, তিথিকে ফোন করে

boierpathshala.blogspot.com

জানাবে। নিজেই পিছিয়ে গেল। তিথি ভীতু মেয়ে। ঘাবড়ে যাবে। হয়তো কাঁপা গলায় বলবে, 'কী হবে বারিধারা?'

'কী আবার হবে, যা হওয়ার তাই হবে।'

'ম্যাম তো মারাত্মক খেপে যাবেন।'

'গেলে কী করব? ওই নোংরা ছেলের পা ধরে ক্ষমা চাইব?'

'আমার খুব ভয় করছে বারিধারা।'

'তোর কেন ভয় করবে? তোকে তো কোনও ঝামেলায় পড়তে হয়নি। হবেও না। চড় মেরেছি আমি, মধুজা ম্যাডামের কথা আমি অমান্য করব। উনি কোনও অ্যাকশন নিলে আমার বিরুদ্ধে নেবেন। তুই এর মধ্যে কোথা থেকে আসছিস? ঘটনাটা তোকে নিয়ে শুরু, তাই জানিয়ে রাখলাম।'

তিথি ঢোক গিলে হয়তো বলবে, 'সেই জন্যই তো আমার বেশি ভয় করছে। ইস আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'তুই ফালতু চাপ নিচ্ছিস তিথি। আমি ঠিক সামলে নেব।'

তিথি বলবে, 'তোকে ঘটনাটা না বললেই হত। সবাই আমার ওপর রাগ করবে। বলবে, তোর জন্য মেয়েটা মাথা গরম করে বিপদে পড়ল।'

'মাথা গরম করাটাই বড় হল তিথি! অপমানটা কিছু নয়? অতগুলো ছেলেমেয়ের সামনে ওই বাস্টার্ড তোকে অমন একটা নোংরা কথা বলল...সেটা কিছু নয়?'

তিথি হয়তো আমতা আমতা করে বলবে, 'সে তো কত লোকেই নোংরা হয় বারিধারা। পথেঘাটে, বাসে-ট্রামে দেখিসনি? ছুতোনাতায় মেয়েদের গায়ে হাত দেয়। খারাপ কথা বলে।'

'পথেঘাটে, বাসে-ট্রামের নোংরা লোক আর সহপাঠী, সহকর্মী, চেনা লোকের নোংরামি এক হবে?'

তিথি নিশ্চিত এসব যুক্তি কানে নিত না। বলত, 'ইস, কেন যে মরতে তোকে বলতে গেলাম। আমারই দোষ। ওসব কথা গায়ে না মাখলেই হত। তোকে যদি আমি না বলতাম, তুইও চড় মারতিস না। মধুজা রায় খুব পাওয়ারফুল....তোর কেরিয়ারের সমস্যা করে দিতে পারে।'

'শুধু মধুজা রায় কেন? তার সঙ্গে ছেলেটার এক রিলেটিভও জুটেছে। তার নাকি আরও বেশি পাওয়ার। দুই পাওয়ার মিলে সুপারপাওয়ার আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে।'

তিথি এসব শুনলে আরও ঘাবড়ে যাবে। অবশ্যই কাঁদো কাঁদো গলায় বলবে, 'এখনও ঠাট্টা করছিস বারিধারা! আমার তো হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'তুই একটা কাজ কর তিথি। হট ওয়াটার ব্যাগে গরম জল নিয়ে বসে হাত-পা গরম কর। আমি আমার কাজ করি।'

শ্রবণের ব্যাপারও তাই। সে তিথির মতো ঘাবড়ে না গেলেও চিন্তিত হবে। ওর নিজের কাজকর্ম আছে। বেশিটাই ভাবনা-চিন্তার কাজ। মাথায় এসব ঢুকলে সেই কাজে গোলমাল হবে। প্রেমের ব্যাপারে যতই ক্যাবলা হোক না কেন, ছেলেটা যে গুণী, সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। বাঁধাধরা নিয়ম নয়, নিজের গুণ দিয়ে উপার্জন করতে চায়। বিজ্ঞাপনের কনসেপ্ট তৈরি এখন ইন থিঙ্ক। গোটা দুনিয়াই বিজ্ঞাপনের ওপর চলছে। আবার এই লাইনে ভিড়ও খুব হচ্ছে। ইনোভেটিভ, ইমাজিনেটিভ ছেলেমেয়েরা আসছে। কেউ গাইতে পারে, কেউ আঁকতে পারে, কেউ ফটো তুলতে পারে, কেউ ভাবতে পারে। কেউ আবার মার্কেট অ্যানালিস্ট, প্রোডাক্ট এক্সপার্ট, ম্যানেজমেন্ট এফিসিয়েন্ট। প্রতিযোগিতাও খুব। তবে এখানে তেমন কাজ নেই। এখানে ছোটখাটো কাজ করতে করতে হাত পাকিয়ে চলে যেতে হবে মুম্বাই। শ্রবণও হয়তো তাই যাবে। এখন খুব খাটছে। কাল বিকেলে শাম্বদের চিলেকোঠার ঘর থেকে বেরিয়ে দুজনে ট্যাক্সি নিয়েছিল। সোজা নন্দন চত্বর। কলকাতায় এখন প্রেম করবার জন্য নানারকম জায়গা হয়েছে। সুন্দর সুন্দর পার্ক। গঙ্গার ঘাটটাও চমৎকার হয়েছে। বসবার জায়গা, হাঁটবার বাঁধানো পথ, আলো। শপিং মলে ঢুকে গেলেও হয়। এক

boierpathshala.blogspot.com

কাপ চা বা কফি নিয়ে যে-কোনও জায়গায় বসে যাও। নিউ টাউনের ইকো পার্ক তো খুবই সুন্দর। আর পকেটে পয়সা থাকলে তো কথাই নেই। সিসিডি, বারিস্তা তো এখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে। তবে প্রেম করবার জন্য বারিধারার সবথেকে বেশি পছন্দ নন্দন, নয়তো হন্টন। হয় নন্দন চত্বরে বসো, নয় পথে হেঁটে হেঁটে গল্প, ঝগড়া ভাব-ভালোবাসা করো। নন্দনের ওপর বারিধারা দুর্বল। সেখানেই শ্রবণের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। আলাপের ইস্যু ছিল আছাড়। কোনও প্রেম হয় দর্শনে, কোনও প্রেম হয় আকর্ষণে, কোনও প্রেম হয় শাসনে। এই প্রেম হয়েছিল আছাড়ে।

সেদিনটা চিরকাল মনে থাকবে বারিধারার। সকাল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। আকাদেমির পাশ দিয়ে নন্দন চত্বরে ঢোকবার মুখটা ছিল কাদা কাদা। মাথায় ছাতা নিয়ে বারিধারা ঢুকছিল। নন্দনে সিনেমা দেখবে। পা টিপে হাঁটছিল বারিধারা। পিছলে না যায়। হঠাৎই ধপাস আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে দেখে, পাশে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা ছেলে চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, তাড়াহুড়োর কারণে পা হড়কেছে। ছেলেটির কাঁধের ব্যাগ ছিটকে পড়েছে। ব্যাগ থেকে কাগজের বান্ডিল, রংতুলি, প্যালেট উঁকি মারছে। আর্টিস্ট। নন্দন চত্বরে আর্টিস্ট কোনও বড় বিষয় নয়। আর পাঁচজন পা হড়কে পড়লে যেমন বোকার মতো হাসে, এই ছেলেও হাসছিল। বারিধারার তাড়া ছিল, তার পরেও থমকে দাঁড়াল। সহজভাবে হাত বাড়িয়ে দিল। ছেলেটি লজ্জা লজ্জাভাবে হাত ধরে বলল, 'ধন্যবাদ। এত কাদা...।'

বারিধারা বলল, 'ইটস ওকে। সাবধানে উঠুন।'

ছেলেটি বলল, 'সাবধানেই উঠছি... আপনাকে ধন্যবাদ...।'

আধখানা উঠে ছেলেটি আবার পা হড়কাল এবং আছাড় খেল।

একটা কাদামাখা মানুষকে ছেড়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া কঠিন। তার ওপর মানুষটি একজন শিল্পী। ছোট হোক, বড় হোক, মেজো হোক শিল্পী তো বটে। বারিধারা নীচু হয়ে বসে মাটিতে ছড়িয়ে পড়া আঁকার সরঞ্জাম তুলতে থাকে। নিজের রুমাল দিয়ে কিছু কিছু মুছেও দেয়। শ্রবণ খুবই লজ্জা পেয়েছিল।

'আমি করে নিচ্ছি। আপনি কাজে যান।'

বারিধারা সে কথায় পাত্তা দেয় না। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে বলে, 'হাতদুটো পাতুন।'

শ্রবণ বলে, 'না না, ঠিক আছে।'

বারিধারা কঠিন গলায় বলে, 'হাত না ধুলে আপনি যেটাই ধরবেন কাদা লেগে যাবে। কাগজ, ছবি, রং, তুলিতে কাদা লাগলে ভালো হবে? নিন, হাতটা এগিয়ে দিন। দেরি করবেন না। আমার তাড়া আছে।'

হাত ধোওয়ার পর শ্রবণ নিজেকে অনেকটাই সামলে নেয়। বারিধারা বিদায় নিয়ে দ্রুত পা চালায়। সিনেমার দেরি হয়ে গেল। সে আরও দ্রুত হাঁটে। কয়েক পা এগিয়ে ছোট লাফ দিয়ে খানিকটা জল টপকাতে যায় এবং এবার সে আছাড় খেয়ে পড়ে।

শ্রবণ প্রায় ছুটে এসে তাকে তুলতে যায়। বারিধারা কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে, সে দাঁড়াতে পারছে না। তার বাঁ পা মচকেছে। তার যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়ে অচেনা তরুণটির ওপর। তার জন্যই দেরি, তার জন্যই তাড়াহুড়ো, তার জন্যই আছাড়, তার জন্যই পা মচকানো। তারপর...।

তারপর যাই ঘটুক, এই হল আছাড় প্রেম। আর এই কারণেই নন্দন চত্তরের প্রতি বারিধারা দুর্বল। বিশেষ করে যেখানে দুজনে আছাড় খেয়েছিল, সেদিকটা। কালও শ্রবণকে নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। রবীন্দ্র সদনের টিকিট কাউন্টারের সিঁড়িতে বসে চা খেল। চা খেতে খেতে বুঝল, তার ঠোঁটটা একটু ছড়ে গেছে। জ্বালা জ্বালা করছে। নিশ্চয় চুমু খাবার সময় শ্রবণের দাঁতে লেগেছে। জ্বালাটা ভালো লাগছে।

শ্রবণ বলল, আমাকে একটু হেল্প করবে বারি?'

বারিধারা বলল, 'কী হেল্প? বাড়ি পৌঁছে দেব?'

শ্রবণ হেসে বলল, 'না ধারা, তুমি আমাকে একটা অ্যাড কনসেপ্ট বলে দাও।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা বলল, 'কীসের অ্যাড?'

'ছাতা।'

বারিধারা হেসে বলল, 'ছাতা!'

শ্রবণ চিন্তিত হয়ে বলল, 'আমি দু-একটা বানিয়েছি, কিন্তু জমছে না। চেনা চেনা হয়ে যাচ্ছে। সেই রোদ, বৃষ্টি, সুইমিং পুল। ধ্যুস। এদিকে টাফ কম্পিটিশন।'

এই ছেলেকে মধুজা রায়ের ঝামেলা বলে লাভ কী?

তার পরেও মনে হল, কারও সঙ্গে শেয়ার করা দরকার। সে ঘটনাটা গোপন রাখবে। আবার পরামর্শও দেবে। এই কাজটা একমাত্র পারে ওই বুড়ো মানুষটা। কমলকান্তি সেন। একানব্বুই বছর বয়সেও চিন্তাভাবনা কী পরিষ্কার! নিজের দাদু না হলে বিশ্বাস হত না। মনে হত, মিথ্যে বলছে। বারিধারা তাই তিনতলায় দাদুর কাছে এসেছে।

তখনও সে জানত না, কমলকান্তি সেন তাকে একটা মারাত্মক কাজ করতে বলবেন। বারিধারা চমকে উঠল।

বাইশ

বিমলকান্তি সেন একতলার ঘরে বসে আছেন। সামনে, টেবিলের ওপর অফিসের কাগজপত্র ছড়ানো। তিনি সেদিকে তাকাচ্ছেন না।

বিমলকান্তির মতো সিরিয়াস মানুষকে এ ধরনের আচরণে দেখা যায় না। তিনি কাজ সামনে নিয়ে বসে থাকায় বিশ্বাস করেন না। হয় কাজ করেন, নয় কাজ সরিয়ে রাখেন। যদি কখনও মনে করেন, এখন খাতায়-কলমে কাজ নয়, কাজ হবে মাথার ভিতরে, তাহলে তাই হবে। তিনি আর পাঁচটা বিষয়ের মতো ভাবনাকেও সিরিয়াসভাবে দেখেন। তিনি মনে করেন, যদি ভাবার দরকার হয়, তাহলে মন দিয়ে ভাবা উচিত। অনেকেই একটা কাজ করতে করতে অন্য কিছু নিয়ে ভাবে। অনেকটা প্যারালাল থিঙ্কিং-এর মতো। একটার সঙ্গে একটা কাজ করার অর্থ, কোনওটাতেই উপযুক্ত গুরত্ব না দেওয়া। বিমলকান্তি মনে করেন, এটা ঠিক নয়।

আজ তার নিজের কী হল?

খানিক আগে গেট থেকে ভীম ইন্টারকমে ফোন করেছিল। একজন দেখা করতে চায়। বিমলকান্তি বিরক্ত হয়েছিলেন। চিন্তায় ছেদ পড়েছিল বলে বিরক্ত।

'আজ তো বুধবার নয় ভীম! তুমি জানো না, আমি শুধু বুধবার ভিজিটর মিট করি? নাকি দিনটা ভুলে গেছ?'

ভীম নীচু গলায় বলল, 'স্যার, একজন মেয়েমানুষ এসেছে।'

বিমলকান্তি আরও বিরক্ত হলেন। তার পরেও শান্ত গলায় বললেন, 'মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষের জন্য কি দেখা করবার দিন আলাদা হয়েছে? কই, আমি তো জানতাম না!'

ভীম আমতা আমতা করে বলে, 'না, মানে... বলেছে অনেক দূর থেকে এসেছে। ফুলিয়া না কৃষ্ণনগর।'

বিমলকান্তি আর গলা শান্ত রাখতে পারলেন না। কঠিন গলায় বলেন, 'ফুলিয়া, কৃষ্ণনগর কেন? দিল্লি, মুম্বই থেকে এলেও আজ আমি কারও সঙ্গে দেখা করব না।'

'স্যার, আমি বলেছি। তার পরেও বলছে জরুরি দরকার।'

বিমলকান্তি ঝাঁঝ নিয়ে বললেন, 'মুখের ওপর কথা বলছ কেন? ওর দরকার থাকতে পারে, আমার দরকার নেই। চলে যেতে বলো।'

ভীম ইন্টারকাম কেটে দেয়। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ এবং বিধ্বস্ত চেহারার মহিলাটিকে ধমক দেয়। মহিলা কিছু বলার চেষ্টা করে। এবার ভীম তাকে হাত নেড়ে তাড়ায়। সে এই মহিলার ওপর রেগে গেছে।

boierpathshala.blogspot.com

এর জন্যই স্যারের কাছ থেকে বকুনি খেতে হল। হতাশভাবে মহিলাটি ফুটপাথ বদল করে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবার ভীমের ইন্টারকম বেজে ওঠে। 'স্যার'-এর নম্বর। ভীম দ্রুত রিসিভার তোলে।

'স্যার।'

বিমলকান্তি চাপা গলায় বললেন, 'ভীম, সেদিনও তুমি একই অন্যায় করেছ। প্রহ্লাদ নামে আমার অফিসের একজন স্টাফকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলে। সেদিন দেখা করবার দিন ছিল না, তার পরেও এনেছিলে। আজ আবার সেই অন্যায় করতে যাচ্ছিলে।'

ভীম থতমত গলায় বলল, 'আর হবে না স্যার। আমি বুঝতে পারিনি।'

বিমলকান্তি বললেন, 'বাড়ির গার্ড যদি নিয়ম বুঝতে না পারে, তাহলে সেটা চিন্তার। গোটা বাড়ির সিকিউরিটি সিস্টেম নড়বড়ে হয়ে যায়। আমার মনে হয়, বাড়ির সিস্টেম নড়বড়ে হওয়ার আগেই কথাবার্তা বলে আমাদের একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। মনে হচ্ছে, কাজটা তুমি আর সিরিয়াসভাবে নিতে পারছ না। সে ক্ষেত্রে আমরা অন্যভাবে ভাবতে পারি।'

ভীম এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আর হবে না স্যার।'

বিমলকান্তি একটু চুপ করে থাকলেন। বললেন, 'আর একটা কথা ভীম। মহিলাদের মেয়েমানুষ বলাটা ঠিক নয়। এই কাজ তুমি আর কখনও করবে না।'

'আচ্ছা, স্যার, আর হবে না।'

বিমলকান্তি ইন্টারকম নামিয়ে আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। তাঁর চিন্তিত হওয়ার কারণ অনেকগুলো। এই যে তিনি মাঝে মাঝেই আরেকজন মানুষ হয়ে যাচ্ছেন, সেই মানুষটার মতো করে দুনিয়াটাকে দেখছেন, সামনের মানুষটাকে চিনছেন এটা যে এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা, এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অসুস্থতা কতটা জটিল? অসুখটা কি শেষ পর্যন্ত ভায়োলেন্সের দিকে যাবে? অনেক মানসিক অসুস্থতাই মারধর, ভাঙচুরের দিকে ঘুরে যায়। তার এক খুড়তুতো ভাইয়ের এইরকম হয়েছিল। এমনিতে শান্ত স্বভাব। কিন্তু একটা সময়ের পর যাকে কাছে পেত কামড়ে দিতে চাইত। তাকেও তেড়ে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কী, এই কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে ভয়ও করেছে। ডাক্তার যদি ভয়ের কিছু খুঁজে পায়। জীবনে নানা ধরনের জটিলতা, সমস্যা সাহসের সঙ্গে দেখেছেন। নিজের মানসিক সমস্যার ব্যাপারে সাহস দেখানো কঠিন। দ্বিতীয় চিন্তার কারণ হল, বাবা। বাবা কি সত্যি নিখিলেশ উপাধ্যায়কে অফিসে পাহারাদার হিসেবে রেখেছেন? তিনি সুযোগ বুঝে 'কোপ' মারবার কথা ভাবছেন। সেই 'কোপ' কী? সেন অ্যাসোসিয়েটসের কোনও ক্ষতি করতে চাইছেন? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? উপাধ্যায়বাবু সর্বক্ষণ কোম্পানির ভালো করবার চেষ্টা করেন। এমনকী এবারও করেছেন। অত বড় একটা অর্ডার যাতে হাত ফসকে না যায়, তার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাহলে? কথাটা বাবাকে জিগ্যেস করাটা উচিত। কিন্তু গোটা বিষয়টাই যদি ভুল হয়, তাহলে বিষয়টা নিয়ে কথা বলা ছেলেমানুষি হবে। বাবা এই বাষট্টি বছরের ছেলের ছেলেমানুষি খুব সহজভাবে নিতে পারবেন বলে মনে হয় না। চিন্তিত হওয়ার সব থেকে বড় কারণ হল, গোটা বিষয়টা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করা যাচ্ছে না। মণিকুন্তলাকে সমস্যাটা জানানো উচিত। কিন্তু মন চাইছে না। সে ঘাবড়ে গেলে মুশকিল। বাড়িসুদ্ধ সবাই জানতে পারবে। একটা হট্টগোল শুরু হবে। আবার স্ত্রী হিসেবে স্বামীর এই ধরনের সমস্যা সবার আগে তার জানা উচিত। এটা নিয়েই মনের মধ্যে দোনামোনা চলছে। তবে প্রথমে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলাটাই যুক্তিযুক্ত।

আবার ইন্টারকম বেজে উঠল।

'কী হয়েছে ভীম?'

'ভীম ভয় পাওয়া চাপা গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছে।'

বিমলকান্তি সেন অবাক হলেন। ভীমেরও কি মাথায় সমস্যা হল? এতটা বঝাঝকা, এমনকী চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়ার ভয় দেখানোর পরও লোক পাঠাতে চাইছে?

boierpathshala.blogspot.com

বিমলকান্তি কিছু বলবার আগে ভীম গলা আরও নামিয়ে বলল, 'স্যার, বলছে পুলিশের লোক।'

বিমলকান্তি নড়েচড়ে বসলেন।

'কী বললে? কীসের লোক?'

ভীম গলা নামিয়ে বলল, 'পুলিশের লোক। প্রথমে অর্চিনদাদাকে খুঁজছিল।'

অর্চিনকে পুলিশ খুঁজছে! বিমলকান্তি সেনের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'অর্চিন কোথায়?'

'সকালবেলা যেমন প্রতিদিন বের হয়, আজও বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। সে-কথা শুনে ওই লোক বলছে, আপনার সঙ্গে দেখা করবে।'

বিমলকান্তি একটু চুপ করে থাকলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। ভিতরে নিয়ে এসো।'

বিমলকান্তি টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র গোছাতে শুরু করলেন। অর্চিনকে পুলিশ খুঁজছে! কেন? পথেঘাটে সে কোনও গোলমাল পাকিয়েছে? অর্চিন তো গোলমাল পাকানোর ছেলে নয়। তাহলে? নিশ্চয় ভুল কিছু হচ্ছে।

ভীম যাকে নিয়ে এল, তাকে দেখে পুলিশ বলে মনে হয় না। মনে হচ্ছে, স্কুল-কলেজের মাস্টার। কমবয়সি মাস্টার। চোখমুখে এক ধরনের উজ্জ্বল ভাব। 'বই পড়া, বই পড়া' ব্যাপার আছে। পুলিশের ইউনিফর্ম নেই। কাঁধে একটা ব্যাগ। চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগটা মোটা। ব্যাগে রিভলভার আছে?

ভীমকে চোখের ইশারায় চলে যেতে বলে বিমলকান্তি সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'নমস্কার, বসুন।'

যুবকটি বসল না। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। সেই ব্যাগের ভাঁজ খুলে এগিয়ে ধরল। খাপের ভিতরে আইডেনটিটি কার্ড। সরকারি সিলমোহর দিয়ে তাতে লেখা—'ইনস্পেক্টর'।

যুবক সৌজন্য হেসে বলল, 'আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আসছি। আমার নাম সুপর্ণ ভট্টাচার্য।'

বিমলকান্তি বললেন, 'কার্ড দেখাতে হবে না। আমি বিশ্বাস করেছি। আপনি প্লিজ বসুন।'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য সহজভাবে চেয়ারে বসল। যেন এই ঘরের চেয়ারে সে আগে বহুবার বসেছে। পুলিশ বোধহয় এরকমই হয়। অভিনয় করতে পারে।

'মিস্টার সেন, আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দু:খিত। তবে বেশিক্ষণ সময় নেব না।'

বিমলকান্তি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'ইটস ওকে। কী ব্যাপার বলুন তো? শুনলাম, আপনি অর্চিনকে খুঁজতে এসেছেন?'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য সহজভাবে বলল, 'হ্যাঁ মিস্টার সেন, আমি অর্চিন রায়ের সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি। তবে সেই সূত্রে আপনার সঙ্গেও কথা বলতাম। হয়তো খানিকটা পরে বলতাম। অর্চিনের সঙ্গে কথা বলবার পর। কিন্তু সেটা তো সম্ভব হল না। অর্চিন তো এখন বাড়িতে নেই। আমাকে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাই ভাবলাম, সেই সময়টা যদি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। আপনার কি অসুবিধে হবে?'

অবশ্যই অসুবিধে হবে। আজ তার বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলবার মতো মানসিক অবস্থা নেই। তার ওপর অফিসে বেরোনোর সময় হয়ে গেল। কিন্তু পুলিশকে তো আর সে কথা বলা যায় না। বিমলকান্তি অস্ফুটে বললেন, 'না, অসুবিধে হবে না। তবে আমার অফিসের সময়...।'

যুবক অফিসার বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'তাহলে বরং আজ থাক। আপনার সঙ্গে আমি অন্য কোনও সময় দেখা করে নেব। আমি কি অর্চিনের জন্য এখানে বসে একটু অপেক্ষা করতে পারি?'

বিমলকান্তি সেন বললেন, 'না না, তেমন তাড়া নেই যে কথা বলতে পারব না। আপনি বলুন না কী জানতে চান।'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'ধন্যবাদ। আপনি চিন্তা করবেন না। অফিসের লেট করিয়ে দেব না। অল্প ক'টা কথা বলেই আপনাকে ছেড়ে দেব। অর্চিন রায় আপনার কে হয়?'

বিমলকান্তি সেন একটু ভেবে বললেন, 'রিলেটিভ। আত্মীয়।'

boierpathshala.blogspot.com

সুপর্ণ ভট্টাচার্য বলল, 'আচ্ছা, ঠিক কী ধরনের আত্মীয়?'

বিমলকান্তি সেন আবার একটু চুপ করে রইলেন। পুলিশকে কতটা বলা ঠিক হবে? আবার না বলেই বা উপায় কী? নিশ্চয় ইতিমধ্যে অনেকটা জেনে এসেছে।

'সরাসরি আমার রিলেটিভ নয়। আমার স্ত্রীর বোনের ছেলে। দূর সম্পর্কের বোন।'

যুবক অফিসার চোখদুটো বড় করে বিস্ময়ের ভান করল।

'অর্চিন আপনার এখানে আছে কেন?'

বিমলকান্তি হালকা বিরক্ত হলেন। এই ছোকরা অফিসার অতিরিক্ত চালাক মনে হচ্ছে। নানারকম অভিনয় করছে। কখনও বিনয়ের, কখনও বিস্ময়ের। এবার বিমলকান্তির গলায় বিরক্তির ভাব এসে পড়ল। বললেন, 'ছেলেটির বাড়ি সিউড়িতে। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। কলকাতায় খুব নামকরা জায়গায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। আপনি নিশ্চয় বুঝবেন, সিউড়ি থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করে লেখাপড়া সম্ভব নয়। তাই আমার বাড়িতে থাকে।'

'অর্চিনের বাবা-মা কি সিউড়িতে থাকে?'

বিমলকান্তি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'এত ডিটেইলসে আমি বলতে পারব না। যদি বলেন, স্ত্রীর কাছে জেনে রাখতে পারি।'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য হাত তুলে বলল, 'না না, অত কিছু করতে হবে না মিস্টার সেন। আপনি যতটা জানেন, ততটাই যথেষ্ট। আমার কনসার্ন অর্চিন রায়কে নিয়ে, তার বাবা-মাকে জড়ানোর কোনও বিষয় নেই।'

বিমলকান্তি ভারী গলায় বললেন, 'আপনি কি চা খাবেন?'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য হেসে বলল, 'আমি চা খাই না।'

বিমলকান্তি সেন বললেন, 'তাহলে কি আমার সঙ্গে কথা শেষ?'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য ঘাড় কাত করে বিনয়মাখা গলায় বলল, 'অবশ্যই শেষ। আপনি যে এই ছেলে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না, বোঝা যাচ্ছে। আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য দু:খিত।'

বিমলকান্তি বললেন, 'আমি কি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

যুবক অফিসার হেসে বলল, 'প্রশ্ন করতে হবে না। আমি জানি আপনি কী জানতে চান। আপনি জানতে চান, আমি কেন অর্চিনের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তাই তো? মিস্টার সেন, আমরা একটা অস্ত্র মামলায় আপনার এই দূর সম্পর্কের, সরি, আপনার স্ত্রীর এই দূর সম্পর্কের ব্রিলিয়ান্ট বোনপোটির কানেকশন পেয়েছি। ঠিক কানেকশন বলব না, বলব নাম পেয়েছি।'

বিমলকান্তি চমকে উঠলেন। অর্চিন অস্ত্র মামলায়! তিনি কি ঠিক শুনছেন? নিশ্চয় নয়।

'অফিসার আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, একটু স্পষ্ট করে বলবেন?'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য বলল, 'কেন বলব না? অবশ্যই বলব। গত সপ্তাহে পুলিশ একটা বড় অস্ত্র চালান র‍্যাকেট ক্র্যাক করেছে। এরা বিভিন্ন জেলা এবং কলকাতা জুড়ে কাজ করে। এখন পর্যন্ত পুলিশ তিনজনকে অ্যারেস্ট করেছে। ইনভেস্টিগেশন চলছে। আরও অনেকেই ধরা পড়বে। আসামিদের ইন্টারোগেশনের সময় তারা কতগুলো নাম বলেছে। তার মধ্যে অর্চিন রায়ের নামও রয়েছে।'

উত্তেজনায় বিমলকান্তি সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আবার বসে পড়লেন। বললেন, 'কী বলছেন আপনি! হতেই পারে না। অর্চিন ভালো ছেলে। সে এইসবের মধ্যে মোটেও যুক্ত থাকতে পারে না।'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য মৃদু হেসে বলল, 'মিস্টার সেন, আমি তো একবারও বলিনি সে যুক্ত আছে। একজন অস্ত্র চালানের আসামি জেরার সময় কত নাম বলে। তার কথা বিশ্বাস করতে হবে? বিশ্বাস করলে তো আপনার রিলেটিভকে আমরা আগে অ্যারেস্ট করতাম। সেসব তো আমরা কিছু করিনি।'

অ্যারেস্ট! বিমলকান্তির মনে হচ্ছে তাঁর শরীর কাঁপছে। বুকের ভিতর ধড়ফড়ও করছে। কপালে ঘাম জমছে। হাত দিয়ে সেই ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'তাহলে এসেছেন কেন?'

boierpathshala.blogspot.com

সুপর্ণ ভট্টাচার্য বলল, 'ছেলেটি যে এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, সেই বিষয়টা কনফার্ম করতে এসেছি। পুলিশের রুটিন খোঁজ। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেই চলে যাব। আপনি বরং অর্চিনের মোবাইল ফোনের নম্বরটা আমাকে দিন। একটা ফোন করে দেখি, সে কখন আসবে। যদি সেরকম দেরি হয়, তাহলে না হয় সে আমার অফিসে আসবে। সেখানে কথা হবে। আপনি যখন বলছেন ছেলেটি এত ভালো, তখন তাড়াহুড়ো তো কিছু নেই।'

বিমলকান্তি অসহায়ভাবে মুখ তুললেন। মোবাইল ফোন নম্বর! অর্চিনের মোবাইল ফোন নম্বর তো তিনি জানেন না। মাথাটা হালকা ঘুরে উঠল যেন। আর তখনই নিমেষের জন্য বদলে গেলেন বিমলকান্তি। মনে হল, তিনি উলটো চেয়ারে বসা ছোকরা পুলিশ অফিসার সুপর্ণ ভট্টাচার্য হয়ে গেছেন। চোখ সরু করে অফিসার বিমলকান্তির দিকে তাকিয়ে আছেন। লোকটার একটা কথাও বিশ্বাস হচ্ছে না। বুড়ো অনেক কিছু জানে, কিন্তু বলছে না।

বিমলকান্তি নিজের মধ্যে ফিরে আসতে আসতে কেঁপে উঠলেন। নিজেকেই নিজের বিশ্বাস হচ্ছে না! কী ভয়ংকর! এ কী অসুখ হল তার! চেয়ারের হাতল ধরে নিজেকে সামলালেন বিমলকান্তি।

সুপর্ণ ভট্টাচার্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে মিস্টার সেন?'

বিমলকান্তি সেন মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'না, ঠিক আছে।'

মুখে ঠিক আছে বললেও বিমলকান্তি সেন বুঝতে পারলেন, ঠিক নেই। অনেক কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

তেইশ

কর্ণিকা শেষ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছে। ঘুম ভাঙার পর থেকে স্বপ্নটা সমস্যা করছে। স্বপ্ন মনে থাকবার কথা নয়। জেগে ওঠবার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন থেকে আবছা হতে হতে মিলিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই স্বপ্নের বেলায় ঘটনা ঘটছে অন্যরকম। বার বার মনে পড়ছে। তাতে একই সঙ্গে কর্ণিকার লজ্জা করছে, আবার ভালোও লাগছে।

বাড়িতে খুশির হাওয়া। কাল বাড়ি এসে প্রোমোশনের কথা বলেছে কর্ণিকা। বাবা-মা-ভাই তিনজনের তিনরকম প্রতিক্রিয়া। মা চিবুকে হাত ঠেকিয়ে আদর করল। ছলছল চোখে বলল, 'হ্যাঁরে, কাজ পারবি তো? এইটুকু মেয়ে। অত বড় অফিস!'

কর্ণিকা বলল, 'না, পারব না।'

মা বলল, 'তোকে এখন কী করতে হবে?'

কর্ণিকা খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না মা। মনে হচ্ছে অফিস ঝাঁট দিতে হবে। ঝাঁট দিয়ে সোনাদানা খুঁজে বের করতে হবে।'

মা বলল, 'সবসময় ঠাট্টা করিস না।'

কর্ণিকা হাত বাড়িয়ে মায়ের একটা হাত ধরল। অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'ঠাট্টা করছি না। সত্যি আমি জানি না, ঠিক কী করতে হবে। মনে হয়, আমার কাজটা হবে খবরদারি। খবরদারি মানেই তো ঝাঁট দেওয়া। কে সোনাদানা ফেলে গেল, কে সোনাদানা ঠিকমতো চিনতে পারল না, কে সোনাদানার বদলে ছাইভস্ম তুলে নিল। কমপ্লিকেটেড বিষয়। তুমি বুঝবে না। তার কারণ, তুমি অফিসে কাজ করো না বলে নয় মা, তার কারণ, বিষয়টা আমিও বুঝতে পারিনি।'

মা চোখ বড় করে বলল, 'সে যাই হোক, তোর ভালো হয়েছে এটাই ভালো। সাবধানে থাকবি। কাজে ভুল করবি না।'

কর্ণিকা ফোঁস করে একটা নি:শ্বাস ফেলে বলল, 'সাবধানে থেকে লাভ হবে না। আমাদের স্যার একজন অদ্ভুত মানুষ। কাজ ভুল করলে রাগ করেন না। কিন্তু...।'

boierpathshala.blogspot.com

মা বলল, 'কিন্তু কী...?'

কর্ণিকা উঠে বসে, হেসে বলল, 'কিন্তু শুনে লাভ নেই। তুমি এখন ঘর থেকে দ্রুত কেটে পড়ো মা। আমি স্নান করতে যাব। কিছু খাবার ব্যবস্থা করো তো। খিদে পেয়েছে। আজ সারাদিন একই সঙ্গে শরীরে টেনশন এবং খুশি—দুটো এফেক্ট কাজ করছে। মিক্সড এফেক্ট। এতে খিদে বাড়ে।'

মা বলল, 'বাবাকে বলেছিস?'

'না।'

মা অবাক গলায় বলল, 'সে কী! চাকরির উন্নতির খবর বাবাকে বলবি না!'

কর্ণিকা খাট থেকে নেমে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘরে পরবার জামাকাপড় নিতে লাগল। বলল, 'তুমি বলো।'

মা এগিয়ে এসে মেয়ের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ছি। এটা কেমন কথা কনি? তুই নিজের মুখে বললে মানুষটা খুশি হবে।'

কর্ণিকা হাতে জামাকাপড় নিয়ে মায়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'কে বলল এটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। খবরটা পেলেই তো হল। তুমি তো জানো মা, বাবার সঙ্গে কথা বলাটা একটা ঝামেলা, একটুক্ষণের মধ্যে মুড অফ হয়ে যাবে। এমন সব কথা বলবে, মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না। আজকের দিনে মেজাজ খারাপ করতে ভালো লাগছে না।'

মা মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'এটা ঠিক নয় কনি। সব মানুষ এরকম হয় না। তোর বাবাও নয়। তার পরেও সে তোর বাবা। এখন আর রাগ করে সময় নষ্ট নয়। যাও প্রোমোশনের খবরটা বলে এসো।'

কর্ণিকা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বলছি। তার আগে তুমি জানিয়ে রাখো, তাহলে আর আমাকে বেশি বকতে হবে না।'

মা ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল, 'আমি কিছু বলব না। যা বলবার তুমি বলবে।'

কর্ণিকা স্নান সেরে বাবার কাছে গেল। দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। সুখময়বাবু টিভির সামনে বসে আছেন। টিভিতে রোগা-পাতলা একটা লোক বসে। খালি গা। গলায় গাদাখানেক রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে চন্দনের তিলক। মুখটা চোয়াড়ে, নাকটা টিয়াপাখির মতো লম্বা। ভাগ্য গণনা চলছে। লাইভ ভাগ্যগণনা। টেলিফোন আসছে। জ্যোতিষসম্রাট উত্তর দিচ্ছে। তার মুখ অবশ্য নামানো। সামনে রাখা খাতায় পেন্সিল দিয়ে কিছু একটা নোট নিচ্ছে।

'প্রণাম জানবেন ঠাকুর।'

রোগা-পাতলা নাক টেনে বলল, 'আপনাকে প্রণাম। আমাকে ঠাকুর বলবেন না। আমি ঠাকুর নই। আমি ঠাকুরের শিষ্য। তার ইচ্ছেতেই মানুষের সেবায় মন দিয়েছি।'

'স্যার, আমি বড় কঠিন সমস্যায় পড়েছি।'

রোগা-পাতলা নোটখাতায় কীসব লিখতে লিখতে বলল, 'আগে নাম বলুন, ঠিকানা বলুন।'

'নাম-ঠিকানা বলা যাবে না গুরুদেব। ফেঁসে যাব।'

'আচ্ছা, বলতে হবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘটনাই তার পরিচয়। নাম-ঠিকানায় কার কী আসে যায়? ঘটনা বলুন।'

'ঘটনা খুব গুরুতর। আমার বউ একটা বিচ্ছিরি কেসে ফেঁসে গেছে।'

রোগা-পাতলা এবার মুখ তুলে ক্যামেরার দিকে তাকাল। ভুরু কোঁচকাল। ভুরু সম্ভবত ফলস। নরমাল ভুরু এত ঘন হতে পারে না। 'আপনার স্ত্রীর সমস্যা, আপনি বলছেন কেন? তিনি কি কথা বলতে পারেন না?'

'দাদা, আমার স্ত্রী লজ্জায় বলতে পারছে না।'

boierpathshala.blogspot.com

রোগা-পাতলা ফের নোটখাতায় মুখ নামাল। বলল, 'সংসারে আমাদের এই হল জটিলতা। অনেক সময়েই আমরা নিজেরা আমাদের সব সমস্যা নিজের মুখে ব্যক্ত করতে পারি না। তা করলে কী করে হবে? সমস্যা সমাধানের পথ তো আমাকেই সন্ধান করে নিতে হবে। মুক্তির পথ তো আমারই হাতে। শ্লোকে বলেছে, য: স্থাপিত নিজস্ব পথেচ, তদবি চলিতানি দিবসরাত্রি। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল...যাক, এর অর্থ শুনে আপনার কাজ নেই। আপনি বলুন। বলুন আপনার স্ত্রীর সমস্যা কী?'

টিভিতে কোনও কথা নেই। রোগা-পাতলা মুখ তুলে বিরক্ত গলায় বলল, 'কী হল বলুন? নাকি আপনারও সমস্যা?' তার পরেও প্রশ্নকর্তার কোনও কথা নেই।

'চুপ করে আছেন কেন? আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? এই যে হ্যালো...হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন না?'

কর্ণিকার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। একটা সুস্থ পুরুষমানুষ টিভির সামনে বসে ভর সন্ধেবেলা এসব কী দেখছে। এই সময়টা কিছু কাজকর্ম তো করতে পারত। কাজকর্ম না করুক বাইরে কোথাও গিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে গল্পটল্প করে আসতে পারত। ক্লাবে গিয়ে তাস খেলতে পারে। তা না করে এসব কী? টিভিতে ভাগ্যবিচার দেখছে! অসুখ থেকে উঠেছে অনেক দিন। তার পরেও একটানা ঘরে বসে আছে। মা বলে, মানুষটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। কর্ণিকার বিশ্বাস, ওসব কিছু নয়। বাবার কাজ করবার অভ্যেস নষ্ট হয়ে গেছে। তার ওপর মেয়ের উপার্জনের পয়সা যখন আসছেই, তখন আর সংসার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? সবই এই লোকটার দোষ। শরীর-টরীর কিছু নয়।

মুখটা তেতো খাওয়া মতো করে কর্ণিকা সুখময়বাবুর থেকে দূরত্ব রেখে বেতের সোফায় বসল।

'বাবা, টিভিটা বন্ধ করো।'

সুখময়বাবু মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন। রিমোট দিয়ে টিভির সাউন্ড কমালেন।

'বাবা, এসব কী হাবিজাবি জিনিস দেখছ?'

সুখময়বাবু চোখ কপালে তুলে গদগদ গলায় বললেন, 'হাবিজাবি কী বলছিস কনি! ভদ্রলোক কত বড় অ্যাস্ট্রোলজার জানিস? আট জায়গায় চেম্বার। সপ্তাহে সাতদিন সাত জায়গায়, একদিন ডবল জায়গায়। ওনার সব কথা অব্যর্থ। তুই যদি ওনাকে এখন ফোন করে কিছু জিগ্যেস করিস, ঠিক বলে দেবেন। ধর...ধর...জানতে চাইলি কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হবে কিনা। উনি তোর ডেট অফ বার্থ, টাইম অফ বার্থ, কোষ্ঠী বিচার করে ঠিক বলে দেবেন।'

কর্ণিকার বিরক্তি বাড়ল। এই জন্যই সে বাবার কাছে চট করে আসতে চায় না। নিজেকে সামলাল। সামনে টেবিল থেকে একটা পুরোনো ম্যাগাজিন টেনে পাতা উলটোতে লাগল।

'বাবা, আমার কিছু জানতে হবে না। অফিসে আমার একটা প্রোমোশন হয়েছে।'

সুখময়বাবু রিমোট টিপে ফট করে টিভিটা বন্ধ করলেন। ঘুরে বসলেন মেয়ের দিকে।

'সে কী! এতক্ষণ বলিসনি কেন?'

'এই তো বাড়ি ফিরলাম।'

সুখময়বাবু উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'বেতন কত বাড়ল?'

কর্ণিকার মেজাজটা দুম করে বিগড়ে গেল। প্রথমেই বেতনের কথা? মেয়ের অফিসে উন্নতি মানে, শুধু বেতন বাড়া? কী কাজ, কী দায়িত্ব, সেসব জানবার কোনও উৎসাহ নেই? মায়ের মতো একজন সাধারণ ঘরসংসার করা মহিলা যে-কথা ভাবে, এই মানুষটা সেকথাও ভাবতে পারে না। শুধু টাকা আর টাকা!

কর্ণিকা কোলের ওপর রাখা ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে বলল, 'জানি না।'

সুখময়বাবু বিরক্তি দেখিয়ে বললেন, 'সে কী! প্রোমোশন হল, মাইনে কত বাড়ল জানলি না! এই হল হাঁদার মতো কাজ। কালই গিয়ে জানবি। ভালো করে খোঁজ নিবি।'

কর্ণিকা সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। কড়া গলায় বলল, 'কেন?'

boierpathshala.blogspot.com

'কেন! কেন আবার কী? টাকাই তো আসল। বাজারের কী অবস্থা জানিস? জানবি কী করে? শুধু অফিস আর ঘর করিস, দোকান-বাজার তো করতে হয় না। করতে হলে বুঝতিস।'

কর্ণিকার চোখমুখ কুঁচকে গেল। উফ! এই জন্যই আসতে চাইছিল না। ক'টা বাজে কথা শুনতে হবে। বলতেও হবে। নিজেকে কতক্ষণ সামলে রাখা যায়?

'ভাগ্যিস বুঝতে পারি না। তাহলে সারাদিন তোমার মতো কোনও কাজকর্ম না করে বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হত। অপেক্ষা করতাম, জ্যোতিষী কখন আমার উন্নতির কথা বলবে।'

সুখময়বাবু মেয়ের কথায় বোকা বোকা হাসতে লাগলেন। কর্ণিকা সেই ফাঁকে ঘর থেকে চলে গেল। গেল ছাদের ঘরে। ভাইয়ের কাছে।

মানা তার দিদির প্রোমোশনের ব্যাপারটা নিজের মতো করে নিল।

ছাদের এই ঘরটা মানা বছর খানেক হল দখল করেছে। তার নাকি লেখাপড়া করতে সুবিধে হবে। বাবা বেদম চেঁচামেচি করেছিল। এইটুকু ছেলের আবার আলাদা ঘর কীসের? লেখাপড়া করবে না কচু করবে। যে ছেলে লেখাপড়ার ধারে-কাছে যায় না, তার এসব কী ফুটানি! পরীক্ষায় দুটো থেকে তিনটে সাবজেক্টে ফেল না করলে ভাত হজম হয় না। এই ছেলের জন্য ঘর নয়, চাবুক দরকার। মা-ও মানার ওপর রাগারাগি করল। সেটা অবশ্য অন্য কারণে। ছাদের ঘর ধুলো, ঝুল আর আবর্জনায় ভর্তি। তার ওপর একটা মাত্র জানলা। সেটাও ছোট। ওই ঘরে গেলে ছেলের শরীর খারাপ হয়ে পড়বে। কর্ণিকাই শুধু মানার পাশে ছিল।

'ঘরটা যখন পড়েই আছে, মানা গিয়ে থাকুক না। সমস্যা কী? সাফসুতরো করে নেবে।'

সুখময়বাবু দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'কেন? তুই কেন ভাইয়ের হয়ে ওকালতি করছিস?'

কর্ণিকা বলল, 'ওকালতি কিছু করছি না। এই বয়সে একটা স্পেস লাগে।'

সুখময়বাবু ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, 'স্পেস! কেন আমাদের তো কখনও ওসব লাগেনি। সবাই মিলে থেকেছি। বিড়ি খাবার জন্য লাটসাহেবকে ঘর দিতে হবে?'

কর্ণিকা হেসে ফেলল। বলল, 'বাবা, বিড়ি-সিগারেট খাবার হলে বাইরে গিয়েও খেতে পারবে। এভাবে আটকানো যাবে না। মানা এমন একটা বয়সের মধ্যে দিয়ে চলেছে, যেখানে সর্বক্ষণ বাবা-মা-দিদির মাঝখানে থাকতে ভালো লাগবার কথা নয়। একটা ঘর যখন পড়ে আছে, ও ব্যবহার করুক।'

সুখময়বাবু বললেন, 'কই, তোর তো আলাদা ঘর লাগেনি। তুইও তো একসময়ে এই বয়সে ছিলি। নাকি শিশু থেকে লাফ মেরে ধেড়ে হয়ে গিয়েছিস?'

কর্ণিকা বলল, 'ছেলে আর মেয়ে এক ব্যাপার নয় বাবা। মেয়েরা অনেক কিছু মেনে নেয়। তাছাড়া আমার তো সুযোগ ছিল না। আমি ছাদের ঘরে একলা থাকব শুনলে তোমরা রাগতে না, ভয়ে মরে যেতে। থাক ওসব কথা। মানাকে ''হ্যাঁ'' বলে দাও। সবিতামাসিকে দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে দিলেই হবে।'

দিদির সাপোর্ট পেয়েই সিঁড়ির পাশের এই লম্বাপনা ঘরটা পেয়েছে মানা। টেবিল-চেয়ার, টেবিল ফ্যান, বইয়ের তাক। দেওয়ালে ঘুড়ি, মারাদোনা, শচীনের ফটো। ঘরের সবথেকে মজা, দরজাটা আটকালেই বাড়ির থেকে আলাদা। কর্ণিকা কাল রাতে যখন এই ঘরে উঠে এল, মানা খাটে শুয়ে পড়ছিল। কর্ণিকা রাগী গলায় বলল, 'এ কী পড়াশোনার কায়দা? শুয়ে শুয়ে পড়া হয়? ওঠ এক্ষুনি। উঠে বসে পড়।'

মানা অতি বিরক্তির সঙ্গে উঠে বসল। কর্ণিকা তক্তাপোষের ওপর বসে ভাইয়ের পিঠে হাত রাখল। নরম গলায় বলল, 'জানিস, মানা, অফিসে আমার প্রোমোশন হয়েছে। কাজ বেড়েছে।'

মানা বলল, 'খুব ভালো হয়েছে। কাজ যখন বেড়েছে নিশ্চয় এবার থেকে দেরি করে বাড়ি ফিরবি। বাঁচা যাবে। আমিও শুয়ে শুয়ে পড়তে পারব। এসে খিটখিট করবি না।'

এখন কর্ণিকা দাঁড়িয়ে আছে বাথরুমে। শাওয়ারের তলায়। একটু পরেই অফিসের গাড়ি চলে আসবে। মানার কথাটা মনে পড়ায় হাসি পেল। যার যাতে সুবিধে। দিদি দেরি করলে পড়ায় ফাঁকি দেওয়া যাবে।

boierpathshala.blogspot.com

একই সঙ্গে রাতের স্বপ্নটাও মনে পড়ে গেল কর্ণিকার। কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ওই স্বপ্নে অর্চিন তাকে আদর করেছে। সেই সময় তার গায়ে জামাকাপড় কিছু ছিল না। ঠিক এখনকার মতো। মাগো!

কর্ণিকা বাথরুমে দরজায় ঝোলানো তোয়ালের দিকে হাত বাড়াল।

চব্বিশ

মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে
ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না–
ওই যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি।।
শুনেছি কোন কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে
ওগো তোরা জানিস যদি আমায় পথ বলে দে।।
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আমি তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।।

বাঁশিতে রবিঠাকুরের এই গান পুরোটা বাজানোর পর বংশীবাদক এখন খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে লুচি-আলুরদম খাচ্ছে। পাশে রসগোল্লার রসভর্তি ছোট একটা বাটি। মেঘবতী প্রথমে বাটিতে দুটো রসগোল্লা দিয়েছিল। বংশীবাদক বলেছে, 'মা, রসগোল্লা নিয়ে যাও, শুধু রসটা থাক। শেষ পাতে চুমুক দিতে খাব।'

'সে কী! আপনি শুধু রস খাবেন! একটা মিষ্টি অন্তত নিন।'

বংশীবাদক হেসে বলল, 'রসের থেকে বেশি মিষ্টি আর কী আছে মা? রসই তো মিষ্টির প্রাণ। তুমি আমাকে শুধু রসই দাও। আমি ভিখিরি মানুষ, রসেই আমি খুশি।'

মেঘবতী কথা বাড়ায়নি, বাটি থেকে রসগোল্লা সরিয়ে নিয়েছে। আসলে মেঘবতী চিন্তিত। এই লোক বাঁশি ভালো বাজালেও ঝামেলা করবে বলে মনে হচ্ছে। কাকভোরে বাঁশি বাজিয়েছে। ঘুম ভেঙে গেছে। একদিন-আধদিন বাঁশির সুরে ঘুম ভাঙলে ভালো লাগে। রোজ হলে মুশকিল। সুন্দর ভাব নষ্ট হয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক। মেঘবতীর এক বন্ধু গড়িয়ার কাছে থাকে। একটু ভিতর দিকে। ওদিকটায় এখনও কিছু কিছু পুকুর-দীঘি, গাছপালা রয়েছে। পাখিও আছে। পাখিরা সারাদিনই ডাকাডাকি করে। শুনতে ভালোই লাগে। হঠাৎই একটা কোকিল খুব ঝামেলা শুরু করল। রাত একটা-দুটোতে 'কুহু কুহু' শুরু করল। এক-আধবার ডাক নয়। একটানা ডাক। নি:শব্দ গভীর রাতে সেই ডাক তীক্ষ্ণ হয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। প্রথম দিন কোনওরকমে মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু পরদিনও যখন এক কাণ্ড, তখন অসহ্য মনে হল। ইচ্ছে করল, গিয়ে কোকিলের গালে ঠাঁটিয়ে দুটো চড় লাগাই। মাঝরাত কুহু শোনানোর সময়? ইয়ার্কি হচ্ছে। কোকিলের কুহু কুহু ডাক যতই মিষ্টি হোক, রাত একটা-দুটোয় সেই ডাক ভয়াবহ। কাকের কা কা-এর থেকেও কর্কশ। মেঘবতীর বন্ধু জানলা আটকে সেই ডাক ঠেকাতে গেল। পারল না। কানে বালিশ চাপা দিল। তাতেও লাভ হল না। বাধ্য হয়ে জেগে বসে থাকতে হল গোটা রাত। এরকম প্রায় টানা সপ্তাহখানেক চলেছে। শেষের দিকে সারাদিন ধরে টেনশন হত। আজ রাতে কোকিলের ডাকে ঘুম ভাঙবে না তো? কোকিল-ফোবিয়া। বন্ধুদের একথা বলতে গিয়ে ঠাট্টা শুনতে হয়েছে। কোকিলের ডাক আবার খারাপ লাগে নাকি! নিশ্চয় মেয়েটা বানিয়ে বলছে। তাছাড়া, কোকিল মাঝরাতে ডাকবে কেন? সে ডাকবে সকালে আর বিকেলে।

boierpathshala.blogspot.com

সঙ্গীকে ডাকবে। মন ভালো করে দেবে। এই কোকিলের নিশ্চয় মাথায় গোলমাল হয়েছে। মেঘবতীর সেই বন্ধুকে কেউ ঠাট্টা করে বলল, 'তুই বরং ওকে সাইকায়াট্রিস্ট দেখা।' কেউ বলল, 'তুইও জানলা খুলে কোকিলকে পালটা গান শোনা। এক হাতে কান চেপে গলা খুলে গান ধরবি। কোয়েলিয়া গান থামা এবার, তোর এই কুহুতান ভালো লাগে না আমার...। দেখবি পাখি ঘাবড়ে গিয়ে উড়ে গেছে।'

ঠাট্টা হোক, আর যাই হোক, কোকিলের মিষ্টি ডাকও অসময়ে অত্যাচারের মতো লাগে। বাঁশিও তাই হবে। আশপাশের বাড়ি থেকে অবজেকশন দেবে। এই জন্য মেঘবতী চিন্তিত। তবে তার থেকে অনেক বেশি চিন্তা হচ্ছে জ্যোতিষ্ককে নিয়ে। সে বংশীবাদককে পেয়ে কেমন যেন গলে মতো পড়ছে। তার মুগ্ধভাবে বাড়াবাড়ির লক্ষণ। বলছে, সেরকম বুঝলে নাকি বাঁশিওয়ালার সঙ্গে ঘর ছাড়বে। প্রথমে মনে হয়েছিল, রসিকতা করে বলছে। তার স্বামীর রসবোধ আছে। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, রসিকতা নয়, কথাটার মধ্যে কোথাও এক ধরনের সত্যি সত্যি ভাব আছে। তবে ভয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে গুপির মা।

'এইসব মানুষকে ঘরবাড়িতে রাখা ভালো নয় বউদি।'

মেঘবতী ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'ভালো নয়? কেন? কী হয়েছে?'

গুপির মা ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। সেই কাজ বন্ধ না করে সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'সবের কি কারণ থাকে বউদি? দুনিয়া দুই রকম জিনিসে ঠাসা। তার কিছু জিনিস ভালা, কিছু জিনিস ভালা নয়। বুঝেসুঝে চলতে হয়। এইটা যেমন ভালা নয়।'

মেঘবতী বলল, 'কী সুন্দর বাঁশি বাজায়, তার পরেও তুমি এসব বলছ গুপির মা?'

'এমনি এমনি বলছি না বউদি। এই মানুষ ঘরবাড়ির মানুষ নয়, এই মানুষ হল পথের মানুষ। ঘরের মানুষকে যদি পথে রাখেন, সে যাবে নষ্ট হয়ে। তেমন পথের মানুষকে ঘরে রাখলেও এক ঘটনা। সে নষ্ট হবে।'

মেঘবতীর মনে মনে খুঁতখুঁতানি হচ্ছিলই। গুপির মায়ের কাছ থেকে আরও কথা শুনতে চাইল।

'আমরা কি জোর করে ধরে রেখেছি। তার ইচ্ছে হয়েছে তাই আছে। ইচ্ছে না হলে থাকবে না। অমন একটা ধেড়ে লোককে আমরা নষ্ট করবার কে?'

গুপির মা এই বাড়িতে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত থাকে। তবে কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ। গোটা ঘরে হয়তো ঝাঁটা বুলিয়ে চলে গেল, ধুলো পড়ে থাকল আগের মতো। টেবিল মুছল ঠিকই, কিন্তু হলুদের দাগ রয়ে গেল এক কোণায়। ভেজানো কাপড়-জামার আদ্দেকটা কাচল, আদ্দেকটা ফেলে রাখল পরের দিনের জন্য। মেঘবতীকে কঠিন নজর রাখতে হয়। এই আলোচনার সময় কঠিন নজর রাখতে পারল না। গুপির মা দার্শনিক প্রসঙ্গ তুলে তাকে অন্যমনস্ক করে ফেলেছে। টেবিল-চেয়ারের তলা পর্যন্ত তার ঝাঁটা পৌঁছল না।

'অতসব জানি না বউদি। তবে এটুকু জানি, এসব মানুষ ঘরে থাকলে নিজে নষ্ট হয়, সংসারের ক্ষতি করে।'

মেঘবতী চোখ বড় করে বলল, 'কী ধরনের ক্ষতি করে?'

এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গুপির মা গলা নামিয়ে বলল, 'দাদাকে বুড়োটার কাছে অত ঘুরঘুর করতে দেবে না বউদি। এরা ভালোমানুষ বশ করতে পারে। ভিখিরি ফকির মানুষ, মন্ত্র-টন্ত্র, ঝাঁড়ফুক জানে।'

মেঘবতী নড়েচড়ে বসল। সে এসব কুসংস্কারে মোটে বিশ্বাস করে না। বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিল। বাপেরবাড়ি, শ্বশুরবাড়ি কোথাও তাবিজ-মাদুলির ব্যাপার নেই। কিন্তু এখন নিজেকে কেমন দুর্বল লাগছে। ঘটনা সত্যি নয়তো? জগতে কত কিছুই তো থাকে। সব কি যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করা যায়?

গুপির মা চিন্তিত মুখে বলল, 'কে জানে, ওই লোক এতক্ষণে দাদাবাবুকে বশটশ কিছু করে বসেছে কিনা। যেভাবে এ বাড়িতে জাঁকিয়ে বসেছে, তাতে তো মনে হচ্ছে, একটা কিছু ঘটেছে! নইলে পথের ভিখিরি নোংরা জামাকাপড় পরে খাটে বসে লুচি খায়?'

boierpathshala.blogspot.com

মেঘবতী মন শক্ত করল। বলল, 'বাজে কথা বোলো না। লোকটার গুণ দেখনি? কেমন সুন্দর বাঁশি বাজায়। এরা হল শিল্পী মানুষ। এদের তোয়াজ করতে হয়। তাছাড়া তোমার দাদাবাবু ছেলেমানুষ নয়। তুমি থামো দেখি। ওই লোক তো পাকাপাকি এখানে থাকতে আসেনি, কাল-পরশুই চলে যাবে। তার নিজের দেশের বাড়ি নেই নাকি?'

গুপির মা ফোঁস করে নি:শ্বাস ফেলে বলল, 'কিছু না হলেই ভালো। তবে যতক্ষণ না ওই বুড়ো বাড়ি থেকে যায়, সাবধানে থাকবে বউদি।'

মেঘবতী এতে আরও ঘাবড়ে গেল। গুপির মা এসব বলছে কেন? ভয় দেখাচ্ছে? কীসের ভয়? সে তো জানে না, জ্যোতিষ্ক এই লোকের সঙ্গে ঘর ছাড়বে বলে প্ল্যান করছে। তাহলে? বোনকে ফোন করে দুশ্চিন্তার কথা জানাতে গেল মেঘবতী। বারিধারা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছে। বংশীবাদককে খাবার দিয়ে ওপরে চলে এসেছে। তার কান্না পাচ্ছে। খানিকটা কেঁদে নিলে কি টেনশন কমবে? একটাই নিশ্চিন্তি, তার কান্না পাচ্ছে মানে ঘটনা সিরিয়াস নয়। কেস হিস্ট্রি বলছে, সিরিয়াস ঘটনায় তার কখনও কান্না পায় না। যতসব ছোটখাটো গুরত্বহীন বিষয়েই তার চোখে জল আসে।

নীচের গেস্টরুমে তখন অন্য দৃশ্য।

জ্যোতিষ্ক চেয়ার টেনে খাটের পাশে বসে আছে। এতক্ষণ সে আপ্লুত হয়ে বাঁশি শুনছিল, এখন মুগ্ধ হয়ে বংশীবাদকের খাওয়া দেখছে।

একটু আগে বাঁশিতে যে গান বংশীবাদক বাজিয়ে শোনাল, সেটা যে প্রায়ই শোনা যায় এমন নয়। 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে' এ গানটা জ্যোতিষ্ক আগে শুনেছে কিনা, মনে করতে পারল না। গানের কথাও তার জানা নেই। বংশীবাদক বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার আগে তার ঝোলা থেকে একটা জীর্ণ খাতা বের করে। গেরুয়া কাগজ দিয়ে মলাট দেওয়া। জ্যোতিষ্কের দিকে এগিয়ে বলল, 'নিন, ষোলো নম্বর পাতাটা খুলুন।' খাতা হাতে নিয়ে জ্যোতিষ্ক বলল, 'কী আছে?'

'আমি যে গানটা এখন বাজাব, সেটা আছে। আপনার চোখের সামনে কথাগুলো থাকলে শুনতে ভালো লাগবে।'

জ্যোতিষ্ক হেসে বলল, 'থাক, আমার কথা লাগবে না, আপনার বাঁশিই সুন্দর।'

বংশীবাদক বলল, 'যে সুরে কথা আছে সেখানে কথাও সুন্দর। তাছাড়া এই গানটা রবি ঠাকুরের। তার গানের কথা না শুনলে সুর অসম্পূর্ণ থাকে। এই কারণেই তো আমি ওঁর গান বিশেষ বাজাতে চাই না। শুধু সুর দিয়ে কথার আনন্দ, যন্ত্রণা, গভীরতা আর কতটা ফুটিয়ে তোলা যায় বলুন। কেউ হয়তো পারেন, আমি তাদের মতো গুণী নই। নিন, গানটা বের করুন।'

বংশীবাদক লুচি খাওয়া শেষ করে রসের বাটিতে ছোট একটা চুমুক দিল।

জ্যোতিষ্ক বলল, 'আপনি বাঁশি কোথা থেকে শিখেছেন?'

'মাঠেঘাটে। ওই যে বললাম, পেটের তাগিদে বাঁশি বানাতাম। তখনই শিখতে হয়েছে। নিজে না জানলে যে ভালো জিনিস বানানোই যাবে না। খানিকটা নিজে শিখেছি, খানিকটা একে ওকে ধরে শিখেছি।'

জ্যোতিষ্ক উৎসাহ নিয়ে বলল, 'বাঁশি কীভাবে বানাতে হয়?'

বংশীবাদক সামান্য হেসে বলল, কতরকম বাঁশি আছে, একেকটা একেকরকম ভাবে বানাতে হয়।'

জ্যোতিষ্কর এই বিষয়টাও জানা ছিল না। অনেকরকম বাঁশি আছে! সে জানত, বাঁশি একরকমই। মোটাসোটা, গোলগাল। ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। বড়রা পাশ থেকে ফুঁ দেয়। কমবয়সিরা সামনে থেকে ফুঁ দেয়। হারমোনিয়ামের রিডের মতো ফুটো খুলে বন্ধ করে সুর বের করতে হয়। সে বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, 'বাঁশি অনেকরকম হয় বুঝি!'

বংশীবাদক বলল, 'অবশ্যই অনেকরকম। আড় বাঁশি, কদ বাঁশি, সরল বাঁশি, হরিণা বাঁশি, টিপরা বাঁশি, লয়া বাঁশি, মুখ বাঁশি, ভুয়াং বাঁশি, মোহন বাঁশি। হরিণ বাঁশি নামটা সুন্দর নয়? অতি সুন্দর। বাঁশের কঞ্চি

boierpathshala.blogspot.com

দিয়ে তৈরি করতে হয়। প্রায় নয় থেকে দশ ইঞ্চির মতো লম্বা হয়। নীচ পর্যন্ত দুভাগে ভাগ করা থাকে। ফুটোর কোনও বলাই নেই। এতে ফুঁ দিলে হরিণ শাবকের ডাকের মতো এক ধরনের আওয়াজ হয়। হরিণ শিকারের কৌশল হিসেবে একসময় এই বাঁশি ব্যবহার হত। এখন তো সে পাট চুকে গেছে। তবে এখনও বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় এই বাঁশি পাওয়া যায়।'

জ্যোতিষ্ক অস্ফুটে বলল, 'ইন্টারেস্টিং। আপনি কি এই বাঁশি বানাতে পারেন?'

বংশীবাদক রসের বাটিতে আর একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'না, পারি না। তবে এরকম সুন্দর বাঁশি আরও আছে। যেমন ধরুন পাতা বাঁশি। তালপাতা দিয়ে এই বাঁশি বানাতে হয়। গ্রামের দিকের ছেলেপিলেরা বাজায়। একটা পাতা দু'ভাঁজ করে করে কলম কাঁটার মতো করে আগাটা একটু কেটে নিতে হয়। পরের পাতাকে কেন্দ্র করে পাতা জড়াতে জড়াতে আস্তে আস্তে বন্ধ করতে হয়। ওই ছোট মুখে ফুঁ দিলেই বাঁশি বেজে ওঠে। তবে পাতা বাঁশি দিয়ে নিখুঁত বা মধুর সুর তৈরি করা সম্ভব নয়।'

কথা শেষ করে খাট থেকে নেমে পড়ল বংশীবাদক।

'যাই, হাতটা ধুয়ে আসি। স্যর, আপনি বরং একটা কাজ করুন। আমার ঝোলাটার মধ্যে একটা বই আছে। বাঁশি বিষয়ক বই। বইটা নিন। পড়ে দেখুন।'

জ্যোতিষ্কও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'অবশ্যই পড়ব। কিন্তু আপনি এখনও আমাকে স্যর বলছেন কেন? আমি তো আপনাকে বলেছি...'

বংশীবাদক হাত তুলে থামিয়ে বলল, 'আমি জানি, ওইসব প্রথাগত সম্বোধনে আপনি আগ্রহী নন। প্রথম দিনই বুঝেছিলাম। যেদিন আপনার সঙ্গে ভবানীপুরের চায়ের দোকানে আলাপ হয়েছিল, সেদিনই আপনাকে চিনেছি। তবু আপনি কত বড় সরকারি অফিসার! পদের মর্যাদা বলে তো একটা ব্যাপার আছে।'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'বাড়িতে আবার পদ কী? না না, দয়া করে আপনি আমাকে আর স্যর ডেকে বিড়ম্বনায় ফেলবেন না। এটাই আমার অনুরোধ।'

বংশীবাদক হাসতে হাসতে বলল, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন। আপনি আগে বইটা উলটে পালটে দেখুন। আপনার বাঁশি সম্পর্কে আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

জ্যোতিষ্ক এবার ঝট করে বলে ফেলল, 'আচ্ছা, আমি বাঁশি শিখতে পারি না?'

বংশীবাদক দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

'কেন পারবেন না? অবশ্যই পারবেন।'

জ্যোতিষ্ক লজ্জা পাওয়া মুখে বলল, 'আসলে বয়স হয়ে গেছে তো। এই বয়সে নতুন করে কিছু শেখা...।'

'বাঁশি বাজানো তো ফুটবল খেলা নয় স্যর। বয়স হলে দৌড়তে পারবেন না সেই সমস্যা নেই।'

জ্যোতিষ্ক নিজের ঘরে গিয়ে খবরের কাগজের মলাট দেওয়া বই খুলল। বইটি তাঁতঘর নামে এক পতিতার বাঁশি বিষয়ক সংকলন। খুবই আশ্চর্য লাগছে, ভিখিরি মানুষটা শুধু বাঁশি বাজাতে পারে না, পড়াশোনাও করে। বইয়ের একটা পাতায় চোখ পড়ল। লেখা আছে—বাঁশির সবথেকে বড় পরিচয় হল তার অন্তরটি অন্ত:সারশূন্য। যার অর্থ, সে অহমিকাহীন। কামনা-বাসনায় শূন্যতার বৈভবে সে রসময়। যে একটি বিশুদ্ধ পাত্র বা আধার। বাঁশি শূন্য, তাই সে পূর্ণ হয়ে যায় রসিকজনের প্রসন্ন শব্দময় ধ্বনিতে।

জ্যোতিষ্ক অস্ফুটে বলল, 'আহা!'

জ্যোতিষ্কর এই 'আহা!' উচ্চারণের কিছুক্ষণের মধ্যে এ বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটল।

তখন জ্যোতিষ্ক অফিসে। মেঘবতীও বাইরে। বংশীবাদকের জন্য জামাকাপড় কিনতে বেরিয়েছে। নোংরা পোশাকে তাকে বেশিক্ষণ বাড়িতে অ্যালাও করা যাচ্ছে না। সেই কারণেই খুব বিরক্তির সঙ্গে গড়িয়াহাটে গেছে। পায়জামা, পাঞ্জাবি কিনবে। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি ফিরে মেঘবতী দেখে, গোটা বাড়ি লণ্ডভণ্ড। বেডরুমের আলমারি ভাঙা। কাপড়জামা, টাকা পয়সা, গয়নাগাঁটি কিচ্ছু নেই। এরও মিনিট পনেরো বাদে গোঁ

boierpathshala.blogspot.com

গোঁ আওয়াজ শুনে একতলার রান্নাঘরে গুপির মাকে পাওয়া গেল। তার হাত পা এবং মুখ বাঁধা। বাঁধার কাজ করা হয়েছে তারই শাড়ি খুলে নিয়ে। তার পরনে শুধু ব্লাউজ আর সায়া।

গেস্টরুমে বংশীবাদক নেই। তার ঝোলা নেই। বিছানার ওপর একটা বাঁশি পড়ে আছে শুধু।

পঁত্রিশ

বারিধারার দিকে তাকিয়ে কমলকান্তি সেন মুচকি মুচকি হাসছেন।

হাসবারই কথা। খানিক আগে তিনি নাতনিকে মারাত্মক একটা প্ল্যান বাতলেছেন। এমন প্ল্যান যে বারিধারার মতো সাহসী মেয়েও চমকে গেছে। তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। চোখ হয়ে গেছে বড় বড়। কমলকান্তির মনে হল, অবাক হওয়ার কারণে তার ছোট নাতনিকে বেশি সুন্দর লাগছে।

নাতনিদের সৌন্দর্যের ব্যাপারে কমলকান্তি চিরকালই বাড়াবাড়ি ধরনের দুর্বল। তার বিশ্বাস, তাঁর দুই নাতনি পৃথিবীর এক নম্বর এবং দু'নম্বর সুন্দরী। কে 'এক' আর কে 'দুই' চট করে বলা যাবে না। একেক সময় একেক জন। এই জিনিস তিনি আজ হঠাৎ করে মনে করছেন না। নাতনিদের জন্মের পর থেকেই মনে করছেন। মেঘবতী হওয়ার পর নার্সিংহোমে নাতনিকে দেখে বাড়ি ফিরে ঘোষণা করেছিলেন, 'দুনিয়ার সবথেকে সুন্দরী মেয়ে সেনবাড়িতে জন্ম নিল। রূপে এই মেয়েকে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। এরপর যখন বারিধারা হল, তখন বললেন, 'এতদিনে আমার বড় নাতনিকে টক্কর দেওয়ার মতো একজন সুন্দরীকে পেলাম। ব্যাপারটা ওয়ান সাইডেড হয়ে যাচ্ছিল। একতরফা কোনও কিছুই ঠিক নয়। এখন কে বেশি সুন্দর তাই নিয়ে দুই বোনে লড়াই হবে মনে হচ্ছে।'

স্বাভাবিকভাবেই এই কথায় সবাই হাসাহাসি করত। বলত, নাতনিদের নিয়ে দাদুর বাড়াবাড়ি। মেঘবতী, বারিধারাও মজা পেত। ছোটবেলায় তারা দাদুর কাছে এসে বলত, 'আমাদের মধ্যে কে বেশি সুন্দর দাদু?'

কমলকান্তি চোখ-নাক কুঁচকে চিন্তার ভাব করতেন। বলতেন, 'একটু পরে বললে হবে? বিষয়টা জটিল। ভাবনাচিন্তার জন্য সময় লাগবে।'

মেঘবতী কাঁদো কাঁদোভাবে বলত, 'না, এখনই বলতে হবে।'

বারিধারা ঠোঁট উলটে কান্না কান্না গলায় বলত, 'দিদি আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে। বলছে ও নাকি আমার থেকে বেশি সুন্দর। বড় হয়ে আমরা যখন বিউটি কনটেস্টে নাম দেব ও মিস ইউনিভার্স হবে।'

মেঘবতী তেড়েফুঁড়ে বলত, 'অবশ্যই আমি বেশি সুন্দর। আমার গায়ের রং ফর্সা।

বারিধারা বলত, 'আমার নাক টিকোলো, গালে টোল, চোখ টানা। সেটা কিছু নয়?'

কমলকান্তি হাত তুলে বলতেন, 'দুজনেই সুন্দর।'

মেঘবতী গোঁ ধরে বলত, 'তা বললে চলবে না দাদু। ঠিক করে বলতে হবে।'

কমলকান্তি হেসে বলতেন, 'আমার চোখে তো দুজনেই সমান রূপসি। পৃথিবীর রূপসিরা ডানাকাটা পরি হয়, আমার দুই নাতনির অদৃশ্য ডানা আছে। তোমরা যদি চাও আমি রাংতা দিয়ে তোমাদের জন্য ডানাও বানিয়ে দিতে পারি।'

বারিধারা দাদুর গলা জড়িয়ে বলত, 'এসব তোমার ফাঁকিবাজির কথা দাদু। তুমি আগে বলো, আমাদের মধ্যে কে বেশি সুন্দর।'

কমলকান্তি তখন দুই নাতনিকে আদর করে দুপাশে বসাতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, 'মানুষ কি গায়ের ফরসা রং, টিকোলো নাক, টানা টানা চোখ দিয়ে সুন্দর হয়? মোটেও নয়। ওসব তো বাইরের ব্যাপার। তোমরা যখন বড় হবে তখন দেখবে বাইরের রূপ রং-চং দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায়। আর ক'টা দিন বাদে আমি যখন ফোকলা হয়ে যাব, বাঁধানো দাঁত লাগিয়ে ঘুরে বেড়াব। সবাই বলবে, আরে বাবা! বুড়োমানুষটার কী সুন্দর দাঁত! কথাটা তো ঠিক নয়। ওটা তো নকল দাঁত। কেউ বুঝতে পারে না, ঠকে যায়।

boierpathshala.blogspot.com

ভুল বিচার করে। আসলে মানুষ সুন্দর হয় ভিতর থেকে। যে মানুষের ভিতরটা যত ভালো, সে তত সুন্দর। এই সৌন্দর্য রং-চং দিয়ে বানানো যায় না। মনের ভিতর থেকে আলো জ্বালাতে হয়। আমি যে আমার দুই নাতদিকে সুন্দর বলি সে কি তাদের গায়ের রং বিচার করে বলি? একেবারেই নয়। আমি দেখতে পাই আমার দুই নাতনির মনের ভিতরটা আলো ঝলমল করছে। ভালো হওয়ার আলো। আর সেই কারণেই তারা সবথেকে সুন্দর। যত বড় হবে ভিতরের ভালোটাকে যত্ন করে ধরে রাখবে। দেখবে কোনওরকম রং-চং, মেকাপ ছাড়াই সুন্দর হয়ে গেছ। শুধু বিউটি কনটেস্ট নয়, পৃথিবীর সব কনটেস্টেই তখন জিতে যাবে। সবাই বলবে, এই মেয়ে দুটো সবথেকে সুন্দর। মনে রাখবে, মানুষ অতি অভাগা। সে 'সুন্দর' শব্দটার মানে ঠিকমতো বুঝতে পারে না। যদি বুঝতে পারত, পৃথিবীটা মাঝে মাঝে এত খারাপ হত না।'

দুই বোন অবাক হয়ে দাদুর কথা শুনেছিল। বেশিটাই বুঝতে পারেনি। তবে ভালো লেগেছিল। বারিধারা বলেছিল, 'দাদু, মনের ভিতরে আলো কী করে জ্বালাতে হয়?'

কমলকান্তি বললেন, 'ওই যে বললাম, ভালো হয়ে। মানুষ হয়ে।'

মেঘবতী বলল, 'ভালো মানে কি শান্ত মেয়ে? মা যে বলে, শান্ত মেয়েরা ভালো।'

কমলকান্তি দরজার দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'মাকে যদি না বলিস তো তা হলে একটা কথা বলব।'

বারিধারা দাদুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বলো।'

কমলকান্তি বললেন, 'সবসময় শান্ত হলে ভালো হওয়া যায় না। যেখানে অশান্তি দরকার সেখানে গোলমাল পাকাতে হবে। দুষ্টুমি করতে হবে।'

ভালো হতে গেলে অশান্ত হতে হয়, গোলমাল পাকাতে হয়, দুষ্টুমি করতে হয় এমন কথা দুই বোন সেই বয়সে শোনেনি। বরং সবসময়ে উলটোটাই জেনেছে। তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

মেঘবতী চোখ বড় করে বলল, 'কীরকম গোলমাল দাদু?'

বারিধারা ফিসফিস করে বলে, 'চিৎকার?'

কমলকান্তি গল্প বলবার ঢঙে বললেন, 'অবশ্যই চিৎকার করতে হবে। সেরকম হলে দু-ঘা দিতেও হবে।'

মেঘবতী ছোটবেলা থেকেই শান্ত। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'কাকে দু-ঘা দিতে হবে দাদু?'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'কাকে দিতে হবে নিজেরাই বুঝতে পারবে। যত বড় হবে বুঝতে পারবে, চারপাশে দু-ঘা দেওয়ার মতো অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যায় দেখলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। হাত-পা চালাতেও হবে। অন্যায় দেখে মুখ বুজে থাকলে ভালো হওয়া হবে না। তখন আর তোমাদের কেউ সুন্দরও বলবে না। সে যতই ফরসা হও আর যতই চোখ টানা টানা হোক।'

বড় হওয়ার পর দুই বোন 'সুন্দর' হওয়ার কথা মনে রাখেনি, তবে দাদুর 'দু-ঘা'-র কথা মনে রেখেছে। বাসে, ট্রামে, বাজারে কেউ অসভ্যতা করলে 'দু-ঘা' দিতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করেনি। তবে একবার লজ্জায় পড়েছিল। অমনটা যে ঘটতে পারে ভাবতেও পারেনি।

মেঘবতীর তখনও বিয়ে হয়নি। এক বিকেলে এসপ্ল্যানেড যাচ্ছিল মেট্রোতে। ভিড় বিশেষ ছিল না। তাও পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রসভ্য দেখতে বয়স্ক একজন বারবার ঘেঁষে আসে এবং নানা কায়দায় গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। মেঘবতী সরে গেলে লোকটাও সরে আসে। কয়েকবার কড়া চোখে তাকায় মেঘবতী। চাপা ধমকও দেয়।

'ঠিক করে দাঁড়ান।'

ধমকের কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লোকটি মেঘবতীর ডানদিকের বুকে হাত দিয়ে বসে। হাত সরিয়ে নেওয়ার ফাঁকেই ঘুরে দাঁড়ায় মেঘবতী। তার মাথায় আগুন ধরে যায়। লোকটাকে খপ করে চেপে ধরে হাত মুচড়ে ধরে। টি শার্ট, জিনস পরা শান্ত মুখের সুন্দরী এরকম একটা কাজ করতে পারে লোকটার সম্ভবত ধারণা ছিল না। সে হকচকিয়ে যায়। তারপর যথারীতি কাঁউমাঁউ করে ওঠে।

boierpathshala.blogspot.com

'ব্যাপারটা কী? আমার হাত ধরেছেন কেন?'

মেঘবতী দাঁত চেপে বলে, 'ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছেন না?'

লোকটা চোখ পাকিয়ে বলে, 'হাত ছাড়ুন। ভালো হবে না বলছি।'

মেঘবতী দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'হাত ছাড়া ছিল বলে আপনি এতক্ষণ কী করছিলেন?'

বয়স্ক হম্বিতম্বি করে বলল, 'আপনি ভুল করছেন। ভিড় ট্রেনে উঠলে অমন হতেই পারে...আপনি হাত ছাড়ুন...আপনি মিথ্যে অভিযোগ করছেন...।'

মেঘবতী বলে, 'আপনি ইনটেনশনালি বারবার আমার গায়ে হাত দিচ্ছিলেন। আমি আপনাকে সতর্ক করি, তারপরেও করেছেন।' বলতে বলতে হাতটা আরও জোরে মুচড়ে ধরে মেঘবতী। বলে, 'বলুন দিচ্ছিলেন কি না। সবার সামনে স্বীকার করুন।'

ট্রেনের যাত্রীকুল ততক্ষণে মজা পেয়ে গেছে। তারা নানারকম মন্তব্য করতে শুরু করে। তড়পাতে থাকে।

'কান ধরে ওঠবোস করান।'

'পুলিশের হাতে দিন।'

'পুলিশকে দিয়ে কী হবে? দশ টাকা পকেটে গুঁজে ছাড়া পেয়ে যাবে।'

'বরং সবাই মিলে চাঁদা করে পেটানো উচিত।'

মেঘবতী পাত্তা দেয় না। এ সব সময়ে যারা বেশি হম্বিতম্বি করে তারা এই ধরনের কাজ বেশি করে। সে লোকটার হাত মুচড়ে বলে, 'আগে স্বীকার করুন অন্যায় করেছেন, তারপর আপনার হাত ছাড়ব।'

বয়স্ক লোকটা খানিকটা বেঁকে দাঁড়িয়ে 'আ', 'উ' করতে থাকে।

'খুব ভালো হয়েছে মেয়ে।'

'ছাড়বেন না দিদি।'

'আরও জোরে মোচড় দাও বোনটি।'

'এ সব লোকের হাত ভেঙে দেওয়া উচিত ম্যাডাম।'

অন্যদের মন্তব্য তখন মেঘবতীর কানে ঢুকছে না। রাগে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। তার জেদ চেপে গেছে। এত বড় সাহস! লোকটাকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করিয়ে তবে ছাড়বে। এর মাঝেমাঝেই ট্রেন এসে স্টেশনে দাঁড়ায়। কামরার দরজা খুলে যায়। কয়েকজন নামলে, উঠেও আসে বেশ কয়েকজন। তাদের মধ্যে একদল কমবয়সি ছেলেমেয়ে রয়েছে। ট্রেন ছাড়লে তারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। একটি শাড়ি পরা মেয়ে সিট খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসে। মেয়েটির বয়স মেঘবতীর কাছাকাছি। হঠাৎই তার চোখ পড়ে মেঘবতীদের দিকে। দৃশ্যটা দেখে থমকে দাঁড়ায়। সামনের সিট থেকে একজন চাপা গলায় হেসে ওঠে।

'বেটা মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ার সাজা পাচ্ছে। সত্যি কথা না বলা পর্যন্ত সাজা চলবে।' মেয়েটি বিস্ফারিত চোখে লোকটির দিকে তাকায়। বয়স্ক লোক মুখ নামায়। মেয়েটির কাঁধে একটা হালকা নীল রঙের শান্তিনিকেতনি ব্যাগ ছিল। সে ব্যাগটা চেপে ধরে। মেঘবতীর উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলে, 'কী হয়েছে?'

মেঘবতী হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'কী আর হবে, এই ধরনের নোংরা লোক বাসে-ট্রামে-ট্রেনে যা করে। ভদ্র পোশাকে থাকে, সুযোগ পেলে মেয়েদের গায়ে হাত দেয়। তারপর ছুঁচোর মতো অস্বীকার করে। তবে এই লোক যতক্ষণ না সবার সামনে অপরাধ স্বীকার করছে ততক্ষণ ছাড়ব না।'

মেয়েটি মাথা নামিয়ে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'দিদি, এই ভদ্রলোক আমার বাবা। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ওকে অপরাধ স্বীকার করতে বলছি।'

মেয়েটি বয়স্ক লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, তুমি অপরাধ স্বীকার করো।'

এবার মেঘবতীর কেঁপে ওঠবার পালা ছিল। এমন একটা বিশ্রী ঘটনা যে এরকম নাটকীয় মোড় নেবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। গল্প-উপন্যাসেও এরকম শোনা যায়নি। তার বয়সি এই ফুটফুটে মেয়েটি এই নোংরা

boierpathshala.blogspot.com

লোকের মেয়ে! মেঘবতী দ্রুত লোকটির হাত ছেড়ে দেয়। বিব্রত ভঙ্গিতে বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে...আমি ঠিক বুঝতে পারিনি....ঠিক আছে আপনি যান...।'

মেয়েটি কঠিন গলায় বলে, 'কিছুই ঠিক হয়নি। বাবা, তুমি অপরাধ স্বীকার করো। ওর সামনে বলো, তুমি কী বিশ্রী কাজ করেছ। বলো তুমি।'

কাছে থাকা যেসব যাত্রী ঘটনা পুরো দেখেছে তারা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। মেঘবতী অস্বস্তিতে পড়ে। সে আবার বলে, 'ঠিক আছে বললাম তো। কিছু বলতে হবে না। যান স্টেশন এসে গেছে, নেমে যান।'

মেয়েটির শান্ত মুখে যেন আগুন লেগেছে। রাগে-অপমানে-দু:খে লাল হয়ে সে এগিয়ে গিয়ে লোকটির হাত ধরে। চাপা গলায় বলে, 'বাবা, আগে তুমি সবার সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করো। তারপর গাড়ি থেকে নামবে।' বলতে বলতে মেয়েটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

ঘটনাটা মেঘবতী অনেকদিন পর্যন্ত মনে রেখেছিল।

আজকের ঘটনা বারিধারা মনে রাখবে। খানিকক্ষণ 'হাঁ' অবস্থায় থাকবার পর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কিন্তু দাদু...।'

কমলকান্তি ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে হাত তুললেন।

'আর কিন্তু নয় বৃষ্টি। এবার তোমার ব্যাপার। তোমার এই মধুজা ম্যাডাম, তার বন্ধু মানিনী আর ওই বদ ছেলেটা, কী যেন নাম বললে ছোকরার? দর্শন না সুদর্শন কী যেন? যে নামই হোক, এদের শায়েস্তা করবার জন্য তোমাকে প্ল্যান দিলাম। সেই প্ল্যান তুমি কাজে লাগাতে পারবে কি না সেটা তোমার ব্যাপার।'

বারিধারা বলল, 'সে তো বুঝলাম দাদু, কিন্তু...।'

কমলকান্তি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'আবার কিন্তু?'

বারিধারা হেসে ফেলল। বারিধারার সবথেকে বড় গুণ হল, টেনশনের মধ্যেও সুন্দর করে হাসতে পারে।

'আচ্ছা, আর কিন্তু নয়। তবে এমন মারাত্মক একটা প্ল্যান দেওয়ার জন্য তোমাকে কি আমি একটা হামি খেতে পারি?'

কমলকান্তি ফের ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। বললেন, 'না পারো না। কারণ তুমি এতক্ষণ নিজের কথা বললে, কিন্তু আমার ইম্পর্ট্যান্ট কথাটা শোনোনি।'

বারিধারা ঝুঁকে পড়ে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরল। হেসে বলল, 'কী কথা?'

ছাব্বিশ

কমলকান্তি সেন নাতনির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

বারিধারা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী হল দাদু, হাসছ কেন?'

কমলকান্তি বললেন, 'তোকে এমন একটা কথা বলব, তুই খুব খুশি হবি।'

বারিধারা বলল, 'ইউনিভার্সিটির ব্যাপার নিয়ে যা বললে তাতেই আমি খুশি। তোমার প্ল্যানটা কাজে লাগাতে পারলে ভালো হবে। সবাই জব্দ হবে।'

কমলকান্তি বললেন, 'এটা তার থেকে অনেক ভালো। ওটা তো শাস্তি, আর এটা হল পজিটিভ একটা বিষয়।'

বারিধারা চোখ বড় করে বলল, 'তাই নাকি! শুনি কী কথা!'

কমলকান্তি একটু চুপ করে রইলেন। গলা নামিয়ে বললেন, 'বৃষ্টি, আমরা যদি একটা স্কুল তৈরি করি কেমন হয়?'

বারিধারা খানিকটা থতমত খেয়ে গেল। একানব্বই বছরের একজন মানুষের মুখে এ কী কথা! স্কুল তৈরি করবে! বৃদ্ধ এই মানুষটির তো এখন শান্ত হয়ে অপেক্ষা করার সময়। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা। তিনি বলছেন,

boierpathshala.blogspot.com

নতুন কিছু করবেন! স্কুল গড়বেন! বারিধারা ঢোঁক গিলে বলল, 'আমরা করব? আমরা কারা দাদু?'

কমলকান্তি জ্বলজ্বলে চোখে বললেন, 'কেন? আমরা সবাই। এই আমি, তুই, মেঘ, জ্যোতিষ্ক, তোর মা, অর্চিন, আমাদের পরিচিত, বন্ধুবান্ধব সবাই তো আছে, আমরা কি কম লোক হলাম?'

বারিধারা ঘাবড়ে গেল। মানুষটার হঠাৎ হল কী! বয়স হয়েছে বলে দাদু ঝিমিয়ে পড়েনি ঠিকই, কিন্তু 'কিছু করা' থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে বহুদিন। এখন তার জীবনযাপন হল, খাব, ঘুমোব, নাতনিদের সঙ্গে গল্প করব আর বই পড়ব। ব্যস, এর বেশি নয়। এমনকী অফিসের কোনও কাজেও নাক গলায় না। বাবা বললেও নয়। তবে কি এখন চুপচাপ বসে এটাই চিন্তা করতেন?

বারিধারা নিজেকে সামলে বলল, 'স্কুল করবে? সে তো অনেক হ্যাপা।'

কমলকান্তি সেন উৎসাহ নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, স্কুল। সেখানে গ্রামের মেয়েরা পড়বে।'

বারিধারা বলল, 'গ্রামে তো স্কুল আছে দাদু। আজকাল প্রায় সব গ্রামেই স্কুল হয়ে গেছে। সেখানে মেয়েরা পড়ে। আজকাল গ্রামগঞ্জের ছেলেমেয়েরা কত ভালো রেজাল্ট করছে জানো? খবরের কাগজে বেরোয়। দরিদ্র ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় খুব সাইন করছে।'

কমলকান্তি বললেন, 'আমি জানি। তবে এটাও জানি, যত ছেলেমেয়ে পড়ছে তার থেকে বেশি ছেলেমেয়েরা পড়ছে না। বিশেষ করে মেয়েরা। গ্রামের দরিদ্র মেয়েদের স্কুল ড্রপ আউট ভয়াবহ জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। একটা সময়ের পর নিজেরাও যায় না, বাড়ি থেকেও যেতে দেয় না। কয়েক বছর আগে আমি একটি রিপোর্ট পড়েছিলাম। ভয় পেয়ে যাওয়ার মতো রিপোর্ট।'

বারিধারা বলল, 'তুমি কি তাদের সব ধরে ধরে এনে স্কুলে ভর্তি করবে ভেবেছ?'

কমলকান্তি সেন বললেন, 'এই স্কুলটা সেরকম হবে না বৃষ্টি, অন্যরকম হবে। এমন স্কুল যা আগে কখনও হয়নি। এখানে মেয়েদের ধরে আনতে হবে না, তারা নিজেরাই আসবে। তাদের বাড়ি থেকে পাঠাবে।'

বারিধারা আগ্রহ নিয়ে বলল, 'আগে কখনও হয়নি! সেটা কীরকম?'

কমলকান্তি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকালেন। তিনি যেন ছবির মতো তার স্বপ্নের স্কুলটা দেখতে পাচ্ছেন।

'এই স্কুলে বাঁধাধরা কোনও সিলেবাস থাকবে না। পরীক্ষা, পাস-ফেল—এ- সব থাকবে না। যেসব গরিব মেয়ে নিয়ম করে স্কুলে যেতে পারে না বা শুরু করেও স্কুল ছেড়ে চলে গেছে, যাদের বাড়ি থেকে পড়তে দেওয়া হয় না তারা এখানে পড়বে। ছোট, বড় সবাই পড়তে পারবে। বয়েসের বার থাকবে না।'

বারিধারা হেসে ফেলল। দাদুর গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'যারা ইচ্ছে থাকলেও পড়তে পারে না, তারা তোমার স্কুলে পড়তে আসবে কী কারণে?'

কমলকান্তি সোজা হয়ে বসলেন।

'আমরা ব্যবস্থা করব।'

বারিধারা হেসে বলল, 'কী ব্যবস্থা? ধরো, গ্রামের কোনও গরিব ফ্যামিলি চায় মেয়ে লেখাপড়া করবে না, বিয়ে করবে। তুমি কী করবে? পুলিশ দিয়ে স্কুলে ধরে আনবে?'

কমলকান্তি বললেন, 'সেটাই তো আমাদের স্কুলের আসল মজা হবে। আমাদের স্কুলে যে মেয়ে লেখাপড়া শিখবে সেই মেয়ের বিয়ের যাবতীয় খরচ আমাদের স্কুল থেকে বহন করা হবে। এটা শুধু নিছক একটা স্কুল নয়। একটা প্রোজেক্ট। একটা প্রকল্প।'

বারিধারার এবার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা হল।

'বলো কী দাদু! আর ইউ ইন সেন্স?'

কমলকান্তি সাদা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মাই ডিয়ার বৃষ্টিরানি, তুমি কি কখনও দেখেছ কমলকান্তি সেন সেন্সের বাইরে গিয়ে কথা বলছে? দেখেছ কখনও?'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, তা বলছি না, কিন্তু এই প্রোজেক্ট তো বিরাট খরচের ব্যাপার দাদু। এত খরচ সামলাবে কী করে?'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'সে কি আমি জানি না? আমার অনেকটা ভাবনাচিন্তা করা হয়ে গেছে। বাকিটা আমরা সবাই মিলে বসে ঠিক করব। সবার আইডিয়া নেব। সবাই মিলে একদিন বসতে হবে। শুধু বিয়ের খরচ নয়, আমাদের স্কুলে যে মেয়েরা পড়বে তারা যাতে পরে নিজেরা উপার্জন করতে পারে সেই ব্যবস্থাও থাকবে।'

বারিধারা বিড়বিড় করে বলল, 'কীভাবে এসব হবে জানি না। তবে একসাইটিং লাগছে। কবে বসব দাদু?'

কমলকান্তি বললেন, 'তোমার ঝামেলাটা মিটলেই বসব।'

বারিধারা বলল, 'আমার ঝামেলার জন্য এত ভালো একটা কাজ আটকে থাকবে?'

কমলকান্তি বললেন, 'আটকে থাকবে না। তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আটঘাঁট বেঁধে এগোতে হবে।'

বারিধারা বড় করে হেসে বলল, 'এরকম একটা কিছু করতে পারলে খুব ভালো হবে।'

কমলকান্তি বাইরের জানলা দিয়ে বাইরে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের এই গোটা প্রোজেক্টটার একটা নাম ভেবে ফেলেছি রে বৃষ্টি।'

'নাম ভাবাও হয়ে গেছে! ওয়ান্ডারফুল দাদু।'

কমলকান্তি নাতনির দিকে মুখ ফিরিয়ে লজ্জা লজ্জা হেসে বলল, 'নামটা একটু বড়। সবাই মিলে যখন বসব তখন যদি অ্যাপ্রুভ হয় তবেই নামটা থাকবে। নইলে বাদ।'

বারিধারা ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আগে নামটা তো বলো! তারপর অ্যাপ্রুভের কথা দেখা যাবে।'

কমলকান্তি নীচু গলায় বললেন, 'আমাদের এই প্রোজেক্টের নাম হবে ''একটু পরে রোদ উঠবে''।'

বারিধারা চুপ করে গেল। তার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। ভালো কাজের এমন সুন্দর নাম হতে পারে! এত আধুনিক আর ইন্টারেস্টিং! সত্যি তো এটা মেয়েদের জীবনের মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ঝলমল হয়ে ওঠবার প্রোজেক্ট। এই রোদ তো আর চট বলতে উঠবে না, তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সময় লাগবে। দাদু ঠিকই বলেছে। একটু পরে রোদ উঠবে।

বারিধারার ইচ্ছে করল, এখুনি দিদি আর মাকে ঘটনা গিয়ে বলে। কিন্তু আজ হাতে একদম সময় নেই। ইউনিভার্সিটির ঝামেলা রয়েছে। সে উঠে দাঁড়াল। কমলকান্তি সেনের মাথার সাদা চুল এলোমেলো করে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'ইউ আর গ্রেট ডার্লিং। আই লাভ ইউ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যদি বিয়ে করি তা হলে তোমাকেই বিয়ে করব। এরকম ইনোভেটিভ মাথাওলা বর আমার খুব প্রয়োজন।'

কমলকান্তি দু:খ দু:খ মুখ করে বললেন, 'সরি বৃষ্টিরানি। তুমি যতই চাও, তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার দিদির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে গেছে। মেঘ রাজকুমারীকে বিয়ে করলে শুধু তাকেই আমি কাছে পাব এমন নয়, তার বাবা আমাকে রাজত্ব দেবে বলেছে। এই অবস্থায় তোমাকে কী করে বিয়ে করি?'

বারিধারা ঠোঁট উলটে বলল, 'তোমাকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে। আমার অনেক ভালো বর জুটবে।'

দাদু-নাতনি দুজনেই 'হো-হো' আওয়াজ করে হেসে উঠল।

বারিধারা বলল, 'এখন আমি কাটলাম দাদু। পরে সব কথা হবে। একটু পরে রোদ উঠবে জিন্দাবাদ।'

বারিধারা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কমলকান্তি ইজিচেয়ারে মাথা রেখে চোখ বুজলেন। চোখ বুজে তিনি যেন তার প্রোজেক্টের গেটটা দেখতে পেলেন। গেটের মাথায় বড় বড় করে লেখা—

'একটু পরে রোদ উঠবে'

নামটা কি কাব্যিক হয়ে গেল? মানুষের স্বপ্ন তো আসলে কবিতাই। এই প্রোজেক্টে ঢোকবার সময়ে সবাই যেন ভাবে, এবার দু:খ-দুর্দশার অন্ধকার কেটে ঝলমলে আলোর জীবন আসবে। তাতে নাম যদি বড় হয়

boierpathshala.blogspot.com

ক্ষতি কী?

কমলকান্তি মনে-মনে স্ত্রীর সঙ্গে কথা শুরু করলেন।

'নাম পছন্দ হয়েছে গিন্নি?'

'পছন্দ হয়েছে।'

কমলকান্তি বললেন, 'একবার ভেবেছিলাম, তোমার নামেই করব। নীহারিকা। যেমন সবাই স্কুল-কলেজ, মন্দির, লাইব্রেরিতে মৃত মা, বাবা, বউয়ের নাম ব্যবহার করে। তারপর ভেবে দেখলাম, তুমি বিরক্ত হবে।'

'শুধু বিরক্ত নয়, আমি খুব রেগে যেতাম। নাম দিয়ে ভালো কাজের মধ্যে ঢুকে পড়া এক ধরনের হামবড়াই ভাব থাকে। কাজের থেকে নামটা বড় হয়ে যায়। একটু পরে রোদ উঠবে খুব সুন্দর নাম হয়েছে।'

কমলকান্তি বললেন, 'তোমার ছোট নাতনিরও পছন্দ হয়েছে।'

'আমি খুশি।'

কমলকান্তি বললেন, 'আমি জানি তুমি খুশি হবে। তবে কাজটা অনেক বড় করে ভেবে ফেলেছি।'

'তোমাকে বড় কাজই মানায়।'

কমলকান্তি মনে-মনে হাসলেন। বললেন, 'তোমাকে পাশে পেলে সুবিধে হত।'

'আমি তো তোমার পাশেই আছি।'

কমলকান্তি বললেন, 'তা ঠিক। তুমি আছ বলেই তো সাহস করে এত বড় একটা কাজের কথা ভাবতে পারলাম। নীহারিকা, আমার হাতে বেশিদিন সময় নেই। সময় ফুরিয়ে এসেছে। এবার আমার যাওয়ার পালা। তার আগেই কাজটা শুরু করে দিতে চাই।'

'কতদিন বাঁচলে এটা কোনও কথা নয়। বেঁচে কী করলে সেটাই কথা।'

কমলকান্তি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আজকাল তোমার জন্য মন কেমন করে।'

'মন কেমন কোরো না। আমাদের তো দেখা হবে।'

কমলকান্তি মলিন হাসলেন। বললেন, 'অপেক্ষা করছি।'

'এখন এসব নিয়ে ভেবো না। একটু পরে রোদ উঠবে নিয়ে ভাবো।'

কমলকান্তি মুচকি হেসে বললেন, 'যথা আজ্ঞা মেমসাহেব।'

কমলকান্তি সেনের স্ত্রী নীহারিকা সেনকে সত্যি মেমসাহেবের মতো দেখতে ছিল। গায়ের রং ফর্সা টকটক করত। ব্রোচ লাগানো শাড়ি, কনুই পর্যন্ত জামা পরে, উঁচু হিলের জুতো পরে যখন হাঁটতেন তখন সকলে তাকিয়ে দেখত। পাতলা শরীরের এই মেয়েটির চোখে-মুখে ছিল বুদ্ধির ঝলকানি। চাপা ব্যক্তিত্বের কারণে সবাই কমবেশি সমীহও করে চলত। সবথেকে বড় কথা, সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস আর তার কর্মচারীদের খুব ভালোবাসতেন নীহারিকা সেন। কর্মচারীরাও তাদের মালকিনকে বিশেষ পছন্দ করত। সাতদিনের অসুখে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলেন নীহিরিকা। তবে মৃত্যু যে এমন দ্রুত আসবে কেউ ভাবতে পারেনি। যদিও এমনটাই হয়। জন্মের মতো দশ মাস ধরে সাজো সাজো রব তুলে নয়, মৃত্যু আসে অতর্কিতে। সাপের মতো চকিতে ছোবল দিয়ে চলে যায় নি:শব্দে। শোক সামলাতে পারেননি কমলকান্তি সেন। ঠিক করেছিলেন, অফিস, ওয়ার্কশপ সব ছেড়েছুড়ে বাইরে চলে যাবেন। একমাত্র সন্তান বিমলকে কোনও বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে দেবেন। ব্যবস্থাও প্রায় করে ফেলেছিলেন। মৃত নীহারিকাই বারণ করলেন। একদিন তিনি এলেন চিন্তায়।

'এটা তুমি কী করছ। কাজকর্ম সব ছেড়ে দিচ্ছ?'

'ভালো লাগছে না নীহারিকা।'

'ভালো-মন্দ লাগবার প্রশ্ন নয়, এত বড় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করাটা তোমার দায়িত্ব।'

'কী হবে রক্ষা করে? আমার যা টাকাপয়সা আছে, ছেলে আর আমার চলে যাবে।'

'আর কোম্পানির এতগুলো কর্মচারী? তাদের কী হবে?'

'নতুন কেউ দায়িত্ব নেবে।'

boierpathshala.blogspot.com

'না, দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। তুমি সেন অ্যাসোসিয়েটসকে বড় করবে। তোমার চিন্তা কী? আমি তো তোমার সঙ্গে সবসময় আছি। তুমি ডাকলেই আসব।'

তারপর থেকে তিনি মাঝে মাঝেই মৃত স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। ওই নতুন প্রোজেক্ট করবার তাগাদা স্ত্রীরই।

'একটু পরে রোদ উঠবে'র প্রাথমিক খরচের একটা বড় অংশ নীহারিকা সেনের নামে রাখা টাকা থেকে নেওয়া হবে।

গত চল্লিশ বছর ধরে এই টাকা কোম্পানি থেকে ব্যাঙ্কে রাখা হয়। এটা নীহারিকা সেনের শেয়ার। এই টাকা দু'কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ঝাড়গ্রামের ভুলাভেদায় সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের যে জমি পড়ে আছে প্রোজেক্ট হবে সেখানে। কলকাতা থেকে খুব দূরে হল না, আবার শহুরে হট্টগোলের বাইরেও হল। জমির পরিমাণও অনেক। স্কুলবাড়ি, হস্টেল, ট্রেনিং সেন্টার বানানোর পরও অনেকটা জায়গা পড়ে থাকবে। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে হ্যান্ডিক্র্যাফটসের ওস্তাদদের এনে মেয়েদের ট্রেনিং দেওয়ানো হবে। তাঁতে কাপড় বোনা থেকে, পুতুল, মুখোশ, পিতল, ডোকরা, বাঁশ, মাটির কাজ শেখানো হবে। ধাপে ধাপে এসব জিনিস মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন শহরে শো-রুম হবে। এখানে থেকেই মেয়েদের বিয়ে, লেখাপড়ার খরচ উঠবে। সবাই মিলে বসলে নিশ্চয় আরও ভাবনার কথা জানা যাবে।

কমলকান্তির মন শান্ত লাগছে। ভালো লাগছে। বেঁচে থাকবার একটা মানে বোঝা যাচ্ছে। বাইরের মেঘ কেটে একটু রোদও উঠেছে।

এরকম একটা সময়ে একতলায় বাড়ির গেটের কাছে একটা ঘটনা ঘটল।

অর্চিন হন হন করে বাড়িতে ঢুকতে গেলে ভীম আটকাল।

অর্চিন বলল, 'কী হয়েছে ভীমদা?'

ভীম নীচু গলায় বলল, 'তোমাকে থানা থেকে খুঁজতে এসেছিল।'

অর্চিন চমকে উঠে বলল, 'থানা থেকে!'

ভীম আরও গলা নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, একজন সাদা পোশাকের পুলিশ। স্যারের সঙ্গে কথা বলেছে।'

অর্চিন বলল, 'তারপর?'

ভীম ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'তোমাকে সন্ধের পর থানায় যেতে বলেছে।'

অর্চিন একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চিন্তিত মুখে বলল, 'আচ্ছা' বলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল অর্চিন।

সে জানতেও পারল না বাড়ির উলটো দিকের ফুটপাথ থেকে মাঝবয়সি এক মহিলা তার দিকে পরম মমতা মাখা চোখে তাকিয়ে আছে।

সাতাশ

'ও মাটি জননী মাগো, আমি তোর উদরের ধুলো

অপার আঁচলে আজ মুছে নেব ভুল তত্ত্বটিগুলো।'

এটি একটি কবিতার শেষ দুই লাইন। কবিতার নাম 'মাটিবতী'। বাংলাদেশের অতি বিখ্যাত কবি আবু হাসান শাহরিয়ার কবিতাটা লিখেছেন। এই লাইন দুটি শেখর গুপ্ত তার একটি লেখার শুরুতে ব্যবহার করেছেন। কবিতার লাইন দিয়ে শুরু করলেও লেখার বিষয় সহজ নয়। লেখার বিষয় জটিল। লেখার বিষয় হল, 'বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং বামপন্থার সংকট।'

boierpathshala.blogspot.com

আজ সকাল থেকে শেখর লিখতে বসেছে। দমদমের একটা পত্রিকা বেশ কয়েকদিন ধরে লেখা চাইছে। দেব দেব করেও হয়ে উঠছিল না। নানা কারণ ছিল। খানিকটা হাতে সময় নেই, খানিকটা আলিস্যি, খানিকটা লেখার জন্য যে বইগুলো দরকার সেগুলো হাতের কাছে নেই। তবে মূল কারণ অন্য। শেখর হালকা খবর নিয়ে জেনেছে, পত্রিকাটি কোনওরকম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। ব্যস এতেই শেখর উৎসাহ হারিয়েছে। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়, এমন কোনও পত্রিকায় লেখালিখিতে তার চিরকালের অনীহা। সে যে খুব লেখালিখি করে এমন নয়। কালেভদ্রে একটা-দুটো। আগে তো অন্য কাজের চাপে একেবারেই পারত না। পার্টি ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তাও কিছুটা সম্ভব হয়েছে। গত কয়েক বছরে খানকতক প্রবন্ধ লিখেছে। সবই পার্টির সঙ্গে যুক্ত পত্রপত্রিকায়। বিভিন্ন গণসংগঠনের কাগজে। তবে সবসময়েই মনে হত, রাজনীতির ধারকাছ দিয়ে যায় না, এমন পত্রিকায় লেখা অর্থহীন। সে তো গল্প উপন্যাস লিখতে বসেনি যে, যে-কোনও পত্রিকায় লিখবে আর মানুষ পড়বে। সে লিখছে রাজনীতির কথা। তাও আবার নির্দিষ্ট মতাদর্শের কথা। এটা এমন একটা মতাদর্শ যা রসাল ভাষায়, তরল ভঙ্গিতে লেখা সম্ভব নয়। শেখর লিখছেও না। তার পছন্দ নিরস, কঠিন ভঙ্গি। এই ধরনের লেখার জন্য আলাদা পত্রিকা থাকে, আলাদা পাঠক থাকে। সাধারণ পত্রিকায় এসব কথা কে পড়বে? পড়লেই বা কে বুঝবে? বেশিভাগই তো পাতা উলটে যাবে। তার পরেও এক-দুজন পড়তে পারে। সে পড়ার অর্থ কী? পরিশ্রম করে লেখা হল, অথচ কোনও কাজে লাগল না—এতে লাভ কী? এইসব ভেবে সাধারণ পত্রিকায় লেখালেখি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে শেখর। এবারও রেখেছিল। দমদম থেকে আসা অনুরোধ পড়েই ছিল। তমসাই জোর করল। দিন তিনেক আগে চেপে ধরল। শুধু চেপে ধরল না, জোরে চেপে ধরল। কথা এক ধরনের বিতর্কের দিকে চলে গেল। পার্টির চলবার পথ কেমন হবে? কাকে সে বেছে নেবে? কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটি? আলোচনা যদিও শুরু হয়েছিল সহজ ভঙ্গিতে।

তমসা সেদিন বেশ রাগ রাগ করেই বলেছিল, 'ওরা এতবার বলছে, তারপরেও লিখছ না কেন? আজও তো ফোন করেছিল। করেছিল না?

শেখর এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলল, 'হ্যাঁ করেছিল, কিন্তু লেখা নিয়ে বসবার সময় পাচ্ছি না।'

তমসা বলল, 'কী এমন কাজ করছ যে তিন মাস ধরে তিনপাতা লেখবার সময় পাচ্ছ না?'

শেখর আত্মরক্ষার কায়দায় খানিকটা আমতা আমতা করেই বলল, 'আহা, লিখব বললেই তো চট করে লিখতে বসে যাওয়া যায় না তমসা। কী লিখব ভাবতে হয়, তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। বই ঘাঁটতে হয়। সময় লাগে। হাতে এখন সেই সময় কোথায়? সবে কনফারেন্সগুলো শেষ হল। এবার তো রিপোর্ট গোছগাছ করতে হচ্ছে। দেখছ না সর্বক্ষণ গাদাখানেক কাগজ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

স্বামীর এই উত্তর পছন্দ হল না তমসার। থম মারা গলায় বলল, 'না লিখলে বলে দাও ওদের। ঝুলিয়ে রেখেছ কেন? হয়তো তোমার লেখার জন্য অপেক্ষা করছে বেচারিরা। তুমি তো আর বিরাট কোনও লেখক নও যে, তোমার লেখা ছাড়া পত্রিকা চলবে না।'

শেখর হেসে ফেলল। বলল, 'এটাই তো সমস্যা তমসা। ''না'' বলতে পারছি না। এটা আমাদের কঙ্কণদার শ্যালকের ম্যাগাজিন। কী যেন নাম ম্যাগাজিনের? আগুনের ঝরণা, না আগুনের নদী, না, না মনে পড়েছে আগুনের স্রোত। দমদম থেকে বের করে। নিজেদের গল্প কবিতা ছাপে। এবার কী শখ হয়েছে, ঠিক করেছে, এখন থেকে পলিটিক্সও ছাপবে। কঙ্কণদাকে বলেছিল, লেখা চাই। যে কারও লেখা নয়, এমন লোকের লেখা চাই যে নিজে অ্যাকটিভলি পলিটিক্স করে। কঙ্কণদা আমাকে ফাঁসিয়েছে। বলেছে, ওরে বাবা, আমি ওসব রাজনীতি টাজনীতিতে নেই। একজনকে চিনি, সে বেটা এসবে আছে। দেখো বাপু তাকে ধরে যদি রাজি করাতে পারো। আমাকে ওরা কঙ্কণদার রেফারেন্সে ফোন করল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও। ওরা বলল, তা হবে না দাদা। আপনি সময় নিন, কিন্তু লিখতে হবে। আমি বললাম, নিজের ইচ্ছেমতো লিখতে পারব তো? ওরা বলল অবশ্যই। আপনি যা ভালো বুঝবেন। আমি জিগ্যেস করলাম, এই সময় আমার কথা

boierpathshala.blogspot.com

ছাপতে পারবে? আমার রাজনীতি কিন্তু অন্যরকম? ওরা বলল, সব জানি দাদা। কঙ্কণদা সব বলেছে। আমাদের কোনও সমস্যা নেই। আপনি আপনার মতো লিখবেন। আমি বললাম, কতদিন সময় দেবে? ওরা বলল, মাসখানেক নিন।'

শেখর থামলে তমসা বলল, 'এই তো, তাহলে তো তুমি রাজি হয়েছিলে। এত কথা বলা মানে তো রাজি হওয়া। এবার তাহলে ঝুলিয়ে রাখছ কেন?'

শেখর মুখ নামিয়ে একটা ছোট নি:শ্বাস ফেলল। বলল, 'আসলে কী জানো তমসা, তখনও আমি জানতাম না, পরে খবর নিলাম। ম্যাগাজিনটার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। যারা এটা বের করে তারাও যে পলিটিক্যালি মোটিভেটেড এমনটা নয়।'

তমসা দাঁড়িয়ে শাড়ি ভাঁজ করছিল। থমকে বলল, 'তাতে কী?'

'না মানে, ওখানে আমি লিখে কী করব?'

তমসা বলল, 'ওখানেই তো এখন লিখতে হবে।'

শেখর মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে আধশোয়া অবস্থায় কাজ করছিল। এটা তমসার নিয়ম। সে বিছানায় বই, ফাইল, কাগজপত্র ছড়িয়ে কাজ করলে রাগ করে। বাড়িটা পার্টি অফিস নয়। এখানে বিছানা বিছানা। কাজ করতে হলে হয় টেবিল-চেয়ারে, নয় মেঝেতে। শেখর আধশোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'তমসা, এসব জায়গায় আমাদের মতো লোকদের লিখে কী হবে বলো তো? ক'জন পড়বে? আমি প্রচারের কথা বলছি না, বলছি, যে ক'জন পড়বে তারাও কি বুঝবে? এই পাঠকরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্তই নয়। আমার পরিশ্রমটাই মাঠে মারা যাবে। আর তুমি তো জানো তমসা, লিখব ভাবলে, আমি খেটেখুটেই লিখব। ফাঁকি দিতে পারব না।'

তমসা বলল, 'এটা কী বলছ? এখন তো এসব জায়গাতেই নিজেদের কথা বলবার সময়। যারা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের কাছে পৌঁছতে হবে। এই আগুনের স্রোত ম্যাগাজিনের একজন পাঠকও যদি তোমার লেখা ভালোবেসে ফেলে, সেটাই আমাদের লাভ।'

শেখর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'অত খেটেখুটে তৈরি করা লেখা একজন পড়লেই হবে! এটা তুমি কী বলছ।'

তমসা শক্ত গলায় বলল, 'ঠিকই বলছি। অনেক কোয়ান্টিটি আমরা দেখেছি, এবার কোয়ালিটি খোঁজবার পালা। মিটিং, মিছিলের লোক কম দেখেছি? লাভ কী হয়েছে?'

শেখর হেসে ফেলল। বলল, 'তোমার কোয়ালিটির কথাটা ফেলতে পারলাম না তমসা, কিন্তু আমাদের মিটিং মিছিল নিয়ে অ্যাসেসমেন্ট মানতে পারছি না। ভোটে হেরে যাওয়ার পর অনেককেই এসব বলতে শুনেছি। ব্রিগেডে অত বড় মিটিং করে লাভ কী হল? ভোটের আগে বর্ধমান, হাওড়া, যাদবপুরে অত বড় বড় মিছিল করে লাভ কী হল? সেই তো হারতে হল। তুমিও একই কথা বললে তমসা। মিটিং-মিছিলের স্ট্রেংথ দিয়ে সরকার সমর্থনের বিচার হয় না। যদি কেউ বিচার করে থাকে সে ভুল করেছে। সেটা পদ্ধতির ভুল। মিটিং, মিছিলের ভুল নয়। ধরো, সেই সময় মিটিং, মিছিলগুলো যদি ছোট হত, তাহলে কী হত? যা হওয়ার তাই হত। না আমরা ভোটে জিততাম, না আমাদের অ্যাসেসমেন্ট ঠিক হত? অবশ্যই যারা ভুল অ্যাসেসমেন্ট করবার জন্য মুখিয়ে ছিল, তাদের কথা বলছি। তারা সবসময়ই ভুল ভাবত। কারণ তারা ভুল ভাবতে চাইছিল।'

তমসা খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তুমি কী বলছ, এরকম বিচার হয়নি? শুধু ভোট কেন, একটা সময় ছিল যখন বছরের পর বছর আমরা মিটিংয়ের লোক দেখে খুশি হয়েছি। যত বেশি লোক, তত বেশি খুশি। কত বড় মিটিং, কত বড় মিছিল বলে পিঠ চাপড়ে দিয়েছি নিজেদের। মিটিং, মিছিল যাতে বড় হয় তার জন্য জেলা কমিটিগুলো লোকাল কমিটি, ব্রাঞ্চ কমিটিকে কোটা বেঁধে দিয়েছে। এই ঘটনা তো বছরের পর বছর

boierpathshala.blogspot.com

ঘটেছে। কোয়ান্টিটি আমাদের গ্রাস করেছে। বাইরে যতই আমরা অন্য কথা বলি, ঘরের ভিতর এই কথা তুমি অস্বীকার করতে পারো?'

শেখর এবার পুরো উঠে বসল। শান্ত গলায় বলল, 'আমি তোমার কথা অস্বীকার করছি না, আবার পুরোটা স্বীকারও করছি না তমসা। পার্টি যখন ক্ষমতায় থাকে তখন নানা ধরনের ভাইসেস তাকে ঘিরে ফেলে। যে-কোনও পার্টির জন্যই একথা সত্য। কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ক্ষেত্রে এই সত্য অনেক বেশি। দীর্ঘদিন মার খাবার পর ক্ষমতা এক ধরনের মুক্তি। কমিউনিস্টরা যুগযুগান্ত ধরে শুধু মারই খেয়েছে। কখনও মালিকের হাতে মার খেয়েছে, কখনও রাষ্ট্র তাকে মেরেছে। তারপর কোনও কোনও দেশে কেউ কেউ ক্ষমতা পেয়েছে। কেউ ভোটে, কেউ বিপ্লবে, কেউ জোর করে। এই ক্ষমতা পেয়ে মার খাওয়া কমিউনিস্টরা যেন মুক্তির স্বাদ পেয়ে গেল। এই ঘটনায় বিশৃঙ্খল হওয়ার প্রবণতা বেশি হওয়ারই কথা। সেই প্রবণতা আমরা জিনে ক্যারি করছি। আমাদের পার্টির জিনে। আমাদের পার্টির বেলাতেও তাই হয়েছে। অনেকের বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। নিজেকে যেমন অ্যাসেস করতে পারেনি, পার্টিকেও পারেনি। ভাবতেও পারেনি, কখনও ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। তাই মিটিং, মিছিলের ভিড় দেখে সমর্থনের হিসেব কষত। কিন্তু তার মানে এই নয়, সবার বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল তমসা। সবাই ভুল হিসেব কষেছে। আমাদের লিডারশিপের অনেকেই বুঝেছিল, দিন ফুরিয়ে আসছে। নতুন দিনের জন্য তৈরি হতে হবে।'

তমসা বলল, 'তাহলে মিটিং, মিছিলের ভিড় নিয়ে আমরা এত হইচই করতাম কেন?'

শেখর বলল, 'ঠিকই করতাম। হইহই করবার মতো জিনিস বলেই করতাম। মিটিং, মিছিল বড় হওয়া মানে আমাদের দাবি, আবেদন মানুষের কাছে বেশি জোরে পৌঁছে দেওয়া। আমরা তা করেছি। পাঁচ-দশজনের মিছিল যতটা জোরে কোনও কথা বলতে পারে, পাঁচ হাজারের মিছিল তার থেকে অনেক বেশি জোরে সে কথা বলতে পারে। মানুষ সে কথা মানতে নাও পারে, কিন্তু ইগনোর করতে পারে না। বছরের পর বছর আমরা এভাবে মানুষের কাছে পৌঁছেছি। বহু ভোটে জয়ী হয়েছি। বহু দাবি জোগাড় করেছি। মানুষকে যতটা সম্ভব রিলিভ দিয়েছি। এতে ভুল কী হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না।'

তমসা বলল, 'আবার সেই কোয়ান্টিটি আর কোয়ালিটির প্রশ্ন। মিছিল, মিটিং-এ কত বাজে লোক ঢুকেছে। সুযোগ নিয়েছে।'

শেখর এবার বিরক্ত হল। বলল, 'উফ তমসা, আজ তোমার হঠাৎ কী হল বলো তো? বাজে লোক কি শুধু মিটিং, মিছিলে ঢুকেছিল? যেখানে হাজার, দশ হাজার, এক লক্ষ মানুষ ছিল সেখানে? যেখানে তিনজন, পাঁচজন, দশজন সেখানে বাজে লোক ঢোকেনি? বাজে লোক, ভুল লোকের প্রবেশ সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। করেওনি। যাক। সেই জন্যই পার্টিতে তো রেক্টিফিকেশনের চেষ্টা হচ্ছে। তার মানে এই নয়, সুযোগ পেলে আমরা আবার বড় মিটিং, মিছিল করব না। একশোবার করব। তাতে দু-পাঁচটা পুরোনো মন্দ মানুষ এলে আসবে। তবে একজন নতুন ভালো মানুষকে পেলে সেটা হবে বড় অ্যাচিভমেন্ট। কোয়ান্টিটি দিয়ে কোয়ালিটি ধরে আনতে তবে তমসা। কোয়ান্টিটি অস্বীকার করা বোকামি। তা ছাড়া...তা ছাড়া... মিটিং-এ লোক আনো, মিছিলে লোক আনো বলে পার্টিরা কর্মী, সাপোর্টারদের অ্যাকটিভ রাখা হত। এটা তো মিথ্যে নয়।'

তমসা থুতনির নীচে শাড়ি চেপে ধরে ভাঁজ শেষ করল। বলল, 'আমি কোনওটাই মিথ্যে বলছি না, তবে এটাও বলছি, মিটিং, মিছিলে মানুষের সংখ্যা যখন কম, তখনও সেটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। দাবিটা কী, সেটাই আসল কথা। লোকটা নয়।'

শেখর উৎসাহ নিয়ে বলল, 'অবশ্যই। দশটা লোকও যদি ঠিক দাবিতে, ঠিক প্রতিবাদে একসঙ্গে হয়, তার মূল্য আছে। ভুল দাবিতে দশ হাজার মানুষের সমাবেশের থেকে সেই মূল্য অনেক বেশি। তবে দশ হাজার মানুষ একসঙ্গে হয়েছেন বলেই তাকে বাজে লোকের ভিড় বলে ছোট করব, এটাও ঠিক নয়।'

boierpathshala.blogspot.com

তমসা বলল, 'তাহলে তুমি লিখতে শুরু করো। সেই লেখা যদি ঠিক তিনজন পাঠকও পড়ে সেটার মূল্য অনেক। অন্তত ভুল তিনশো পাঠকের থেকে তো বটেই।'

শেখর হেসে ফেলল। বলল, 'তোমার যুক্তির কাছে হার মানছি তমসা। তোমার কথা আমার কাছে একরকম শিক্ষার মতোই হল। আমি অবশ্যিই লিখব।'

তারপরেই শেখর লিখতে বসছে। কবিতার লাইন দিয়ে শুরু করে বেশ ভালো লাগল শেখরের। তরতর করে লেখা এগিয়ে চলল।

'আমাদের দেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটটি যদি চালচিত্রের মতো খুলে ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে, তার বড় অংশটাই মধ্যবিত্তের দখলে। কমিউনিস্ট দলগুলি, যারা সব সময় শ্রমিক-কৃষক সর্বহারার নেতৃত্বের কথা বলে, তারাও এখন স্বীকার করে, তাদের পার্টি চালায় মধ্যবিত্ত। এর অর্থ, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির শ্রেণিচরিত্রে এখন বড় রদবদল ঘটেছে। মধ্যবিত্তের আধিপত্য দেখা দিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি এখন মধ্যবিত্তের পার্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কি কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য দু:সময়? নাকি এই ছিল ভবিতব্য? মধ্যবিত্তর এই সর্বগ্রাসী দখলদারি বামপন্থার জন্য কতটা সর্বনাশের, সে বিচার করবার আগে দেখা যাক, অতীতে বাঙালি মধ্যবিত্ত বাম আন্দোলনে কতটা অবদান রাখতে পেরেছে...।'

মোবাইল বেজে উঠল। শেষের লেখা থামিয়ে বিরক্তি মুখে ফোন তোলে। কঙ্কণদা।

'কী হয়েছে কঙ্কণদা?'

'শেখর, ভালো আছিস?'

শেখর হেসে বলল, 'ভালো আর থাকতে দিলে কই কঙ্কণদা? ঘাড়ে যা চাপিয়েছ। তোমার শালার জন্য লিখতে হবে না? তারই মকসো করছিলাম।'

ওপাশে কঙ্কণদা একটু চুপ করে থেকে বলে, 'একটা কথা বলতে হচ্ছে, কিছু মনে করিস না।'

'আরে বলো, কী হয়েছে? আমতা আমতা করছ কেন?'

'না, বলতে বাধো বাধো ঠেকছে।'

শেখর হালকাভাবে বলল, 'আবার লেখার অনুরোধ না হলে অনায়াসে বলতে পারো। আমি কিছু মনে করব না।'

'আমার শ্যালক তোকে যে লেখাটার জন্য বলেছিল, ওটা ছেড়ে দে।'

শেখর অবাক হয়ে বলল, 'ছেড়ে দেব মানে!'

কঙ্কণদা বলল, 'লিখতে হবে না তোকে। ওরা নিজেরা তোকে কথাটা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। আমাকে ফোনে ধরল। বলল, তোর লেখা ছাপায় ওদের সমস্যা হবে। যে লোক পত্রিকা ছাপার টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে, সে নাকি আপত্তি করেছে। বলেছে, তোদের পলিটিক্সের কথা ছাপা হলে সে আর থাকবে না। বুঝতেই তো পারছিস, ছোট পত্রিকা...আমার খুব খারাপ লাগছে। আই অ্যাম সরি শেখর।'

শেখর আবার হেসে বলল, 'দুর, সরির কী আছে? কথাটা তো সত্যি। বেচারিরা এখন আমাদের লেখা ছেপে বিপদে পড়বে নাকি? থাক ও সব। তুমি আছ কেমন বলো?'

দু-একটা কথার পর 'কঙ্কণদা' ফোন ছাড়লে শেখর গুপ্ত আবার উপুড় হয়ে শুয়ে লিখতে শুরু করল। এই লেখা কে পড়বে সেটা বড় কথা নয়, লিখতে হবে এটাই আসল কথা।

আঠাশ

তমসার আজ মন ভালো। আজ তার জীবনের একটা বিশেষ দিন। প্রতি বছর ঘুম থেকে উঠেই তমসার তারিখটা মনে পড়ে যায় আর ভালো লাগে। আবার লজ্জাও করে। আশ্চর্য লাগে, এত বছর হয়ে গেল তারপরে দিনটা সে ভুলতে পারেনি। তমসা জানে, এ তার ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। ছেলের দশ

boierpathshala.blogspot.com

বছর বয়স হয়ে গেল, এখনও এসব মনে থাকবার কথা নয়! নেহাত তমসাকে যারা চেনে তারা কিছুতেই তাকে 'নেকা' বলতে পারবে না, নইলে তারাও এই কথা শুনলে 'নেকা' বলত। অবশ্য এই ঘটনা কেউ জানে না। এটা তমসার গোপন কথা। কাউকে গল্প করবার মতো নয়।

আজ তমসাদের স্কুল ছুটি। স্কুলের গভর্নিং বডির এক মেম্বার মারা গেছেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছিল। তমসারা তাকে কখনও চোখেও দেখেনি। স্কুলের মিটিংয়েও আসতেন না। নামকাওয়াস্তে গভর্নিং বডিতে ছিলেন। তার পরেও একটা ছুটি পাওয়া গেল। আমাদের দেশে মানুষকে সম্মান জানানোর শর্টকাট পথ হল ছুটি। শুধু সম্মান কেন, কিছু একটা হলেই হল। শোকের ঘটনায় ছুটি, আনন্দের ঘটনায় ছুটি। ছুটি পেলে সবাই খুশি। তমসা খুশি নয়। সামনে পরীক্ষা আসছে। মেয়েদের সিলেবাস শেষ হয়নি। চাপ তো টিচারদের ওপরই পড়বে। কিন্তু করার কিছু নেই। তবে বাড়ির কাজ সারবার জন্য হঠাৎ একটা ফাঁকা দিন পাওয়া গেল।

তবে শুধু বাড়ির কাজ নয়, আজ পার্টি অফিসেও খানিকটা সময় দেবে তমসা। এলাকার মহিলাদের নিয়ে একটা আলাদা কিছু করবার কথা ভাবা হচ্ছে। পুরোনো সমিতি নয়, তার থেকে আলাদা। আগের সমিতিগুলো সম্পর্কে মানুষের ধারণা ভালো নয়। ভালো না হওয়ারই কথা। একটা সময় সমিতির মহিলারা রাজনীতির থেকে বেশি পাড়ায় পাড়ায় খবরদারি করত। অন্যের সংসারে নাক গলাত। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াতেও ঝান্ডা হাতে চলে যেত। ওই চেহারা এখন চলবে না। সবাই দুচ্ছাই করে তাড়িয়ে দেবে। সেই কারণে অন্য ধরনের মঞ্চ তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। লেডিস গ্রুপের মতো যদি কিছু করা যায়। তারা সারাসরি দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না। বাইরে কাজ করবে। সমস্যা হচ্ছে, শহরে এই ধরনের গ্রুপ কী কাজ করবে এবং কীভাবে কাজ করবে সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। গ্রাম, কলোনি, বস্তি হলে কাজ সহজ হত। শহরের মেয়েরা এসব জায়গায় কতটা আসবে তাই নিয়ে সন্দেহ আছে। পার্টি তমসাকে ভাবতে দিয়েছে। তমসা দু-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। আজও করবে। তমসার ইচ্ছে অন্যরকম। একেবারে পার্টি থেকে বেরিয়ে কাজটা হবে। ক্লাবের মতো একটা কিছু তৈরি করতে হবে। গান-বাজনা-নাটক, এগজিবিশনের ক্লাব। পার্টির গণসঙ্গীত নয়, সাধারণ গানবাজনা। পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ, মহালয়ায় কমিউনিটি হল নিয়ে ফাংশন হবে। এই কনসেপ্টে পার্টি রাজি হলে হয়। এটা যে আসলে কিছু মেয়েদের একসঙ্গে করবার একটা কৌশল সেটা কি নেতাদের মাথায় ঢুকবে? ঢোকা কঠিন। কমিউনিস্টরা চিরকালই নিজেদের ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে বসে থাকে। বইতে যেমন লেখা আছে তেমনভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দল যে তাতে এগোচ্ছে না কে বোঝাবে? পার্টি ভোটের সময় ক্লাবকে কাজে লাগায়, কিন্তু নিজেরা ক্লাব মনোবৃত্তিকে সমর্থন করে না। এই ধরনের ফ্যালাসি নিয়ে চলা মুশকিল। দেখা যাক। তমসা ঠিক করেছে, দরকার হলে নেতাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে।

ছেলে স্কুলে গেছে। ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো হয়েছে যে। ভালো হয়েছে না বলে, লেখাপড়ায় মন হয়েছে বলা ঠিক হবে। নিজের পড়া নিজে করে নেয়। স্কুলে যেতে ভালোবাসে। ঝড়বৃষ্টিতেও কামাই করতে চায় না। নামে শান্ত, স্বভাবেও শান্ত হয়েছে। অনেকটা তার বাবার মতো। খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা তেমন নেই। যা দেওয়া হবে খেয়ে নেবে। শুধু রাতে শোয়ার পর গল্প শোনানোর বায়না করে। কোনও কোনওদিন তমসার ভালো লাগে না। ক্লান্ত লাগে। সেদিন বলে, 'আজ গল্প-টল্প নয়, চুপ করে শুয়ে পড়।'

তারপরেও শান্ত ঘ্যান ঘ্যান করে। তমসা রেগে যায়।

'এবার কিন্তু চড় দেব। পাশ ফিরে ঘুমোও।'

শেষপর্যন্ত শেখর উদ্ধার করে। সে তার বাইরের ঘর থেকে উঠে এসে ছেলেকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। শান্ত বড় হয়ে যাওয়ার পর শেখর বাইরের ঘরে শোয়।

তমসা ঘুম থেকে উঠে ঘর গোছাল। দু'কামরার বাড়ি। ভাড়াবাড়ি। জায়গা কম। ছেলে বড় হচ্ছে, জায়গা দিন-দিন আরও কমছে। বাড়িটা যেন সবসময় অগোছাল থাকতে চায়। তমসা গোছানো মেয়ে বলে সামলে

boierpathshala.blogspot.com

চলে। আজও নিজেদের কোনও ঘরবাড়ি হল না। হওয়ার কথাও নয়। বাড়ির প্রধান মানুষ যদি উপার্জন না করে তা হলে বাড়ি হয় না। কথাটা সবাই মানতে চায় না। সবাই কেন, আজকের দিনে বেশিরভাগই মানে না। একবার এক মামির সঙ্গে তমসার এই নিয়ে খুব ঝগড়া হয়েছিল। তখন পার্টি সরকারে ছিল। মামিমা খুব অপমানজনক কথা বলেছিল। ঝগড়ার পর এক বছর সেই মামির বাড়িতে তমসা যায়নি।

মামিমা বলেছিল, 'শেখরকে এবার একটা ফ্ল্যাট-ট্যাট কিছু করতে বল তমসা। ক'দিন ভাড়াবাড়ির ঘুপচিতে পড়ে থাকবি? ছেলেটাও তো বড় হচ্ছে।'

তমসা বলেছিল, 'কী যে বলো মামি। শেখর ফ্ল্যাট করবে কোথা থেকে? তার টাকা কই?'

মামিমা চোখ কপালে তুলে বলেছিল, 'তার মানে! ফ্ল্যাট করবে কীভাবে মানে! এতদিন পার্টি করছে একটা ফ্ল্যাট করতে পারবে না?'

তমসা হেসে বলেছিল, 'তুমি এমনভাবে বলছ যেন পার্টি একটা বিজনেস। মিটিং, মিছিল করা মানে লাভ করা। ওর রোজগার কোথায় মামিমা? তুমি তো জানো শেখর পার্টির হোলটাইমার। মাস গেলে পার্টি থেকে ওয়েজ পায়। সে আর কত টাকা? আমার স্কুলের চাকরিটাই ভরসা। এতে ফ্ল্যাট-ট্যাট হয় না। কোনওরকমে সংসার চলে।'

মামিমা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, 'বাজে কথা বলিস না তমসা। আমাকে টাকার গল্প শোনাস না।'

তমসা অবাক হয়ে বলেছিল, 'টাকার গল্প শোনাচ্ছি মানে! তুমি কী বলছ? আমি বুঝতে পারছি না।'

মামিমা বলল, 'বুঝে কাজ নেই। আমাকে বললি ঠিক আছে, বাইরের কাউকে এসব বলতে যাস না তমসা। হেসে গড়িয়ে পড়বে। খবরদার বলতে যাসনি।'

তমসা আরও অবাক হয়ে বলল, 'কী বলতে যাব না?'

মামিমা বলল, 'পার্টি করে অথচ টাকা নেই এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এখন পার্টি করে সবাই গাড়ি-বাড়ি হাঁকাচ্ছে। দমদমে আমার বাপের বাড়ির ওখানে দেখছি না? আগে টালির ঘরে থাকত, এখন পার্টির লোকগুলো সব তিনটে-চারটে করে ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলেছে। নামে, বেনামে সম্পত্তি। তোর মামার অফিসে কাজ করে দাসবাবু। নির্মল দাস। কর্মচারী নাকি কী গুষ্টির পিণ্ডি ইউনিয়ন করে, এক সময়ে তোর মামার কাছ থেকে ধার করে সংসার চালাত। এখন তারও নাকি দুটো গাড়ি। কাজ তো কিছুই করে না। অফিসের ইউনিয়ন রুমে বসে বিড়ি ফোঁকে আর সময় সময় গেটে গিয়ে ঝান্ডা নাচিয়ে মানব না মানছি না করে। এরপরেও তুই বলছিস পার্টি করে পয়সা হয় না?'

তমসা শুকনো গলায় বলেছিল, 'সবাই সমান হয় না মামিমা।'

মামিমা তেড়েফুঁড়ে বলেছিল, 'সবাই সমান। পার্টির লোকগুলো সব চোর। প্রোমোটার, বিজনেসম্যানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে আর টাকা কামায়। আমরা সব দেখতে পাচ্ছি। তুই কাকে সাধুপুরুষ বলবি?'

তমসা খানিকটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সবাই চোর কথাটা তোমার বলা উচিত নয় মামিমা। পার্টিতে অনেক সৎ মানুষও আছে। একটা পয়সাও ছুঁয়ে দেখে না।'

মামিমা বিদ্র+পের ঢঙে বলল, 'আছে নাকি! আমার তো বাপু বিশ্বাস হয় না। তারপরেও তুই যখন বলছিস আছে হয়তো। লুকিয়ে আছে। মুখ দেখাতে লজ্জা পায়।'

তমসা শান্তভাবে বলেছিল, 'তোমার অভিযোগ সবটা মিথ্যে বলছি না। কিন্তু তোমার জানার বাইরেও বহু মানুষ আছে। তারা কষ্ট করে রাজনীতি করে, কষ্ট করে জীবনযাপন করে।'

অপমানিত হয়েই সেদিন বাড়ি ফিরেছিল তমসা। রাতে শেখর বলেছিল, 'তুমি বিষয়টাকে এত কঠিনভাবে নিচ্ছ কেন তমসা?'

তমসা বলল, 'কী বলছ! তোমাকে চোর বলছে, সেটা সহজভাবে নেব?'

শেখর হেসে বলল, 'আমাকে নয়, পার্টির লোকদের বলছে।'

'তাই বা বলবে কেন?'

boierpathshala.blogspot.com

শেখর গম্ভীর মুখে বলে, 'এটাই তো আমাদের ভাবা উচিত তমসা। যে পার্টিতে এত লড়াই, এত স্যাকরিফাইজ, এত অনেস্টি সেই পার্টির লোকদের মানুষ চোর বলবে কেন? একটা মানুষও বলবে কেন? আমরা কি বিষয়টা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবি? ভাবি না। অনেক অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা হয়তো কমিশন-টমিশন বসিয়ে পার্টি থেকে বহিষ্কার করি, তাও বছরে একটা-দুটো, তার বেশি নয়। ব্যস, মানুষ কী বলছে সেদিকে তাকাই না। বরং গাল দিলে, সমালোচনা করলে তার ওপর রাগ করি। কোণঠাসা করি।'

তমসা উত্তেজিত হয়ে বলে, 'মানুষের এই সব অভিযোগ তো সত্যি নয়। কানাইবাবু, কেষ্টদা, নিতাই সরকার, তালুকদারকাকা, অমিয় এরা তো ভয়ঙ্কর দুর্দশার মধ্যে সময় কাটায়। কেষ্টদা তো হস্টেলের বারান্দার মাদুর পেতে শোয়। রুমরেন্ট দিতে পারেনি বলে ঘরে জায়গা পায় না। এ সব কি মানুষ জানবে না?'

শেখর বলল, 'না জানবে না। কারণ আমরা জানানোর কথা ভাবি না। সৎ ভাবে বেঁচে থাকাটাকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছি। ফলে মানুষ সামনে যে খারাপটাকে দেখতে পায়, সেটাকেই সব ভাবে। আলটিমেট বলে মনে করে।'

তমসা বলে, 'ভাববে কেন?'

শেখর হেসে ফেলে।

'কেন ভাববে এটা তুমি জিগ্যেস করতে পারো না তমসা। পারসেপশনটাই এরকম হয়ে যাচ্ছে। পার্টির লোক মানে চোর। চোর আছেও তো। অনেক চোরই আছে। আমরা একদিকে যেমন তাদের তাড়াতে পারি না, তেমন ভালো লোকদের সামনে আনি না। তার থেকে ভয়ের কথা, আমরা মানুষের সামনে নীতি, আদর্শের কথা তুলে ধরতে পারছি না। তার ফলে ব্যক্তির জীবন, বাহুল্য দিয়ে পার্টির কথা প্রচার হচ্ছে। একজন মন্ত্রী সাইরেন বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে গেলে রাস্তার লোক গাল দেয়। তাদের দোষ নেই। তারা তো জানে না যে মানুষটা মন্ত্রী হয়েছে, সাইরেন বাজিয়ে যাচ্ছে তার অতীত কী? সে কত লড়াই করেছে? সোসাইটিতে তার কন্ট্রিবিউশন কী? কেন তাঁকে সাইরেন বাজিয়ে আগে যেতে হবে? আমরা মানুষকে এসব বোঝানোর চেষ্টাও করি না। ইগনোর করি। আমার ধারণা এর ফল ভালো হবে না। যে গুন্ডা মস্তান সাইরেন ছাড়াই পথ চলে সে গাড়িতে চড়লেও খারাপ, না চড়লেও খারাপ। তুমি তোমার মামিমার কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না। উনি আমাদের কারণেই ভুল বুঝে আছেন।'

তমসা গজগজ করে বলেছিল, 'যা-ই হোক, আমি ওর বাড়িতে আর কখনও যাব না।'

তমসা বাইরের ঘরে এল। শেখর উপুড় হয়ে লিখছে। নিশ্চয় দমদমের ওই পত্রিকার জন্য। খুব ভালো লাগল তমসার। মানুষটা এই যুগের সঙ্গে খাপ খায় না। সেই কারণেই বোধহয় এত ভালো। শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাস নয়, নিজের জীবনের প্রতিও গভীর বিশ্বাস আছে। পায়ের আওয়াজে মুখ তুলল শেখর। হেসে বলল, 'এসো তমসা। ঘর গোছানো হল?'

তমসা বহুদিন পর শেখরের পাশে মাদুরের ওপর বসে পড়ল। আঁচল দিয়ে কপালের গলার ঘাম মুছল। শেখর স্থির চোখে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর মুখের দিকে।

তমসা গাঢ় স্বরে বলল, 'কী দেখছ?'

শেখর মুচকি হেসে বলল, 'তোমাকে। এই সময় তোমাকে কতদিন দেখিনি।'

তমসার গা শিরশির করে উঠল। শেখরের গায়ে হাত দিয়ে নীচু গলায় বলল, 'ধুত যত বাজে কথা। উনি যেন আমাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন।'

শেখর খাতার ওপর খোলা পেন রেখে সোজা হয়ে বসল। তমসার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'কে বলল থাকি না?'

তমসা শেখরের হাত সরিয়ে দিতে দিতে অভিমান করা গলায় বলল, 'বাজে কথা। আমার জন্য অপেক্ষা করতে বয়ে গেছে তোমার। খালি কাজ আর কাজ। এই মিটিং, সেই মিটিং। আমি যে একটা মানুষ মনেই

boierpathshala.blogspot.com

থাকে না।'

শেখর তমসাকে কাছে টানল।

'তোমাকে মনে না রাখলে এত কাজ করতেই পারতাম না তমসা। সত্যি কথা।'

স্বামীর স্পর্শে বহুদিন পর তমসার শরীর কেঁপে উঠল। মনে হল, নতুন মানুষ। এই প্রথম বুঝি কোনও পুরুষ তার গায়ে হাত দিল। ভালোবাসার হাত। ছেলে বড় হওয়ার পর এই সুযোগ কমে গেছে। দুজনের কাছে আসাই হয়ে ওঠে না। আজ শান্ত নেই। অসময়ে বাড়িতে দুজনে। তাই কি এই শিহরন? তমসা লজ্জা পেল। শেখরকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল। শেখর চেপে ধরল। তমসা চোখ পাকিয়ে বলল, 'অ্যাই কী হচ্ছে?'

শেখর চাপা গলায় বলল, 'কতদিন আদর করিনি বলো তো?'

'বয়ে গেছে তোমার।'

শেখর তমসার মুখের দিকে মুখ এগিয়ে বলল, 'না বয়ে যায়নি। খুব ইচ্ছে করছে তমসা। প্লিজ।'

তমসা বাঁ হাত দিয়ে স্বামীর মুখ সরিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ইস দিনের ফটফটে আলোয় বাবুর খুব ইচ্ছে না?'

'রাতে আর তোমাকে পাই কোথায়?' ছেলে ঘুমিয়ে পড়বার আগেই তো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

তমসা চাপা স্বরে বলল, মিথ্যে কথা। নিজের মনে পড়ে না সেটা বলো।'

শেখর হেসে বলল, 'আচ্ছা, বেশ মনে পড়ে না। এবার তো এসো। এবার মনে পড়েছে।'

কাছে টেনে তমসার বুক থেকে শাড়ির আঁচল সরিয়ে দিল শেখর। তমসা বাধা দিল আবার দিলও না। সে চোখ বুজল।

বিড়বিড় করে বলল, 'মাগো! কত আলো।'

শেখর তমসার বুকের ওপর মুখ নামাতে নামাতে বলল, 'কী সুন্দর!'

তমসা ব্লাউজ খুলতে খুলতে মাদুরের একপাশে শুয়ে পড়ল। তার শরীর ঝিমঝিম করছে। কী অদ্ভুত ঘটনা! একেই কি কোইন্সিডেন্স বলে? আজ থেকে বারো বছর আগে আজকের এই দিনটায় শেখর তাকে প্রথম আদর করেছিল। তখনও তাদের বিয়ে হয়নি। বিয়ের কথাও হয়নি। শুধু ভালোবাসার টান দুজনে অনুভব করেছিল। এরকমই এক সকালে তমসা এই বাড়িতে এসেছিল। এসেছিল পার্টির কাজে। কাজটাও মনে আছে। লোকাল কমিটির সম্মেলন হবে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে সেমিনারের দায়িত্ব ছিল তমসা আর তার টিমের ওপর। সেই সেমিনারের বিষয় ফাইনাল করতে এসেছিল। ব্যবহারিক জীবনে মার্কসবাদের প্রয়োগ কি আজকের দিনে বাস্তবসম্মত? কথা শেষ করে তমসা যখন উঠে পড়েছিল, শেখর খুব সহজভাবে তাকে বলেছিল, 'তমসা কথাটা বলা উচিত নয়, তারপরেও যদি বলি তুমি কি রাগ করবে?' তমসা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

শেখর বলেছিল, 'আমরা দুজনেই আমাদের সম্পর্কের কথা জানি। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। সেই সম্পর্কের জেরে আজ যদি আমি আদর করতে চাই তুমি কি প্রত্যাখ্যান করবে তমসা? করলে সমস্যা নেই। আমি সহজভাবেই মেনে নেব। কিন্তু দয়া করে সত্যি কথা সরাসরি বলার জন্য আমার ওপর রাগ কোরো না। কোনও মানুষের তার ভালোবাসার জনকে আদর করতে চাওয়াটা অনুচিত হতে পারে, কিন্তু অপরাধ নয়!'

এমন সহজভাবে, কোনওরকম ভনিতা ছাড়া সরাসরি একজন পুরুষমানুষ কোনও মেয়েকে এই কথা বলতে পারে! তমসা বাকরুদ্ধ হয়ে বসেছিল দীর্ঘক্ষণ। যতক্ষণ না পর্যন্ত শেখর গিয়ে দরজার ছিটকিনি দেয় এবং এসে তার হাত ধরে।

ঘরের ভিতর, মেঝেতে পাতা মাদুরে দুটো নগ্ন শরীর যখন জগৎসংসার ভুলে মত্ত, দরজার বাইরে তখন এক তরুণ এসে দাঁড়াল। তার চেহারা বিধ্বস্ত। চোখে-মুখে গভীর দুশ্চিন্তা। তাঁকে পুলিশ খুঁজছে।

অর্চিন দরজায় ধাক্কা দিল। চাপা গলায় বলল, 'শেখরদা, শেখরদা।'

boierpathshala.blogspot.com

উনত্রিশ

নিজের ঘরে মধুজা রায় গুম মেরে বসে আছেন। টেবিলের ওপর নানা ধরনের জরুরি কাগজপত্র। তিনি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু দেখছেন না।

মধুজা রায়ের মেজাজ খারাপ। মেজাজ বেশি খারাপ হলে মানুষের নানারকম সমস্যা হয়। প্রেসার বাড়ার কারণে কারও ঘাড় মাথা চিনচিন করে, কারও রাগে কান ভোঁ ভোঁ করে, কারও মুখ তেতো হয়ে যায়। চিনির সরবত খেলেও মনে হয় নিমপাতার রস খাচ্ছি। মধুজা রায়ের ঘটনা অন্যরকম। মেজাজ বিগড়নোর সময়ে তার নাকের ভিতর সুড়সুড় করে। বার বার নাকে হাত দিতে ইচ্ছে করে। নাকে হাত দেওয়া একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। মনে হয়, নাক খুঁটছে। মধুজা রায় একজন মহিলা এবং ডাকসাইটে প্রফেসর। তার পক্ষে প্রকাশ্যে এই কাজ অস্বস্তিকর। আবার না করে উপায়ও নেই। নাকের ভিতর সুড়সুড় এমন একটা ঝামেলা যে, মুক্তির দ্বিতীয় বিকল্প নেই। মনে হয়, নাকে হাত না দিলে এক্ষুনি মারা যেতে হবে। সব মিলিয়ে খুবই ঝামেলা। তাই যতক্ষণ নাক সুড়সুড় ধরনের মেজাজ খারাপ থাকে, ততক্ষণ মধুজা রায় টেনশনে থাকেন। যতটা না মেজাজের জন্য টেনশন, তার থেকে অনেক বেশি নাকের জন্য টেনশন।

লব ঘরে ঢুকল। তার মুখও থমথমে।

'দিদি, চা খাবেন।'

মধুজা রায় এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা কেউ এসেছিল?'

লব বলল, 'না, এখনও আসেনি।'

যেহেতু মধুজা রায় বেশিরভাগ দিনই ক্লাস নিতে পারেন না, এমনকী ইউনিভার্সিটিতে আসতেও পারেন না, তিনি এলে ছেলেমেয়েরা ভিড় করে। সিলেবাস, পরীক্ষা, রেজাল্ট, গবেষণা নিয়ে তাদের অনেক সমস্যা থাকে। প্রশ্ন থাকে। সেগুলোর সমাধান করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের রেকমেন্ডেশনে সই করানোর থাকে। অন্য প্রফেসরদের ফোন করানোর থাকে। সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েরা জানতে চায়, ম্যাডাম আজ ক্লাস নেবেন কিনা। নাকি বসে থেকে থেকে চলে যেতে হবে? সব মিলিয়ে ঘরের বাইরে একটা জটলা থাকে। মধুজা রায় এই জটলা পছন্দ করেন। বাইরের কেউ এলে এই জটলা দেখে মনে করবে, ইউনিভার্সিটিতে তিনি একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। সেই কারণেই ছাত্রছাত্রীদের ভিড় লেগে আছে। যদিও ঘটনা সেরকম নয়। মধুজা রায়ের কাছে ছেলেমেয়েদের আসবার মূল কারণ তিনি 'পাওয়ারফুল'। দু:খের হলেও কথাটা সত্যি, আজকাল দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকেও ছাত্রছাত্রীদের পাওয়াফুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেশি প্রয়োজন। তারা নানা ধরনের ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। মধুজা রায় এই ব্যাপারে তালিকার ওপর দিকে। ছেলেমেয়েরা ভয়ে এবং লোভেই তাঁর কাছে ভিড় করে।

লব বলল, 'না, এখনও তো ছেলেমেয়েরা আসেনি।'

মধুজা রায় ভুরু কোঁচকালেন। এই তথ্য তাঁর পছন্দ হল না। তিনি চিন্তিত হলেন। উদ্বেগ চেপে রেখে বিরক্ত গলায় বললেন, 'কেন! তাদের কী হল?'

লব এখানে তিরিশ বছর ধরে পিওনের কাজ করছে। প্রফেসর, অফিসারদের মেজাজমর্জি তার ভালো জানা আছে। মধুজা রায়কেও সে হাড়ে হাড়ে জানে। তার রাগ, মেজাজ, বিরক্তিকে পাত্তা দেয় না। তার ওপর ইদানীং এই মহিলার ওপর রাগ হয়েছে। বাঁকুড়ার এক কলেজের অফিসে ভাগ্নেকে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিল। ক্লার্কের পোস্ট। তার কাছে খবর ছিল, ওই কলেজের গভর্নিং বডিতে মধুজা রায়ের তিনজন চেনাজানা আছে। বললেই হয়ে যেত। তার পরেও মহিলা কিছু করেনি। শুধু করেনি বললে ভুল বলা হবে, এই ফাঁকে অন্য একজনকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই ছেলে অতি বদ। মধুজা রায়ের সঙ্গে চেনাজানার কথা

boierpathshala.blogspot.com

নিজেই বলে ফেলেছে। একদিন ঝগড়ার সময় অফিসে গলা চড়িয়েছিল। সেখান থেকে জানাজানি হয়েছে। লবের কাছেও খবর এসে গেছে।

'আমি কলকাতার মধুজা ম্যাডামের পরিচিত। আমাকে কেউ কিস্যু করতে পারবে না।'

এরপরই লবের রাগ বেড়ে গেছে। সেও বিরক্ত গলায় বলল, 'ছেলেমেয়েরা কেন আসেনি, তা তো বলতে পারব না দিদি। আমি তো ছেলেমেয়েদের কাজ করি না। আমি আপনাদের কাজ করি।'

মধুজা রায় লবের বিরক্তি আঁচ করতে পারলেন। মাথায় সাৎ করে রক্ত চড়ে গেল। তার পরেও চুপ করে গেলেন। এদের ঘাঁটানো বিপদ। এরা স্টুডেন্টদের মতো চুপ করে থাকবে না। হয় ফস করে মুখের ওপর একটা অপমানজনক কথা বলে দেবে, নয় এমন কলকাঠি নাড়বে যে, কঠিন গোলমালে পড়ে যেতে হবে। তবে ছেলেমেয়েদের না-আসাটা ভালো লাগছে না। মনের ভিতর খচখচ করছে। কী হল?

'চা খাবেন দিদি?'

'না। তুমি এখন যাও লব। দরকার হলে ডাকব। আর স্টুডেন্টরা কেউ এলে বলবে, আজ দেখা করতে পারব না। আজ আমি ক্লাসও নেব না। আমার অন্য কাজ আছে।'

লব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মধুজা রায়ের মোবাইল বেজে উঠল। রিং টোনে পিয়ানোয় রবীন্দ্রনাথের গান। কতবারও ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া...। চড়া নয়, চাপা বাজনা। এই গান মধুজা রায়ের পছন্দ নয়। আজকের দিনে আপনা ভুলিয়া বলে কিছু হয় না। এসব কথা রবীন্দ্রনাথের আমলে ছিল। এখন অবসলেট হয়ে গেছে। তার পরেও মধুজা গানটা মোবাইলে রেখেছেন। তাঁর কাছে খবর আছে, রাজ্যের একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রী মোবাইলে এই গান রিং টোন করেছেন। যদি তার সঙ্গে কোনওদিন দেখা হয় এবং সেই সাক্ষাতে মোবাইল বেজে ওঠে, তাহলে কিছু একটা হলেও তো হতে পারে। এই আশায় রাখা। আদৌ তার সঙ্গে দেখা হবে কিনা, দেখা হলে মোবাইল বাজবে কিনা, বাজলে মন্ত্রীসাহেব খুশি হবেন কিনা, হলে তিনি কিছু পাইয়ে দেবেন কিনা, সেসব কিছুই এখন বলা যাচ্ছে না। কিন্তু যদি হয়? যদি কখনও কোনওদিন তার সঙ্গে দেখা হয় আর তখন যদি ফোন বেজে ওঠে অথচ সেই ফোনে আপনা ভুলিয়া গান না বাজে? তাহলে একটা আপশোসের ঘটনা হবে। মধুজা রায় চান্স নিয়ে রেখেছেন। অতি তুচ্ছ ঘটনাও জীবনে বড় মোচড় আনতে পারে। এরকম একটা ব্যাপার তাকে একসময়ে অনেক উপকার দিয়েছিল। সেও গান ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা গান নয়, অগ্নিগর্ভ বিপ্লবের গান। আগের গভর্নমেন্টের আমল তখন। পার্টি অফিসে শিক্ষা সেলের এক নেতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল একদল অধ্যাপক। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ঠিক করা নিয়ে জটিলতা হচ্ছিল। কাউন্সিলে দুজন অন্য মতের অধ্যাপক ঢুকে পড়েছিল। তাদের কীভাবে ঠেকানো যায় তাই নিয়ে মিটিং। মধুজা রায় তখন অল্প অল্প করে ক্ষমতাবানদের কাছাকাছি আসছেন। আরও আসবার জন্য ব্যগ্র। তিনি ম্যানেজ করে অধ্যাপকদের দলে ঢুকে পড়লেন। পৌঁছে গেলেন পার্টি নেতার কাছে। শিক্ষা সেলের নেতা খুবই পরিশীলিত মানুষ। পার্টির ভ্যাদভ্যাদে অশিক্ষিত মিটিং, মিছিল করা কর্মীদের থেকে শিল্পী সাহিত্যিক শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। শিক্ষার সঙ্গে সুন্দরী মহিলা যুক্ত থাকলে তো কথাই নেই। কথা বলবার উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে যেত। যাবেই তো। নারী শিক্ষাই তো সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নেতা অতি উৎসাহে সেদিন নিজের গল্প শুরু করেন।

'সে একটা সময় ছিল বুঝলেন। আমার তরুণ বয়েসের সময়। আমরা কমিউনিস্টরা তখন উদ্দাম, আমরা কমিউনিস্টরা তখন আগুন, আমরা কমিউনিস্টরা তখন সমাজ গড়বার লক্ষ্যে মাতোয়ারা। এই সময় সরকার আমাদের ওপর নামিয়ে এনেছে প্রবল দমনপীড়ন। একটা দিনের কথা খুব মনে পড়ছে। আপনাদের মতো বড় মানুষদের কাছে সেই কথা বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। সেদিন ছিল আমাদের সভা। আমরা গাইছিলাম গান। সাথীদের খুনে রাঙা পথে দেখ, পথে দেখ, পথে দেখ...' ফাটা রেকর্ডের মতো কয়েকবার

boierpathshala.blogspot.com

'পথে দেখ পথে দেখ' বলে শিক্ষা-নেতা থমকে গিয়েছিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'উফ! কী যেন পরের কথাটা...কী যেন...আহা! আমাদের যৌবনের সেই গান...আজ আর পুরোটা মনে পড়ে না।'

পিছনে বসা মধুজা রায় ভয়ে ভয়ে বলছিলেন, 'আমি বলব স্যার?'

নেতা চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা মুগ্ধ।

'বলুন।'

মধুজা বললেন, 'সাথীদের খুনে রাঙা পথে দেখ হায়নার আনাগোনা।'

নেতা চওড়া হেসে বললেন, 'ইয়েস হায়না, মনে পড়েছে হায়না, দে আর হায়নাজ। থ্যাঙ্কু ম্যাডাম। থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ। তারপর কী হল শুনুন। আমরা তো স্টেজে গান ধরেছি। হঠাৎ দেখি পুলিশ...।'

এর সাত দিনের মধ্যে সেই নেতা মধুজা রায়কে ফোন করলেন।

'আছেন কেমন? শুনুন নর্থবেঙ্গলের শিক্ষামেলায় একটা সেমিনার হচ্ছে। আমি আপনার নাম বলেছি। আপনি কিন্তু না করবেন না। আপনাদের মতো লেখাপড়া জানা মানুষ এগিয়ে না এলে হবে না।'

একেবারেই হঠাৎ শিকে ছিঁড়ল। পাড়ার মোড়ে শোনা গানের কলি মনে ছিল বলেই না চেনা পরিচয় হয়েছিল অত বড় নেতার সঙ্গে। তারপর কতবার যাতায়াত। থাক সে কথা। আসল কথা, কী থেকে কী হয়ে যায় কেউ বলতে পারে! একটা সময় 'হায়না' যখন এই কাণ্ড করতে পেরেছে, এখন খোদ রবিঠাকুর কতটা পারবেন তার ঠিক আছে? যদি দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রীর মনে ধরে যায়?

এই কারণেই মোবাইলে গান রাখা। অতীতের শিক্ষা।

ফোন তুললেন মধুজা। ফোনে নাম দেখলেন, অভ্রনাথ। উফ ছেলেটা জ্বালিয়ে খাচ্ছে। বউয়ের ট্রান্সফার চায়। একটা ধমক দেওয়া উচিত।

মধুজা রায় নিজেকে সামলালেন।

'তোমাকে তো বলেছি অভ্রনাথ, আমি কথা বলব। নর্থবেঙ্গল থেকে কলকাতার কলেজে নিয়ে আসা তো হুট বলতে হয় না। তুমি ধৈর্য ধরো।'

ওপাশ থেকে অভ্রনাথ গদগদ গলায় বলল, 'অবশ্যই ধৈর্য ধরব মধুজাদি। শুধু ধৈর্য কেন, আপনি যা বলবেন তাই ধরে বসে থাকব। আপনি যেরকম বলবেন সেরকমটাই করব।'

মধুজা রায় গলায় ঝাঁঝ নিয়ে বললেন, 'করছ কই অভ্রনাথ? আরে ট্রান্সফারের জন্য তো পদ্ধতি প্রকরণ আছে। সেগুলো মানতে হয়। আমি না হয় কয়েকটি স্টেপ কমিয়ে দেব। সবক'টা তো পারব না। তুমি আমাকে আর ফোন কোরো না। সময় হলে আমি যোগাযোগ করে নেব'খন।'

'আপনি যা বলবেন, তাই হবে মধুজাদি। আপনি ছাড়া আমি আর কাউকে চিনি না।'

ন্যাকা। মুখে আপনি কাউকে চিনি না বলছে, এদিকে আরও তিনজনকে ধরে বসে আছে। কিছু করার নেই। লবি রাখতে এসব সহ্য করতে হয়। নইলে অভ্রনাথরাই অন্য দিকে চলে যাবে। ফোন কেটে মধুজা রায় দেখলেন, মেজাজ আরও খারাপ হয়েছে। নাক সুড়সুড়ানি বাড়ছে।

মেজাজ বিগড়ানোর ঘটনা সকাল থেকে পরপর ঘটছে।

প্রথমটা ঘটিয়েছে কমলা। রান্নার লোক। আজ আবার কামাই। গত দু'মাসে দু'বার হয়ে গেছে। তবে সেগুলো ছিল জানিয়ে। আজ না জানিয়ে। রান্নার লোক কামাই করা মানে সব ঘেঁটে যাওয়া। ইন্টেলেকচুয়্যালপনা, সকাল থেকে ফোনে ধান্দাবাজি, গ্রুপবাজি সব সব বন্ধ। রান্নাঘরে ঘেমেনেয়ে একসা হয়ে রান্না করতে হয়। সুশান্ত আবার আজ বাজার করেছে বোকার মতো। গাদাখানেক মাছটাছ এনে একাকার কাণ্ড। মধুজার ইচ্ছে করছিল, ছুড়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিই। প্রথমে খুব একচোট চেঁচামেচি করলেন। সুশান্ত বেচারি ভয়ে জড়সড় মেরে গেলেন। আমতা আমতা করতে থাকেন।

'আমি তো জানতাম না কমলা আসছে না।'

'কেন জানবে না? সংসার কি শুধু আমার? সব জানা আমাকে জানতে হবে?'

boierpathshala.blogspot.com

সুশান্ত স্ত্রীর চেঁচামেচিতে ভীত হয়ে বললেন, 'তা নয়। বাজারে যাওয়ার আগে যদি একবার বলতে...।

'কী করে বলব? কমলা কি আমাকে জানিয়েছে? বজ্জাত কোথাকার। জানালেই বা কী? মনে করে তোমাকে বলতে হবে? দেখতে পাচ্ছ না সকাল থেকে আমি লেখাপড়া করছি। ক্লাস আছে না আজ। তোমাদের মতো তো চাকরি নয়। দুটো কম্পিউটার টিপলেই হয়ে গেল। মাস গেলে গাদাখানেক মাইনে। প্রতিদিন আমাদের লেখাপড়া করে উপার্জন করতে হয়। ইস কেন যে মরতে এত পড়াশোনা করতে গিয়েছিলাম। তার থেকে বাড়ির বউ হয়ে সকাল থেকে আনাজপাতি নিয়ে বসা ভালো। বদ মেয়েছেলেটা একবারও কি আমাকে জানাতে পারল না?'

এই ধাক্কা সামলানোর আধঘণ্টা পরে ফোন করল বীতশোক। ডিপার্টমেন্টে জুনিয়র। খেলুড়ে ছেলে। সবদিক হাতে রেখে চলে। বাড়িতে ফোন করে ল্যান্ড ফোনে। ইচ্ছে করে ল্যান্ড। যাতে পরে কাউকে নম্বর দেখিয়ে চট করে প্রমাণ না করা যায় ফোন করেছিল। মধুজা রায় মাছ ধুচ্ছিলেন। আঁশটে হাতে কানে রিসিভার ধরলেন। 'ম্যাডাম, জরুরি কথা আছে।'

'কী হয়েছে?' বিরক্ত গলায় বললেন মধুজা রায়।

বীতশোক নীচু গলায় বলল, 'ডিপার্টমেন্টে কী প্রবলেম হয়েছে?'

মধুজা রায় থমকে গেলেন, 'কী হয়েছে বলো তো?'

বীতশোক বলল, 'আমি পুরোটা শুনিনি। ওভারহিয়ার করলাম। কল্যাণ সমাজপতি আর অরিন্দমদা বলাবলি করছিল।'

মধুজা রায় বললেন, 'চুপ করলে কেন? কী বলাবলি করছিল ওরা।'

বীতশোক খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'ফাইনাল ইয়ারের বারিধারা, বারিধারা সেন, তাকে নাকি কোন ছেলে অ্যাবিউস করেছে। সে প্রোটেস্ট করেছে। চড়ও মেরেছে। আপনি...।'

মধুজা চাপা গলায় বললেন, 'আমি কী?'

বীতশোক একটু থেমে বলল, 'আপনি নাকি সেই ছেলেকে শেল্টার দিচ্ছেন। সে নাকি আপনার পরিচিত। আমি কিছু জানি না। যেটুকু শুনলাম মনে হল আপনাকে জানানো জরুরি। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। অরিন্দমদা বলল, এরকম হলে ওরাও চুপ করে থাকবে না। ছেলেমেয়েদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। ঘটনার প্রতিবাদ করবে।'

শরীর ঝনঝন করে উঠল মধুজা রায়ের। কল্যাণ সমাজপতি আর অরিন্দম দুজনেই তার বিরুদ্ধে। দুটোই পাজি। সমস্যা হল, এরা কোনও লোভেই বশ মানে না। ছেলেমেয়েদের কাছে পপুলার টিচার। শিক্ষিত লোক ধান্দাবাজ হলে যেমন মারাত্মক, তেমন মেরুদণ্ড শক্ত হলেও বিপজ্জনক। এরা তাই। মেরুদণ্ড শক্ত থাকা মানুষ। সামনে পাত্তা না দিলেও মনে মনে মধুজা রায় এদের সমঝে চলেন। হাতে ক্ষমতা নেই বলে, এরা কিছু বলে না, তবে চান্স পেলে ছাড়বে না। তবে বীতশোক ছোকরাকে কিছু বলা ঠিক নয়। বললেই হয়তো ওদের ফোন করে জানাবে। মধুজা রায় শান্ত গলায় বললেন, 'ও কিছু নয় বীতশোক। তুমি চিন্তা কোরো না। ওই দুটো তো আমার পিছনে লাগবে বলে সমসময় রেডি হয়ে থাকে। লাভ হবে না। মধুজা রায়ের হাত অনেক বড়।'

ফোন ছাড়বার পর থেকে মেজাজ আরও বিগড়ে গেল।

সেই মেজাজ বিগড়ানো ইউনিভার্সিটিতে এসে বাড়ছে। তিনি থম মেরে বসে আছেন। নাক সুড়সুড় করে উঠল। মধুজা রায় হাত তুললেন। ইস, হাতে এখনও মাছ কাটবার আঁশটে গন্ধ। লব আবার ঘরে ঢুকল।

'লব, ডিপার্টমেন্টে তিথি নামের মেয়েটা এসেছে কিনা খোঁজ নাও তো। এলে বলো, আমি ডাকছি।'

তিরিশ

boierpathshala.blogspot.com

মহিলাটি কে?

খানিক আগে সেনবাড়ির উলটো দিকের ফুটপাথে মাঝবয়সি এই মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। চেহারায় বিধ্বস্ত ভাব। দূরের পথ থেকে এলে যেমন হয়। চুল উসকো-খুসকো। চোখ মুখে রোদে পোড়া কালো ছাপ। মহিলা মাঝে মাঝেই শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখে গলায় ঘাম মুছছিলেন।

আজ প্রথম নয়, গত এক বছরে বেশ কয়েকবার এই মহিলা সেনবাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কারও খেয়াল হয়নি। খেয়াল হওয়ার কথা নয়। একজন সাধারণ চেহারার বাঙালি মহিলাকে রাস্তার ভিড়ে কে খেয়াল করবে? যদিও কিছু মহিলা পথের লোকের নজর কাড়বার নানা আয়োজন জানে। পোশাকে, ভঙ্গিতে, কথাবার্তায় তারা এমন কিছু করতে পারে যে লোক মুখ না ফিরিয়ে পারবে না। শুধু পুরুষ নয়, অন্য মহিলারাও দেখতে বাধ্য। বেশি কিছু করতে হবে না, পোশাকের একটু এদিক-ওদিক ঘটিয়েই পথের মানুষের নজরে আসা সহজ। সেই নজরে কখনও মুগ্ধতা, কখনও কামনা, কখনও হিংসে থাকে।

এই পর্যন্ত সমস্যা নেই। সমস্যা হল, নজর কাড়বার পর কিছু মহিলা তেড়েফুঁড়ে ওঠে। তারা নি:সংকোচে বলে বসে, পুরুষগুলো অতি খারাপ। অশ্লীল। মেয়ে দেখলেই শরীরের দিকে নোংরা চোখে তাকায়।

'ইস! সেদিন গড়িয়াহাটে কতগুলো ধেড়ে লোক এমনভাবে বুকের দিকে তাকাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল, চড় দিই।'

এই কথা বলবার আগে মহিলার মনে থাকে না সে নিজেই সেদিন 'নজর কারবার' জন্য জামা-কাপড়ে আয়োজন করে পথে বেরিয়েছিল। নজর পাওয়ার পর আয়োজনটা যেন কোনও ব্যাপারই নয়। এই প্রসঙ্গ তুললে অনেক নারীবাদী হইহই করে ওঠে। মেয়েদের পোশাক কি তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ঠিক করে দেবে? এটা কি মধ্যযুগ? বর্বর যুগ? তা হলে কি মেয়েদের আজও পথে ঘোমটা দিয়ে বেরোতে হবে? পালকিতে পর্দা টেনে পথ চলতে হবে? বদ পুরুষমানুষ শরীরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাবে বলে ফ্যাশন বন্ধ হবে নাকি?

এই হইচইয়ের সময় নারীবাদীরা এতটাই উত্তেজিত হয়ে থাকে যে কোনও যুক্তি শুনতে চায় না। এমনিতে স্লোগান হল—'নারী পুরুষ সমান' আর উত্তেজনার সময় স্লোগান হল, 'আমরা নারী, আমাদের বক্তব্যই ঠিক।' এই সময় যদি কোনও মহিলাও যুক্তি দিয়ে কিছু বলতে চায় তা হলে তাকেও 'নারী বিদ্বেষী' বলে চিহ্নিত করা হবে। নারীকুলে কলঙ্ক। কে উত্তেজিত নারীবাদীদের বোঝাবে, এটা মধ্যযুগ নয়? এখন ছেলেমেয়ে সবাই নিজের রুচি অনুযায়ী পোশাক পরবে। যা খুশি পরবে। বেশ করবে। মেয়েরা স্বাধীন, শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী। সম্প্রতি আমেরিকার এক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে, কোম্পানি পরিচালনার ব্যাপারে মেয়েরা পুরুষদের থেকে বেশি দক্ষ। বেশি ইনোভেটিভ। শুধু সাজুগুজু নয়, সুযোগ পেলে তারা বড় বড় ব্যবসায় তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। লাভ বাড়িয়ে দিচ্ছে। মেয়েরা শান্তির জন্য আন্দোলনও করে, আবার যুদ্ধবিমান চালায়। ঘোমটা, পালকির যুগ শেষ। পোশাক-আশাকের মতো ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে চিন্তা করবার মতো সময় আর মেয়েদের নেই।

নারীবাদীদের কে বোঝাবে এসব কথা? এই যুক্তি তারা মানতে চায় না। নজর কাড়বার মতো পোশাক পরে পথে নামলে নজর পড়বেই। এক ছিপছিপে তরুণী হটপ্যান্ট পরে ক্যামাক স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তার পায়ের দিকে যদি কেউ না তাকায় তা হলে তো ওই সুন্দরী বাড়ি গিয়ে সুইসাইডের চেষ্টা করবে। সে তার পায়ের চর্চা করছে। ওয়াক্সিং, স্পা, জিমের পিছনে বড় খরচ করেছে। তবেই পা এত চমৎকার। এই চমৎকার পা কি কেবল পোশাকের পিছনে লুকিয়ে রাখবার জন্য বানানো হল? বাথরুমের বাথটবে শুয়ে পুরোনো দিনের হলিউড সিনেমার নায়িকাদের মতো তুলে নিজে দেখবার জন্য? অসম্ভব। তার ওপর হটপ্যান্টের পিছনেও খরচ আছে না? গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলাপ্যান্টের থেকে থাই পর্যন্ত প্যান্ট এখন অনেক দামি। নামে হট, দামেও হট। সব মিলিয়ে খরচ, পরিশ্রম কম হল? আগে পা দেখানোর মানে ছিল 'লাথি দেখানো'। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষেই তাই করত। তাতে কোনও খরচখরচা ছিল না। এখনে পা দেখানোতে

boierpathshala.blogspot.com

বিরাট খরচ। তারপরেও কেউ না দেখলে লোকসান। হতাশা গ্রাস করে। তবে 'পা-সুন্দরী'-দের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নজর লোকে করে। সেই নজর কামনার না প্রেমের, নাকি ঘৃণার? নাকি লজ্জার? অন্য মেয়েদের হিংসেও হতে পারে। তবে সেসব বিচার এক-একজনের কাছে এক-একরকম। যাকে বলে 'সাবজেক্টিভ' আলোচনা। নজর পড়ে এটাই সত্য। তা হলে রাগ কেন? আমার কাঁধ, বুক, পিঠ, পা, হাঁটু উন্মুক্ত। তুমি সেদিকে তাকালে আমি তোমাকে অশ্লীল, অসভ্য বলব কেন? বরং না দেখলে তো মনোকষ্ট হওয়ার কথা। এটা কি দ্বিচারিতা নয়?

আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলছে, যারা এই বিষয়ে দ্বিচারিতা করে, একরকম চায়, অথচ একরকম বলে, তারা ভালো নয়। পুরুষ নারী নির্বিশেষেই ভালো নয়। নজর কাড়বার স্থূল চেষ্টা আসলে এক ধরনের অসুখ। কেউ এই চেষ্টা করে শরীর দেখিয়ে, কেউ করে পথের মাঝে ডিগবাজি খেয়ে। নিজেদের বহুবিধ হীনমন্যতা, অক্ষমতা থেকেই এই অসুখের জন্ম। নারীবাদীদের হুঙ্কার এই অসুখকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তারা সমাজের আসল সমস্যাকে গুলিয়ে দিতে চেষ্টা করে। মনোবিজ্ঞানীরা যাই বলুন, আশার কথা, সমাজে এই ধরনের পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা কম। সেই কারণে সমাজটা এখনও বাসযোগ্য।

সেনবাড়ির সামনে দাঁড়ানো মহিলার পথের মানুষের 'নজর কাড়বার' জন্য কোনও আয়োজন নেই। বরং উলটো। মহিলা ভিড়ে যেন নিজেকে মিশিয়ে রাখতে চাইছেন। গায়ে একটা সাধারণ সুতির শাড়ি। সেটাও পিঠ ঢেকে জড়িয়ে আছেন। শাড়ির রংও ঝলমলে নয়। চট করে চোখ টানে না। মহিলাকে দেখলে মনে হচ্ছে, একেবারে দরিদ্র না হলেও টাকাপয়সা বিশেষ নেই। দাঁড়িয়ে থাকবার মধ্যে এক ধরনের জড়সড় ভাব রয়েছে।

এর আগে কখনও কখনও একে অর্চিনের ইউনিভার্সিটির সামনেও দেখা গেছে। ইউনিভার্সিটির উলটো দিকে যে বাস স্টপটা আছে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। যতবার তিনি এসেছেন, খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে তিনি চলে যান। আজ ব্যতিক্রম ঘটল। রাস্তা টপকে বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিশাল গেট। উঁচু পাঁচিল। কলকাতার বনেদি ধনী পরিবারের বাড়ি যেমন হয়। গেটের বাইরে দারোয়ান। মহিলা এগিয়ে যান।

ভীম বলল, 'কাকে চাই?'

মহিলা ইতস্তত করে বলেন, 'এটা কি কমলকান্তি সেনের বাড়ি?'

ভীম ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'উনি তো কারও সঙ্গে দেখা করবে না। নিজের ঘর থেকেই বেরোন না।'

মহিলা একটু থমকালেন। কিছু ভাবলেন। বললেন, 'ওহ আমার জানা ছিল না। তার ছেলে আছেন? বিমলকান্তি সেন?'

অপরিচিত মহিলার এই থতমত ভাবে ভীমের ভুরু কোঁচকানো আরও গভীর হল। বলল, 'আছেন'।

'তার সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

দারোয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'না, আজ স্যার বাড়িতে কারও সঙ্গে দেখা করেন না।'

মহিলা আবার একটু চুপ করে রইলেন। একেই মহিলার মধ্যে বিধ্বস্ত ভাব, তার ওপর দেখা হবে না শুনে তিনি যেন খানিকটা হতাশ হয়ে পড়লেন। ভীমের মায়া হল। দারোয়ানের মায়াদয়া থাকার কথা নয়। ভীমের এটাই সমস্যা। মাঝে মাঝে মায়ার মধ্যে পড়ে যায়। সে গলা খাকড়ি দিল। 'স্যার দেখা করেন বুধবার করে। আপনি বুধবার আসবেন। সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে আসবেন।'

মহিলা খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, 'একবার দেখা হবে না? একটু সময় নেব।'

ভীম মনকে শক্ত করল। বলল, 'না, হবে না। আপনি একটা কাজ করতে পারেন। স্যারের অফিসে গিয়ে দেখা করতে পারেন।'

মহিলা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, অত লোকজনের মধ্যে...না, না, আমি ওনার সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই...।'

boierpathshala.blogspot.com

মহিলার গলায় ভয় ভয় ভাব। কিছু একটা গোপন করতে চাইছেন যেন। বিপদে পড়লে মানুষের কখনও কখনও এরকম হয়। হাবেভাবে ব্যস্তসমস্ত। কথা বলবার সময় চারপাশে তাকাচ্ছেন। কেউ দেখে ফেলছে না তো?

ভীম চিন্তিত হল। কেউ দেখে ফেললে কী সমস্যা?

'আপনি বুধবার আসুন।'

মহিলা এবার অনুরোধের ঢঙে বলল, 'আপনি বিমলকান্তিবাবুকে একবার বলে দেখুন। একটু খানিক সময় নেব। অনেক দূর থেকে আসছি। সেই কৃষ্ণনগর থেকে।'

বাইরে চোখ-মুখ কঠিন রাখতে পারলেও ভীম ভিতরে 'মায়া' ভাব অনুভব করল। না, এভাবে চললে চাকরি থাকবে না। তবে এই মহিলার ভাবভঙ্গি অন্যরকম। সত্যি যদি কোনও সমস্যা থাকে?

'একটু দাঁড়ান। স্যারকে একবার বলে দেখছি।'

ভীম বিলমকান্তি সেনকে ইন্টারকমে ফোন করে এবং জোর ধমক খায়। ধমকের চোটে কৃষ্ণনগর নামটা ফুলিয়ার সঙ্গে গুলিয়েও যায়। বিমলকান্তি তখন আরও ধমক দেন। জানান, মুম্বই, দিল্লি থেকে এলেও কিছু করবার নেই। কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। নিজের ওপর রাগ হয় ভীমের। কেন যে 'স্যার'-কে বলতে গেল? সেই রাগ সামনে আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার ওপর পড়ে। সে একরকম হাত নাড়িয়ে ভাগিয়ে দেয়।

কিন্তু মহিলাটি কে? কেনই বা তিনি মাঝে মাঝেই এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান? অর্চিনের ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত বা ধাওয়া করেন কেন? আজ এই বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন কেন?

মহিলার নাম বৈশাখী। বৈশাখী সান্যাল। বয়স বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। মহিলা মোটেও কৃষ্ণনগর বা ফুলিয়া থাকে না। থাকেন দুর্গাপুর। জায়গার নাম বানিয়ে বলেছেন। তিনি ভীমকে নাম বলবার সুযোগ পাননি। সুযোগ পেলে নামও বানিয়ে বলতেন। বানানো নাম ঠিক করাও ছিল। মহুয়া। মহুয়া রায়। নিজের নাম, ঠিকানা মিথ্যে বলবার অভ্যেস বৈশাখী অনেকদিন ধরেই করছেন। না করে উপায় নেই। সত্যি পরিচয় দিলে অনেক ধরনের ঝামেলা। সেই ঝামেলা পুলিশ, জেল পর্যন্ত গড়াতে পারে। গড়াতে পারে কেন, গড়াবেই। যাই হোক, সেই দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় এসে সেনবাড়ির সামনে বৈশাখী সান্যালের ঘুরঘুরের কারণ কমলকান্তি বা বিমলকান্তি নন। কারণ অর্চিন। সেই কারণে তিনি অর্চিনের ইউনিভার্সিটির সামনেও যান।

ভীম ভাগিয়ে দেওয়ার পর বৈশাখী উলটো দিকের ফুটপাথ ধরে খানিকটা হাঁটলেন। খুব জল তেষ্টা পাচ্ছে। মোড়ের কাছে এসে একটা পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'ঠান্ডা আছে?'

উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে দোকানদার বলল, 'আছে বউদি। কোনটা নেবেন?'

বৈশাখী নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'যে-কোনও একটা হলেই হবে। ঠান্ডা হলেই চলবে।'

দোকানদার ঠান্ডা পানীয়ের বোতল খুঁজতে লাগল। বৈশাখী দোকানের পাশে ঝোলানো আয়নার চুল ঠিক করলেন। পেটে গোঁজা রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। খানিকটা জলের ঝাপটা দিতে পারলে হত। গরমের মধ্যে এতটা জার্নিতে চোখ-মুখ বসে গেছে। তার ওপর অর্চিনের বাড়ির সামনে অতটা সময় দাঁড়াতে হয়েছে। একবার তো বৃষ্টি নেমে গেল। সঙ্গে আবার ছাতাও ছিল না। ভাগ্যিস পিছন দিকের একটা দোকানে খানিকটা শেড ছিল, তার তলায় গিয়ে দাঁড়াতে ভেজার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল। নইলে ভেজা শাড়িতেই থাকতে হত।

দোকানদার বোতলের মুখ খুলে, স্ট্র ভরে নীচু হয়ে হাত বাড়াল।

'নিন বউদি, ভালো ঠান্ডা।'

বৈশাখী হাত বাড়িয়ে বোতল না ধরেই বলল, 'জিনিস ভালো তো?'

boierpathshala.blogspot.com

'অবশ্যই ভালো। এত বড় কোম্পানির মাল খারাপ হবে কেন? দোকানদার মহিলার বোকামিতে হাসল। এ কী বোকার মতো কথা? বড় কোম্পানির জিনিস কখনও খারাপ হয়!

হাতে বোতল নিয়েও বৈশাখী সেই বোতল মুখে না তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, 'বাজে কথা বোলো না ভাই। এই তো সেদিন পেপারে পড়লাম। কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলে পোকা। ছিপি বন্ধ ছিল তারপরেও পোকা। ইস!'

দোকানদার বলল, 'হাজারটায় একটা-দুটো ওরকম হতেই পারে।'

বৈশাখী বললেন, 'আমার এই বোতলে পোকা-টোকা নেই তো?'

দোকানদার এবার বিরক্ত হল। একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এত জাবাবদিহি তার পছন্দ হচ্ছে না। সে চুপ করে পান সাজতে শুরু করল। বৈশাখী বললেন, 'কী হল, বললে না? তুমি ভালো করে বোতল দেখে দিয়েছ তো?'

দোকানদার এবার কড়া গলায় বলল, 'আমার দোকানে এসব হয় না। কিছু থাকলে পয়সা নেব না।'

বৈশাখী এই কথায় খানিকটা যেন আস্বস্ত হলেন। বোতলে ডোবানো স্ট্রতে মুখ দিলেন। লম্বা করে টান দিলেন। আহ। শরীর জুড়োল।

'সে তুমি না হয় পয়সা নেবে না, কিন্তু পোকা পেটে গেলে আমায় তো হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।'

দোকানদার পানের সরঞ্জাম থেকে মুখ না তুলে বলল, 'বলছি তো কিছু নেই।'

স্ট্রতে এবার নিশ্চিন্তে একটার পর একটা টান দিতে লাগলেন বৈশাখী।

আজ অর্চিনকে দেখতে পেলেন না কেন? এই সময়টা তো বাড়ি থাকে। হয় ঢোকে, নয় বের হয়। শরীরটরীর খারাপ হল না তো? আবার ইউনিভার্সিটিও যেতে পারে। হয়তো সকাল সকাল বেরিয়ে গেছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা আছে। ছেলে লেখাপড়ায় খুবই ভালো। আহা! মন ভরে যায়। এই ছেলের বাবাও ঠিকমতো লেখাপড়া করলে ভালো করত। অঙ্কে মাথা ছিল। পড়াশোনাই তো করেনি। এখন একবার ইউনিভার্সিটি গেলে হত। অর্চিনকে পাওয়া যেত। শুধু একবার দূর থেকে দেখা। অতদূর থেকে আসা তো শুধু একবার ছেলেটাকে চোখের দেখা দেখতে। ইদানীং অবশ্য কাজ নিচ্ছেন বৈশাখী। কলকাতায় পার্টি ধরছেন।

চিৎকার করে উঠল উঠলেন বৈশাখী।

'এ কী! এ মা! কী এটা?'

বোতল হাতে ধরে নাক-মুখ কুঁচকে আছেন বৈশাখী। বোতল প্রায় শেষ। পানীয়র তলানিতে গোল মতো কিছু একটা ভাসছে। কালো পোকার মতো চেহারা। রোঁয়াও আছে। দোকানদার হাতের কাজ ফেলে ঝুঁকে পড়ল।

'কী হল বউদি?'

বৈশাখী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

'কী হল? কী হল বলছ! দেখো, দেখো বোতলে কী পড়ে আছে। ওয়াক।'

বৈশাখী গলা-বুকে হাত রেখে বমির ভঙ্গি করলেন। হাত বাড়িয়ে বোতল নিল দোকানদার। চোখের সামনে তুলে দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

ধমকে উঠলেন বৈশাখী।

'কী দেখছ? পোকা চিনছ? ফাজলামি হচ্ছে? এই জন্য বলেছিলাম, বোতলটা দেখে দাও। ওয়াক। ওয়াক। এবার আমার কী হবে? বমি পাচ্ছে।'

পথের দু-একজন মুখ ঘুরিয়ে দেখছে। ক'জন দাঁড়িয়েও পড়ল। দোকানদার তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'ঠিক আছে বউদি, ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে দাম দিতে হবে না।'

বৈশাখী আরও জোর ধমক দিতে গেলেন! দাম! এরপরেও দামের কথা বলছে লোকটা! নিজেকে সামলালেন।

boierpathshala.blogspot.com

'ঠিক আছে। আর যেন কখনও এমন না হয়।'

বৈশাখী চোখ-মুখ কুঁচকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা অটোতে উঠলেন। তিনি এখন যাবেন শিয়ালদা। বৈশাখী মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকালেন। ব্যস্ত কলকাতা ছুটছে। বেচারি পান-সিগারেটের দোকানদার। যখন বোতলের তলানিটুকু ফেলে, পরীক্ষা করে দেখবে, ওই কালো গোল জিনিসটা পোকা-টোকা কিছু নয়, দলা পাকানো সুতো, তখন তিনি অনেক দূরে। এ কাজ তিনি আগেও কয়েকবার করেছেন। কোলড্রিঙ্কস খেতে খেতে শাড়ির আঁচল থেকে সুতো ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে বোতলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এতে তেষ্টাও মেটে আবার খরচও হয় না। শ্রীমতী বৈশাখী সান্যাল মনে-মনে হাসলেন। লেখাপড়ায় ফার্স্ট হওয়া গুড বয় অর্চিন যদি জানত, তার মা এভাবে লোক ঠকিয়ে বেড়ায় তা হলে কী করত? কাঁদত? নাকি ঘেন্না করত? খুব জানতে ইচ্ছে করে।

একত্রিশ

'দ্য ক্যালকাটা' হোটেলের ঘরে ঢুকে বৈশাখী সান্যাল অবাক হলেন।

এই দুনিয়ায় ঠকবাজ, জালিয়াত, দু'নম্বরী লোকদের দেখতে বেশি ভদ্রলোকের মতো হয়। অরিজিনালের থেকে বেশি। পোশাক-আশাক ফিটফাট। কথাবার্তা, চালচলন, জুতো পালিশের মতো চকচকে। হয় শুদ্ধ বাংলা, নয় চাপা গলায় ইংরেজিতে কথা বলে। মনে হবে শিক্ষা, রুচি, ভদ্রতায় এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। সেই সঙ্গে সততার পূজারি। দরিদ্র অসহায় মানুষের জন্য মন আকুল। গত পনেরো বছরে বহু চিটিং কারবারির সঙ্গে বৈশাখীর দেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে কারও কারওকে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। দু'নম্বরী কাজকে এরা ভারী সুন্দর মোড়কে ঢেকে রেখেছে। ভদ্রতার মোড়ক। গোটা বিষয়টাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অফিসে, স্কুলে, কলেজে, পথেঘাটে, ট্রামেবাসে, কলকাতার নন্দন চত্তরে এদের দেখলে মানুষ ভক্তি শ্রদ্ধা দেখায়। ছেলেমেয়েকে ফিসফিস করে বলে, 'বাবু, বড় হয়ে তোমাকে এনার মতো হতে হবে। যাও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো।'

ঘরে ঢুকে বৈশাখী এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। ঠিক ঘরে এসেছেন তো? নীচের রিসেপশন থেকে তো এই ঘরের কথাই বলল। রিসেপশনের লোকটা ভিখিরি মার্কা স্যুট পরেছে। অনেকদিন কাচা হয়নি। ডানহাতের বগলের কাছটা কুঁচকে আছে। বুকের কাছে একটা বোতাম নেই। তবে দ্যা ক্যাটকাটা হোটেলের সঙ্গে মানানসই। ঢোকবার সময়েই বৈশাখীর মনে হচ্ছিল, এই বাড়িটাও যেন অনেকদিন কাচা হয়নি।

'আপনিই মিসেস সান্যাল?'

'হ্যাঁ।'

'কার কাছে এসেছেন?'

বৈশাখী একটু থমকে থেকে বললেন, 'এডি'।

রিসেপশনের লোকটা টেবিলের একপাশে রাখা ইন্টারকম কানে দিয়ে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল। রিসিভারের দিকে তাকাল। ফোনে গোলমাল হলে সবাই রিসিভারের দিকে তাকায়। লোকটা নম্বর টিপে কয়েকবার ঘটঘট করল। দু'বার রিসিভারে চড় মারল। লাভ হল না, ফোন রেখে দিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, 'থার্ড ফ্লোরে চলে যান। একশো পাঁচ নম্বর রুম।'

'সিঁড়ি কোনদিকে?'

'ওইদিকে লিফট।'

'লিফটে নয়। সিঁড়িতে যাব।'

লোকটা মুখ তুলে চাপা গলায় বলল, 'অতটা হেঁটে উঠবেন কেন? লিফটে যান?'

'বৈশাখী বলল, আমি সিঁড়িতেই যাব। সিঁড়ি কোনদিকে?'

boierpathshala.blogspot.com

এই কায়দাটা শিখিয়ে গেছে অর্চিনের বাবা।

'অচেনা বাড়িতে কাজে গেলে চট করে লিফটে ওঠানামা করবে না। করলেও সিঁড়িটা চিনে রাখবে। কোনওরকম গোলমাল হলে পালানোর অপশন জানতে হয়। লিফট সব সময় নিজের হাতে থাকে না। যখন দরকার তখন হয়তো দেখবে দশতলার ওপর উঠে বসে আছে। নামতে নামতেই বিপদে পড়ে যাবে।'

নোংরা কোট পরা রিসেপশনিস্ট সিঁড়ির পথ দেখিয়ে আবার ভাঙা ইন্টারকমে মন দিল। এবার তার ধরে টানাটানি করছে। বৈশাখী মনে মনে বললেন, যেমন হোটেল, তেমন তার রিসেপশনিস্ট, তেমন তার ইন্টারকম। নিশ্চয় লিফটে উঠলে কোনও একটা বিপত্তি ঘটত।

তিনতলায় উঠে ডানদিকের করিডর দিয়ে খানিকটা গেলে একশো পাঁচ নম্বর রুম। বৈশাখী করিডরে যেতে যেতেই হাত দিয়ে চুল ঠিক করলেন। আঁচল দিয়ে মুখ মুছলেন। একশো পাঁচ নম্বর ঘরের দরজা আধখানা খোলা। একসময়ে এইসব জায়গায় একা আসা-যাওয়া করতে ভয় করত। কে কোথায় ফাঁদ পেতে আছে কে জানে! হয়তো পুলিশ বসে আছে ঘাপটি মেরে। তার ওপর মহিলা। চিটিংবাজ, চোর, স্মাগলার, ছ্যাঁচোড় নিয়ে কাজ। খারাপ কিছু করে বসতে পারে। অর্চিনের বাবা ভরসা দিয়েছিল।

'এই চিন্তা করবে না। চোর-ছ্যাঁচোড়রা প্রফেশনাল হয়। তারা যাকে দিয়ে কাজ করায় তার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করে না। তারা যখন খারাপ কাজ করে সেটাও প্রফেশনালভাবে করে। খুব বেশি হলে তোমাকে প্রস্তাব দিতে পারে। জোরজুলুম করবে না।'

বৈশাখী রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'প্রস্তাব দেবেন মানে! আমার সঙ্গে নোংরামি করবে কিনা তার প্রস্তাব দেবে!'

অর্চিনের বাবা শুয়ে শুয়েই হেসেছিল। বলেছিল, 'আমরা যেটাকে নোংরামি বলি, সবাই সেটাকে নোংরামি বলে না বৈশাখী। আবার উলটোটাও তাই। কোনটা পরিষ্কার, কোনটা নোংরা কে বলবে?'

অর্চিনের বাবা সাত বছর হল মারা গেছে। এখন আর কায়দা শেখানোর কেউ নেই। বৈশাখী নিজেই সাবধান হতে শিখেছে। খারাপ কাজ যারা করে তারা নিজেদের লোকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না, এটা ঠিক নয়। তার একাধিক অভিজ্ঞতা আছে। অর্চিনের বাবাকে সবটা বলা হয়নি। ইচ্ছে করেই হয়নি। তখন বয়স কম ছিল। এখন বয়স বেড়েছে। এই শরীর দেখে পুরুষমানুষের বাসনা জাগবে না। তারপরেও বিশ্বাস নেই। সেরকম কিছু হলে যাতে নিজেকে বাঁচানো যায় তার ব্যবস্থা আছে। শুধু তাই নয়, পেশাগত কোনও ঝামেলার হাত থেকে হঠাৎ বাঁচতে হলেও ব্যবস্থা লাগে। বৈশাখী সান্যাল কাঁধের ভ্যানিটি ব্যাগে রিভলভার রাখেন। তাতে ছ'টা বুলেট ভরা আছে। জিনিস কেনবার পর ফাঁকা জায়গায় গিয়ে চালানো শিখেও এসেছেন। যারা বেচেছে, তারাই শেখানোর ব্যবস্থা করেছিল। দুটো বুলেট ফ্রি দিয়েছে। তারপরেও আরও তিনটে বুলেট কিনে গুলি ছুড়েছিলেন বৈশাখী। খুব আরাম হয়েছিল।

হাত বাড়িয়ে একশো পাঁচ নম্বর ঘরের দরজায় টোকা দিলেন বৈশাখী।

ভিতর থেকে ফিনফিনে গলায় কেউ কথা বলে উঠল।

'ভিতরে আসুন মিসেস সান্যাল।'

পার্টি জানল কী করে? রিসেপশনের ফোন ঠিক হয়েছে? নাকি লিফটে করে এসে খবর দিয়ে গেছে?

বৈশাখী সান্যাল ঘরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ঘরের একপাশে চেয়ার-টেবিল। লোকটা টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আছে। টেবিলে চায়ের কাপ। এ কেমন পোশাক! মলিন শার্ট, প্যান্ট। উস্কোখুস্কো চুল। একমুখ দাড়ি। চিমসে মার্কা চেহারা। চোখে এক ধরনের চোর চোর ভাব। শুধু চোখ কোন, গোটা চেহারাটার মধ্যেই এক ধরনের চোর-ছ্যাঁচোড় ভাব। যে দেখবে তারই সন্দেহ হবে। এই পোশাক, এই চেহারা দিয়ে কখনও চুরি-চামারির কাজ করা যায়? কাজ করতে হয় ভদ্রলোকের পোশাকে।

অর্চিনের বাবা প্রথম যে দু'নম্বরী লোকটার কাছে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তার কথা আজও বৈশাখী ভুলতে পারেননি।

boierpathshala.blogspot.com

অর্চিনের বাবা বলেছিল, 'আজ তোমাকে একজন বিরাট মানুষের কাছে নিয়ে যাব।'

'কার কাছে?'

অর্চিনের বাবা বলল, 'অবনী সমাজপতি।'

বৈশাখী ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, 'নামটা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন শুনেছি।'

অর্চিনের বাবা হেসে বলেছিল, 'স্বাভাবিক। শুধু শোনওনি, দেখেওছ। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে অবনী সমাজপতির ছবি বের হয়।'

বৈশাখী বললেন, 'তাই হবে। উনি নেতা-মন্ত্রী নাকি?'

অর্চিনের বাবা বলল, 'না, উনি সমাজসেবী। সমাজের দরিদ্র, দু:খী মানুষের সেবা করেন।'

বৈশাখী বললেন, 'বা:। ভালোমানুষ তাহলে।'

অর্চিনের বাবা মুচকি হেসে বলল, 'ঠিকই বলেছ। ভালোমানুষ। অমন ভালোমানুষ না থাকলে আমাকে না খেয়ে মরতে হত।'

বৈশাখী অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'না খেয়ে মরতে হত! মানে?'

অর্চিনের বাবা বলল, 'মানে আর কী, এই যে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, কাজকর্ম নেই, ধেড়ে বয়েসে বেকার, এদিকে বিয়ে করে বসে আছি, এরকম মানুষ না থাকলে সংসার চলত কীভাবে?'

বৈশাখী বলেছিলেন, 'এসব কী বলছ! বুঝতে পারছি না।'

'বুঝে কাজ নেই। গেলেই বুঝতে পারবে।'

বৈশাখী চুপ করে গিয়েছিলেন। অর্চিনের বাবার অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর। কাজ চলে গেছে। হাতে টাকাপয়সা নেই। এদিকে পেটে তখন অর্চিন এসে গেছে। লোকটা কাজের জন্য পাগলের মতো ঘুরছে। কিন্তু কাজ পাওয়া যাচ্ছে না।

কারখানায় কাজ করলে কী হবে, অর্চিনের বাবা না ছিল লেখাপড়া জানা ইঞ্জিনিয়ার, না ছিল মেকানিক। এমনকী লেবারও নয়। মাঝারি ধরনের ম্যানেজারের কাজ করত। মাঝারি ধরনের কর্মীর কাজকর্ম চলে গেলে বিপদ। এদের বিশেষ কোনও যোগ্যতা থাকে না। আবার প্রেস্টিজের কারণে যে-কোনও কাজ চট করে করতেও পারে না। বন্ধ কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাশিয়াররা কেউ কেউ এদিক-ওদিক কাজ পেয়ে গেল। অনেক লেবার এখানে-সেখানে মুটে-মজুরের কাজ শুরু করে দিল। কেউ কেউ ঠেলাও চালাতে শুরু করল। অর্চিনের বাবার জন্য কোনওটাই সম্ভব হল না। বয়স হয়ে গেছে। বেশি খাটাখাটনি সম্ভব ছিল না। একটা চাকরি ছেড়ে দিতে হল। ন'ঘণ্টা, দশ ঘণ্টার কাজ ছিল। বেতনও কম। তার ওপর লোকটার মেজাজ ছিল অদ্ভুত। সহজে রাগত না। কিন্তু রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকত না। ঠিক এই কারণে বৈশাখীর বাবা-মায়ের সঙ্গে তুলকালাম করে এসেছিল। বড় মেয়ে বিয়ে করে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার পর বৈশাখীর মা সতর্ক হয়েছিলেন। মণিকুন্তলা সেনের খুড়তুতো বোন। তিনি মেয়েকে চোখে চোখে রাখতেন। যাতে বড় মেয়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। মেয়ে যেন কিছুতেই প্রেম না করে। ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা তো দূরের কথা, কিশোরী বৈশাখীকে ছেলেদের মুখোমুখিও হতে দিতেন না সেই মহিলা। স্কুলে যাতায়াতে পাহারা। ছাদে পাহারা। বিয়েবাড়িতে পাহারা। আত্মীয়দের বাড়িতে থাকা বন্ধ। বন্ধুদের বাড়িতে একা যাওয়া নয়। এমনকী সকাল-বিকেল মেয়ের খাতাপত্র ঘেঁটে দেখা হত। প্রেমপত্র নেই তো? এই নজরদারি মেয়ে বড় হওয়ার পরও চলল। তারপরেও মেয়ে কলেজে ঢুকেই প্রেমে পড়ল। নরমাল প্রেম নয়। পাগলের মতো প্রেম। নিজের ভালোমন্দর জ্ঞান ছিল না। বাড়িতে এত কড়াকড়ির জন্যই প্রেমের তীব্রতা ছিল ভয়ংকর। সেকেন্ড ইয়ারে বিয়ে করে এসে মাকে খুব শান্তভাবে খবর দিয়েছিল।

'আমি বিয়ে করেছি মা। আজ আমাদের রেজিস্ট্রি হয়েছে।'

'বিয়ে! রেজিস্ট্রি! কী বলছিস হাবিজাবি কথা?'

boierpathshala.blogspot.com

'কথাটা হাবিজাবি নয়, তবে বিয়েটা হাবিজাবি হয়েছে। আমার বর এখনও কোনও চাকরিবাকরি করে না। এটা একটা সমস্যা।'

'বৈশাখী কী বলছিস এসব কথা! কী বলছিস তুই! আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস?'

'না মা, ঠাট্টা করছি না। ছেলে ভালো কিনা জানি না। লেখাপড়া বিশেষ করেনি। প্রেমে পড়বার কারণে অতসব বিচার করিনি। করবও না। আমাকে খুব ভালোবাসে শুধু এইটুকু বুঝেছি। তবে সেটাও এখন পর্যন্ত। পরে কী হবে জানি না।'

'কেন এরকম করলি?'

'কী বলছ মা! কেন প্রেমে পড়লাম কেউ বলতে পারে?'

'তুইও দিদির মতো আমাদের মুখে চুনকালি দিলি?'

'আমাদের প্রেম যদি তোমাদের মুখে চুনকালি হয়, সেটা তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের। দিদির সঙ্গে তোমরা যে ব্যবহার করছ, সেটা অন্যায়। দিদির বিয়ে তোমরা মানওনি। পরবর্তী জীবনে আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছ, সেটা অত্যাচার। ক্লাস নাইনে লেটার বক্সে ছেলেদের চিঠি পেয়ে বাবা আমাকে রাতে বেল্ট দিয়ে মেরেছিল। অথচ সেই চিঠির বিন্দুবিসর্গ আমি জানতাম না। সেদিন রাতে গায়ে বেল্টের জ্বালা নিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যদি কোনওদিন সুযোগ হয়, ওই চিঠি যে লিখেছে, তার সঙ্গে প্রেম করব। তাকে বিয়ে করব। সে যে-ই হোক। তুমি শুনলে খুশি হবে মা, আমি সেই ছেলেকে খুঁজে পেয়েছি। তাকে আমি বিয়েও করেছি। আনন্দের কারণে যাচাই করে দেখতে পারিনি, ছেলে আমাদের পরিবারের যোগ্য কিনা।'

'আমি এ বিয়ে মানি না।'

'কিছু এসে যায় না। আমি দিদির মতো চলে যাব।'

বৈশাখীর বাবা পরদিন অফিস গেলেন না। সারাদিন বাড়িতে থম মেরে বসে রইলেন। বিকেলে মেয়েকে বললেন, 'ছেলেটিকে বাড়িতে একবার ডাকতে পারবে? নাকি তার এ বাড়িতে আসবার সাহস নেই?'

বৈশাখী ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, 'পারব।'

'তাহলে ডাকো।'

বৈশাখী নীচু গলায় বলল, 'তুমি কি চিন্ময়কে বকাবকি করবে? অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে, সেটা কিন্তু তার একার নয়। বিয়ের জন্য আমিই তাকে চাপ দিয়েছিলাম।'

বৈশাখীর বাবা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'তুমি ছেলেটিকে খবর দাও। তার সঙ্গে আজ বিকেলে আমি চা খাব।'

বৈশাখীর বর চিন্ময় এল সন্ধেবেলা। তখন চেহারা ছিল রোগা-পাতলা। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। হাবভাবে এক ধরনের ডোন্ট কেয়ার ভঙ্গি। চোখমুখ বলছে, রণক্ষেত্রে প্রবেশের আগে মনে মনে তৈরি হয়েই এসেছে।

বৈশাখীর বাবাকে নীচু হয়ে প্রণাম করতে গেলে তিনি বাধা দিলেন। 'থাক, ওসব লাগবে না। বসো।'

ভিতর থেকে চা এল। শুধু চা-ই এল। বৈশাখীর যতদূর মনে পড়ে, বাবা সেরকমটা আদেশ করেছিলেন।

'শুধু চা দেবে। আর কিছু নয়।'

সেই চা আসবার পর বৈশাখীর বাবা বললেন, 'নাও, চা খাও।'

চিন্ময় বলে, 'থাক, ও সব লাগবে না। কেন ডেকেছেন বলুন।'

বৈশাখীর বাবা এই উত্তরে খানিকটা থমকে যান। সম্ভবত বুঝতে পারেন, এই ছেলে কঠিন। লড়াই করবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমার মেয়েকে ডিভোর্স দিতে হবে।'

চিন্ময় বলল, 'কেন?'

বৈশাখীর বাবা বললেন, 'আমি আমার বড় মেয়েকে হারিয়েছি। ছোট মেয়ের জীবন নষ্ট হতে দেব না।'

boierpathshala.blogspot.com

চিন্ময় চেয়ারে হেলান দিয়ে, মৃদু হেসে বলল, 'আমাকে বিয়ে করায় আপনার মেয়ের জীবন নষ্ট হবে ভাবছেন কেন?'

বৈশাখীর বাবা বললেন, 'যদি নষ্ট না হয়, সে যদি রাজরানি হয়, তাতেও কিছু আসে যায় না আমার। মেয়েকে আমি আমার পছন্দমতো বিয়ে দেব। তাতে তার ক্ষতি হলে হবে। আমি তার জন্ম দিয়েছি, আমি তার জীবন তৈরি করব। যাই হোক, কথা বাড়াতে চাই না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। তুমি ডিভোর্স দেবে। কালই আমি উকিল ডেকে কাগজপত্র তৈরি করে ফেলব। তুমি এসে সই করে দেবে। এই সময় আসবে।' একটু থামলেন, তারপর অবহেলায় বললেন, 'আর হ্যাঁ। আমি তোমায় কিছু টাকা দেব। এইসব করতে তোমার নিশ্চয় খরচাপাতি হয়েছে। কত লাগবে বলো? বিশ হাজার?'

চিন্ময় চুপ করে রইল। বৈশাখীর বাবা বললেন, 'কী হল, চুপ করে গেলে কেন? বিশে হবে না? পঁচিশ?'

চিন্ময় নীচু গলায় বলল, 'আমি যদি রাজি না হই?'

বৈশাখীর বাবা কড়া চোখে তাকালেন। দাঁত ঘষে বললেন, 'রাজি না হলে বিপদ হবে।'

'কার?'

বৈশাখীর বাবা ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ?'

চিন্ময় এবার হেসে বলল, 'আপনি যদি আমার সঙ্গে রসিকতা করতে পারেন, আমি পারব না কেন? বিয়ের পরদিন যদি কাউকে ডেকে ডিভোর্স করতে বলা হয়, সেটা রসিকতা ছাড়া কী?'

বৈশাখীর বাবা এবার চিৎকার করে উঠলেন।

'শট আপ। সান অফ আ বিচ। পুলিশ ডেকে লকআপে ঢুকিয়ে দেব। মেরে হাড় ভেঙে দেব শুয়োরের বাচ্চা।'

চিন্ময় উঠে দাঁড়াল। ঠান্ডা গলায় বলল, 'আপনি আমাকে যা বললেন, তার জন্য আপনার আমার কাছে একটা চড় প্রাপ্য। কিন্তু আমি আপনাকে মারলাম না। সম্পর্কে আপনি আমার শ্বশুরমশাই হন। শ্বশুরমশাইয়ের গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়। ভেবেছিলাম, ক'দিন পরে, একটা কাজকর্ম জোগাড় করে বৈশাখীকে নিয়ে যাব। কিন্তু এখন সিদ্ধান্ত বদল করলাম। আজই আপনার মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যাব। অবশ্য যদি সে যেতে চায়।'

বাবার চিৎকার শুনে আড়াল থেকে বৈশাখী এবং তার মা ছুটে এসেছিলেন। বৈশাখীর দিকে তাকিয়ে ছেলে বলল, 'তুমি কি আজ আমার সঙ্গে যাবে বৈশাখী?'

বৈশাখী একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'চলো, আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি।'

মেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাবা বলেছিলেন, 'আর কোনওদিন এ বাড়িতে ঢুকবে না।'

বৈশাখী মলিন হেসে বলেছিলেন, 'আমি জানি বাবা। আমাকে আর এ বাড়িতে আসতে হবে না।'

না, বৈশাখী জানতেন না। তাকে এ বাড়িতে আবার আসতে হল। তখন বড় দু:সময়।

অর্চিনের বয়স তখন আট মাস। চিন্ময় জেলে। সোনার দোকানে হাতসাফাই করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পুলিশ বেদম মারধর করেছে। বৈশাখীর নামও পেয়েছে। সোনার দোকানে অপারেশনের সময় চিন্ময়ের সঙ্গে বৈশাখীও ছিল। দুজনে মিলে গয়না কেনবার ভান করছিল। এটা-সেটা নেড়েচেড়ে দেখছিল। এক ফাঁকে বৈশাখী গলায় পরা নকল চেইন খুলে দোকানের আসল চেইনের সঙ্গে বদলে দেন। হাতের আংটিও বদল করে। তখনকার দিনে এত সি সি টিভির নজরদারি ছিল না। তার পরেও দুদিনের মধ্যে চিন্ময়কে পুলিশ ধরে ফেলে। তারা বৈশাখীর খবরও পায়। পুলিশ তাকে যে-কোনও সময় ধরবে ধরবে অবস্থায় বৈশাখী আট মাসের অর্চিনকে কোলে নিয়ে বাড়িতে পালিয়ে আসেন। বাবা-মা দুজনেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। চোর মেয়েকে তারা বাড়িতে কিছুতেই আশ্রয় দেবেন না। ইতিমধ্যে তারা কানাঘুষোয় খবর পেয়েছিলেন, চিন্ময় কাজকর্ম হারিয়ে চুরিচামারি, চিটিংবাজি, স্মাগলিং-এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তাদের মেয়েও হাত মিলিয়েছে। দুজনেই

boierpathshala.blogspot.com

মনকে বুঝিয়েছিলেন, তাদের কোনও সন্তান নেই। এই মেয়েকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তার ওপর পুলিশের তাড়া খেয়ে এসেছে। ছি:। ছি:।

বৈশাখী বলেছিলেন, 'আমাকে রাখতে হবে না। আমার ছেলেটাকে তোমরা রেখে দাও। আমাকে পুলিশ ধরলে, ছেলেটা ভেসে যাবে।'

কঠোর বাবা-মা প্রথমে তাতেও রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত নাতির মুখ দেখে মায়া হয়। মেয়েকে বলেন, নাতিকে তিনি রাখতে পারেন। কিন্তু শর্ত মানতে হবে। ভবিষ্যতে কোনওদিন ফিরে এসে ছেলের দাবি করা যাবে না। সে জানবে, শিশু বয়েসেই তার মা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধু মুখে বললে হবে না। লিখে দিয়ে যেতে হবে। যতদিন ছেলে নাবালক থাকবে, তার ওপর কোনও দাবি করা যাবে না। বৈশাখী আগুপিছু ভাবেননি। ছেলেকে বাঁচাতে বাবার শর্তে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। হাতে সময় নেই। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পারলে, পরে আবার দেখা যাবে। বাবা-মা তো। কতটাই বা কঠিন হতে পারবে। নিজের চোর-চিটিংবাজ বাবা-মায়ের থেকে দাদু-দিদার কাছে থাকলে সে মানুষ হবে।

সেদিন রাতেই বাড়িতে পুলিশ এল। বৈশাখীর সুটকেসে চুরি করা সোনার চেইন পাওয়া গেল। বৈশাখীকে ধরে নিয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সাজা হয়। জেল থেকে বেরিয়ে দুজনেই ঠিক করে, ছেলের থেকে তারা দূরে থাকবে। জেলখাটা বাবা-মার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক না থাকাই ঠিক।

অর্চিন দাদু-দিদার কাছে থেকে বড় হয়। লেখাপড়ায় মন বসে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে থাকে। ক্লাসে ফার্স্ট হয়। বৈশাখী বাবাকে লুকিয়ে মাকে মাঝে মাঝে ফোন করতেন। মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতেন। 'কেন তুই ফোন করেছিস?'

'অর্চির খবরটুকু শুধু দাও মা।'

'কী করবি খবর নিয়ে? ছেলেকে নিয়ে যাবি?'

'না না, শুধু খবরটুকু জানব। সে ভালো আছে?'

'ওকে বিরক্ত করিস না। ওইটুকু ছেলে সারাদিন বই পড়ে। ক্লাসে এবারও ফার্স্ট হয়েছে।'

বৈশাখী ফোনের ওপাশে কেঁদে ফেলে।

'বা:, তোমরা ওকে মানুষ করেছ।'

'তুই ওকে বিরক্ত করিস না। ওর সামনে আসিস না। জেলখাটা বাবা-মার কথা জানলে ছেলেটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। মা হয়ে তুই এই সর্বনাশ করিস না।'

'কখনও করব না। কোনও দিনও করব না। অর্চি কি আমার কথা জিগ্যেস করে?'

'না করে না। আমরা তাকে বুঝিয়েছি। কতজনেরই তো বাবা-মা থাকে না। অন্য লোকে দত্তক নেয়। তাদের কাছে মানুষ হয়। আমরা তো ওর নিজের দাদু-দিদা। তুই ওকে নিয়ে যাস না বৈশাখী। নিজের যে সর্বনাশ করেছিস, ওর করিস না।'

'করব না মা।'

বৈশাখী মনকে শক্ত করে নিয়েছিলেন। চিন্ময়ও বুঝিয়েছিল।

'ছেলেটাকে মানুষ হতে দাও বৈশাখী।'

বৈশাখী বলেছিলেন, 'আমরা কি এইসব অপরাধের কাজ ছেড়ে দিতে পারি না?'

চিন্ময় বলেছিল, 'পারব না কেন? পারি বই কী। এই কাজ ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষে করে থাকতে পারি। না খেয়ে মরতে পারি।'

'যারা চুরি-চামারি করে না, তারা কি সবাই না খেয়ে মরে? আমরা না হয় কম খেয়ে থাকব।'

চিন্ময় বলল, 'কোথায় থাকব? বস্তিতে?'

বৈশাখী বললেন, 'দরকার হলে তাই থাকব।'

'পারবে?'

boierpathshala.blogspot.com

বৈশাখী হেসে বলেছিলেন, 'জেলে থাকতে পেরেছি, আর বস্তিতে থাকতে পারব না?'

চিন্ময় হেসে বলল, 'তাতে গা থেকে জেলের গন্ধ যাবে?'

বৈশাখী বললেন, 'না যাক। আমরা চেষ্টা করি।'

চিন্ময় মৃদু হাসল। বলল, 'পুরোনো কথা ভুলে গেলে বৈশাখী? তখনও তো চেষ্টা করেছিলাম। লাভ হয়েছিল কোনও?' কথাটা ঠিক। কারখানার কাজ চলে যাওয়ার পর চিন্ময় নতুন করে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। পাকাপাকি কাজ জোটেনি কোনও। ঠুকরে চলছিল। এখানে একমাস, সেখানে দশদিন। এইভাবে চলতে চলতে কাঞ্চন রক্ষিতের সঙ্গে যোগাযোগ। কাঞ্চন ছিল নামকরা চিটিংবাজ। অপরাধ জগতে তার নাম ছিল চিটকাঞ্চন। বাড়ি-জমি নিয়ে কারবার করত। একই সম্পত্তি তিন জায়গায় বেচত। জাল দলিল থেকে জাল রেজিস্ট্রেশন—সবের ব্যবস্থা ছিল। চিটকাঞ্চন একদিন চিন্ময়কে ডেকে পাঠাল।

'আমার সঙ্গে কাজ করবে?'

চিন্ময় লোকটার নাম শুনেছিল। সাবধানে বলল, 'কী কাজ?'

'কী কাজ সে পরে বলব। আগে বলো করবে কিনা।'

চিন্ময় অবাক হয়ে বলল, 'কী কাজ না জেনে হ্যাঁ-না বলব কী করে?'

চিটিকাঞ্চন বলল, 'এই লাইনে এটাই নিয়ম। আগে হ্যাঁ-না, তারপর কাজের কথা।'

চিন্ময় চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার কাজ মানে তো ঝামেলা।'

চিটিকাঞ্চন সহজভাবে বলল, 'ঝামেলা তো বটেই। চিটিংয়ের কারবার করি, ঝামেলা থাকবে না? ঝামেলা বেশি বলে টাকাও বেশি। দোকানে ম্যানেজারি করে কত টাকা পাও? আমার কাছে তার তিনগুণ পাবে। রাজি কিনা বলো?'

চিন্ময় বলল, 'হঠাৎ করে আমাকে ধরলেন কেন? আপনার কি মনে হয় আমি দু'নম্বরি কাজ ভালো পারব?'

চিটিংকাঞ্চন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'মনে হচ্ছে। তোমার চেহারার মধ্যে একধরনের শিক্ষিত, সৎ-সৎ ভাব আছে। আমি এই ধরনের চেহারা খুঁজছিলাম। তুমি যে দোকানে কাজ করো, সেখানকার লোক আমাকে খবর দিয়েছে।'

চিন্ময় হেসে ফেলল। নিজের চেহারা নিয়ে এরকম কথা সে কখনও শোনেনি।

'কী করতে হবে?'

চিটিংকাঞ্চন বলল, 'তাহলে রাজি তো?'

'পুলিশ ধরবে না তো?'

চিটিংকাঞ্চন সহজভাবে বলল, 'ধরতে পারে। চান্স আছে। তবে ধরলেও বেশিদিন ভিতরে রাখতে পারবে না। আমাদের ব্যবস্থা আছে। কেস লাইট করে দেওয়া হয়।'

চিন্ময় এই অকপট ভঙ্গিতে মজা পেল। বলল, 'কাজটা বলুন।'

বত্রিশ

প্রথম হিসেবে কাজটা সহজ ছিল। তবে ইন্টারেস্টিং। এই দেশে জালজোচ্চুরি যে একটা চমৎকার শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেটা বোঝা যায়। তার ওপর গোটা অপারেশনের মধ্যে অভিনয়ের একটা বড় অংশ আছে। এতে চিন্ময় ঘাবড়েছিল।

'অভিনয় তো আমার জানা নেই।'

চিটিংকাঞ্চন বলেছিল 'চিন্তা করবার কিছু নেই; অভিনয় জানতে হয় না। এটা নিজে থেকেই আসে। সারাক্ষণ তো অভিনয়ের ওপরই আছি। আছি কিনা? ঘরে-বাইরে আমরা এক-একজন বড় অভিনেতা।

boierpathshala.blogspot.com

হাসি-কান্না, রাগ সব অভিনয়। চিন্তা নেই, কাজের সময় কী বলতে হবে, শুধু যেটুকু শিখিয়ে দেব। তারপর নিজের মতো এগোবে।'

চিন্ময় বলল, 'যদি গোলমাল হয়ে যায়?'

চিটিংকাঞ্চন নির্লিপ্তভাবে বলল, 'গোলমাল তো হবেই। আজ না হোক, কাল হবে। আমার এখনও কত গোলমাল হয়।'

'কী হবে তখন?'

চিটিংকাঞ্চন বলল, 'সেটা কাজের ওপর নির্ভর করছে। অপারেশন কেমন, তার ওপর নির্ভর করছে। পাবলিক ডিলের ব্যাপার হলে প্যাদানি হতে পারে। আরও বড় কেস হলে পুলিশে ধরতে পারে। সেখানেও অভিনয় করে, বুদ্ধি দিয়ে বেরোতে হবে। দু'নম্বরী কাজ আসলে বুদ্ধির কাজ। বোকা মানুষ পারে না। পারে না বলেই সৎ সেজে ঘুরে বেড়ায় আর আপশোস করে। বলে, হায়রে! জীবনে কিছু হল না। আরে বেটা, তুই গাধা তোর জীবনে হওয়ার কী আছে?'

কাঞ্চন লোকটাকে পছন্দ হল চিন্ময়ের। চিটিংয়ের কারবার করলেও এক ধরনের দার্শনিক দার্শনিক ভাব আছে। জালজোচ্চুরির মধ্যে ফিলজফি খোঁজে। এটা একটা মজার ব্যাপার।

'অভিনয় নিয়ে ঝামেলা হবে না। কাজটা বের করে আনব এই টার্গেট মাথায় থাকলে, বাকিটা হয়ে যাবে। লোক ঠকানো একটা আর্ট। এই আর্টে অভিনয় যেমন লাগে, এই সহজ-সরল ভাবটাও লাগে। তোমার মধ্যে এই ভাব আছে।'

চিন্ময় অবাক হল। তার মধ্যে লোক ঠকানো ভাব আছে, এটা জানা ছিল না। বলল, 'আচ্ছা চেষ্টা করব।'

বারাসাতের দিকে দশ কাঠা খাস জমির নকল মালিক সাজতে হবে। সরকারি জমি প্লট করে বেচবার জোচ্চুরি। জমি কেনবার জন্য পার্টি ধরে আনবে কাঞ্চন। এরপর কাজ শুরু। পার্টিকে প্রথমে দরদাম করে তাড়িয়ে দিতে হবে। সেই পার্টি আবার আসবে। আবার তাড়িয়ে দিতে হবে। তৃতীয়বার এলে তাকে বলতে হবে, টেন পার্সেন্ট ক্যাশ পেমেন্ট করলে তবে কথা বলব। নইলে আর নয়। বার বার কথা বলে সময় নষ্ট হচ্ছে। পার্টি গাঁইগুঁই করবে। তখন বলতে হবে, 'বাদ দিন ভাই। জমি কেনবার জন্য অনেক লোক আছে। পার্টি শেষ পর্যন্ত লাখ দুয়েক টাকা দেবে। তখন জাল দলিল দেখাতে হবে।

'সার্চিংয়ের জন্য কাগজ পাঠানো হল। দশদিন পরে আসবেন। এসে ডুপ্লিকেট নিয়ে নিজের মতো জমির খোঁজখবর নেবেন। পছন্দ হলে নেবেন। নইলে টাকা নিয়ে যাবেন। আচ্ছা দাঁড়ান, এখনই টাকা নিয়ে যান।'

এই কথা শুনে পার্টি ঘাবড়ে যাবে। ভাববে, জমি অন্য কাউকে বেচে দেওয়া হবে।

'আমি তো টাকা ফেরত চাইনি।'

বলতে হবে, 'আপনি চাননি তো কী হয়েছে? আমি চাইছি। আসলে আমি দেখছিলাম, আপনার জমিটা নেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা। নাকি শুধুই নাড়তে-চাড়তে এসেছেন। টাকা ওই কারণেই চেয়েছিলাম। টাকা পেয়ে বুঝলাম, ক্ষমতা আছে। নিন এবার টাকা ফেরত নিয়ে যান। জমি ঠিক কিনা দেখে টাকা দেবেন। তবে তার আগে আমরা নিজেরা দেখে নেব। কাগজপত্র যা পাওয়ার তারপর হাতে পাবেন।'

পার্টি এতে গলে যাবে। বলবে, 'না না, টাকা যখন দিয়ে ফেলেছি, আর ফেরত নেব না। জমি আমার খুব পছন্দ। আমি নেব।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলতে হবে, 'পছন্দ তো অনেকেরই। কিন্তু টাকা আমি আগে নেব না। ঠিক আছে আপনি যখন এত জোর করছেন, খানিকটা টাকা রাখছি। বাকিটা ফেরত নিন। নিন, এক লাখ টাকা ফেরত নিয়ে যান।'

পার্টি গদগদভাবে টাকা ফেরত নেবে। তার মান যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাও থাকবে না। এমনকী জমির দলিলটলিল ঠিক আছে কিনা, তাও জানতে চাইবে না। দশদিন পরে আসার কথা বলে হাসিমুখে চলে যাবে।

boierpathshala.blogspot.com

এই অভিনয় দশটা পার্টির সঙ্গে করতে হবে। দশ লাখ টাকার ব্যবসা হয়ে গেলেই পাততাড়ি গুটিয়ে ভ্যানিশ হতে হবে।

চিন্ময় বলল, 'এতজনের সঙ্গে অভিনয়! পারব তো?'

কাঞ্চন বলল, 'আমি থাকব। তা ছাড়া কথা তো একই। টাকা দিন, টাকা ফেরত নিন। টাকা ফেরত দিলে যে-কোনও মানুষ খুশি হয়।'

চিন্ময় একটু ভেবে বলল, 'আমার কত?'

চিটিংকাঞ্চন বলল, 'ওয়ান পার্সেন্ট। এক লাখ। চেয়ার-টেবিলে বসে সাতদিনে এক লাখ রোজগার। মন্দ কী।'

চিন্ময়ের গা শিরশির করে উঠল। এক লক্ষ টাকা! কতদিন এত টাকা একসঙ্গে দেখেনি। বৈশাখী টাকা পেয়ে খুশি হবে? অবশ্যই হবে। মেয়েটা খুব টানাটানির মধ্যে থাকে। একটু স্বস্তি দেওয়া যাবে। ভালোমন্দ খাওয়া যাবে ক'দিন। কীভাবে টাকা পেল, সে কথা এখনই না বললেও চলবে।

চিটিংকাঞ্চন বলল, 'কাজ ঠিকঠাক পারলে পরের অ্যাসাইনমেন্ট দেব।'

'আবার জমি?'

'না, আর জমিটমি নয়। এক লোককে দিয়ে এক কাজ দু'বার হবে না।'

এসব কথা বৈশাখী তার স্বামীর কাছ থেকে পরে শুনেছিলেন। স্বামী লোক ঠকিয়ে রোজগার করছে শুনে বৈশাখী প্রথমটায় ধাক্কা খেয়েছিলেন। ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছিলেন। না মেনে উপায় ছিল না। ভদ্রলোকের মতো উপার্জনের পথ 'ভদ্রলোক'রাই বন্ধ করে দিয়েছে। একটা ছোট প্রাইভেট স্কুলে কাজ পেয়েছিলেন। কলেজের পড়া শেষ করতে পারেননি। ফলে বেতনও সামান্য হল। সেই বেতনে যাতায়াতের খরচ উঠত না। একটা বেসরকারি অফিসে কিছুদিন রিসেপশনে বসতে বলল। সেখানে মাইনে মন্দ ছিল না, কিন্তু ডিউটি ছিল রাত পর্যন্ত। তাও ঠিক ছিল। ডিউটি শেষে অফিসের মালিক গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য চাপাচাপি করত। লোকটা অফিসে ভালো, বাইরে নোংরা। এরপর বৈশাখী কাজ নিলেন সেলসে। বাড়ি ঘুরে মেয়েদের কসমেটিক্স বিক্রি করতে হবে। সস্তার জিনিস। প্রথম মাসে কাজ ভালো হল। পরের দুটো মাস মার খেতে হল। ইনচার্জ মহিলা গালিগালাজ করে অফিসে বসিয়ে রাখল। কাজ না পারার শাস্তি। অফিসে চা করতে হবে, টেবিল মুছতে হবে, জিনিসপত্রের ধুলো ঝাড়তে হবে। আটদিনের দিন চলে এলেন বৈশাখী। সরকারি কাজ পাওয়ারও চেষ্টা করেছেন। হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখলে যতটা পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপন বেরোলে পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষা খারাপ দেননি। তবু চাকরিটা হল না। রেজাল্ট বেরোনোর পর দালাল চলে এল। হেলথ চেকআপ, পুলিশ ভেরিফিকেশন, আইডেনটিটি প্রুফের জন্য টাকা লাগবে। অনেক টাকা। নইলে কোনও কাগজ বেরোবে না। টাকা অনেক দূর পর্যন্ত দিতে হবে। এত টাকা কোথায়? বৈশাখীর তখন না আছে টাকা দেওয়ার মতো আত্মীয়, না আছে বিক্রি করবার মতো গয়নাগাঁটি। তাও হাল ছাড়লেন না। আবার পরীক্ষা দিলেন। প্রাইমারি স্কুলে দিদিমণির চাকরি। অনেকটা এগিয়ে সেখানেও আটকে যেতে হল। সেই টাকা। পোস্টিংয়ে টাকা লাগবে। একটা-দুটো টাকা নয়। বিশ হাজার টাকা। বৈশাখী শিখলেন, গরিব মানুষকে সবাই মারতে চায়। শেষ পর্যন্ত দোকানে বসবার কাজ নিলেন। মেয়েদের অন্তর্বাসের দোকান। সেখানে তিনমাস পর হিসেবে ঝামেলা হল। টাকার হিসেবে গোলমাল নয়, জিনিসের হিসেবে গোলমাল। অর্ডারের সঙ্গে স্টকের হিসেব মিলল না। এক পেটি ব্রা, দু'পেটি প্যান্টি উধাও। দোকানে মোট তিনজন কর্মচারী। মালিক তাদের ডাকলেন।

'ব্রা-প্যান্টি নিয়ে আমি থানা-পুলিশ করতে চাই না। সেটা ভালো দেখায় না। আমি চাই তোমরা নিজে থেকেই কাজ ছেড়ে দাও। যা হওয়ার হয়ে গেছে। ক্ষতিটা যে খুব বড় হয়েছে এমন নয়। তোমরা জানো, ওই জিনিসের দাম খুব বেশি নয়। কিন্তু লক্ষণটা ঠিক নয়।'

কাজ ছেড়ে চলে এসেছিলেন বৈশাখী।

boierpathshala.blogspot.com

চিন্ময় এসে যখন চিটিংকাঞ্চনের গল্প, বারাসতের জমির ঘটনা বলল তখন প্রথমে ধাক্কা লাগলেও মনে হল, এটাই ভালো। একদিকে ঘুষ, অন্যদিকে অপমান। ভদ্রলোকেরাই এই ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছে। যাতে ভদ্রলোকের মতো বাঁচা না যায় তার ব্যবস্থা। এর থেকে লোকঠকানো ভালো। একদিন চিন্ময় তাকেও কাজে ঢুকিয়ে নিল।

'একটা কাজে আমাকে হেল্প করতে হবে বৈশাখী।'

বৈশাখী বললেন, 'কী কাজ? জালিয়াতি?'

চিন্ময় গায়ে মাখল না। বলল, 'আপত্তি আছে? আপত্তি থাকলে বলো, বাইরে থেকে কাউকে নিয়ে নেব। টাকা দিলে লোকের অভাব হবে না। তবে নিজেদের মধ্যে হলে সব দিক থেকে ভালো। টাকাটা বাইরে যায় না। রিস্কও কম থাকে।'

বৈশাখী বলেছিলেন, 'আমি লোক ঠকাতে পারব না।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম পারব না। পরে যখন বুঝলাম এই দুনিয়ায় হয় আমাকে ঠকাতে হবে, নয় আমি ঠকব—তখন পেরেছি। বৈশাখী, কোনও অসুবিধে হবে না। হাতে টাকা থাকলে সব অসুবিধে দূর হয়ে যায়। নাও, এত চিন্তা কোরো না।'

চিন্ময় নিয়ে গেল একজনের কাছে। ধুতি-ফতুয়া পরা সুদর্শন পুরুষ। একমাথা সাদা চুল। বয়স বেশি হলেও চেহারা শক্তপোক্ত। ঘরের দেওয়ালে দেবদেবীর ছবি। একদিকে উঁচু আলমারি। সেখানে বাঁধানো সার্টিফিকেট, স্মারক। এক পাশে ফটোর সারি। সেখানে নেতা, মন্ত্রী, বড় মানুষদের সঙ্গে ছবি। ভদ্রলোক পুজোআচ্চা, ধ্যানদান, সমাজসেবা নিয়ে থাকেন। এই সব সার্টিফিকেট, স্মারক, ফটো তার সমাজসেবা করে পাওয়া। ভদ্রলোকের চেহারায় এক ধরনের ঋষি ঋষি ভাব। চোখমুখ, ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, মানুষটার মধ্যে আর যাই থাকুক লোভ বলতে জিনিস নেই। মাটিতে মাদুর পেতে বাবু হয়ে বসে আছেন। চিন্ময় পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর বৈশাখীকে বললেন, 'বসো মা।' তারপর কাজের কথা হল।

কাজ জটিল। এই ঋষি টাইপ সমাজসেবক মানুষটির মূল ব্যবসা বিধবার সম্পত্তি হাতানো। তার জন্য তিনি নানা ধরনের পদ্ধতি প্রকরণের মধ্যে দিয়ে যান। কখনও দরিদ্র মহিলার অসহায়তার সুযোগ নেন, কখনও আইনের প্যাঁচ কষেন, কখনও ভয় দেখান। চারদিকে তার লোক ছড়ানো আছে। তারাই খোঁজখবর আনে। সস্তায় সম্পত্তি হাতানোর জন্য তারা মহিলার কাছে পৌঁছে যায়। বলা বাহুল্য, সব সময়েই টার্গেট থাকে অসহায়দের প্রতি। যাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই।

এবার অসুবিধেয় পড়েছেন। বাঁকুড়ার এক মহিলার কেস। মহিলার দেওর, ভাসুর এসে হাজির হয়েছে। তারা মহিলাকে বাড়ি-জমি-বাগান বিক্রি করতে দেবে না। মহিলাকে ভয় দেখাতে হবে। গুন্ডা-মস্তানের ভয় নয়, সামাজিক বদনামের ভয়। এমন ভয় যাতে মহিলা ভাসুর-দেওরদের কথা না শুনে গোপনে দলিলে সই করে দেয়। কী সে ভয়? বৈশাখীকে তার স্বামীর গোপন স্ত্রী সাজতে হবে। বিধবার বেশে গিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে হবে মহিলার সঙ্গে। সম্পত্তির ভাগ চাইতে হবে। এই চাপের মাঝে সমাজসেবক ফের দালাল পাঠাবে। সে-ও চাপ দেবে। পারিবারিক কেচ্ছা ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেবে। মহিলা এবার দ্রুত বাড়ি-জমি বিক্রি করবেন। যা দাম পান তাতেই করবেন। গ্রামবাংলায় এখনও টাকার থেকে কেচ্ছার দাম বেশি।

বৈশাখী নিখুঁতভাবে কাজ করলেন।

সেই তার লোক ঠকানো শুরু। স্বামী মারা গেছে। আজও অপরাধের দুনিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি বৈশাখী। ভূতের মতো তার কাঁধের ওপর চেপে আছে। হয়তো এটাই তার ভবিতব্য ছিল। নিজের জীবনের কাছে বার বার ঠকে, অন্যকে ঠকানোর নেশায় মেতে থাকেন। কখনও মনে হয়, এই নোংরামি থেকে বেরিয়ে আসবেন। টাকাপয়সার তো দরকার নেই আর। দুর্গাপুরে মাথা গোঁজবার মতো একটা আস্তানা রয়েছে। বাকি জীবনটা দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার মতো টাকা রয়েছে। আর এইসব খারাপ কাজ করে কী লাভ? পরক্ষণেই মনে হয়েছে, কী হবে কাজ ছেড়ে? কোথায় যাবেন? কী নিয়ে থাকবেন? বাবা-মা মারা

boierpathshala.blogspot.com

গেছে। অনেক পরে পরে সব খবর পেয়েছেন। খবর পেয়েছেন, অর্চিন কলকাতায় দূর সম্পর্কের আত্মীয়র বাড়িতে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। মণিকুন্তলার বাড়ি। সম্পর্কে জ্যেটতুতো বোন হয়। তবে তাকে তেমন করে মনে করতে পারেন না বৈশাখী। ছোটবেলার চেনা। বহু বছর যাতায়াত ছিল না। এখন সেনবাড়ির ঠিকানা জোগাড় করেছেন। মাঝে মাঝে ছেলেটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। বাড়ির উলটোদিকের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। একদিন অর্চিনকে ফলো করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত গেছেন। সামনে যেতে খুব মন চায়। নিজেকে আটকে রাখেন। থাক। জেলখাটা, লোকঠকানো মাকে না দেখাই ভালো। মাকে না দেখে এতদিন যখন পেরেছে, বাকি বছরগুলোও পেরে যাবে নিশ্চয়।

আজ ছেলেটাকে দেখা হল না। না হয়ে ভালোই হয়েছে। মায়া বাড়ানো ভালো নয়। আজ কি কলকাতায় থেকে যাবেন? কাল একবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? আর একটু সকাল সকাল নাহয় সেনবাড়ির উলটোদিকে গিয়ে দাঁড়াবেন। খারাপ হবে? থাক। মায়া বাড়বে। ফিরে যাওয়াই ভালো।

ফিরে যাবে ভেবেও ফেরা হল না। কলকাতায় থাকতে হল অর্চিনের মাকে। তবে ছেলেকে দেখবার জন্য নয়। অর্চিনকে যারা আশ্রয় দিয়েছে তাদের কোম্পানি 'সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'কে ঠকানোর বরাত নিয়ে থাকতে হল। দ্য ক্যালকাটা হোটেলের উসকোখুসকো চেহারার পার্টি কাজের বরাত দিল। কাজটাও শক্ত, টাকার পরিমাণও ভালো। সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস কাদের কোম্পানি জানতে পারলেন না বৈশাখী, চানওনি। তবে জানতে পারলেন, এই ভয়ংকর কাজের পিছনে যে মানুষটা রয়েছে, তার নাম নিখিলেশ উপাধ্যায়। সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস কোম্পানির বয়:জ্যেষ্ঠতম কর্মী। অবসর নেওয়ার বয়স দশ বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। তার পরেও চাকরি করছে। মালিকপক্ষের গভীর বিশ্বাসের লোক।

এই লোক কোম্পানির বড় সর্বনাশ করতে চায়।

তেত্রিশ

হাম্বা, হাম্বা, হাম্বা...

বারিধারার মোবাইলে শ্রবণের মেসেজ ঢুকেছে। তবে আজ গরুর গলাটা একটু কাঁপা। বারিধারা ভুরু কোঁচকাল। গলা কাঁপা কেন? গরুর কী হল? কোনো সমস্যা হয়েছে?

বারিধারা নিজের ঘরে। দাদুর কাছ থেকে এসে তার মন ভালো হয়ে আছে। মন ভালো হওয়ার কারণ দুটো। এক নম্বর কারণ, মধুজা রায়ের সঙ্গে আজ তার একটা হেস্তনেস্ত হবে। আর দু-নম্বর কারণ, দাদুর নতুন প্রজেক্ট 'একটু পরে রোদ উঠবে।' এই প্রজেক্টে যেসব অসহায়, গরিব মেয়ে লেখাপড়া করতে গিয়ে বাধা পায়, তারা আসবে। লেখাপড়া শিখবে। হাতের কাজ শিখবে। সেই জিনিস বিক্রি করে নিজেরাই নিজেদের খরচ জোগাড় করে নেবে। ফ্যানটাসস্টিক! দাদুর ঘর থেকে বেরিয়েই বারিধারা ঠিক করে ফেলেছে, ইউনিভার্সিটির পাট চুকে গেলেই সে 'একটু পরে রোদ উঠবে' প্রজেক্টে ফুলটাইম ঢুকে যাবে।

মধুজা ম্যাডামের ঘটনা নিয়ে দাদু যে প্ল্যান দিয়েছে, সেটাও ভালো। এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করলে ম্যাডাম রেগে ফায়ার হয়ে যাবেন, অথচ কিছু বলতে পারবেন না। ম্যাডাম রেগে গেলে তার এফেক্ট অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। পরীক্ষার রেজাল্ট থেকে শুরু করে পি এইচ ডি, কেরিয়ার সব ঘেঁটে যেতে পারে।

বারিধারা ভালো করেই জানে কলেজ, ইউনিভার্সিটিগুলোতে ছাত্রছাত্রী, গবেষক, পার্টটাইম টিচার, ফুলটাইম টিচারদের ঘেঁটে দেওয়ার নানারকম সিস্টেম চালু আছে। যারা মনে করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটা বিরাট পবিত্র, সৎ জায়গা—তারা অনেকেই এইসব সিস্টেমের খবর জানে না। হিডেন সিস্টেম। চোরাগোপ্তা কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে গবেষকদের পারফরমেন্সের থেকে খুশি করবার ওপর নম্বর বেশি। ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটরের হাতে প্রশ্নপত্রের সেট থাকে। সবক্ষেত্রে না হলেও কিছুক্ষেত্রে তো প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটরকে তেল দিতে হয়ই। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। সব

boierpathshala.blogspot.com

অপরাধ প্রমাণ হয়, 'তেল অপরাধ' প্রমাণ হয় না। শুধু কলেজ ইউনিভার্সিটির নম্বর বাড়ানো কেন, জীবনের সবক্ষেত্রেই সাকসেসের পিছনে তেলের বিরাট ভূমিকা। বাঙালি স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে রান্নার তেলের ব্যবহার কমাচ্ছে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেলের ব্যবহার বাড়াচ্ছে। তেল ঢাললে হড়াৎ করে সবাইকে টপকে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। ইউনিভার্সিটিতে তেল দেওয়াকে ছেলেমেয়েরা বলে 'এক্স' পেপার। বারিধারা যতই মেধাবী ছাত্রী হোক সে জানে, পার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারের সঙ্গে 'এক্স' পেপারেও নম্বর তুলতে হয়। সেমিস্টারের বেলাতেও তাই। কলেজের বেলায় সাজেশন পাওয়ার ব্যাপার থাকে। প্রশ্ন কে করেছেন? মডারেশন কার হাতে? কার টিউশনে সাজেশন মেলে—ছেলেমেয়েদের জানতে হয়। নইলে গেলে। পরীক্ষা সৎ ব্যাপার। টোকাটুকি করে ধরা পড়লে সাজা। কিন্তু যে টিচার টিউশন করে সাজেশন মিলিয়ে দেন, তিনি হলেন 'মহামতি পরীক্ষাশ্রী'। সবার শ্রদ্ধেয়। সবার প্রণম্য। ছেলেমেয়েরা বাড়িতে ছবি টাঙিয়ে রাখে। সাজেশন মেলে কী করে? পরীক্ষা ভগবান কি বাছা বাছা টিচারদের স্বপ্নে সাজেশন পাঠিয়ে দেন? তাই হবে। বারিধারা অনকে ভেবেও এসবের উত্তর পায়নি।

তবে বারিধারা জানে, এরাই সব নয়। সে তার জীবনে অনেক ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকা পেয়েছে। তারা দারুণ। শুধু বিদ্যা বুদ্ধি বা পড়ানোতে দারুণ নয়, ব্যবহারেও দারুণ। সবাইকে সমান চোখে দেখে। তারা ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধার মানুষ। এদের মেরুদণ্ড শক্ত। এরা কোনওরকম পার্সিয়ালটি নয়, ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকারের লেখাপড়াকে ভালোবাসেন। নিজেরা লেখাপড়া করেন। তাদের ডিপার্টমেন্টের কল্যাণ সমাজপতি আর অরিন্দম সেনগুপ্ত তো এরকমই। কল্যাণ সমাজপতি ফাঁকিবাজ মাস্টারমশাই। ধরে-বেঁধে ক্লাস করাতে হয়, নোটিস দেখাতে হয়। কিন্তু একেবারে খাঁটি। ছেলেমেয়েরা বাড়িতে হানা দিলেও বিরক্ত হন না।

তবে ভালোরা বেশিরভাগ জায়গাতেই কোণঠাসা। শুধু ছেলেমেয়ে নয়, ভালো টিচারদের ওপরও ঝামেলা করা হয়। কলেজে পড়বার সময়ও বারিধারাকে এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তাদের ডিপার্টমেন্টে সুমনা সেন নামে এক অধ্যাপিকাকে কয়েকজন টিচার মিলে খুব হেনস্থা করত। সুমনা ম্যাডামের দোষ, তিনি ভালো পড়াতেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় ছিলেন। তাদের নিয়ে নাটক, ডিবেট, সেমিনার করতেন। রুটিন যাতে ঠিকমতো হয়, ক্লাস যাতে নিয়মিত হয়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া যাতে বেশি করে হয় তার জন্য সবসময় বলতেন। কয়েকজন মাস্টারমশাই তার পিছনে লেগে গেল। সুমনা ম্যাডাম একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন। যদিও ক্লাসে সেই মত কখনওই আনতেন না। সেটা নিয়েও অন্য টিচাররা ঘোঁট পাকাতেন। ছেলেমেয়েরাও সে খবর জানত। নোংরা মানুষকে সবাই ছি ছি করে। পুলিশ এলে ধরে নিয়ে যেতে পারে। এসব জায়গার নোংরা লোকগুলো স্টেজে বসে মালা পায়। তার পরেও কলেজ, ইউভার্সিটিগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকা আর ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তাদের শক্তি এত বেশি হয় যে, খারাপ লোকগুলো হাজার চেষ্টা করেও তাদের দমাতে পারে না। সাময়িকভাবে হয়তো কিছুদিন রাজত্ব করে। শেষ পর্যন্ত হারতে হয়।

বারিধারা ইউনিভার্সিটি যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। প্যান্ট-শার্ট পরা হয়ে গেছে। টেবিল ঘেঁটে ব্যাগে বই-খাতা নিচ্ছে। বারিধারা বই-খাতা না নিয়ে কখনও ইউনিভার্সিটিতে যায় না। বন্ধুরা ঠাট্টা করে।

শমজিতা বলে, 'তুই কি এখনও স্কুলে পড়িস বারি? গাদাখানেক বই-খাতা আনিস কেন?'

বারিধারা বলে, 'মনে হয় স্কুলে পড়ি।'

স্বয়ংদ্যুতি বলে, 'আমরা তো একটা কয়েকটা সাদা পাতা নিয়ে আসি। নোটস নিয়ে ফাইলে ক্লিপ করে রাখি।'

বারিধারা গম্ভীর গলায় বলে, 'আমি অবশ্য তা করি না। খাতায় নোটস টুকি, তারপর বাড়ি যাওয়ার সময় ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিই।'

তিথি বলে, 'বেশি স্মার্ট হতে চেষ্টা করিস না বারি। ইউনিভার্সিটিতে এত বই-খাতা আনা একটা ছেলেমানুষি হ্যাবিট। তুই ভালো স্টুডেন্ট হতে পারিস, কিন্তু ছেলেমানুষি করবার অধিকার নেই।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা বলে, 'আমারও তাই মনে হয়। কী করব বল, ইউনিভার্সিটিতে আসবার সময় বই-খাতা না নিয়ে বেরোলে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। মনে হয়, প্রপার জামাকাপড় পরিনি।'

শমজিতা চোখ টিপে হেসে বলে, 'কী মনে হয়? ন্যুড হয়ে এসেছিস?'

সবাই খিলখিল আওয়াজে হেসে ওঠে। বারিধারাও হাসে। হাসতে হাসতেই বলল, 'তাতে তোর কী সুবিধে হবে শমজিতা?'

স্বয়ংদ্যুতি বারিধারার কাঁধ চেপে বলে, 'বুঝতে পারছিস না? তাহলে ও সাহস পাবে। পরদিন থেকে ও কিছু না পরে ক্লাসে যাবে।'

তিথি গলা নামিয়ে চোখ বড় করে বলল, 'সত্যি যদি এরকম একদিন হয়, কী হবে বল তো?'

বারিধারা তিথিকে নকল করে চোখ বড় করে বলল, 'কী হবে তিথিরানি?'

'আমরা মেয়েরা যদি সবাই একদিন ইয়ে হয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকি।'

শমজিতা গম্ভীর মুখ করে বলল, 'কী আর হবে? যারা দেখবে তারা জ্ঞান হারিয়ে ধড়াস ধড়াস করে পড়ে যাবে।'

তিথি বলল, 'সবাই মোবাইল বের করে ফটাফট ছবি তুলতে থাকবে। তারপরে ফেসবুকে লোড করবে।'

স্বয়ংদ্যুতি বলল, 'বাকিটা বল। ভিসি পুলিশ ডেকে অ্যারেস্ট করাবে।'

বারিধারা বলল, 'এ আর এমন কী? পৃথিবীতে বহু জায়গায় ন্যুড অ্যাজিটেশন হয়। টিভিতে দেখায়। কাগজে ছবি বেরোয়। মেয়েদের ওপর অপ্রেশনের বিরুদ্ধে এই ধরনের অ্যাজিটেশন একটা কমন ব্যাপার। এতে সবার নজর পড়ে। ইস্যুটা সামনে চলে আসে।'

শমজিতা বলল, 'আমরা কীসের জন্য বিক্ষোভ করব? পরীক্ষায় পাস করাতে হবে?'

স্বয়ংদ্যুতি বলল, 'তাহলে শুধু মেয়েরা কেন, ছেলেরা কী দোষ করল? তাদের পরীক্ষায় পাস করতে হবে না?'

বারিধারা বলল, 'ছেলেদের এই ধরনের আন্দোলনের কথা শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। হয়তো হয়েছে। তবে এই ফর্মে বিক্ষোভ কোনও পারসোনাল সুবিধে আদায়ের জন্য হয় না। এটা প্রোটেস্ট এগেইন্সট সোসাইটি, সিস্টেম। যে সোসাইটি, সিস্টেম মেয়েদের অসম্মান করে। অত্যাচার করে। মেয়েরা জামাকাপড় খুলে তখন বলে, এই সমাজ মেয়েদের লজ্জা নিবারণ, উপযুক্ত অধিকার, প্রাপ্য সম্মান দিতে ব্যর্থ, অযোগ্য। এই সমাজের কাছে মেয়েদের পোশাক অর্থহীন। এটা সমাজের ভুল নিয়মকানুন, মেকি ভদ্রতার ওপর একটা থাপ্পড়।'

শমজিতা বলল, 'আমরা এখন এসব করতে গেলে, আমরাই থাপ্পড় খাব।'

বারিধারা বলল, 'আমাদের সোসাইটি, কালচারে ন্যুড অ্যাজিটেশন ঠিক যায় না। তবে চারপাশে মেয়েদের ওপর যেসব কাণ্ড ঘটছে, একদিন হয়তো এটাও হয়ে যাবে। হয়তো একদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল বেরিয়ে যাবে।'

তিথি চোখ বড় করে বলল, 'ছি ছি। তাহলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে।'

বারিধারা হাত বাড়িয়ে তিথির থুতনি নেড়ে বলল, 'চিন্তা করিস না। তোকে সেই মিছিলে ডাকা হবে না।'

তিথি বলল, 'আর তোকে যদি ডাকা হয়? যাবি?'

বারিধারা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, আমি যাব না। বললাম তো, আমি যে স্ট্রাকচারে আছি, তাতে এটা যায় না। প্রয়োজনও নেই। দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে অনেক মিছিল হয়েছে, কোনওটাতে মেয়েরা জামাকাপড় খুলে হাঁটেনি। তার পরেও সরকারের বিরুদ্ধে বড় বড় আন্দোলন হয়েছে। তাতে মেয়েরা লাঠি-গুলি কম খায়নি। কোথাও জামাকাপড় খুলতে হয়নি। গল্প শুনেছি, সত্তর দশকে ওয়ানে বহরমপুরে আমার মামাবাড়ির পাড়ায় গুন্ডারা মেয়েদের খুব বিরক্ত করত। বিরক্ত বললে কম বলা হবে, অত্যাচার করত বলা উচিত। রাস্তায় বেরোলে হাত ধরে টানাটানি তো বটেই, এমনকী একটু সুন্দর দেখতে হলে জোর করে বিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

পর্যন্ত করতে চাইত। নইলে রেপ করে দেওয়ার হুমকি দিত। অ্যাসিড ছুড়ত। পুলিশকে বলে কোনও লাভ হত না। কমপ্লেইন করলে পুলিশ বাড়িতে এসে, থানায় ডেকে অসভ্যতা করে যেত। পাড়ার মেয়েরা আর সহ্য করতে পারল না। ছোট-বড় সবাই মিলে একদিন হাতা-খুন্তি-বঁটি, লাঠি, ঝাঁটা নিয়ে 'মার মার' বলে বেরিয়ে পড়ল। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, গরিব, বড়লোক—সবাই ছিল। বাড়ি থেকে গুন্ডাগুলোকে টেনে বের করে বেধড়ক মার দেওয়া হল। থানা ঘেরাও হল। গভর্মেন্টের টনক নড়ল। না পড়ে উপায় ছিল না। চারদিকে ছ্যা ছ্যা পড়ে গেল যে। দুদিনের মধ্যে অনেক গুন্ডা-মস্তান অ্যারেস্ট হল। পাড়াছাড়া হল বাকিরা। কই কোনও মেয়েকে তো পোশাক খুলতে হয়নি!'

শমজিতা বলল, 'বা : চমৎকার গল্প।'

বারিধারা বলল, 'গল্প নয়, সত্যি কথা।'

তিথি বলল, 'তাহলে বলছিস, মেয়েদের ন্যুড মিছিলের থেকে হাতা-খুন্তি-ঝাঁটা মিছিল বেশি এফেক্টিভ?'

বারিধারা বলল, 'আমার তাই মনে হয়। অন্তত আমাদের সমাজে তো বটে।'

স্বয়ংদ্যুতি বলল, 'এত ভারী ভারী কথা বলতে গিয়ে তুই কিন্তু আসল জায়গা থেকে সরে গেলি বারি।'

বারিধারা হেসে বলল, 'আচ্ছা বাবা, কাল থেকে ইউনিভার্সিটিতে ছেলেমানুষের মতো বই-খাতা আনব না। বড় মানুষের মতো হাতা-খুন্তি নিয়ে আসব। হবে তো?'

সবাই হেসে ওঠে।

ব্যাগ বন্ধ করে শ্রবণের মেসেজ পড়ল বারিধারা। মাঝারি সাইজ। 'বারি, হঠাৎ করে আজ সকালে খুব জ্বর এসেছে। মে বি ম্যালেরিয়া। ডেঙ্গিও হতে পারে। এখন হেভি ডেঙ্গি হচ্ছে। বাড়িতে কেউ নেই। বসিরহাটের বড়পিসি অসুস্থ। তাকে দেখতে গেছে। দাদা ক্যান ড্রাইভ। সেই কারণে অফিস কামাই করে দাদাকে যেতে হয়েছে। আমি জ্বরে ধুঁকছি। প্লিজ ধারা, ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আগে একবার কি আমাকে দেখে যাওয়া যায় না?'

বারিধারা রেগে গেল, আবার হেসেও ফেলল। জ্বরের গল্পটা গুল। এই মিথ্যে কথা বলে বছর খানেক আগে একবার ফাঁকা বাড়িতে তাকে ডেকে নিয়েছিল শ্রবণ। আবার একই কায়দা! ছেলেটার সাহস তো কম নয়! এর পরেও রাগ হবে না?

সেদিনটা ছিল খুব বৃষ্টির।

সকাল থেকে ঝরছে তো ঝরছেই। রাস্তায় জল জমে গেছে। ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না বারিধারার। মণিকুন্তলা ঘরে এসে তাড়া দিলেন। এত বেলা পর্যন্ত বাসি বিছানা তিনি সহ্য করতে পারেন না। এই ব্যাপারে ছুটির দিন মেয়েদের সঙ্গে তাঁর অনেকবার ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। বড় মেয়ে বিয়ে করে চলে যাওয়ায় ঝগড়া হাফ হওয়ার কথা। কিন্তু বেড়েছে। ছোট মেয়ে সহজে বিছানা তুলতে চায় না। অন্য কেউ হাত দিক তাও চায় না। কাজের মেয়েটাকে ধমক দেয়। তার সঙ্গে ঝগড়া করে। তার পরও মণিকুন্তলাদেবীর দেরি হলে মেয়ের ঘরে আসেন। শরীরটরীর খারাপ হল কিনা সে চিন্তা থাকে, বিশেষ করে পিরিয়ড শুরুর প্রথম দিন। বেশি কষ্ট পায়। ছোটবেলা থেকেই এই সমস্যা। তবে সেদিন এরকম কোনও সমস্যা ছিল না। দেরি দেখেই মণিকুন্তলা ঘরে এলেন। এই মেয়ের ঘরে আসা মানেই ঝগড়া। মেয়ে হয় ফাজলামি করবে, নয় পাত্তা দেবে না।

'কীরে এখনও উঠিসনি?'

'উঠেছি মা। আমি উঠে পড়েছি অনেকক্ষণ। এই যে আমি শুয়ে আছি, এটা আমি নই, আমার শরীর। যার ওপর আজ আর আমার কোনও কন্ট্রোল নেই।'

মণিকুন্তলাদেবী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বাজে কথা না বলে উঠে পড়।'

বারিধারা শোওয়া অবস্থাতে হাত বাড়িতে মায়ের হাত ধরল।

boierpathshala.blogspot.com

'মা, প্লিজ একটা কাজ করে দাও। ব্রাশ আর টুথপেস্টটা এনে দাও। আজ আমার বিছানা ছাড়তে করছে না। শুয়ে শুয়ে দাঁত মাজব।'

মণিকুন্তলা জোর ধমক দিতে যাবেন, এমন সময় বারিধারার মোবাইল হাম্বারবে শ্রবণের মেসেজ আসার কথা জানান দিয়েছিল। সেদিনও ঠিক একইভাবে শ্রবণ তাকে জ্বরের কথা বলে ডেকেছিল।

'বারি, জ্বর হয়েছে। মনে হচ্ছে টাইফয়েড। বাড়িতে কেউ নেই। দাদা-বউদি শ্রীরামপুর। বউদির বাপের বাড়ি। বাবা-মা পুরী গেছে সে তো জানোই। একা ভয় করছে। ধারা, একবার আসবে প্লিজ?'

চৌত্রিশ

সেদিন কলিং বেল টিপতে শ্রবণ এসে দরজা খুলেছিল। নীল রঙের পায়জামা আর কালো রঙের টি শার্টে তাকে ঝলমলে লাগছে। ডানদিকের গালে খানিকটা সবুজ রঙের আঁচড়। নিশ্চয় ছবি আঁকছিল। মুখে রং লেগে গেছে।

বারিধারা থমকে গেল। কোথায় জ্বর! দিব্যি সুস্থ ছেলে। বরং অন্যদিনের থেকে বেশি ফ্রেশ লাগছে।

'তোমার না জ্বর?'

শ্রবণ মুখ শুকনো করবার চেষ্টা করল। হল না। হেসে বলল, 'ছিল। এখন কমে গেছে। নেই বলতে পারো।'

বারিধারা ভুরু কোঁচকাল। তার রাগ হচ্ছে। জলকাদায় তাকে বেরোতে হয়েছে। মায়ের সঙ্গে কথা বলবার ফাঁকেই শ্রবণের মেসেজের রিপ্লাই পাঠিয়েছিল।

'জ্বর কত?'

জবাব এসেছিল দ্রুত—'জানি না। কপালে হাত দিয়ে মনে হচ্ছে অনেক। থার্মোমিটার খুঁজে পাচ্ছি না। বউদি কোথায় রেখে গেছে। তুমি এলে খুঁজে দিও।'

বারিধারা রেগে গিয়ে লিখেছিল—'আই কান্ট। আমি থার্মোমিটার খুঁজতে তোমার বাড়ি যেতে পারব না।'

জবাব এল—'আচ্ছা, থার্মোমিটার খুঁজতে হবে না। এমনি এসো।'

বারিধারা তারপর বিছানায় উঠে বসে হেসে বলেছিল, 'যাক, মাতৃআজ্ঞাই পালন করলাম। শয্যাত্যাগ করেছি।'

মণিকুন্তলাদেবী রাগের ভান দেখিয়ে বললেন, 'খুব করেছ, আমি ধন্য হয়েছি। এবার বাথরুমে যাও।'

এ বাড়িতে বিছানা তোলা, ঘর ঝাড়পোঁছ করবার জন্য একাধিক লোক আছে। তারপরেও মণিকুন্তলা নিজের বিছানা নিজেই তোলেন। ছোটবেলা থেকে মেয়েদেরও সেরকম শিখিয়েছেন। মেয়েদের বিছানায় বাইরের লোকের হাত দেওয়া উচিত না। মহিলা হলেও নয়। মেয়েদের বিছানা একটা ব্যক্তিগত বিষয়। অন্য কারও সেই ব্যক্তিগত বিষয় জানা উচিত নয়। কম বয়সে বারিধারা আর মেঘবতী দুজনেই অতি উৎসাহে সেই কাজ করেছে। তারাও যে 'ব্যক্তি' এবং তাদের যে 'ব্যক্তিগত' বিষয় থাকতে পারে, এটা ভেবে তাদের বিরাট আনন্দ ছিল। কিন্তু যত বড় হয়েছে এই সামান্য কাজে তাদের আলিস্যি এসেছে। মেঘবতী শ্বশুরবাড়িতে নিজেকে বদলেছে, বারিধারার আলিস্যি বেড়েছে। বকাবকি করলে মেয়ে ফাঁকিবাজির জন্য নানারকম যুক্তি দেখায়।

'মা বাসি বিছানা হল বাসি লুচির মতো। খেয়ে দারুণ আরাম।'

মণিকুন্তলা কটমট করে বলেন, 'তোমাকে তো বিছানা খেতে বলিনি বৃষ্টি। মাথা গরম করে দেওয়া কথা বলছ কেন?'

বারিধারা হেসে বলে, 'বিছানা খাওয়া মানে কচমচ করে খাওয়া নয় মা। বাসি বিছানা খাওয়া হল বিছানায় গড়াগড়ি খাওয়া, কানে হেড ফোন লাগিয়ে গান শোনা, পায়ের ওপর পা তুলে গল্পের বই পড়া।'

boierpathshala.blogspot.com

মণিকুন্তলা আরও রেগে যান। বলেন, 'এই সবক'টা কাজ পরিষ্কার করেও করা যায়।'

বারিধারা ঝলমলে মুখে বলল, 'যাবে না কেন? অবশ্যই যায়। লুচি কি ভেজেই গরম গরম খাওয়া যায় না? তার পরেও বাসির টেস্ট দারুণ। তুমি একটা বই টানটান, কাচা বেডকভার, নতুন বালিশের ওয়াড়, পাটভাঙা চাদরের মধ্যে পড়ো, আর দু দিন ফেলে রাখা, চাদর ঘুচিমুচি হওয়া বিছানায় পড়ো—দেখবে দুটো অন্যরকম লাগবে। গানের বেলায়ও তাই। এমনকী ফোনে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বললেও দেখবে, টাটকা বিছানা আর বাসি বিছানা আলাদা এফেক্ট তৈরি করছে। ইচ্ছে করলে তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো। তারপর যদি বাইরে এমন মেঘবৃষ্টি থাকে, তাহলে তো কথাই নেই।'

মণিকুন্তলার মাথা গরম হয়ে যায়। এই মেয়ের কথা শুনলে রাগ না করে থাকা যায়! আলিস্যিপনার পক্ষে বানিয়ে কতরকম যুক্তি দিচ্ছে। মনে হয় পিঠে গুম গুম করে দিই দুটো। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তো কী হয়েছে? মা ছেলেমেয়েকে সবসময় দুটো মার দিতে পারে। তাও মণিকুন্তলা নিজেকে সামলালেন।

'থাক অনেক লেকচার হয়েছে। এবার উঠে পড়ো। পরে কোনওদিন বাসি বিছানা নিয়ে গবেষণা কোরো। তোমার দাদুকেও নিও। তিনি নাতনির পাগলামিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য সবসময় তো মুখিয়ে থাকেন।'

বারিধারা তড়াক করে খাট থেকে নেমে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা ভালো আইডিয়া। বাসি বিছানা নিয়ে গবেষণা। বাইরে কি জল জমেছে মা?'

মেয়ের বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'নন্দ গাড়ি বের করবার সময় বলছিল। চৌমাথায় জল জমেছে।'

বারিধারা আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'সর্বনাশ হল। জল ভাঙতে হবে।'

'সর্বনাশের কী? আজও বেরোতে হবে?'

বারিধারা আপন মনে বলল, 'বেরোব না ভেবেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে বেরোতে হবে।'

নন্দকাকা শ্রবণের গলির সামনে নামিয়ে দিল।

'আমি অপেক্ষা করি ছোড়দি?'

ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। গলির মুখটাতেও জল জমেছে। বারিধারা প্যান্ট গুটিয়ে বলল, 'না নন্দকাকু। আমি এখান থেকে ট্যাক্সিফ্যাক্সি কিছু একটা নিয়ে চলে যাব। তুমি বাড়ি যাও।'

গলির ভিতরে ঢুকতেই রাস্তার জমা জল বাড়ল। হাঁটু পর্যন্ত প্যান্টটা ভিজে গেল মুহূর্তে। তারমধ্যে আবার ওপর থেকে জল পড়ছে। ছাতায় ছাঁট আটকানো যায় না। ফলে শার্টটাও ভিজল। মোটামুটি ভিজে ঢাউস হয়ে সেদিন শ্রবণের বাড়ির দরজার সামনে হাজির হয়েছিল বারিধারা। গেট খুলে ঢোকবার সময় চরম কেলেঙ্কারিটা হল। পায়ের চটিটা বুড়ো আঙুলের কাছ থেকে ফটাং করে গেল ছিঁড়ে।

দরজা খুলে 'জ্বর কমে গেছে' জানিয়ে শ্রবণ বোকার মতো হাসল।

বারিধারার মাথায় তখন আগুন শোঁ শোঁ করছে। শ্রবণ তাকে মিথ্যে বলে নিয়ে এল! ক্যাবলা ছেলেটার তো বিরাট সাহস হয়েছে!

'কী হল, ভিতরে তো আসবে? নাকি বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজবে? চটিও ছিঁড়েছ দেখছি। এসো বারি।' অপরাধী অপরাধী গলায় বলল শ্রবণ।

বারিধারা একবার ভাবল, দরজা থেকেই অ্যাবাউট টার্ন করি। তারপর মনে হল, ক্যাবলাটাকে এত সহজে ছেড়ে দেব? জল বৃষ্টি কাদায় বের করে আনবার জন্য কোনও শাস্তি হবে না? অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। সেদিন সহজভাবেই বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল বারিধারা।

'বাড়ির সবাই আছে? নাকি সেটাও জ্বরের মতো মিথ্যে বলেছ?'

শ্রবণ পড়া না-পারা ছাত্রের মতো নার্ভাস গলায় বলল, 'না, বাড়ির কেউ নেই। ওটা মিথ্যে বলিনি।'

বারিধারা কাঁধের ব্যাগটা রাখল। শ্রবণের চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, 'বাথরুমে সাবান আছে?'

শ্রবণ বলল, 'আছে।'

'কাচা তোয়ালে আছে?'

boierpathshala.blogspot.com

'আছে।'

শ্রবণ ছুটে গিয়ে একটা সাদা তোয়ালে নিয়ে এল। কাচা তোয়ালের খবর তার জানার কথা নয়। আজ সকালেই তার ঘরে বউদি কাচা তোয়ালে রেখে গেছে। কোইনসিডেন্স। শ্রবণ ভাবল, ভাগ্যিস কোইনসিডেন্স বলে পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে।

বারিধারা একটু চুপ করে থাকল। বলল, 'তোমার নতুন পায়জামা, পরিষ্কার জামা আছে?'

শ্রবণ ঢোঁক গিলে বলল, 'পায়জামা! আমি এখন কোথাও বেরোব না ধারা।'

বারিধারা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'যা বলছি তার জবাব দাও। তোমার পরিষ্কার পায়জামা, জামা আছে কিনা বলো?'

শ্রবণ ভয়ে ভয়ে বলল, 'আছে।'

'এনে দাও। আমি চেঞ্জ করব।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারিধারা সেদিন যখন শ্রবণের ঘরে গিয়েছিল, শ্রবণ খানিকক্ষণের জন্য থ' মেরে গিয়েছিল। এমন বারিধারাকে সে আগে কখনও দেখেনি। চেনাই যাচ্ছে না। কী সুন্দর! কী সুন্দর! কটকটে রোদ ঝলমল মেয়েটা এখন মেঘলা দিনের মতো স্নিগ্ধ লাগছে। বারিধারা স্নান করেছে। খোলা চুল। শ্রবণের নীল রঙের পায়জামা আর বেগুনি রঙের টি শার্ট পরেছে। দুটোই মাপে বড়। এতে একধরনের ছেলেমানুষির সৌন্দর্য হয়েছে।

'আমার ভেজা জামাকাপড় তোমাদের ডাইনিঙের চেয়ারগুলোতে মেলে ফ্যান চালিয়ে দিয়েছি। অসুবিধে হবে না তো?'

শ্রবণ তাড়াতাড়ি বলল, 'ছি ছি। কী অসুবিধে হবে?'

বারিধারা ঘরের একপাশে পাতা বেতের চেয়ারে বসতে বসতে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আমার কোনও অসুবিধে হবে না। ইনারগুলোরও আছে তো। হুট করে বাইরের কেউ এলে ঘাবড়ে যেতে পারে। ঘরের মধ্যে মেয়েদের ইনার কেন? সরি আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না। ভিজে জিনিস পরে জ্বর ডেকে আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

শ্রবণের ঘরের মেঝেতে আঁকা, লেখার সরঞ্জাম ছড়ানো। শ্রবণ বিজ্ঞাপনের ডিজাইন বানাচ্ছে। বারিধারা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'জ্বরের মধ্যেও কাজ করছ?'

শ্রবণ মাথা চুলকে বলল, 'না মানে, জ্বরটা কমেছে...এতক্ষণ তো শুয়েই ছিলাম। শরীরটা ভালো লাগতে মনে হল, কাজটা শেষ করি।'

বারিধারা পায়ের ওপর পা তুলে ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমাকে ডেকেছ কেন?'

শ্রবণ এবার বেশি নার্ভাস হয়ে গেল। বলল, 'ডেকেছি বুঝি বারি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডেকেছি... আসলে হয়েছে কী জানো ধারা... আমার একটা কাজ আটকে যাচ্ছে... ভাবলাম তুমি যদি প্ল্যান দাও...।'

'কী কাজ?' বারিধারার গলা আরও তীক্ষ্ণ।

শ্রবণ এক গাল হেসে বলল, 'একটা অ্যাড সামলাতে পারছি না। কনসেপ্টে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

'কীসের অ্যাড?'

শ্রবণ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'জুতোর বিজ্ঞাপন। বড় কোম্পানি। অফিসে কাজটা এসেছে। ওরা আমাকে বলেছে ভাবনাচিন্তা করো। লেগে গেলে আমার লাভ হবে। বারি, জুতো নিয়ে নতুন কোনও কনসেপ্ট দিতে পারো। হাঁটছে, লাফাচ্ছে, ছুটছে এসব ঢের হয়েছে।'

বারিধারা বলল, 'জুতোর বিজ্ঞাপনের কনসেপ্ট নিতে আমাকে বৃষ্টি-কাদার মধ্যে ডেকে আনলে? তাও আবার মিথ্যে কথা বলে?'

শ্রবণ তাড়াতাড়ি বলল, 'না, ঠিক মিথ্যে নয়...মনে হল কী...ওরা তো সবাই বেরিয়ে পড়ল...আমি ভাবলাম, আজ আর অফিস যাব না, বাড়িতে বসে কাজ করব...তারপর মনে হল, তুমি যদি একবার ঘুরে

boierpathshala.blogspot.com

যাও...।'

বারিধারা কটমট চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমি ঘুরে যাব কেন?'

শ্রবণ গালে হাত বোলাতে গিয়ে মুখে আরও খানিকটা রং লাগিয়ে ফেলল। বোকার মতো হেসে বলল, 'সরি ধারা। ভেরি সরি। জ্বরের কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি। তুমি যে এতটা ভিজে যাবে, বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম গাড়ি করে একেবারে আমাদের বাড়ির গেট পর্যন্ত চলে আসবে। আমি ছাতা নিয়ে যাব, তুমি টক করে ঢুকে যাবে।'

বারিধারা হেসে ফেলতে গিয়ে নিজেকে সামলাল। তার প্রেমিকটি সত্যি হাঁদা আর ভালোমানুষ। ছেলেমানুষও বটে। ডেকে ফেলে এখন আর সামলাতে পারছে না। এই যুগে এমন একটা ভালোমানুষ আর ছেলেমানুষ নিয়ে সে কী করে চলবে? বারিধারা এবার চেয়ারের ওপর দুটো পা মুড়ে বসল।

'তোমার জ্বর হয়েছে, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, আর আমিই তোমাকে বলব, আমার মাথায় ছাতা ধরে আমাকে নিয়ে যাও! তোমার মাথা কি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে!'

শ্রবণ বুঝতে পারল সেমসাইড হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'এইটুকু তো...ওতে আর জ্বরের কী হবে...তা ছাড়া...তা ছাড়া...।'

বারিধারা হাত তুলে থামাল।

'চুপ করো। তোমার জ্বর নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তুমি কি ভেবেছিলে নন্দকাকাকে দেখিয়ে দেব যে আমি তোমাদের বাড়িতে এসেছি? আর ফিরে গিয়ে মাকে বলুক? বোকার মতো কথা বোলো না। আমি শুধু ভিজিনি, চটিটাও ছিঁড়ে গেছে। তোমার জন্যই ছিঁড়ে গেছে। এর মানে আমার শার্ট-প্যান্ট ফ্যানের হাওয়ায় শুকিয়ে গেলেও আমি এখন বেরোতে পারব না। আমার চটি নেই।'

'আমার হাওয়াই চটি আছে। আনব?'

গুম গুম করে মেঘ ডেকে উঠল। এর মানে বৃষ্টি আরও বাড়বে। বারিধারা রাগী গলায় বলল, 'বাজে কথা বলো না। ঘরে পরবার চটি পরে ঘরে বসে থাকা যায়, বাইরে বেরোনো যায় না। বাড়ি তো ফেরা যায়ই না। আর হাওয়াই চটি পরে কাদায় বেরোলে কী হবে জানো না? জামা-প্যান্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে কাদা প্রিন্ট হয়ে যাবে। এমনিতে পায়ে কাদা থাকে, হাওয়াই চটি পরলে মাথা পর্যন্ত সেই কাদা যাবে। আমি কি তোমার মতো হাঁদা নাকি? আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি।'

শ্রবণ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কী ডিসিশন!'

বারিধারা মুখ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করে বলল, 'শুনলে তোমার পিলে চমকে যাবে। এইটুকু বলে বারিধারা চুপ করে গিয়েছিল।

শ্রবণ বিস্ফারিত চোখে 'পিলে চমকানো' সিদ্ধান্ত শোনবার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

আবার গুরগুর করে মেঘ ডেকে উঠেছিল।

শ্রবণকে মিনিট দুয়েক টেনশনে রেখে বারিধারা তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল সেদিন।

'চটি না সারিয়ে আমি এখান থেকে এক-পাও বেরোব না। দরকার হলে দুদিন, তিনদিন, সাতদিন এখানে বসে থাকব।' শ্রবণ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। চোখ বড় হয়ে গেল তার।

'কী বলছ বারি! সাতদিন এখানে থাকবে কী করে?' দাদা-বউদি তো রাতেই চলে আসবে।'

বারিধারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আসবে তো আমার কী? তোমার প্রবলেম। আমাকে মিথ্যে বলে ডাকবার সময় মনে ছিল না? ওসব তুমি সামলাবে। আমাকে যদি জিগ্যেস করে, এই যে মেয়ে, এত রাতে তুমি আমাদের বাড়িতে বসে আছ কেন? আমি বলব, আমাকে না করে, দয়া করে আপনাদের ছেলেকে এই প্রশ্ন করুন। সে আমার থেকেও ভালো বলতে পারবে আমি এ বাড়িতে কেন রাত পর্যন্ত রয়ে গিয়েছি।'

শ্রবণ মাথা চুলকে হেসে বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ বারি।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা মুখ ভেংচে বলল, 'না, আমি সিরিয়াস কথা বলছি। রাত হলেই বুঝতে পারবে কোনটা ঠাট্টা, কোনটা সিরিয়াস। একবার তোমার বাড়ির লোকদের ফিরতে দাও। কাছাকাছি কোথায় মুচি বসে?'

শ্রবণ ঘাবড়ানো গলায় বলল, 'মুচি? গলির মোড়ে মনে হয়। ঠিক মনে করতে পারছি না।'

বারিধারা ধমক দিয়ে বলল, 'গলির মোড়ে কেউ নেই। জল জমে আছে। জমা জলের মধ্যে মুচি কী করে বসবে, নৌকো নিয়ে? ভেবে উত্তর দাও।'

শ্রবণ চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'তাই তো। তাহলে কোথায় বসেছে? আমার তো মনেই পড়ছে না।'

বারিধারা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তুমি এমন ভাব করছ যে, মুচিদের কেমন দেখতে হয় সেটাই জানো না। ওনারা কী কাজ করেন জানো, ওনারা ছাতা সারাই করেন? নাকি লেপ কম্বল বানান? বোকা একটা।'

শ্রবণ বলল, 'তাহলে কী হবে?'

বারিধারা অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'সেটাই তো ভাবছি, কী হবে? তুমি চা বানাতে পারো?'

'না, চা পারি না। কফি বানাতে পারি।'

বারিধারা সন্দেহের গলায় বলল, 'সত্যি পারো? নাকি এটাও মিথ্যে।'

শ্রবণ হেসে বলল, 'কফি বানানোটা কোনও কাজ হল? দুধ, জল, কফি। ব্যস, কফি রেডি।'

বারিধারা বলল, 'ঠিক আছে, তুমি আমার জন্য এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণে ভাবি কী করা যায়।' শ্রবণ লাফ দিয়ে কফি বানাতে চলে গেলে বারিধারা নিজের মনে মনে খানিকক্ষণ হাসল। সত্যি ছেলেটা বড্ড ভালো। ভালো বলেই বোকা। বারিধারা উঠে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরেটা জলে ভিজে আছে। এই বিকেলে অদ্ভুত একটা ভেজা আলো। মেঘে ঢাকা আলো। সেই আলো একই সঙ্গে খুশি আর বিষণ্ণ। মনে হচ্ছে, কেউ ছবি আঁকতে গিয়ে খাতায় খানিকটা জল উলটে ফেলেছে। জল ফেলে দিয়ে মনটা খারাপ। আবার খাতার জল যখন নিজের মতো ছবি তৈরি করেছে, তাই দেখে মনটা খুশি। বারিধারারও সেদিন তাই হচ্ছিল। মন খারাপ, আবার মন খুশি। মন খুশি হওয়ার কারণ সে বুঝতে পারছিল। এমন একটা চমৎকার দিনে সে শ্রবণের কাছে এসেছে। কিন্তু মন খারাপের কারণ কী? বেশি মন ভালো হলে কি মন খারাপ লাগে? হয়তো তাই। যেমন বেশি ভালোবাসায় কান্না পায়। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বারিধারার গান গাইতে ইচ্ছে করল। মনে হল, ইস, গলায় যদি সুর থাকত খুব ভালো হত। গলা ছেড়ে গান করত। শ্রবণও শুনত। কিন্তু তার গলায় মোটে সুর নেই। গলায় সুর না থাকলে গান অন্য কাউকে শোনানো যায় না। শুধু নিজে গুনগুন করে গাওয়া যায়। এটা একটা আপশোসের ঘটনা। বারিধারা তারপরেও তার সুরহীন গলায় গুনগুন করে উঠল—

আকাশের কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় ভাসি।।
ভালোবাসি, ভালোবাসি...

দু-লাইন গাইতেই বারিধারার মনে হল, তার গলায় সুর নেই তো কী হয়েছে? বয়ে গেছে। তার তো গাইতে ভালো লাগছে। সেটাই আসল। গান যখন নিজের গাইতে ভালো লাগে না, তখন গান আর গান থাকে না। সে হাজার গলা ভালো হলেও থাকে না।

কফি নয়, শ্রবণ চা-ই বানিয়ে এনেছিল। কফির কৌটো খুঁজে পায়নি। বউদিকে মোবাইলে জিগ্যেস করবে ভেবেছিল। তারপর ভাবল, থাক। বউদির সন্দেহ হতে পারে। যে ছেলে চা-কফি মোটে খায় না, সে সুদূর শ্রীরামপুরে ফোন করে কফির খোঁজ করলে সন্দেহ হওয়াটা স্বাভাবিক। তার থেকে চায়ের কৌটো পাওয়া গেছে যখন চাই-ই হোক।

boierpathshala.blogspot.com

চা খুব খারাপ হয়েছিল। কষটে মার্কা। তারপরেও বারিধারা তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'বাড়ির লোকের হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও একটাই ওয়ে। আমার চটির ব্যবস্থা করা। নতুন চটি কিনে আনতে চাইলে পারো। আমি যাব না। পায়ের মাপ বলে দিচ্ছি। তবে নতুন চটি পরে আমি প্রথমে দুটো দিন বাড়িতে হাঁটাচলা করে নিই। পায়ে ফোসকা পরে কিনা পরীক্ষা করি। নতুন চটি কিনলে তোমার বাড়িতে দুদিন থাকা মাস্ট। পথ একটাই, আমার এই চটিটাই সারিয়ে আনা। কলকাতা শহরে তো আর একজন মুচি থাকে না। তুমি আমার ছেঁড়া চটি নিয়ে বেরোও। যেখান থেকে পারো মুচি খুঁজে সারিয়ে আনো। ততক্ষণে আমার জামাপ্যান্টও শুকিয়ে যাবে। সেই ফাঁকে আমি তোমার ডিভানটায় শুয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। আজ আমি সারাদিন ঘুমোব ভেবেছিলাম। তুমি মিথ্যে বলে আমাকে টেনে এনেছ। কাজটা অন্যায় করেছ। কিন্তু আজ আমার ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে না। তুমি আমার চটি সারিয়ে আনবে, আর আমি এখন ঘুমোব।'

শ্রবণ কাচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'সরি ধারা। তুমি ভিজে যাবে, চটি ছিঁড়ে যাবে এত কিছু আমি ভাবিনি।'

বারিধারা ডিভানের ওপর ধপাস করে বসে পড়ল। বলল, 'এতবার সরি বোলো না। রাগ বেড়ে যাবে। বালিশটা কই? ওই তো।' বালিশ টেনে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বারিধারা। বলল, 'ও শোনো, বাইরে থেকে দরজা টেনে দিয়ে যাও। আমি যতক্ষণ ঘুমোব, এ ঘরে ঢুকবে না। ঘুম ভাঙলে আমি ডাকব। তখন আমাকে আর এক কাপ চা করে খাওয়াবে। বুঝেছ? এখন যেমন বাজে বানিয়েছ, তখন আরও বাজে চা বানাবে।'

শ্রবণ মাথা চুলকে বলল, 'অবশ্যই চা খাওয়াব।'

বারি পায়ের কাছে দলা পাকিয়ে থাকা চাদরটা টেনে নিল গায়ের ওপর। চাদরে শ্রবণের গায়ের গন্ধ না? আহা! বারিধারা বলল, 'এইটা তোমার জুতোর বিজ্ঞাপনের কনসেপ্ট হতে পারে কিনা ভেবে দেখো তো একবার।'

'কোনটা?' শ্রবণ আগ্রহের সঙ্গে বলে।

বারিধারা গম্ভীর ভাবে বলল, 'প্রেমিকা বৃষ্টির জমা জলে চটি ছিঁড়ে ফেলেছে, প্রেমিক সেই চটি সারাতে বেরিয়েছে। খারাপ হবে? যাওয়ার আগে মাথার কাছে জানলার পর্দাটা টেনে দাও। ঘর অন্ধকার ছাড়া আমি ঘুমোতে পারি না।'

শ্রবণ পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করল। দরজা দিয়ে বেরোতে যাওয়ার সময় বারিধারা ডাকল।

'এক মিনিট শ্রবণ, এদিকে একবার এসো তো। ঘুমোনোর আগে তোমার গায়ে হাত দিয়ে দেখব জ্বর আছে কিনা। নইলে ঘুমিয়ে শান্তি পাব না।'

শ্রবণ লজ্জা পেয়ে বলল, 'জ্বরের কথাটা তো বানানো ধারা।'

বারিধারা মাথাটা একটু তুলে কড়া গলায় বলল, 'কাছে আসতে বলছি এসো। অনেক কষ্টে রাগ কন্ট্রোল করে আছি কিন্তু।'

শ্রবণ খানিকটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে। ডিভানের কাছে আসতেই বারিধারা তার হাত ধরে টান দেয়। শ্রবণ বারিধারার গায়ের ওপর পড়ে। সে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'অ্যাই, কী করছ? কী করছ?'

বারিধারা শ্রবণকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে, গালে, গলায় মুখ ঘষতে থাকে। চাপা গলায় বলে, 'শাস্তি দিচ্ছি। আর কখনও মিথ্যে বলে আমাকে ডাকবে? বলো, ডাকবে কখনও?'

শ্রবণ খানিকক্ষণ এই আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করে। একসময় হাল ছেড়ে দেয়। বুঝতে পারে, বারিধারা খেপে উঠেছে। খেপা মেয়ের এই খ্যাপামি তার অচেনা। অন্যরকম ভালো লাগার। এই ভালো লাগবার স্বাদ পেতেই কি সে বারিধারাকে মিথ্যে বলে একলা বাড়িতে ডেকে এনেছে? এবার শ্রবণ বারিধারাকে আদর করতে শুরু করে। আত্মসমর্পণ করে বারিধারা। একসময় জামা খুলে ফেলে। ঠোঁট কামড়ে ফিসফিস করে বলে, 'এই নাও, তোমার জামা, তোমার জামা আমার লাগবে না।'

boierpathshala.blogspot.com

আধো মেঘের আলোয় উন্মুক্ত বারিধারাকে দেখে শ্রবণের মনে হয়, সে স্বপ্ন দেখছে। অবশ্যই স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ এত সুন্দর হয়? সে বিড়বিড় করে কিছু বলতে যায়। বারিধারা কথা পুরো বলতে দেয় না, দু'হাতে তার মাথা ধরে টেনে নামায়।

তখন বাইরে জোরে বৃষ্টি নেমেছিল।

আজও সেই একই মতলব নাকি? বারিধারা ভুরু কোঁচকাল। ঘটনা যদি তাই হয়, এই ছেলের আজ বিপদ আছে। আজ একটা বড় টেনশনের দিন। আজ কোনওরকম এদিক-ওদিক করে সময় নষ্ট করা যাবে না।

আজ নন্দকাকুকে গলির মোড়ে দাঁড়াতে বলে বারিধারা শ্রবণের বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেল। বেল টিপতে শ্রবণই দরজা খুলল। এ কী চেহারা! চুল উসকো-খুসকো। চোখ দুটো লাল করমচার মতো। গায়ে একটা চাদরও দিয়েছে। শুকনো মুখে হাসল।

'এসো ভিতরে এসো।'

ভিতরে ঢুকে শ্রবণের কপালে হাত দিল বারিধারা। গা পুড়ে যাচ্ছে।

'ওষুধ খেয়েছ?'

শ্রবণ হেসে বলল, 'খাইনি। খাব।'

বারিধারা ধমক দিয়ে বলল, 'খাইনি, খাব মানে কী? কোথায় প্যারাসিটামল আছে? দাঁড়াও নন্দকাকুকে দোকান থেকে আনতে বলছি।' বলতে বলতে মোবাইল বের করল বারিধারা। শ্রবণ তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলল, 'আরে অত ব্যস্ত হোয়ো না বারি। ওষুধ ঘরেই আছে।'

বারিধারা বলল, 'কোথায় আছে?'

'দাঁড়াও আমি দেখছি ধারা। মনে হচ্ছে ওই বাক্সে।'

বারিধারা বলল, 'তোমাকে কিছু দেখতে হবে না। আমি দেখছি। তুমি বারি, ধারা আর ধারা, বারি বলা বন্ধ করে চুপ করে বসো।'

বারিধারা শুধু ওষুধ খাওয়াল না, শ্রবণকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে মাথা ধুয়ে দিল। তারপর বিছানায় শুইয়ে গায়ে চাদর টেনে দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'এখন ঘুম দাও। আমি নীচে দরজা টেনে দিয়ে যাচ্ছি। অসুবিধে তো হবে না। অটোমেটিক লক।'

শ্রবণ বলল, 'আর একটু থাকবে না?'

বারিধারা মাথা নামিয়ে শ্রবণের গরম কপালে চুমু খেল। বলল, 'আজ ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা খুব জরুরি কাজ আছে সোনা। চিন্তা কোরো না, ওষুধ খেয়েছ। জ্বর নেমে যাবে। বিকেলে ডাক্তার দেখিয়ে নিও। আমি ফোন করব।'

'বারি, আমি একটা ফাটাফাটি বিজ্ঞাপন তৈরি করেছি। মুভি।'

বারিধারা সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল, 'খুব ভালো করছ।'

শ্রবণ উৎসাহের চোটে একটু উঠে বসে বলল, 'ব্যাটারির বিজ্ঞাপন। টিভি, সিনেমা হলে দেখানো হবে। ওনলি টেন সেকেন্ডস।'

বারিধারা হেসে বলল, 'বা:, আরও ভালো। তবে তুমি অমন করে উঠে বোসো না।'

শ্রবণ আরও খানিকটা উঠে বসল। তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'একটা লাভ স্টোরি ভেবেছি। শুনবে?'

বারিধারা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আজ নয় বাবু। বললাম না, আজ কাজ আছে। অন্য একদিন শুনব।'

গাড়িতেই বারিধারার মোবাইল বেজে উঠল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল, 'চিরসখা কলিং।'

'কী হল আবার?'

'ঘাম দিচ্ছে বারি, মনে হচ্ছে জ্বর গন।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা বিরক্ত গলায় বলল, 'জ্বর গন হোক, তুমি কিন্তু বিছানা থেকে উঠবে না শ্রবণ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ধারা। তুমি আমার জ্বর সারিয়ে দিয়ে গেলে। ভাগ্যিস ডেকেছিলাম।'

বারিধারা চাপা ধমক দিয়ে বলল, 'আহ্লাদিপনা কোরো না। বিকেলে ডাক্তার দেখাবে।'

শ্রবণ বলল, 'ব্যাটারি অ্যাডের কনসেপ্টটা তো শুনবে।'

বারিধারা হতাশ গলায় বলল, 'বলো। তবে দশ সেকেন্ডসের বেশি সময় নেবে না।'

শ্রবণ জ্বরভাঙা গলায় বলতে শুরু করল।

'লিফটে দুজন ছেলেমেয়ে উঠছে। হঠাৎ অন্ধকার। লিফট বন্ধ। এমন সময়...।'

ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতেই বারিধারা খবর পেল, তাকে কল্যাণ সমাজপতি খুঁজছেন। তিনতলার ফাঁকা স্টাডিরুমে বারিধারা গিয়ে দেখল, সেখানে অরিন্দম সেনগুপ্তও আছেন। দুজন স্যারকে দেখে অবাক হল বারিধারা। দুজনের মুখ থমথম করছে।

পঁয়ত্রিশ

'কী হয়েছে স্যার? আমাকে ডেকেছেন?'

অরিন্দম সেনগুপ্ত বললেন, 'বসো বারিধারা। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

দুটো চেয়ার ছেড়ে বসা কল্যাণ সমাজপতির সামনে একটা খাতা। তিনি সম্ভবত কোনও স্টুডেন্টের নোটস দেখছেন। তিনিও অস্ফুটে বললেন, 'বসো।'

বারিধারা উলটো দিকের চেয়ারে খানিকটা জড়সড় হয়েই বসল। যতই হোক দুজন মাস্টারমশাই।

অরিন্দমবাবু বললেন, 'বারিধারা তোমার সঙ্গে মধুজা রায়ের গোলমালের কথা আমরা শুনেছি।'

বারিধারা চমকে উঠল। এই কথা স্যারেরা জানলেন কী করে! ঘটনা কী করে ছড়াল! সেদিন তো মধুজা ম্যাডাম তাকে একা ডেকে হুমকি দিয়েছিলেন। তখন তো ঘরে কেউ ছিলই না। সে নিজেও কাউকে বলেনি। এমনকী যাকে নিয়ে এত ঝামেলা, সেই তিথিকে পর্যন্ত নয়। তাহলে?

বারিধারার চমকে যাওয়ারই কথা। সে তো আর জানে না, মধুজা রায়ের অফিসের খবর তার খাস পিওন লবই পাচার করে। কাজটা অন্যায় জেনেও করে। ম্যাডাম যদি তার ভাইপোর চাকরি নিয়ে অন্যায় কাজ করতে পারে, সে করতে পারবে না কেন? চাকরি উনি না-ই দিতে পারতেন, কিন্তু উনি খবরটা জেনে নিয়ে নিজের ক্যান্ডিডেটকে ঢুকিয়ে দিলেন। এটা শুধু অন্যায় নয়, ভয়ঙ্কর একটা কাজ। ম্যাডাম খুব ভালো করেই জানতেন, বিষয়টা নিয়ে লব কিছু বলতে পারবে না। তার হাতে কোনও প্রমাণ নেই। আর থাকলেই বা কী হত? সে মধুজা রায় একজন প্রফেসর এবং ক্ষমতাশালী। ইউনিভার্সিটির ওপর মহলে যেমন হাত আছে, সরকারের দপ্তরেরও চেনা জানা। আর সে একজন সামান্য পিওন। লব বাধ্য হয়ে চুপ করে গিয়েছিল। তবে সেই ঘটনা নিয়ে মুখে কিছু না বলতে পারলেও প্রতিজ্ঞা করেছে, এই মহিলার সর্বনাশ দেখে ছাড়বে। সে জানে, ইউনিভার্সিটিতে মধুজা রায়ের বিরুদ্ধে এখন অনেকেই চলে গেছে। মধুজা রায় ক্ষমতার দম্ভে মত্ত। ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। রাজনৈতিক মদতও আছে। খেয়াল রাখেন না যে তাঁর বিরুদ্ধে অনেকেই ভিতরে ভিতরে ফুঁসছে। অপেক্ষা করে আছে একটা সুযোগ পেলেই চেপে ধরবে। এদের কাছেই লব খবর পাচার করে। অরিন্দম স্যারকেও সে বারিধারার খবর দিয়েছে। এই কথা বারিধারা জানবে কী করে? তার মুখ দেখে স্যারেরা বুঝতে পারলেন। কল্যাণ সমাজপতি খাতা থেকে মুখ তুললেন।

'বারিধারা, আমরা সব কথা শুনেছি। তুমি ঠিক কাজ করেছ।'

অরিন্দম বললেন, 'তুমি সাহসের কাজ করেছ। ওই ছেলেটা তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তাতে এই শাস্তিটাই ওর প্রাপ্য ছিল। আমি সুদর্শন নামের ছেলেটি সম্পর্কে আগেও কমপ্লেইন শুনেছি। গুন্ডা টাইপ। লেখাপড়া করে না। ড্রপ দিয়ে বসে আছে। শুধু ইউনিয়নবাজি করে। দল বদলের পলিটিক্স। শুনেছি কলেজে

boierpathshala.blogspot.com

একরকম ছাত্র রাজনীতি করত, ইউনিভার্সিটিতে এসে আরেক রকম করছে। যেখানে যাদের ক্ষমতা তাদের সঙ্গে থেকে গুন্ডামি, অসভ্যতা করে।'

বারিধারা বলল, 'স্যার, ছেলেটা কিন্তু আমার সঙ্গে কিছু করেনি।'

কল্যাণ সমাজপতি আর অরিন্দম স্যার একটু থমকে গেলেন। মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। কল্যাণ সমাজপতি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে করেনি মানে? তুমি সুদর্শনকে চড় মারোনি?'

বারিধারা শান্তভাবে বলল, 'মেরেছি স্যার। তবে আমার জন্য মারিনি।'

কল্যাণস্যার অবাক হয়ে বললেন, 'তাহলে কার জন্য মেরেছ?'

তিথির জন্য স্যার। আমাদের ক্লাসের তিথি। ওই ছেলেটা দুদিন আগে সবার সামনে তিথিকে বিশ্রী একটা কথা বলে। স্ল্যাং। তিথি ভীতু ধরনের মেয়ে। সে কোনও প্রতিবাদ করতে পারেনি। পরে আমাকে বলে। আমি বলেছিলাম, ব্যবস্থা নেব। সেই ব্যবস্থাই নিয়েছি।'

অরিন্দমবাবু মাথা নেড়ে অস্ফুটে বলে, 'একটু ভুল খবর পেয়েছিলাম।'

লবই ভুল করেছে। সে আড়াল থেকে মধুজা রায় আর বারিধারার কথা শুনেছে। কিন্তু তিথি নামটা গুলিয়ে ফেলেছিল। রিপোর্টটা তাই ভুল হয়েছে। নাম গুলিয়ে ফেলাটাই স্বাভাবিক। আজকাল অনেক মেয়ে নিজের বা বন্ধুর অপমানের প্রতিবাদ করে। পথ চলতে গেলে মেয়েদেরে এখনও নানারকম অসভ্যতার মুখোমুখি হতে হয়। আগে মেয়েরা মুখ বুজে থাকত, এখন প্রতিবাদ করে। তবে তার সংখ্যাও আর ক'টা? হাজারে একটা কিনা সন্দেহ। সেই জায়গায় শুধু প্রতিবাদ নয়, একেবারে প্রতিশোধ! তাও আবার নিজের জন্য নয়, বন্ধুর হয়ে।

কল্যাণ সমাজপতি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'বা: এটা তো আরও ভালো! তুমি একটা এক্সাম্পেল এস্টাবলিশ করলে বারিধারা। অন্যদের শেখা উচিত। অন্যায় করলে পার পাওয়া যায় না।'

অরিন্দম সেনগুপ্ত বললেন, 'আমিও খুব খুশি হলাম বারিধারা।'

বারিধারা বলল, 'থ্যাঙ্কু স্যার। কিন্তু আমি কিছু প্রমাণ করবার জন্য করিনি। আমার খুব রাগ হয়েছিল। ছেলেটা যদি কোনও চালাকচতুর সাহসী মেয়ের সঙ্গে এই অসভ্যতাটা করত, আমি হয়তো কিছু করতাম না। একটা সহজ সরল ভীতু মেয়ের সঙ্গে করল বলেই রেগে গিয়েছি। তবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার, ঘটনা জানাজানি হল কী করে। আমি তো ওই ছেলেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে চড় মেরেছি। কাউকে বলিওনি।'

অরিন্দমবাবু একটু চুপ করে থেকে কিছু একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দেখো বারিধারা, এসব ঘটনা চাপা থাকে না। ওই ছেলেটির হায়ার লেভেলে চেনাজানা আছে। তার মারফতই তোমাদের মধুজা ম্যাডাম বিষয়টা জেনেছেন। আমরা শুনেছি, উনি তোমাকে ডেকে হুমকি দিয়েছেন। ওই ছেলেটির কাছে ক্ষমা চাইতেও বলেছেন।'

কল্যাণস্যার বললেন, 'শুধু তাই নয় বারিধারা, আমার কাছে খবর আছে, উনি এক্সামিনেশন সেকশনে যোগাযোগ করেছিলেন। তোমার বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্টের রেকর্ড চেয়ে পাঠিয়েছেন।'

বারিধারা অবাক হল না। মধুজা রায় যে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে শুরু করবে, সেটা তার আঁচ করাই আছে। তবে রেজাল্ট জেনে কী করবে?'

অরিন্দম সেনগুপ্ত বললেন, 'আমরা ওখান থেকেই জানতে পেরেছি। আমরা আপত্তিও করেছি।'

বারিধারা বলল, 'স্যার রেজাল্টের রেকর্ড নিয়ে উনি কী করবেন?'

কল্যাণ সমাজপতি বললেন, 'কী আর করবেন, চাপ দেবেন ভেবেছিলেন হয়তো। লাভ হবে না। সবক'টা সেমিস্টারেই তুমি ফার্স্ট ক্লাসের থেকে অনেকটা করে এগিয়ে আছ।'

'ম্যাডাম তো সে কথা জানেন।' বারিধারা নীচু গলায় বলল।

অরিন্দমস্যার এবার নড়েচড়ে বসলেন।

boierpathshala.blogspot.com

'দেখো বারিধারা, তুমি স্টুডেন্ট, একজন টিচারের নামে তোমাকে এভাবে বলা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু তোমরা জানো, তোমাদের মধুজা ম্যাডাম প্রপার টিচারের মতো বিহেভ করেন না। তোমার বেলাতেও করছেন না। তিনি তোমাকে কীভাবে বিপদে ফেলতে চান, উনিই জানেন। তবে তোমাকে রেজাল্টে আটকাতে পারবেন না। অন্য কেউ হলে নম্বর কমিয়ে ফার্স্ট ক্লাস আটকানোর চেষ্টা হত। সেটা সম্ভব নয়। তুমি অনেক এগিয়ে আছ। হয়তো চাপে ফেলতে চান। যাই হোক, তুমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন খুব ভালো ছাত্রী। এতদিন জানতাম তুমি পড়াশোনায় ভালো, এখন জেনেছি, তুমি মানুষ হিসেবেও ভালো। এটা ইউনিভার্সিটির জন্য গর্বের কথা। তুমি যদি দেখো, অন্যায়ভাবে কেউ তোমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করে জেনে রাখবে, আমরা তোমার পাশে আছি।'

অরিন্দমস্যার এবার একমুখ হেসে বললেন, 'ব্যস বারিধারা, তোমাকে আমাদের এই সাপোর্টের কথাটা জানানোর জন্যই ডাকা। তুমি মাথা নোয়াবে না।'

বারিধারার খুব আনন্দ হচ্ছে। এত ভালো, এত বড় দুজন মানুষ তাকে এভাবে সমর্থন করলেন, এটা খুব বড় পাওনা। সে অবশ্য বিশ্বাস করে, পৃথিবীটা পুরো নষ্ট হয়ে যায়নি। মধুজা রায়ের মতো মানুষই শুধু নেই, এই পৃথিবীতে অরিন্দমস্যার, কল্যাণস্যারের মতো মানুষও আছেন। তার ঠাকুরদা। কমলকান্তি সেন আছে। জামাইবাবুর মতো মজার পাগলাটে মানুষ আছে। তার মা, দিদির মতো সুন্দর মানুষ আছে। সব থেকে বড় কথা, তার শ্রবণের মতো বোকা অথচ ভালোমানুষ আছে।

বারিধারা চেয়ার থেকে উঠে স্যারদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে তাঁরা বাধা দেন। অরিন্দম সেনগুপ্ত চাপা গলায় বলেন, 'যদি মনে করো তুমি কোনও কিছু করবে, আমাদের জানিও।'

বারিধারা একটু থতমত খেয়ে বলল, 'আমি কী করব?'

কল্যাণস্যার হাত তুলে বলল, 'আহা তুমি একা নও, যদি ভাবো, তোমরা বন্ধুরা মিলে এর প্রতিবাদে কোনও অ্যাজিটেশন-ট্যাজিটেশন করবে, আমাদের বোলো। সেখানে আমরা গিয়ে তোমাদের সমর্থন করব। কলেজের কোনও স্টুডেন্টের সঙ্গে নোংরা আচরণ করলে শিক্ষকদের উচিত পাশে দাঁড়ানো। সে যেই করুক। গুন্ডাই করুক, আর টিচাররাই করুক।'

বারিধারা একটু ঘাবড়ে গিয়েই বলে, 'না না, ওসব দরকার নেই স্যার।'

অরিন্দমস্যার একটু যেন হতাশ হলেন। বললেন, 'না করতে হলেই ভালো। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনাই হবে। এটা ক্ষোভ-বিক্ষোভের জায়গা নয়। তার পরেও অনেক ঘটনা বাধ্য করে। যাই হোক, আশা করি তোমার কোনও সমস্যা হবে না। তুমি এসো।'

কল্যাণ সমাজপতি বললেন, 'তোমাকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি বারিধারা। আশীর্বাদও করছি। তুমি এইভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।'

বারিধারা মাথা চুলকে একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'স্যার, ব্যাপারটা নিয়ে বেশি হইচই না হওয়াই ভালো। তিথি মেয়েটা নার্ভাস ধরনের। তাকে নিয়ে এত কিছু হলে হয়তো ইউনিভার্সিটিতে আসাই বন্ধ করে দেবে।'

অরিন্দম সেনগুপ্ত এবং কল্যাণ সমাজপতি পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। অরিন্দম হেসে বললেন, 'ডোন্ট ওয়ারি বারিধারা। তুমি না চাইলে এটা আর কেউই জানতে পারবে না। এটা তোমার ওপরই নির্ভর করছে। আমরা শুধু একটা কথাই বলতে পারি। একটা ন্যায়ের কাজ করতে গিয়ে অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করাটাও কিন্তু ঠিক নয়। যাই হোক বেস্ট অফ লাক। আশা করি এই বিষয়ে কোনও সমস্যা হবে না।'

কল্যাণস্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আজ মধুজা ম্যাডাম তোমাকে ডেকেছেন না?'

এনারা এতটা দূর জেনে গেছেন। বারিধারা বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

কল্যাণস্যার বললেন, 'ওই অসভ্য ছেলেটাকেও তো ডেকেছে।'

বারিধারা মাথা নাড়ল। নীচু গলায় বলল, 'একটা মিটমাট চাইছেন।'

অরিন্দমস্যার স্থির চোখে বারিধারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি মিটমাট করবে?'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা একটু হেসে বলল, 'আমার মিটমাট করবার কী আছে স্যার? আমি যা করবার তো করেই দিয়েছি। আমি তিথিকে বলেছিলাম, ওই ছেলেকে শাস্তি দেব। দেওয়া হয়ে গেছে।'

দুই মাস্টারমশাইয়ের কাছে কথাটার মানে খুব স্পষ্ট হল না। বারিধারাও করতে চায়নি। এই দুজনকে সে পছন্দ করলেও নিজের রণকৌশল যুদ্ধের আগে ফাঁস করতে চাইছে না। একানব্বই বছরের দাদু তাকে যে প্ল্যান দিয়েছে, সেটাকেই ঘষেমেজে নিয়েছে।

বারিধারা ঘর থেকে বেরোবার পর কল্যাণবাবু বললেন, 'মনে হয় মেয়েটা কমপ্রোমাইজ করে নিচ্ছে।'

অরিন্দমবাবু বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। মেয়েটা মধুজা রায়ের কাছে সারেন্ডার করবে। ওই ছেলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।'

কল্যাণবাবু মুখ দিয়ে 'চুক চুক' ধরনের আওয়াজ করে বললেন, 'সমস্যাটা অন্য অরিন্দমদা। বারিধারার চড় মারা হয়ে গেছে। এবার ওর কম্প্রোমাইজ করা বা না করায় কিছু এসে যায় না। কিন্তু মধুজা রায়ের এসে যায়। মেয়েটা যদি ওই ছেলের কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে মধুজা রায়ের লাভ। সে ওই পাওয়ারফুল পারসেনের কাছে ক্রেডিট নিতে পারবে। নিজে আরও ক্ষমতা ম্যানেজ করবে। এই ধরনের বিষয়গুলো যে-কোনও মানুষের কাছেই সেনসেটিভ। যাক, আমরা তো বারিধারাকে অনেক উত্তেজিত করবার চেষ্টা করলাম। বললাম, প্রতিবাদ থেকে সোরো না। অ্যাজিটেশন করলে আমরা তোমার পাশে আছি। এর বেশি তো আর বলতে পারি না।'

অরিন্দমবাবু বললেন, 'ঠিকই তো। আমরা তো বলতে পারি না তুমি একটা হইচই বাধাও।'

কল্যাণবাবু বললেন, 'ঘটনাটা কিন্তু খুব সেনসেটিভ ছিল অরিন্দমদা। মধুজা রায়কে ছেলেমেয়েরা চেপে ধরতে পারত। খারাপ লোকদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ফাঁস হয়ে যেত। খুব মিস হয়ে গেল।'

অরিন্দমবাবু খানিকটা চুপ করে থেকে, খানিকটা আপনমনেই বললেন, 'আমার এখনও আশা আছে। আমি পলাশকে একবার ডাকি।'

'পলাশকে আপনি কিছু বলেছেন নাকি?'

অরিন্দমবাবু মোবাইলে নম্বর টিপতে টিপতে বললেন, 'বলিনি, হিন্টস দিয়েছি।'

পলাশ এই ইউনিভার্সিটিরই হিস্ট্রির ছাত্র। এবার ফাইনাল দিয়েছে। সে গতবার স্টুডেন্টস ইউনিয়নের আর্টস ফ্যাকাল্টিতে জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছিল। এবার নমিনেশন জমা দিতে পারেনি। তাকে নাকি হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তবে বিষয়টা নিয়ে পলাশের নিজেদের দলেই গোলমাল আছে। একদল বলছে, পলাশ ভয়ে নমিনেশন জমা দিতে আসেনি। তাকে কেউ মারেওনি, হুমকিও দেয়নি। এসব অজুহাত। আবার একদল বলেছে, পলাশের মতো লিডারশিপে থাকা ছেলে মার খেলে সাধারণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভয় ছড়াত। এমনিতেই এই সময়ে কেউ ক্ষমতার বাইরে থেকে রাজনীতি করতে চাইছে না, এতে তো আরও করবে না। ফলে পলাশের নমিশেন জমা না-দেওয়াটা ঠিক কৌশল হয়েছে। ভয় বা কৌশল যাই হোক না কেন, এই ঘটনায় পলাশের ইমেজে ক্ষতি হয়েছে। তার দলেরও হয়েছে। সে তক্কে তক্কে আছে। ইউনিভার্সিটিতে একটা কোনও গোলমাল পাকিয়ে নিজেদের হারানো জমি যদি খানিকটা ফিরে পাওয়া যায়।

ফোন করবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পলাশ স্যারেদের কাছে চলে এলো।

ছত্রিশ

তিথির হাঁটু কাঁপছে।

যদিও হাঁটু কাঁপার মতো কোনও কথা মধুজা ম্যাডাম বলেনি। তারপরেও কাঁপছে। তিথির এই একটা সমস্যা। খুব অল্পতে সে নার্ভাস হয়ে যায়। কিছু হওয়ার আগেই নার্ভাস। ঘটনার আগে সাত-পাঁচ ভেবে ঘাবড়ে থাকে। ছোটবেলা থেকেই তার এই অসুখ। সেসব রাস্তায় ছেলেছোকরারা গল্পগুজব করত সেসব

boierpathshala.blogspot.com

রাস্তা দিয়ে পারতপক্ষে স্কুলে যেত না। ছোট মফসসল শহর। সবাই সবাইকে চেনে। এত ভয়ের কিছু নেই। বাড়িতে বাবা, কাকা, খুড়তুতো দাদারা আছে। তাকে কেউ বিরক্ত করলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপরেও সাহস হত না। ঘুরপথে স্কুলে যেতে সময় লাগত। সে-ও ভি আচ্ছা। একবার কলেজ থেকে বাড়ি ফেরবার সময় বিরাট কেলেঙ্কারি করেছিল। সেই ঘটনা নিয়ে আজও সবাই হাসাহাসি করে।

সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত আটটা হয়ে গিয়েছিল। চারটে বত্রিশের গাড়িটা ক্যানসেল হয়ে যাওয়ায় ঝাড়া এক ঘণ্টা হাওড়ায় বসে থাকতে হল। তিথি ঠিকই করেছিল স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশা নেবে। স্টেশন থেকে বাড়ি হাঁটাপথে মিনিট তেরো-চোদ্দো। ধীরে সুস্থে হাঁটলে পনেরো। বোসেদের পুকুরপাড় দিয়ে একটা শর্টকাট আছে। সন্ধের পর তিথি ওদিক মাড়ায় না। স্টেশন থেকে বাড়ি এইটুকু পথের জন্য রিকশা নেওয়ার মানে নেই। তারপরেও কোনও কোনওদিন দেরি হলে নিয়ে নেয়। সেদিন স্টেশনের বাইরে এসে রিকশা স্ট্যান্ড ফাঁকা। ব্যাপার কী! যেখানে রিকশার ঠেলায় পথ হাঁটা যায় না, সেখানে একটাও রিকশা নেই কেন? স্টেশনের বাইরে ম্যাগাজিন নিয়ে বসে 'বাচ্চুদা'। অনেকদিনের চেনা। তিথি এখান থেকে ম্যাগাজিন কেনে। আবার উলটেপালটে দেখে রেখেও দেয়। রান্না বা সিনেমার ভালো কোনও ইস্যু হলে 'বাচ্চুদা' নিজে থেকেই সরিয়ে রেখে দেয়।

'কী হয়েছে বাচ্চুদা? রিকশা কই?'

'দিদিমণি, আজ আর রিকশা হবে বলে মনে হয় না। কোথায় কে গোলমাল করেছে বলে থানায় তুলে নিয়ে গেছে। সবাই মিলে ছাড়াতে গেছে। না ছাড়লে গোটা রাত বসে থাকবে।'

তিথি মনে মনে প্রমাদ গুনল। এই রে! আজ দেরি, আর আজই রিকশা নেই। অন্যদিন তো প্যাঁ পোঁ, প্যাঁ পোঁ করে কানের মাথা খেয়ে ফেলে।

বাচ্চুদা বলল, 'নারীর মন পত্রিকায় এবার চিড়িংমাছের অনেকগুলো রেসিপি দিয়েছে, নেবে নাকি?'

তিথি অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আজ থাক বাচ্চুদা।'

তাড়াহুড়ো করে রাস্তায় নেমে এল তিথি। তার কেমন জানি অস্বস্তি হচ্ছে। একেবারেই রাত হয়নি। রাস্তা লোকজনে ভর্তি। হাওড়া থেকে ট্রেন এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই ভিড় হবে। তারপরেও তিথির অস্বস্তি হচ্ছে। কারণ কী? কারণ একটা লম্বা মতো লোক। ট্রেন থেকেই এই অচেনা লোকটা তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছিল। ট্রেনে 'মেয়ে দেখা' পুরুষমানুষ অনেক দেখেছে তিথি। গা সাওয়া হয়ে গেছে। মুখ ফিরিয়ে রাখলেই হল। কিন্তু এই লোক তার সঙ্গে স্টেশনে নেমেছে। সে যখন বাচ্চুদার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছিল। এই কারণে অস্বস্তি। একটু পরে তিথি বুঝল অস্বস্তি নয়, তার ভয় করছে। কারণ ঢ্যাঙা লোকটা মনে হচ্ছে, তার পিছু নিয়েছে। কী হবে? তিথি হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। লোকটাও মনে হয় স্পিড বাড়াল। তিথি এবারে নার্ভাস হয়ে গেল। তার বাড়ির এই পথটা একটু নির্জন। তার মানে এই নয় যে শুনশান। দোকান-টোকানও রয়েছে। চেনা দোকান। কোনও একটা দোকানে ঢুকে যাবে? ঢুকে কী বলবে? হাবিজাবি কিছু কিনবে? নাকি বলবে, 'ও দাদা, ওই লোকটা আমাকে ফলো করছে। ওকে ধরুন।' তারপর লোকজন বেরিয়ে এসে যদি সত্যি ধরে? মারধর শুরু করে যদি? যদি কেন, নিশ্চয় করবে। পাড়ার মেয়েকে অচেনা লোক সন্ধেবেলা ফলো করলে তাকে তো আর বসিয়ে রসগোল্লা খাওয়াবে না। কিন্তু তারপর? বিরাট একটা হইহুল্লোড় শুরু হয়ে যাবে। এখানে সবাই জেনে যাবে, তিথির পিছনে একটা লোক ঘুরঘুর করছিল তাকে ধরে ঠ্যাঙানো হচ্ছে। এইসব খবরে মানুষ মজা পায়। যাকে ধরা হয়েছে তাকে যেমন দেখতে চায়, যার পিছনে লেগেছিল তাকেও দেখবার জন্য ভিড় করে। ইস! মাগো! তিথি ঘামতে শুরু করল। না না, ওসব করা যাবে না। দাদাদের কাউকে ডেকে নেবে? মোবাইলে ধরবে? কিছু বলবে না। শুধু বলবে এসে আমাকে বাইকে নিয়ে যা। তারও উপায় নেই। দুজন দাদাই এখন বাইরে। তিথি মুখ ফ্যাকাশে করে আরও জোরে হাঁটতে শুরু করল। এবার একটা গলিতে ঢুকতে হবে। গলিটা সন্ধে হলেই নিঝুম হয়ে যায়। কী হবে? লোকটা তাকে ফলো করছে কেন? কিছু বলবে? খারাপ কথা নিশ্চয়।

boierpathshala.blogspot.com

বাড়ি-টাড়ি চিনে যাওয়ার ফন্দি নেই তো। খবরের কাগজে প্রায়ই এরকম খবর থাকে। মেয়েদের বাড়ি চিনে যাওয়ার পর ওঁত পেতে থেকেছে। আচ্ছা, অ্যাসিড ট্যাসিড ছুড়বে না তো! হয়তো পুরোনো কোনও রাগ আছে। তাকে হয়তো কোনওসময় প্রেমপত্র দিয়েছিল। তিথি পাত্তা দেয়নি। গলিতে ঢুকে তিথি প্রায় দৌড়োতে শুরু করল। লোকটাও দৌড়োচ্ছে নাকি! তাই তো মনে হচ্ছে! কী ভয়ংকর!

'অ্যাই মেয়ে, অ্যাই মেয়ে।'

ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় লোকটা ডেকে উঠল। তিথির মনে হল ভয়ে মারাই যাবে। ওই তো বাড়ি। হাঁপাতে হাঁপাতে তিথি কোনওরকমে বাড়ির গেটের ওপর গিয়ে পড়ল। লোকটাও এসেছে।

'অ্যাই, তুই শঙ্করের মেয়ে না? তোর নাম তো তিথি? আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি মন্টুমামা।'

তিথি আকাশ থেকে পড়ল। মন্টুমামা! দিল্লির মন্টুমামা!

মন্টুমামা পাশে এসে একগাল হেসে বলল, 'অবশ্য তুই চিনবিই বা কী করে? লাস্ট দেখেছিস বারো বছর আগে। আমার কিন্তু তোকে ট্রেন থেকেই চেনা চেনা লাগল। আসলে ছোড়দির মুখটা পেয়েছিস তো। মনে হচ্ছিল ছোড়দি বসে আছে। একটু পরেই চিনে ফেললাম।'

তিথি স্বস্তি, আনন্দ, সাহস ফিরে পাওয়ায় ঢোঁক গিলে বলল, 'মন্টুমামা আপনি এখানে!'

মন্টুমামা আরও হেসে বলল, 'কেন, এখানে আসতে পারি না? তোরা তাড়িয়ে দিবি? কলকাতায় এসেছি। তোদের সারপ্রাইজ দিতে কাউকে না বলে চলে এসেছি। ভেবেছিলাম স্টেশনে নেমে ঠিকানাটা একবার ঝালিয়ে নেব। কতদিন আগে এসেছিলাম। তোকে চেনবার পর মনে হল মজা করা যাক। চুপচাপ ভাগ্নিকে ফলো করে দেখি পৌঁছতে পারি কি না।'

তিথিও এক গাল হেসে বলল, 'উফ! আর আমি ভেবেছিলাম...ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হওয়ার জোগাড়।'

এই গল্প আজও চলে। কলেজে পড়া মেয়ে, নিজের পাড়ায় যদি এত নার্ভাস হয়ে যায় তা নিয়ে হাসিঠাট্টা চলবেই। তবে এখন হাসিঠাট্টার সিচুয়েশন নেই। এখন তিথির হাঁটু কাঁপছে।

মধুজা রায় তাকে ঘরে ডেকে উলটো দিকের চেয়ারে বসতে বলেছেন। তিথি বসবার পর তিনি একটু সময় চুপ করে থেকেছেন। তারপর ঠান্ডা গলায় কথা বলেছেন।

'তিথি তুমি কি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে চাও না?'

এই কথা হাঁটু কাঁপার মতো কোনও কথা নয়। টিচাররা হামেশাই স্টুডেন্টকে এরকম কথা বলে। হয়তো কোনও একটা পরীক্ষা খারাপ হয়েছে, অথবা নোটস তেমন হয়নি। আবার ক্লাস ফাঁকি দিলেও বলে। এতে ভয় পাওয়ার কী আছে? আছে। মধুজা রায় যখন এ কথা বলে, তখন ছেলেমেয়েরা ভয় পাবে বই কী। এই মহিলার হাতে অনেক ক্ষমতা। তিনি এমন বলছেন মানে, হুমকি দিচ্ছেন।

তিথি কাঁপা গলায় বলল, 'ম্যাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...আমি কি কোনও ভুল করেছি?'

মধুজা রায় চেয়ারে হেলান দিলেন। আজ তিনি মুখে মেকাপ দেওয়ার সময় সম্ভবত অন্যমনস্ক ছিলেন। মুখ আর গলার সঙ্গে রঙের পার্থক্য হয়ে গেছে। তা ছাড়া বয়স কমানোর আয়োজন মুখে হলেও গলায় হয়নি। গলার চামড়া কুঁচকে গেছে। শীতের সময় মধুজা রায় গলা ঢাকবার জন্য রকমারি মাফলার পড়েন।

'ভুল করোনি, ভুল করতে চলেছ।'

এই হেঁয়ালি ধরনের কথায় তিথি আরও নার্ভাস হয়ে গেল।

'ম্যাডাম সত্যি আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি কী করেছি?'

মধুজা রায় সামনে রাখা একটা কাগজ তুলে নিয়ে বললেন, 'ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন ছেলেমেয়ের গত কয়েকটা পরীক্ষার রেজাল্ট দেখছিলাম। তোমার রেজাল্ট তো খারাপ নয় তিথি। আর একটু মন দিলে আরও ইমপ্রুভ করতে পারবে।'

তিথি ঠিক বুঝতে পারে না। মধুজা ম্যাডামের এই পরামর্শও কি হুমকি?'

মধুজা রায় গলা নরম করে বললেন, 'ভালো রেজাল্ট না হলে ভালো কেরিয়ার করবে কী করে?'

boierpathshala.blogspot.com

তিথি মাথা নামিয়ে বলল, 'চেষ্টা করব ম্যাম।'

মুখে বললেও তিথি অবশ্য জানে তার কেরিয়ারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সেই কেরিয়ার চাকরিবাকরি নয়, সেই কেরিয়ার বিয়ে। খুব শিগগিরই তার বিয়ে। ছেলের বাড়ির সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে। তিথির ফাইনাল পরীক্ষার ক'দিন পরেই তারিখ ঠিক হয়েছে। তিথি ইউনিভার্সিটিতে কাউকে এ কথা বলেনি। বারিধারাকেও নয়। এখন বলবেও না। বিয়ে ঠিক হওয়া মেয়েদের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে সমস্যা হয়। কেমন যেন আলাদা আলাদা হয়ে যায়। কলেজে পড়বার সময় ক্লাসে ভ্রমর নামে একটা দারুণ মেয়ে ছিল। সবার সঙ্গে মজা করত। হইচই করত। টেবিল বাজিয়ে গান করত, নাচত, ক্লাস কেটে সিনেমা যেত, কমনরুমে বসে সিগারেটও টানত। সব মেয়েরা ভ্রমরকে পছন্দ করত। এরা হল চারপাশ জমিয়ে রাখা মেয়ে। সব অনুষ্ঠানে ভ্রমরকে চাই। সেই মেয়ের একদিন দুম করে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। ব্যস, ভ্রমরও চুপ মেরে গেল, মেয়েরাও তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল। এখন সব গল্প নাকি তার সঙ্গে করে মজা নেই। ও নাকি এখন হবু বর ছাড়া কোনও মজাতেই মন দিতে পারবে না। কী বিশ্রী! ইউনিভার্সিটিতেও এই ঘটনা হয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে কথাকলির বিয়ে হল। বিয়ের আগে ওর সঙ্গে সবাই ঠাট্টা ইয়ার্কি শুরু করল। তার মধ্যে নিরামিষ, আমিষ দু'রকমের ঠাট্টাই ছিল। মেয়েরা তো বলছিলই, ছেলেরাও কম যায়নি। কেউ জলের বোতল নিয়ে মাতাল দেবদাসের মতো অভিনয় করত। কেউ বলত, 'ধুস তোর পাশে বসে আর লাভ নেই। নো চান্স।' এইসব কারণেই বিয়ের কথা এখনই কাউকে জানাতে চায় না তিথি। তা ছাড়া একটা লজ্জার ব্যাপারও আছে। দিল্লির সেই মন্টুমামাই এই সম্বন্ধ এনেছে। সম্বন্ধ অতি লোভনীয়। ছেলে সফটঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। সে নিজেও যেমন লেখাপড়া করেছে, বউও চায় পড়াশোনা জানা। শুধু সুন্দরীর হলে হবে না, মেয়ের ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি থাকা চাই। পাঁচজনকে যেন বলা যায়। ছেলে এখন পুনেতে আছে। এরপর মিডল ইস্টে কোথাও বদলি হবে। কুয়েত বা আবুধাবি। কোম্পানি মোটা বেতন, বাংলো, গাড়ি সব দেবে। ছেলের রসিকতা করবার শখ আছে। এর মধ্যে রাতে একদিন লুকিয়ে ফোন করেছিল। মোবাইলে অচেনা নম্বর দেখে দুবার লাইন কেটেও দেয় তিথি। তিনবারের বার ধারে।

'তিথি কেমন আছ?'

'আপনি কে?'

'বলো তো আমি কে?'

তিথি ভয় পেয়ে আবার ফোন কেটে দেয়। ফের ফোন বাজে।

'ফোন কেটে দিলে কেন তিথি?'

তিথি কড়া গলায় বলল, 'আপনি কে?'

'আমি তোমার বর। পুনে থেকে বলছি।'

তিথির বুক ধক করে ওঠে। পুনে থেকে 'ও' ফোন করেছে! কী 'দুষ্টু'! নামটাও বলছে না।

'কেমন আছো তিথি?'

তিথির ঘরে কেউ থাকে না। তারপরেও সে ঘরের চারপাশ ভালো করে দেখে ফিসফিস করে বলল, 'আপনি আমার নম্বর পেলেন কোথা থেকে?'

'বলব কেন? বরেরা সব সময় হবু বউয়ের টেলিফোন নম্বর পেয়ে যায়। তার জন্য পরিশ্রম করতে হয় না।'

তিথির শরীরে এবার একসঙ্গে অনেকরকম কিছু হতে লাগল। লজ্জা, ভয়, ঝিমঝিমানি। এমন নয় সে কোনও দিন ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেনি। বহুবার বলেছে। ইউনিভার্সিটিতেই ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। এই পুরুষ মানুষের গলা শুনে তা হলে কেন এমন হচ্ছে?'

'তিথি, তোমাকে একটা জরুরি কথা বলতে ফোন করেছি।'

তিথির মজা লাগল। বলল, 'কী কথা?'

boierpathshala.blogspot.com

'তুমি যখন বিয়ের পোশাক-টোশাক কিনবে তখন মনে করে একটা জিনিস কিনো। এটা তুমি বাড়ির কারও হাতে ছেড়ো না। তারা না জানলেই ভালো।'

তিথি অবাক হয়ে বলল, 'কী জিনিস?'

'আসলে কী জানো তিথি, মিডল ইস্টে আমাদের কোম্পানির সবক'টা বাংলোতে সুইমিং পুল আছে। আমি যেটায় যাব সেটাতেও থাকবে। হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার সিস্টেম।

তিথি খুব খুশি হল। নিজের বাড়িতে সুইমিং পুল সে শুধু সিনেমাতেই দেখেছে। এবার সত্যি সত্যি দেখবে।

'তুমি কি সাঁতার জানো তিথি?'

তিথি বলল, 'না জানি না।'

'কোনও সমস্যা নেই। আমি শিখিয়ে দেব। তুমি মনে করে অবশ্যই একটা সুইমিং কস্টিউম কিনে রাখবে। ওখানেও পাওয়া যাবে। কিন্তু সে আবার খোঁজ করতে করতে সময় নষ্ট। তার থেকে রেডি থাকাই ভালো।'

তিথি কিছু বলতে পারল না। তার লজ্জা করছে। সুইমিং কস্টিউম মানেই তো ছোট পোশাক। ইস!

'বিকিনি হলে সবথেকে ভালো হয়। বিকিনি পরলে তোমার সুইম করতেও মজা, আমার শেখাতেও মজা।'

তিথির কান গরম হয়ে গেল। তার মনে হল, এই ছেলে যদি সামনে থাকত তা হলে সে পিঠে কিল মারত। বলত, 'খুব আহ্লাদ না? বউকে বিকিনি পরিয়ে দেখবার খুব শখ হয়েছে না?'

এসব কথা কাউকে এখন বলা যায়? মধুজা ম্যাডাম কেরিয়ারের কথা বলছেন, চুপচাপ ঘাড় নাড়াই ভালো। তবে পরীক্ষায় ঠিকমতো পাস করতে হবে। নইলে বর বাবাজি খেপে যাবে। তার বিকিনিও চাই আবার এমএ ডিগ্রিও চাই। তবে বউ কাজকর্ম করবে না। বাড়িতেই থাকবে। ঘরসংসার করবে। সে-কথা ছেলের মা খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। তিথির মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে তার।

'দেখুন দিদি, মাছে-ভাতের মতো আমার ছেলে হল পোস্তর বড়া আর চচ্চড়ির বাঙালি। বাইরে সে বাংলো পাবে, গাড়ি পাবে বেয়ারা বাবুর্চি পাবে, কিন্তু পোস্তর বড়া পাবে না। সেই জন্যই বিয়ে। তার খুব শখ মায়ের মতো বউও রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে। বউয়ের চাকরিবাকরির কোনও ব্যাপার নেই। ঘর সংসার করবে, গাড়ি চালিয়ে শপিংয়ে যাবে। বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি গেলে যত্ন আত্তি করবে। আমার হীরের টুকরো ছেলে এরকম বউ চায়। চাকরি করা বউ নয়, লক্ষ্মী বউ।'

তিথির মা গদগদ গলায় বলেছেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না দিদি, মেয়েকে আমি সব বাঙালি রান্না শিখিয়ে দেব। হাতে সময় আছে।'

এসব কথা বাইরে বলার কী আছে? মধুজা রায় যেমন কেরিয়ারে কথা বলছেন বলুন না।

মধুজা রায় সোজা হয়ে বসলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, 'ভেরি গুড। তিথি, তোমার সঙ্গে আমি একটা জরুরি কথা বলব। জরুরি আর গোপন।'

আবার তিথির হাঁটু কেঁপে উঠল। 'ধান্দা রায়'-এর মতো মানুষের গোপন কথা মানে নিশ্চয় খুব ভয়ের।

গোপন কথা বলবেন বলে মধুজা রায় খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তিথির ভয় বাড়ছে। 'গোপন কথা' ব্যাপারটা যেমন ইন্টারেস্টিং তেমন ভয়েরও। ভালো মানুষ বললে ইন্টারেস্টিং। পাজিরা বললে ভয়ের কথা হয়। 'ধান্দা রায়' ম্যাডাম পাজি মানুষদের দলে। তবে আর এক রকম 'গোপন কথা'ও আছে। সেইকথা শুনলে 'মুখ লাল' করে দৌড়ে পালাতে হয়। সেইরকম গোপন কথাও তিথি একবার শুনেছে। তখন ক্লাস এইট। মামাতো দাদার বন্ধু মিন্টুদা তাকে 'গোপন কথা' বলেছিল। সেই ঘটনা আজও স্পষ্ট মনে আছে তিথির। কারণ সেই 'গোপন কথা' ভয়ঙ্কর। গা ছমছমে।

গরমের ছুটিতে কাঁকিনাড়ায় মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল তিথি। খুব মজা হল। মামাতো দাদা সবে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে। বিরাট কোনও বয়সের পার্থক্য নয়। অনেকটা বন্ধুর মতোই। দাদার বন্ধুরা

boierpathshala.blogspot.com

সেরকম। সবার কাছেই তিথি সহজ। এক দুপুরে মিন্টুদা এল। তিথি তখন বারান্দায় বসে মামিমার করা লেবু আচার খাচ্ছিল।

'তিথি, তোর দাদা কোথায়?'

তিথি বলল, 'ঘুমোচ্ছে। দাঁড়াও ডাকছি।'

মিন্টুদা কী একটা ভেবে নিয়ে বলল, 'দাঁড়া ডাকতে হবে না। অ্যাই শোন, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।' তিথি তখন আরও বোকা ছিল। কাউকে সন্দেহ করত না। মিন্টুদাকে করার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অবাক হয়ে বলল, 'কী কথা মিন্টুদা?'

মিন্টুদা এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'এখানে বলা যাবে না। ছাদে চল, ছাদে গিয়ে বলব। গোপন কথা।'

তিথি ভুরু কুঁচকে বলল, 'এখানেই বলো না। এই রোদে ছাদে কেন?'

মিন্টু চাপা গলায় বলল, 'এই বিকেলে রোদ কোথায়? তুই ছাদে আয়, আমি অপেক্ষা করছি।'

তিথি কৌতূহল নিয়ে ছাদে গেল। ছাদের একপাশে, যেদিকটায় ছায়া পড়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে মিন্টুদা সিগারেট খাচ্ছিল। তিথিকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল। কাছে গিয়ে তিথি বুঝল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। মিন্টুদার মধ্যে কেমন যেন ছটফটে ভাব। কী হয়েছে?

মিন্টুদা বলল, 'কাউকে বলবি না?'

তিথি একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী কথা বলবে তো মিন্টুদা।'

মিন্টুদা বলল, 'আর একটু সরে আয়।'

তিথি অবাক হল। তার ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি হল। মেয়েদের এই একটা গুণ। তাদের ভিতরে একজন কেউ থাকে যে সতর্ক করে। কিন্তু মিন্টুদাকে তো অনেকদিন ধরেই চেনে। খুব ভালো ছেলে। লেখাপড়ায় ভালো। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছে। ডাক্তারিতে চান্স পাবে। তবে শুধু বই মুখে থাকা টিপিক্যাল 'গুডবয়' নয়। খেলাধুলো করে, গল্প উপন্যাস পড়ে, নাটকের বই পড়ে। মামাবাড়ির সবাই মিন্টুদাকে পছন্দ করে। তিথিও করে। তাকে নানারকম বই পড়তে দিয়েছে। তার আজ হঠাৎ কী হল! তিথিকে একলা ছাদে ডেকে পাঠাল কেন? তাকে কাছে যেতেই বলছে কী জন্য?

তিথি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এখান থেকেই বলো।'

মিন্টুদা হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'তোর মামিকে একটা কথা বলতে হবে।'

'কী কথা?'

মিন্টুদা ছাদের দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলবি তাদের ছেলে বাজে কিছু লোকের পাল্লায় পড়েছে।'

'দাদা, দাদার কথা বলছ?'

মিন্টুদা ঠোঁটে হাত দিয়ে বলল, 'শ শ। হ্যাঁ তোর দাদা। যে লোকগুলো তাকে ধরেছে, তারা তোর দাদাকে নানারকম ভুল বোঝাচ্ছে। পথে নামাতে চাইছে। আমি অনেক বুঝিয়েছি, শুনছে না। বলছে এসব রাজনীতির বিষয়। আমার নাকি মাথায় ঢুকবে না। আমার ভয় করছে, এভাবে চলতে থাকলে, তোর দাদা বড় কোনও গোলমালে ঢুকে পড়বে। পুলিশ ধরেও নিয়ে যেতে পারে। লোকগুলো ভালো না। নিজেদের ধান্দায় মানুষকে তাতাচ্ছে। আমাকেও বলতে এসেছিল। হাটিয়ে দিয়েছি।'

তিথির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মিন্টুদা কী বলছে এসব! দাদাকে পুলিশে ধরতে পারে। এর মানে কী?

'মিন্টুদা, তুমি বলো।'

মিন্টুদা গলা নামিয়ে বলল, 'এইটা পারব না। তোর দাদা, আমাকে দিয়ে প্রমিস করিয়ে নিয়েছে। ও যে পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েছে, সেটা ওর বাবা-মাকে আমি বলতে পারব না। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম, তোর মামিমাকে উড়ো ফোন করব? তোর মামার নামে বেনামে চিঠি লিখব? তোকে আজ

boierpathshala.blogspot.com

দেখে চট করে মাথায় বুদ্ধিটা এসে গেল। তুই তো কাল বাড়ি ফিরে যাবি। যাবার আগে মামিমাকে বলে দে। বলবি, তোর কথা যেন না বলে। দেরি হয়ে গেলে বিপদ হয়ে যেতে পারে।'

তিথির মনে হল, সে কেঁদে ফেলবে। কোনও রকমে বলেছিল, 'কী বলব?'

'বলবি, দাদা কিছু বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছে। এখনই আটকাও।'

'মামিমা যদি জানতে চায়, কে বলেছে?'

মিন্টুদা একটু ভেবে মাথা চুলকে বলল, 'বলবি... বলবি তুই ওর বন্ধ দরজার বাইরে থেকে টেলিফোনের কথা শুনেছিস।'

তিথি বিস্ফারিত চোখে বলল, 'কথা শুনেছি! আড়ি পেতে কথা শুনেছি? কী কথা?'

মিন্টুদা উত্তেজিত গলায় বলল, 'বলবি...। কাকে যেন বোমা-টোমার কথা বলছিল। এইটুকু মিথ্যে না বললে কিন্তু তোর দাদাকে বাঁচানো যাবে না তিথি। একদিন খুব বড় রকমে ফেঁসে যাবে।'

তিথি এরপর আর ছাদে থাকতে পারেনি। এই 'গোপন কথা' শুনে ভয়ে মুখ লাল করে দৌড়ে নেমে পড়েছিল। তবে মামিমাকে কিছু বলতে হয়নি। সেদিন মামা অফিসেই কার কাছ থেকে ছেলের নামে খবর শুনে এসেছিল। সে নাকি পলিটিক্সের নামে যারা বোমা মারে, আগুন ধরায়, মানুষ মারে তাদের দলে নাম লিখিয়েছে।

এইরকম গোপন কথাও তো আছে। মধুজা রায়ের কথা নিশ্চয় সেরকম নয়। কী বলবেন?

একটু সময় চুপ করে রইলেন মধুজা রায়। সম্ভবত মনে মনে ঠিক করে নিলেন, কীভাবে শুরু করবেন। তারপর তিথির চোখে চোখ রেখে চাপা গলায় বলতে শুরু করলেন।

'তিথি, সেদিন কী হয়েছিল?'

তিথি অবাক হয়ে বলল, 'কোনদিন ম্যাডাম?'

মধুজা রায় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সে কী! তোমাকে নিয়ে এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, আর তোমারই মনে পড়ছে না!'

তিথি ভয়ে ভয়ে বলল, 'ম্যাডাম আপনি কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে নিয়ে কী কাণ্ড হয়েছে!'

মধুজা আবার চুপ করলেন। এতক্ষণ টেবিলের কাছে এসে কথা বলছিলেন, এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! তোমার ব্যাপার তোমারই মনে নেই! যাক, আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। সুদর্শন নামে ছেলেটার সঙ্গে তোমার গোলমাল হয়েছিল। কী গোলমাল?'

তিথি এবার বুঝতে পারল। কিন্তু সে ঘটনা তো নিজেই ভুলে গেছে। ম্যাডাম জানলেন কী করে? তাছাড়া ইউনিভার্সিটিতে এটা নিয়ে তো কোনও কাণ্ডই হয়নি। নাকি তার আড়ালে কিছু হয়েছে? ছি ছি। ব্যাপারটাই এত নোংরা, জানাজানি হলে লজ্জার শেষ থাকবে না।

'কী হল চুপ করে আছ কেন তিথি? গোলমালটা কী হয়েছিল?'

তিথি অস্ফুটে বলল, 'ম্যাডাম, সেসব তো মিটে গেছে।'

মধুজা রায় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মিটে গেছে! তোমার সঙ্গে ওই ছেলের কোনও ঝামেলা হয়নি?'

তিথি বলল, 'আমি কোনওরকম ঝামেলায় থাকি না।'

মধুজা রায় ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসলেন। তাহলে তার খবর ঠিক। তিথি মেয়েটি নার্ভাস প্রকৃতির। শুধু নার্ভাস নয়, ভীতুও।

ডিপার্টমেন্টের দুজন মেয়েকে ডেকে খোঁজ নিয়েছেন। দুজনেই একই কথা বলেছে। কথাকলি আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে আলাদা আলাদা করে ডেকেছিলেন।

'তোমাদের ইয়ারের একজন ডাকাবুকো মেয়ের নাম বলো তো। দিল্লিতে একটা সেমিনার হচ্ছে, সেখানে পাঠাব। মিনমিনে টাইপ হলে হবে না।'

boierpathshala.blogspot.com

কথাকলি বলেছিল, 'আমি যেতে পারি ম্যাডাম। আমি তো কলেজে ডিবেটে ফার্স্ট হতাম।'

মধুজা বললেন, 'এটা কলেজ নয়। ডিবেটও নয়। সেমিনারের পর অডিয়েন্সের কোয়েশ্চেন ফেস করতে হবে। তারা চেপে ধরবে। শুনেছি, তিথি নাকি বেশ সাহসী মেয়ে।'

কথাকলি চোখ কপালে তুলে বলল, 'তিথি! না না ম্যাডাম। ওই মেয়ে খুব ভীতু। দিল্লি যাবে কী, আমাদের সঙ্গে নন্দন পর্যন্ত যেতেই ভয় পায়।'

পরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডেকেও কথাটা যাচাই করে নিলেন মধুজা রায়। যাকে ভয় দেখাবেন, সে কতটা সাহসী সেটা তো জেনে নিতে হবে। কৃষ্ণকলিকে অন্য কায়দায় জিগ্যেস করলেন।

'ডিপার্টমেন্টের ক'জন স্মার্ট মেয়ের নাম বলো তো কৃষ্ণকলি। দিল্লিতে একটা ইউথ প্রোগ্রামে পাঠাব। সেমিনার টেমিনার হবে। ওরা ছেলেমেয়েদের নাম চাইছে। প্রোগ্রামের দেরি আছে, তবে এখন থেকে নাম পাঠাতে বলছে। তিথি কেমন হবে?'

কৃষ্ণকলি বলল, 'খুব খারাপ হবে ম্যাডাম। ওর মতো ক্যাবলা, নার্ভাস মেয়ে এই ডিপার্টমেন্টে আর একজনও নেই। আর যাদেরই আপনি টিমে নিন, তিথিকে নেবেন না।'

মধুজা রায় খুশি হলেন। তিনি যেমন যেমন চাইছিলেন, তিথির মধ্যে তার সবক'টা গুণই আছে।

'তুমি কোনও ঝামেলায় থাকো না শুনে আমার খুব ভালো লাগল তিথি। একজন ভালো স্টুডেন্টের সেটাই হওয়া উচিত। সে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। কেরিয়ার করতে আসে। ঝামেলা করতে আসে না। আমি বুঝতে পারছি, তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হবে। তুমি নিজের মতো চেষ্টা করো, বাকিটা তো আমি রইলাম।'

এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও তিথির মনটা খুশি খুশি হল। মধুজা ম্যাডাম পাজি হলে কী হবে, ক্ষমতা প্রচুর। উনি যদি সঙ্গে থাকেন পরীক্ষায় অনেক সুবিধে। আর ভালো রেজাল্ট হলে তো কথাই নেই। বর নিশ্চয় খুব খুশি হবে। তাকে যখন সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে, তখন বলবে, 'এই আমার স্ত্রী তিথি। মেয়ে খুবই ভালো। শুধু রূপে-গুণে নয়, লেখাপড়াতেও এক নম্বর। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছে।' তিথির শুনতে খুব ভালো লাগবে। তার নিজের জন্য নয়, বরের জন্য ভালো লাগবে। সে বিশ্বাস করে, বিয়ের পর মেয়েদের নিজের সুখদু:খ বলে কিছু থাকে না। স্বামীর সুখদু:খই বউয়ের সুখদু:খ।

মধুজা রায় এক মুখ হেসে বললেন, 'ভেরি গুড। এই তো একটা ভালো স্টুডেন্টের মতো কথা। ভালো ছেলেমেয়েদের অন্য কোনও ঝামেলায় থাকতে নেই। তাদের একটাই ঝামেলা, কীভাবে রেজাল্ট ভালো করা যায়। আমি যত তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তত খুশি হচ্ছি তিথি। কিন্তু আমাকে তো একটা কথা তোমাকে বলতে হবে মাই ডটার।'

তিথি বলল, 'কী?'

'সুদর্শন সেদিন অনেকের সামনে তোমাকে কী বলে অপমান করেছিল?'

তিথির কান লাল হয়ে গেল। এখন এসব আলোচনা কেন? যা হওয়ার তো হয়েই গেছে। দুদিন পরে তার বিয়ে, এই সময় তাকে নিয়ে কোনও খারাপ ছেলে কী নোংরা কথা বলেছে, সেটা নিয়ে চর্চার কী প্রয়োজন?

মধুজা ম্যাডাম বোধহয় ছাত্রীর লজ্জা, ভয় বুঝতে পারলেন। তিনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

'তিথি, আমার জানা দরকার। তুমি আমার কাছে সংকোচ কোরো না। তুমি হয়তো জানো, ঘটনাটা নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে একটা ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে। তোমার বন্ধুরা করছে, কয়েকজন মাস্টারমশাইও করছে।'

তিথির হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। নোংরা কথাটা নিয়ে তার আড়ালে আলোচনা হচ্ছে! সে কাঁপা গলায় বলল, 'সে কী! আমি তো কিছুই জানি না।'

মধুজা ম্যাডাম বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, 'যারা ঘোঁট পাকায়, তারা এরকমই হয়। যাকে নিয়ে সমস্যা, সে জানতেও পারে না। তোমার মতো ভালো মেয়ে এসব বুঝবে না।'

boierpathshala.blogspot.com

তিথি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি কিছু জানি না ম্যাডাম। আমি তো কাউকে কিছু বলিনি। বিশ্বাস করুন ম্যাডাম।'

মধুজা রায় বললেন, 'তুমি বলোনি হয়তো, কিন্তু সেদিন যারা কথাটা শুনেছিল, তারা গোলমাল পাকাতে চাইছে। হয়তো ভাইস চ্যান্সেলর পর্যন্ত বিষয়টা যাবে। তখন একটা হুলুস্থুলু হবে।'

তিথির মনে হল, সে কেঁদে ফেলবে।

'ম্যাডাম, আপনি আমাকে বাঁচান। আমাকে জড়িয়ে কোনও কিছু আমি চাই না।'

মধুজা রায় এই কথাটার জন্যই যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি তো তোমাকে বাঁচাতে চাই। সেই জন্যই তো তোমার রেকর্ড দেখেছি, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, তোমাকে বললামও, তুমি ভুল করছ। কথাটার মানে কী? কথাটার মানে হল, তোমার উচিত ছিল, আমার কাছে এসে সবটা বলা। উচিত ছিল কিনা?'

'ভুল হয়ে গেছে ম্যাডাম।'

মধুজা ম্যাডাম নরম গলায় বললেন, 'যাক, ভুল হয়েছে। এবার ভুল সংশোধন করো। আমাকে সব বলো। ওই বদ ছেলে তোমাকে কী বলেছিল?'

তিথির এখন আর মধুজা ম্যাডামকে অত খারাপ লাগছে না। বরং মনে হচ্ছে, ইনি সত্যি তাকে সাহায্য করতে চান।

'খারাপ কথা ম্যাডাম।'

মধুজা রায় চোখ সরু করে থমথমে গলায় বলেছিলেন, 'আমি শুনতে চাই।'

তিথি ঢোঁক গিলল। পিছনের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। মধুজা রায় বললেন, 'বলো তিথি। আমাকে সংকোচ কোরো না। আমি তোমার দিদির মতো। আমার জানা দরকার।'

তিথি মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'সুদর্শন আমাকে সেদিন অনেকের সামনে বলেছিল, তোর মুখটা খুব সুন্দর। বুকটাও কি এত সুন্দর? আমরা কি দেখতে পারি?'

কথাটা বলে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল তিথি।

অপমানের কান্না।

মধুজা রায় খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিথিকে কাঁদতে দিলেন। তারপর বললেন, 'আমি যদি ওই বদ ছেলেটাকে কড়া শাস্তি দিই, তুমি খুশি হবে।'

তিথি মুখ তুলে বলল, 'ম্যাডাম, আমি কিছু চাই না। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এই ঘটনাটা নিয়ে শোরগোল হলে বিয়ে ভেঙে যাবে।'

মধুজা রায় খানিকটা থমকে গেলেন। পরক্ষণেই এক গাল হেসে বললেন, 'বা: দারুণ খবর। কনগ্র্যাচুলেশন।'

তিথি নাক টেনে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'ও চায় আমি যেন ভালো করে পাস করি। আমাকে নিয়ে এসব বিশ্রী ঘটনা ঘটলে হয়তো...।'

মধুজা রায় বললেন, 'ভেরি, ভেরি গুড। খুব খুশি হলাম।'

তিথি বলল, 'আপনি এসব গোলমাল আটকান ম্যাডাম।'

মধুজা রায় চিন্তিত হওয়ার ভান করে বললেন, 'আটকাতে তো হবেই। এখন যদি ইউনিভার্সিটিতে এটা একটা ইস্যু হয়, তাহলে সকলে তো জানতে চাইবে, ওই বদ ছেলে তোমাকে কী বলেছিল। সেটা খুব খারাপ হবে। আমি যদি ইউনিভার্সিটি থেকে সুদর্শনকে সাসপেন্ড করবার ব্যবস্থা করি, তাহলেও তো সমস্যা তিথি। সবাই কারণ জানতে চাইবে। আর যদি ছাত্রছাত্রীরা গোলমাল করে তাহলে তো মিটিং, মিছিল হবে, পোস্টার পড়বে। কাগজে, টিভিতে দেখাবে। তোমার ছবি দেখাবে।'

তিথি আঁতকে উঠল। কাতর গলায় বলল, 'একটা কিছু করুণ ম্যাডাম।'

boierpathshala.blogspot.com

মধুজা রায় খানিকক্ষণ চোখ বুজে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমি যা বলব, তুমি করতে পারবে তিথি?'

তিথি বলল, 'আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।'

মধুজা রায় বললেন, 'তাহলে কাগজ, পেন নাও। যা বলছি লিখে সই করো।'

সাঁইত্রিশ

পলাশ চুপ করে আছে। টেবিলের উলটোদিকে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে দুই মাস্টার। অরিন্দম সেনগুপ্ত আর কল্যাণ সমজাপতি। ছাত্রের দিকে তাদের এরকম আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে থাকবার কারণ আছে।

আরও মিনিট খানেক চুপ করে থাকবার পর অরিন্দমবাবু বললেন, 'কি পারবে না?'

পলাশ মাথা চুলকে বলল, 'সেটাই তো ভাবছি স্যার।'

কল্যাণ সমাজপতি বললেন, 'পারতেই হবে পলাশ। এরকম ইস্যু চট করে পাওয়া যাবে না।'

অরিন্দমবাবু বললেন, 'মধুজা রায়কে চাপ দেওয়ার খুব বড় একটা সুযোগ এসেছে। এবার ওর মুখোশ খুলে দিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে ও যা করছে সেটা বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। শুধু পাওয়ার দেখানো নয়, পাওয়ারকে কাজে লাগিয়ে নোংরা ঘটনাকে মদত দিতে শুরু করেছে এবার। পিছনে সাপোর্ট আছে বলে যা খুশি করে চলবে? কোনও বিহিত হবে না? আমরা তো পারছি না, এবার তোমরাই ভরসা পলাশ। স্টুডেন্টরা যদি এগিয়ে না আসে এদের দাপট আরও বাড়বে। ইউনিভার্সিটি ডকে উঠবে। ইউনিভার্সিটির ভিতর একটা মেয়ের সঙ্গে গুন্ডারা অসভ্যতা করবে আর টিচার হয়ে তাকে সমর্থন করতে হবে!'

কল্যাণ সমজাপতি কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। মধুজা রায়ের রমরমার শুরু তো এখন হয়নি, হয়ছে বেশ কয়েক বছর আগেই। বহু যোগ্যকে বাদ দিয়ে এই মহিলাকে তখন মাথায় তোলা হয়েছিল। পার্টির এডুকেশন সেলের মাতব্বররাই ধাপে ধাপে সেই কাজ করে। এই কাজের একটা পদ্ধতি ছিল। যাদের 'তোলা হবে' ঠিক হত তাদের প্রথমে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার করিয়ে, পেপার পড়িয়ে পরিচয় করানো হত। পরের ধাপে পাঠানো হত, বাইরের রাজ্যে। ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা, কেরল। সেখানে কখনও সেমিনার, কখনও ওয়ার্কশপ, কখনও শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা। এরপর আসত 'বিদেশ'। চিন, ভিয়েতনাম, রাশিয়ায় সফর। বিদেশ চিরকালই বাঙালির কাছে বড় টোপ। ছুড়লেই কপ করে গিলে ফেলে। শেষ ধাপে বিভিন্ন কমিটিতে নাম ঢোকানো হত। মধুজা রায়ের বেলাতে এই সবক'টা ধাপই মানা হয়েছে। পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ত। শিক্ষামহলে অনেকেই জানত সেই সময় শাসক পার্টির এক নেতা নাকি মধুজা রায়ের সঙ্গে ভিয়েতনাম ট্যুরে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। নেতা দেখেছিলেন সে দেশের রাজনীতি, মধুজা দেখেছিলেন সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতি। পার্টির সমর্থকরা বলত, এ সব গুজব। 'সংগ্রামী' নেতাকে ছোট করবার চেষ্টা। তাকে কালিমালিপ্ত করা। বিরোধীদের চক্রান্ত। ফলে এসব কেচ্ছা নিয়ে কেউ খুব একটা আলোচনায় যেতে ভরসা পেত না। কে কোথায় লাগিয়ে দেবে তার ঠিক নেই। দিলে মুশকিল হত। পার্টির ব্ল্যাক লিস্টে যেতে হত। শুধু পার্টি সমর্থকের বাইরে নয়, পার্টি সমর্থক শিক্ষকদেরও মধুজা রায়ের জন্য সেই সময় অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কল্যাণ সমাজপতি নিজে একজন ভিকটিম। ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল থেকে রাতারাতি তাকে সরিয়ে মধুজা রায়কে আনা হয়েছিল। অপমানিত কল্যাণ সরকার পার্টি অফিসে যান।

'এটা কী রকম হল মনোজদা।'

একসময় 'মনোজদা' শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কারখানার গেটে মিটিং, মিছিল করতেন, ব্যারিকেড করতেন। পরে পার্টি কী মনে করে ওকে নিয়ে এল শিক্ষক সংগঠন দেখভালের দায়িত্বে। দলের

boierpathshala.blogspot.com

শিক্ষক সম্মেলনে প্রশ্ন উঠেছিল, শ্রমিকনেতা শিক্ষকদের বিষয় কী বুঝবেন? পার্টি নেতারা জানাল, 'মনোজদা' দলের একজন নীতিনিষ্ঠ সৈনিক। শ্রেণীহীন সমাজ তৈরির লক্ষ্যে তাঁর ভাবনা, তাঁর কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারখানার শ্রমিক আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাজন দূর করতেই দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর আর তর্ক চলে না। সবাই 'মনোজদা'-কে মেনে নিতে বাধ্য হল। 'শ্রেণী বিভাজন দূর' করবার জন্য তিনি মন দিয়ে শিক্ষকদের প্রোমোশন, বদলি, নিয়োগ, কমিটি গঠন ইত্যাদিতে নিজের এবং দলের মত চাপাতে শুরু করলেন। সেই 'মনোজদা'-র কাছেই গিয়েছিলেন ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল থেকে অপসারিত কল্যাণ।'

'মনোজদা' বললেন, 'কীসের কী হল কল্যাণ?'

কল্যাণ সমাজপতি বললেন, 'আমাকে ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল থেকে সরিয়ে দেওয়া হল কেন?'

'মনোজদা' সহজভাবে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? সবাইকে চিরকাল এক জায়গায় থাকতে হবে? অন্যরা সুযোগ পাবে না? এই যে আমাকেই দেখো না। জীবনের তিরিশ বছর শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করেছি, তারপর এলাম শিক্ষায়। আসলে আমি তো ওই সংগঠনে নতুন একজন নেতার জায়গা করে দিয়ে এলাম। আমি যদি ছেড়ে সরে না আসতাম তা হলে কি নতুন একজন জায়গা পেত? পেত না। অন্যকে জায়গা দেওয়া আমাদের মূল মন্ত্র কল্যাণ। এ কথা ভুললে চলবে না।'

কল্যাণ সমাজপতি থমথমে গলায় বলেছিলেন, 'আপনার সঙ্গে আমার তুলনা চলে না মনোজদা। এরপর হয়তো পার্টি আপনাকে হেলথ সেক্টরের অর্গানাইজেশন দেখবার দায়িত্ব দেবে। আপনাদের অনেক প্রতিভা। আমি সামান্য শিক্ষক। পার্টি সদস্য। আমাকে এই অপমানের কারণ কী? কাউন্সিল থেকে সরাবার আগে একবার আমাকে জানানোর প্রয়োজনও মনে করলেন না আপনারা?'

'মনোজদা' বললেন, 'শান্ত হও কল্যাণ। পার্টি সদস্য হয়ে এই উত্তেজনা তোমাকে মানায় না। মধুজা রায়কে ঢোকানোর অর্ডার পার্টির ওপর মহল থেকে এসেছে। আমরা ইউনিভার্সিটি, কলেজগুলোকে ডাইরেক্ট পার্টি কন্ট্রোল থেকে সরিয়ে রাখতে চাইছি। এমন মানুষ সেখানে থাকবেন যাঁরা আমাদের সমর্থন করেন, পছন্দ করেন, আমাদের জন্য স্যাকরিফাইজ করবেন, কিন্তু সরাসরি দল করেন না। ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল, এগজিকিউটিভ কাউন্সিলগুলো থেকে আমরা ধাপে ধাপে সব পার্টি মেম্বার সরিয়ে নেব। এখানেও সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে। আমিই তোমাকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলেছি। আরও সরবে।'

'মধুজা রায় পার্টির জন্য সাকরিফাইজ করবে বলে মনে করছেন আপনারা। পার্টির দু:সময়ে সঙ্গে থাকবে?'

'মনোজদা' বললেন, 'তুমি তো জানো পার্টির বিশ্বাসভাজন হতে অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তুমিও সেভাবেই পার্টিতে এসেছ। বুর্জোয়া কাঠামো এবং আমাদের সংগ্রামী চেহারার মধ্যে বিস্তর ফারাক। আমরা কষ্টি পাথর যাচাই করে তবে একজনকে পার্টির পবিত্র ভূমিতে পা রাখতে দিই। আমাদের বিচার ভুল হয় না। মধুজা রায়ের মতো শিক্ষিত, বুদ্ধিমতীকে পাশে পেয়ে আমাদেরই শক্তি বাড়ল। সবাইকে তো মিটিং, মিছিল করতে হবে না। কেউ কেউ কলেজ, ইউনিভার্সিটি পরিচালনা করবে। মধুজাকে আমরা সেইভাবে প্রোজেক্ট করব। সে কোনওদিনই আমাদের ছেড়ে যাবে না।'

ক্ষমতা বদলের দুদিনের মধ্যে মধুজা রায় পালটে গেলেন। অন্য দলের জয়ের উল্লাসে যখন কলকাতা ফুটছে, মধুজা রায় টিচার্স রুমে বসে ঘোষণা করলেন, 'এতদিনে শিক্ষাকে রাজনীতি মুক্ত করা হল। চলে যাওয়া পার্টির দাপটে নাভিশ্বাস উঠছিল। উফ, বাঁচা গেল! এবার মন দিয়ে লেখাপড়ার চর্চা করা যাবে।'

টিচার্স রুমে উপস্থিত সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই অবাক হয়েছিলেন। মধুজা রায়ের মুখে এ কী কথা!

এসব কথা তো আর পলাশকে বলা যাবে না। বলা যাবে না, মধুজা রায়ের মতো মানুষ কোনও নির্দিষ্ট দলের হয় না, এরা সব দলেরই বেনো জল। কল্যাণ সরকার তাই চুপ করে গেলেন। তা ছাড়া এখন মধুজা রায়ই প্রধান শত্রু। তাঁকে জোর ধাক্কা দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, এই ঘটনায় যতটা না বারিধারা

boierpathshala.blogspot.com

নামে মেয়েটির মান-অপমানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, তার থেকে বেশি রয়েছে রাজনীতি। এতে লজ্জার কিছু নেই। বারিধারার ঘটনা একটা ইস্যু। এই ইস্যুটাকে ধরে রাজনীতি করে মূল জায়গায় আঘাত করতে হবে। এই ধরনের মানুষকে যারা মদত দেয়, তাদের সবার সামনে তুলে ধরতে হবে।

কল্যাণ সরকার এবার মুখ খুললেন। বললেন, 'পলাশ, তুমি, তোমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলো।'

পলাশ বলল, 'কী বলব সেটাই তো কথা স্যার। যতক্ষণ না বারিধারার বিরুদ্ধে মধুজা ম্যাডাম কোনও অ্যাকশন নিচ্ছেন ততক্ষণ তো আমরা কোনও মুভ করতে পারব না।'

কল্যাণ সরকার বললেন, 'সুদর্শন নামের ওই গুন্ডাটা কোন পার্টি করে?'

পলাশ বলল, 'কোনও পার্টি করে বলে তো শুনিনি। গুলতানি মারা আর নেশা-ভাং করাই ওর কাজ।'

অরিন্দম সেনগুপ্ত বললেন, 'আমরা যে শুনলাম, ওর কোনও আত্মীয় সরকারি অফিসার।'

কল্যাণ বললেন, 'সরকারি অফিসার মানেই তো আর পলিটিক্যাল লোক নয় অরিন্দম।'

অরিন্দম বললেন, 'সেটা ঠিক। কিন্তু রাজনৈতিক চেহারা না থাকলে কী হয়েছে? একটা খারাপ ছেলের বিরুদ্ধে স্টুডেন্টরা আন্দোলন করতে পারে না? যে মেয়েটিকে অপমান করছে সে তো সবার সহপাঠিনী।'

পলাশ সামান্য হেসে বলল, 'স্যার, খারাপ ছেলের বিরুদ্ধে আন্দোলন বলে কিছু হয় না। কোনও স্টুডেন্ট মুভমেন্ট এরকম কখনও হয়নি। পলিটিক্স ছাড়া আবার আন্দোলন কী? যেখানে যত হইচই হয়েছে সবের পিছনেই রাজনীতি থেকেছে। খারাপ ছেলেকে ইউনিভার্সিটি তাড়িয়ে দিতে পারে। আরও বেশি কিছু হলে পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করাতে পারে। আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে গিয়ে চড়-থাপ্পড় মারতে পারে। কিন্তু একটা মুভমেন্ট হবে কী করে? এই ক্ষেত্রেও তাই। শুনতে খারাপ লাগলেও আমাদের নামতে হবে মধুজা ম্যাডামের রাজনীতির বিরুদ্ধে, ঘটনার বিরুদ্ধে নয়। উনি সুদর্শনকে সাপোর্ট করছেন এটাই ইস্যু হতে পারে। সুদর্শন কী করেছে সেটা নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটাই সত্যি।'

অরিন্দম বললেন, 'আমরাও তাই চাইছি।'

পলাশ বলল, 'তবে উনি সুদর্শনকে সাপোর্ট করছেন তার তো একটা প্রমাণ চাই। ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস করাব কী করে?'

কল্যাণ বলল, 'বারিধারা যদি বলে?'

পলাশ বলল, 'আমরা তো চাইছি। কিন্তু আপনারা তো বারিধারার সঙ্গে কথা বলে তাকে রাজি করাতে পারেননি।'

অরিন্দম সেনগুপ্ত চাপা গলায় বললেন, 'সেই জন্যই তোমাকে ডেকেছি। তোমরা ওকে রাজি করাও। তোমরা ওর বন্ধু, তোমাদের কথা শুনবে।'

পলাশ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'বারিধারা মেয়েটি অন্যরকম। নিজের ভাবনাচিন্তা স্পষ্ট। তেজ আছে কিন্তু অন্যের কথায় প্রভাবিত হবে কি না সন্দেহ।'

কল্যাণ ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'বন্ধুরা তো আর অন্য কেউ নও। রাজি করানোটা তোমার দায়িত্ব। তাকে বোঝাও। সে তোমাদের কাছে বলুক, কীভাবে মধুজা রায় তাকে হুমকি দিয়েছে। সুদর্শন নামের ছেলেটার কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছে। তারপর তোমরা সেই অভিযোগ নিয়ে গোলমাল শুরু করো। মিটিং, মিছিল, পোস্টার...যা তোমরা করতে পারো।'

পলাশ উঠে দাঁড়াল। চিন্তিত গলায় বলল, 'ইচ্ছে তো খুব হচ্ছে, কিন্তু দুটো সমস্যা। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের কতটা পাব বুঝতে পারছি না। সময়টা খারাপ। মধুজা রায়ের বিরুদ্ধে নামতে হলে সাহস করে নামতে হবে। কেরিয়ার নিয়ে ভাবলে চলবে না। আর দু'নম্বর পয়েন্ট হল, বারিধারা রাজি হবে কি না। দেখি আগে বারিধারাকে ধরতে চেষ্টা করি। ওকে কনভিন্স না করাতে পারলে কোনও লাভ হবে না। যাই দেখি বারিধারা এখন কোথায়?'

বারিধারা মধুজা রায়ের ঘরে।

boierpathshala.blogspot.com

ম্যাডামকে দেখে বারিধারার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। ভদ্রমহিলা কোনও একটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত। গলাও অনেক নরম।

'কেমন আছো বারিধারা?'

বারিধারা বলল, 'ভালো ম্যাডাম। আপনি?'

খুব অন্যমনস্কভাবে মধুজা বললেন, 'একটু আগে পর্যন্ত ভালো ছিলাম। এখন আর নেই।'

বারিধারা খুব অবাক হল। মধুজা রায়ের এই ধরনের দার্শনিক কথা বলবার মানে? তিনি আজ একজন সাহসী মেয়েকে অপমান করবেন বলে ঠিক করেছেন। সেই মেয়েটি আর কেউ নয় তার ছাত্রী। সে একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। সেই প্রতিবাদের জন্য তাকে শাস্তি দেবেন। শাস্তি খুব সহজভাবে হবে না। একজন গুন্ডার পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে। এই শাস্তি শান্তিপূর্ণভাবে সমাপন করতে পারলে তিনি আরও ক্ষমতা পাবেন। শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তিরা তার প্রতি খুশি হবে। ছাত্রীকে অপমান করে ক্ষমতাশালীদের তুষ্ট দরকার মতো মজার সময় তিনি হঠাৎ দার্শনিক কথা বলছেন কেন?

বারিধারা বলল, 'ম্যাডাম ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

এবার জোর হাসলেন মধুজা রায়। নরম গলায় বললেন, 'মধুজা তুমি নিশ্চয় আমাকে ভুল বুঝছ।'

বারিধারা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'ম্যাডাম, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেদিন আপনি যেমন বলেছিলেন, আমি তাই করব। ওই ছেলের কাছে আজ আমি ক্ষমা চাইব। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে ম্যাডাম।'

মধুজা রায় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী শর্ত?'

বারিধারা চোয়াল শক্ত করে এবার দাদুর শিখিয়ে দেওয়া প্ল্যান বলল।

'ওই ছেলেকেও তিথির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যাদের সামনে সে তিথিকে অপমান করেছে সবার সামনে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

এবার একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। মধুজা রায় স্থির চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন...।

বারিধারা চমকে উঠল। সে কি ঠিক শুনছে? হতেই পারে না, অসম্ভব। সে বিড়বিড় করে বলল, 'ম্যাডাম, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি কি দয়া করে আর একবার বলবেন?'

আটত্রিশ

জীবন হল নদীর মতো। চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক নেয়। বাঁকের খবর আগে থেকে জানা যায় না। বাঁকে পড়ে অবাক লাগে। এ কোথায় এলাম! এখানেও যেন সেরকম রয়েছে। বারিধারা ভাবতেও পারেনি, মধুজা রায়ের মুখ থেকে তাকে এমন কথা শুনতে হবে। সে ভাবল, হয় সে ভুল শুনছে, নয়তো মধুজা রায় বানিয়ে বলছেন।

মধুজা রায় কথাটা আবার বললেন। এবার চোখমুখ শক্ত করে বললেন।

'বারিধারা, তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। ওই ছেলেকে চড় মেরে তুমি ঠিক করেছ।'

বারিধারা ভুরু কোঁচকাল। ম্যাডাম এসব কী বলছেন! উনি কি অন্য কোনও ফন্দি করছেন? নিশ্চয় তাই। তবে করলেও কিছু এসে যায় না। সে তার শর্ত থেকে সরবে না। ওই বদ ছোকরাকে তিথির কাছে আগে ক্ষমা চাইতে হবে। দাদু তাকে বলে দিয়েছে।

'যা খুশি হোক বৃষ্টি, যত খুশি বিপদ হোক, ওই ছেলে যতক্ষণ না তোর বন্ধুর কাছে ক্ষমা চাইবে, তুই মাথা নামাবি না। তোর পয়েন্টে স্টিক থাকবি।'

বারিধারা দারুণ খুশি হয়ে বলেছিল, 'শাবাশ দাদু। এই কারণেই কমলকান্তি ইজ দ্য গ্রেট। তবে আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়াটা গেল। মধুজা ম্যাডাম খুব পাওয়ারফুল। আমাকে ছাড়বে না। নম্বরটম্বর কমিয়ে তো

boierpathshala.blogspot.com

দেবেই, আরও অনেক কলকাঠি নাড়বে। সে নাড়ুক দাদু। তুমি যখন পাশে আছ, নো চিন্তা। আমি কাউকে কেয়ার করি না।'

কলমকান্তি দুপাশে অল্প অল্প মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'ঘটনা অত সহজ হবে না রে বৃষ্টি, অত সহজ হবে না। তোর ওই মধুজা ম্যাডাম তোর শর্তে রাজি হবে না, আবার চট করে পিছোতেও পারবে না। এটা ঠিকই, যে ছেলেকে তুই চড় মেরেছিস, সে তোকে কোনওরকম অপমান করেনি। তোর সামনে অপমান করেছে এমনটাও নয়। তুই তোর বন্ধুর মুখে শুনে রিঅ্যাক্ট করেছিস।'

বারিধারা বলল, 'তাতে কী হয়েছে?' অন্যের অপমান কি অপমান নয়? পথে যদি কোনও মেয়েকে অপমানের মুখে পড়তে দেখি, এগিয়ে যাব না? শুধু মেয়ে কেন, কাউকে হেনস্থা হতে দেখলেই তো প্রতিবাদ করা উচিত। তাই তো এতদিন শিখেছি। নিজের সম্মান বাঁচাতে গেলে সবার সম্মান বাঁচাতে হয়। তোমরাই তো শিখিয়েছ, একা ভালো থাকা যায় না, সবাই মিলে ভালো থাকতে হয়।'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'ডার্লিং, তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু এগুলো নীতির কথা। উচিত-অনুচিতের কথা। বাস্তব জীবনে এই উচিত-অনুচিতকে কাজে লাগানো কঠিন। একগুঁয়েভাবে চললেই হয় না। প্রতিবাদের পিছনেও ভাবনাচিন্তা, কৌশল লাগে। তুমি প্রতিবাদ করে ঠিক করেছ কিন্তু একটা ছোট গোলমাল আছে। ঘটনার সময় তুমি যদি প্রতিবাদটা করতে তাহলে কোনও প্রশ্ন উঠত না। তোমার ম্যাডাম যা খুশি বলুন, যা খুশি করুন, আমি বলতাম, ক্ষমা চাইবে না। কিন্তু এখানে তো তা হয়নি।'

বারিধারা বলল, 'দাদু, আমি তো জেনেছি পরে। তিথি বলেছে। আমার সামনে যদি ওই কথা বলত, তখনও চড় লাগাতম। পরে জেনেছি, তাই পরে মেরেছি।'

'ঠিকই। কিন্তু টেকনিক্যালি একটু সমস্যা হয়ে গেছে বৃষ্টি ম্যাডাম। আর সেই কারণেই আপনার দিদিমণি ক্যাঁক করে আপনাকে চেপে ধরেছে। বার বার বলছে, ওই ছেলে কি তোমাকে কিছু বলেছে? তোমাকে অপমান করেছে? তুমি কেন গায়ে হাত তুলেছ? এটা একটা ডিসিপ্লিনের ব্যাপার। যতই হোক, ইউনিভার্সিটি চত্তরের মধ্যে ঘটেছে।'

বারিধারা বলল, 'কথাটা ঠিকই, তাহলে কি আমাকে ওই গুন্ডাটার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে? আমি মরে গেলেও চাইব না দাদু।'

কমলকান্তি সেন হাত বাড়িয়ে নাতনির চুল ঘেঁটে দিয়ে বললেন, 'ওরে গাধা মেয়ে, সেই কারণেই তো প্ল্যান কষেছি। তোকে অপমান না করা সত্ত্বেও তুই যদি একজনকে চড় মেরে ভুল করে থাকিস, ওই গুন্ডাটা দশগুণ বেশি অন্যায় করেছে। আমরা সেই অন্যায়টা চেপে ধরব। তাকে আগে ক্ষমা চাইতে হবে। যাদের সামনে সে ওই নোংরা কথা বলেছে, তাদের সামনে চাইতে হবে। এটা একটা দাবার চালের মতো হল। আমি নিশ্চিত এই কন্ডিশনে তোর ম্যাডাম থতমত খেয়ে যাবে। খুব বেশি হলে উনি একটাই কথা বলতে পারেন। বলবেন, সে আমরা বুঝব। তুমি আগে অন্যায় স্বীকার করো। তুই ভয় না পেয়ে বলবি, আপনারাই বুঝুন, আগে ওকে ক্ষমা চাইতে বলুন। আমার জোর বিশ্বাস, তোর শর্ত শুনে ম্যাডাম পিছিয়ে আসবেন। পুরো ঘটনাটাই চেপে যেতে চাইবেন।'

বারিধারা দাদুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'পিছোক, এগোক আমার কিছু এসে যায় না। আমি একটুও ভয় পাব না। পাব কেন? আমার ইয়ং দাদু আমার সঙ্গে আছে না?'

কমলকান্তি ছদ্ম রাগ দেখিয়ে বললেন, 'নাইনটি ওয়ান ইয়ং না তো কী? তোরা ব্যবস্থা করছিস না তাই, নইলে আমি এখনও একটা বিয়ে করতে পারি।'

বারিধারা দাদুর গালে চুমু খেয়ে বলল, 'ইস, আমার দাদুর ওপর কাউকে ভাগ বসাতেই দেব না।'

কমলকান্তি সেনের পরিকল্পনায় বারিধারা যতটা না ভরসা পেয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি বল পেয়েছে। লড়াই করবার বল। কিন্ত এ কী ঘটল! মধুজা রায় যে নিজেই পিছিয়ে এলেন!

boierpathshala.blogspot.com

মধুজা রায় এবার থমথমে গলায় বললেন, 'তুমি শুধু চড় মেরে ঠিক কাজ করোনি বারিধারা, আমারও ইচ্ছে করছে, ওই ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে ঠাসিয়ে একটা চড় লাগিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দিতে। অতটা ক্ষমতা আমার নেই, তাই আমি পারছি না। সরি বারিধারা। ঘটনাটা না জেনে তোমাকে ডেকে ক্ষমা চাইবার কথা বলেছিলাম। আমি উইথড্র করছি।'

বারিধারা বিড়বিড় করে বলল, 'ম্যাডাম, আমি ঠিক...।'

মধুজা রায় সোজা হলেন। বললেন, 'বারিধারা, আমি জানতাম না, ওই বদ ছেলে তিথিকে কী বলেছে। আমি যখন শুনি, তুমি তোমার সহপাঠীকে অকারণে চড় মেরেছ, আমি খুব রেগে যাই। যে তোমাকে কিছু বলেনি তার গায়ে তুমি হাত দাও কোন সাহসে? ইউনিভার্সিটির ভিতরে এটা কিছুতেই অ্যালাও করা যায় না। ওপরমহল থেকে আমার কাছে কমপ্লেইন আসে। আমি তোমাকে ডেকে বকাঝকাও করি। কিন্তু এবার জানতে পেরেছি, কেন তুমি ছেলেটিকে মেরেছিলে। বেশ করেছ। ইউনিভার্সিটিতে যে একটা মেয়েকে সবার সামনে ওই কথা বলতে পারে, তার অনেক বেশি শাস্তি হওয়া উচিত। একজন টিচার তো বটেই, একজন মহিলা হয়ে এই নোংরামি মেনে নেওয়া যায় না। আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। তার জন্য তুমিও দায়ী বারিধারা। ঠিক কী ঘটেছিল, তুমি আমাকে বলোনি।'

বারিধারা অস্ফুটে বলল, 'আপনাকে এই কথা বলতে লজ্জা করছিল।'

মধুজা রায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'ঠিকই। একজন ভদ্র, শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে কথাটা মুখে আনা লজ্জারই। তোমার মতো বয়েসে আমি এই কথা রিপিট করতে পারতাম না। টিচারদের সামনে তো নয়ই। তোমার অস্বস্তিটা বুঝতে পারছি বারিধারা। তবে ভবিষ্যতে এরকম কোরো না। এখন ওসব লজ্জা-সঙ্কোচের যুগ নেই। যা হবে সরাসরি জানাতে হবে।'

বারিধারার ভীষণ ভালো লাগছে। মধুজা রায় সম্পর্কে তাদের একরকম ধারণা, আর এখন তাকে আরেকরকমভাবে দেখছে। আসলে মানুষের সবটা একরকম হয় না। রঙের মতো তার মধ্যেও নানারকম ভাগ থাকে। শেডস থাকে। ম্যাডাম যতই গোলমেলে হোন না কেন, তিথির এই ঘটনাটা নিশ্চয় তার মনের কোথাও আঘাত করেছে। তার ভিতরের ভালো অংশটা জেগে উঠেছে। তিনি না জেনেই রাগারাগি করেছিলেন। তার জন্য অনুতাপও বোধ করছেন। মধুজা রায়ের মতো মানুষ একজন ছাত্রীকে 'সরি' বলছেন, একথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। বলবে, হতেই পারে না। উনি সবার কাছ থেকে সরি শুনতে অভ্যস্ত। বারিধারা অবশ্য একথা কাউকে বলতেও চায় না। এটা মধুজা রায়ের সঙ্গে তার জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নয়।

মধুজা রায় খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'তবে আমি যেরকম ভেবেছিলাম সেরকমটা পারব না বারিধারা।'

বারিধারা উৎসাহ নিয়ে বলল, 'কী ভেবেছিলেন ম্যাডাম?'

'ভেবেছিলাম বিষয়টা নিয়ে হইচই করব। ওই ছেলের পিছনে যত বড়ই সোর্স থাকুক, ওকে শাস্তি দিয়ে ছাড়ব।'

বারিধারা তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, সে সবের দরকার নেই। যা শাস্তি পাওয়ার সে তো পেয়েছেই।'

মধুজা রায় একটু কঠিনভাবে বললেন, 'না পায়নি। এইসব ছেলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। সবার জানা দরকার, এই ধরনের অসভ্যতা বরদাস্ত করা হয় না। পিছনে ক্ষমতাশালী কেউ থাকলেও হয় না।'

বারিধারার বিস্ময় বাড়ছে। যে মানুষটা নানা ধরনের ক্ষমতা দেখিয়ে চলতে ভালোবাসে তার মুখে এসব কী কথা! হয়তো এটাই নিয়ম। কোনও ঘটনা আকস্মিকভাবে মানুষের চরিত্র বদল করে।

মধুজা রায় বললেন, 'কিন্তু আমি এক পা-ও এগোতে পারব না বারিধারা।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা বলল, 'থাক ম্যাডাম, এখানেই ঘটনাটা শেষ করা যাক। তিথিকে তো আমি চড় মারবার কথা বলিনি। বলিনি তার কারণ, মেয়েটা নরম স্বভাবের, নার্ভাস প্রকৃতির মেয়ে। ভালো মেয়ে। আমার তো সেই কারণেই আরও রাগ হয়েছিল। একজন সহজ-সরল ভালো মেয়েকে বিশ্রী কথা কেন বলবে? সে কিছু বলতে পারবে না বলে? তিথি যখন আমাকে ঘটনা বলেছিল, ও প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। বেশি ভলো মেয়ে হলে যা হয়।'

মধুজা রায় ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, 'ভালো মেয়ে! কে ভালো মেয়ে?'

বারিধারা এবার একটু অবাক হয়ে বলল, 'আমি তিথির কথা বলছি ম্যাডাম। আপনি তিথিকে বোধহয় ঠিক স্পট করতে পারছেন না ম্যাডাম। শান্তশিষ্ট মেয়ে। নিজেকে আড়ালে রাখতে ভালোবাসে।'

মধুজা রায় খানিকটা রাগের সঙ্গে বললেন, 'শান্তশিষ্ট কিনা জানি না। তবে তোমার ওই বন্ধুটি ভালো নয় বারিধারা। একেবারেই ভালো নয়। তুমি ওর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করো।'

'মাফ করবেন ম্যাডাম, আপনার কোনও ভুল হচ্ছে বোধহয়। তিথিকে ইউনিভার্সিটির সকলেই ভালো মেয়ে বলে জানে। ও আমার খুব বন্ধু।'

মধুজা রায় একটু চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন। টেবিলে পড়ে থাকা পেনটা তুলে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'আমিও তাই জানতাম, সেইরকমই খোঁজ পেয়েছিলাম। তোমাকে বকাঝকা করবার পর, আমি তোমাদের সবার সম্পর্কেই খোঁজখবর নিয়েছি বারিধারা। আমি জানতে পারি, সুদর্শন নামের এই ছেলেটি ভালো নয়। যেহেতু আমি কোনও না কোনও ভাবে ঘটনার মধ্যে ইনভলভড হয়ে পড়েছিলাম, আমার একটা রেসপনসিবিলিটি তৈরি হয়। অন্য কোনও টিচার হলে হয়তো চুপ করে যেত, কিন্তু আমার স্বভাব তো সেরকম নয়। আমার মনে হয়, ওই ছেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এটা তো একধরনের শ্লীলতাহানি। যে মেয়েটি ঠিক কাজ করেছে, সহপাঠিনীর অসম্মানের প্রতিবাদ করেছে, তাকে বকলাম, আর যে দোষী তাকে কিছু বললাম না, এটা তো হতে পারে না। নিজের কাছে নিজেকে আমি কী কৈফিয়ত দেব? কিন্তু তার জন্য আমার একটা কমপ্লেন দরকার। যেটা নিয়ে আমি মুভ করব। আমি তিথিকে ডেকে পাঠাই। তাকে বলি, তুমি আমাকে লিখে দাও, ওই ছেলে তোমাকে কীভাবে অপমান করেছে।'

বারিধারার চোখের পলক পড়ছে না। এই মহিলা এতদূর পর্যন্ত গেছেন! তিথিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিথির নিশ্চয়ই হার্টফেল করবার মতো অবস্থা হয়েছিল। ও যা ভীতু। মধুজা রায় আলাদা করে ডেকেছে শুনলেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু অবাক লাগছে, ম্যাডাম এতদূর পর্যন্ত গেলেন কেন! বিবেকের তাড়না! এতটা!

মধুজা ম্যাডাম ঠোঁটের হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধু আমাকে লিখে দিয়েছে। সেই লেখা দেখে আমি আকাশ থেকে পড়ি!'

এই পর্যন্ত বলে মধুজা রায় থামলেন। ড্রয়ার খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বারিধারার দিকে এগিয়ে দিলেন। বারিধারা কী করবে বুঝতে পারছে না। নদী কি আবার বাঁক বদল করছে?

'নাও ধরো। পড়ে দেখো তোমার বন্ধু কী লিখেছে।'

বারিধারা কাগজের ভাঁজ খুলল। কাঁপা হাতে বাংলা কয়েক লাইন লেখা।

মাননীয় উপাচার্য মহাশয়

বিশ্ববিদ্যালয়

স্যার,

আপনার অবগতির জন্য জানাই, আমি খবর পেলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে জড়িয়ে কেউ কেউ মিথ্যে রটনা করছে। বলা হচ্ছে, আমাকে নাকি আমার এক সহপাঠী অপমান করেছে। এই রটনা আমার পক্ষে মোটেই শোভন নয়। আমি আপনাকে স্পষ্ট জানাতে চাই, আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে কেউ কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম

boierpathshala.blogspot.com

শোরগোল যেন না হয়। যদি হয়, তার সঙ্গে আমি কোনও ভাবে যুক্ত নই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে এসেছি এবং তাই করতে চাই। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি...।'

বারিধারা চুপ করে রইল। মধুজা রায় চিঠি ফেরত নিয়ে বললেন, 'এরপর আমি ওই ছেলের বিরুদ্ধে স্টেপ নেব কী করে? সব জেনেও হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার উপায় কী? এই তোমার ভালো বন্ধু! এত ভীতু! যাই হোক তুমি যে ওই ছেলেকে একটা চড় অন্তত মারতে পেরেছ, এটাই অনেক। আমার এই ফাইল ক্লোজ করা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে।'

মধুজা রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে ক্যান্টিনে এসে বসল বারিধারা। তার মন খারাপ। এই চিঠি যে তিথিকে চাপ দিয়ে লেখানো হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তারপরেও তিথি এটা লিখবে কেন? ছিছি। বারিধারা চা নিয়ে এল। চা খেতে খেতে তার মন খারাপ একটু একটু করে কাটতে লাগল। বরং ভালো লাগতে লাগল। মনে হল, তিথি ভয় পেয়ে কী লিখেছে, অরিন্দম, কল্যাণ স্যাররা এটা নিয়ে ঘোঁট পাকাতে গিয়ে ফেল করলেন, মধুজা ম্যাডাম তাদের কথা ভেবে ভয় পেয়ে ফাইল বন্ধ করছেন—এসব ভেবে কী হবে? যা খুশি হোক। তার যা করবার সেটা তো করেছে। সে একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে এবং তার জন্য ক্ষমাও চায়নি।

ক্যান্টিনে তিথিকে দেখে বারিধারা হাত তুলে ডাকল, 'তিথি, অ্যাই তিথি।'

উনচল্লিশ

কমলকান্তি সেন লিখছেন।

তিনি ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে চওড়া হাতলের ওপর কাগজ রেখেছেন। তিনি লেখালিখি আজকাল বিশেষ করেন না, যখন করেন ফাউন্টেন পেনেই করেন। ঝরনা কলম। তবে কয়েকটা ভালো কলম আছে। আজকের কলমটাও খুব নামি কোম্পানির। কোম্পানির নাম মঁ ব্লা।

একানব্বই বছর বয়সে লেখালেখি করতে হলে হাত কাঁপবে। এটাই স্বাভাবিক। বয়সের সঙ্গে নার্ভ এবং পেশির জোর কমে যায়। কিন্তু কমলকান্তি সেনের হাত কাঁপে না। হাত কাঁপে না বলে হাতের লেখাও কাঁপে না। তবে আজ তার বুক কাঁপছে। বেশি না, অল্প কাঁপছে। আনন্দে কাঁপছে। সেই আনন্দ-কম্পন তার হাতের লেখাতে প্রভাব ফেলছে। লেখা কেঁপে যাচ্ছে।

এই আনন্দ-কম্পনের কারণ কী?

আনন্দ-কম্পনের কারণ, কমলকান্তি সেন এখন তার স্বপ্নের প্রজেক্ট 'একটু পরে রোদ উঠবে' নিয়ে বসেছেন। তিনি লক্ষ করে দেখছেন, আজকাল এই প্রজেক্ট নিয়ে যখনই কিছু ভাবনাচিন্তা বা লেখালিখি করেন, তখনই বুকের ভিতর এক ধরনের স্পন্দন অনুভূত হয়। তিরতির করে ওঠে। শান্ত দিঘির জলে ঢিল পড়লে যেমন হয়। জল প্রাণ পায়।

কমলকান্তি ঠিক করেছেন, সবার আগে তিনি একটা খসড়া তৈরি করবেন। এই খসড়াই বলে দেবে, 'একটু পরে রোদ উঠবে' কোনও উদ্ভট প্রজেক্ট নয়। বাস্তবের মাটির ওপর শক্ত পা এবং মনে দাঁড়িয়ে যাবতীয় কাজ চলবে। আন্তরিকতা থাকলে কাজ করতে কোনও অসুবিধে হবে না। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, যোগ্য সংগঠন এবং টাকাপয়সার ঠিক মতো ফ্লো থাকলে প্রজেক্ট নিয়ে স্বচ্ছন্দে এগোনো সম্ভব। তাই এই তিনটি জিনিসকে আগে গুছিয়ে নিতে হবে। সেই গোড়ার কাজটাই সারতে চাইছেন কমলকান্তি। খসড়া তৈরির কাজ। সবার আগে আলোচনার সময় এই খসড়া তিনি হাজির করবেন। সকলের মতামত শোনা হবে। তারপর হবে অদলবদল।

boierpathshala.blogspot.com

এই পর্যন্ত প্রজেক্ট নিয়ে কমলকান্তি সেন যতটা লিখতে পরেছেন তা হল—

এক) 'একটু পরে রোদ উঠবে' প্রজেক্টের মূল কাজ হল, প্রকৃত বেনিফিসিয়ারি খুঁজে বের করা। অর্থাৎ যারা এই প্রজেক্ট থেকে উপকৃত হবে, তাদের চাই। মনে রাখতে হবে, এই প্রজেক্ট সাধারণভাবে স্কুল ড্রপআউট মেয়েদের জন্য নয়। তাদের জন্য সরকারি-বেসরকারি নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে। কোনওটা কাজ করে, কোনওটা শুধুমাত্র টাকার অপচয়। আবার কেউ 'স্কুলছুট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করছি' বলে দেশের গ্রান্ট, বিদেশের ফান্ড থেকে টাকা, ডলার উপার্জন করে। 'একটু পরে রোদ উঠবে' এসব থেকে আলাদা হবে। মূলত যেসব মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে চেয়েও শিখতে পারেনি, তাদের জন্য এই প্রজেক্ট। যেখানে টাকাপয়সার পাশে সামাজিক বাধানিষেধের ব্যাপার আছে, যেখানে পরিবার মনে করেছে, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে কোনও লাভ নেই, যেখানে ঘর-সংসারের চাপে ইচ্ছুক মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে না—তাদের নেওয়া হবে। এদের নিয়েই প্রজেক্ট গড়ে উঠবে। সুতরাং এদের খুঁজে পেতে হবে। সেই খোঁজার কাজটা কঠিন। পথ বের করতে হবে। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে নানা ধরনের খবর বেরোয়। কোনও কিশোরী পড়তে চায় কিন্তু বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার আয়োজন হয়েছিল। মেয়েটি পালিয়ে থানায়, বিডিও অফিসে, স্থানীয় ক্লাব বা কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠানের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। সাহায্য চেয়েছে। তারা সাহায্য করেছে। মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করেছে। ধমকধামক দিয়েছে। মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। সমস্যা হল, সাময়িকভাবে একটা সুরাহা হলেও, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারল কিনা, তার কোনও খোঁজ হয় না। কাগজে ক'দিন হইচইয়ের পর সব চুপ করে যায়। এই প্রজেক্টে কোনও সাময়িক রিলিফের ব্যবস্থা থাকবে না। তবে বিভিন্ন পুলিশ থানা, বিডিও অফিস, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে আবেদন করতে হবে, এরকম কাউকে পাওয়া গেলে তারা যেন 'একটু পরে রোদ উঠবে'তে যোগাযোগ করে।

দুই) জানতে হবে, ঠিক কোন ধরনের মেয়েদের এই প্রজেক্টে নেওয়া হবে। যারা লেখাপড়া করতে চায় কিন্তু সামাজিক বাধা যাদের সেই পথে যেতে দিচ্ছে না, এমন মেয়েদেরই নেওয়া হবে। এমন অনেকেই আছে যারা টাকাপয়সার কারণে মেয়েকে পড়তে না দিয়ে ঘরের কাজে আটকে রাখে। পরে বিয়ে দিয়ে দেয়। এদের বেলাতেও 'একটু পরে রোদ উঠবে' হাত বাড়াবে। কিন্তু তার আগে দেখে নিতে হবে মেয়েটি সত্যি পড়তে চায় কিনা। ইন্টারভিউ ধরনের কোনও একটা কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে তার মনোভাব বুঝতে হবে। যদি লেখাপড়ায় তার উৎসাহ থাকে, তবেই তার জায়গা হবে।

তিন) যেহেতু লেখাপড়ার কোনও বয়স নেই, এই প্রকল্পে বয়সের কোনও সীমা থাকবে না। সাত থেকে সত্তর যে-কোনও বয়সে এখানে যোগ দেওয়া যাবে। বালিকা, কিশোরী, তরুণী, মহিলা, বৃদ্ধা সবাই আসতে পারে। এমনও হয় টাকাপয়সার অভাব, সংসারের চাপে ছোটবেলায় লেখাপড়া হয়নি। বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু ভিতরে আজও লেখাপড়া করবার ইচ্ছে। শুধুই আপশোস হয়। এনাদের জন্য 'একটু পরে রোদ উঠবে'-র স্লোগান হবে আপশোস নয়, এখনও সময় আছে।

চার) শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবার ব্যবস্থা হবে। তার জন্য হস্টেল, বৃদ্ধাবাস ধরনের সব আয়োজনই করতে হবে। ধাপে ধাপে হবে। তবে যেহেতু প্রজেক্ট সাইট ভুলাভেদায়, তাই ঝাড়গ্রামের আশপাশে যারা থাকে তারা চাইলে বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে পারবে।

পাঁচ) সিলেবাস তৈরি হবে বয়স অনুযায়ী। বছর শেষে পরীক্ষা হবে। পাস-ফেল থাকবে না। যদি কেউ কোনও বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিখতে না পারে, তাকে আবার শেখানো হবে। তার পরেও না পারলে অন্যগুলো বাদ দিয়ে তার জন্য যে বিষয়টা উপযুক্ত, সেটা পড়ানো হবে। এই পদ্ধতি কিছুদিন চলবার পর যদি দেখা যায় কেউ মেইন স্ট্রিমে লেখাপড়া করতে চায়, তাহলে তার গ্রাম, শহর এলাকায় যে স্কুল-কলেজ থাকবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হবে। মনে রাখতে হবে, 'একটু পরে রোদ উঠবে' প্রকল্প কোনও প্রথাগত স্কুল নয়। স্কুল হিসেবে সে কোনও সরকারি সিস্টেমের অনুমোদন নেবে না। এখানে

boierpathshala.blogspot.com

লেখাপড়া করলে কোনও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। ট্রফি দেওয়া হবে। খেলাধুলোর সময় যেমন দেওয়া হয়। এটাও এক ধরনের জয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবারের বাধার সঙ্গে লড়াইতে জয়। 'একটু পরে রোদ উঠবে' এই একটা লড়াইয়ের সঙ্গী। তার কাজ দমিয়ে দেওয়া, দমে যাওয়া ইচ্ছেকে সম্মান জানানো। সেই লড়াইতে জয়ী হওয়ার জন্য ট্রফি দেওয়া হবে। তবে যারা কমবয়সে এখানে আসবে চেষ্টা করা হবে, তারা যেন দ্রুত মূল স্রোতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে যেতে পারে।

ছয়) এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকবার জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকবে। তার বেশি কাউকেই অ্যালাও করা যাবে না। নতুনদের জায়গা ছাড়তে হবে। এই সময়সীমা কতটা, সেটা সবাই মিলে বসে ঠিক করতে হবে।

সাত) এই প্রকল্পের খরচের জন্য কারও কাছে হাত পাতা হবে না। প্রারম্ভিকভাবে নীহারিকা সেনের টাকা এতে খরচ করা হবে। সেই টাকার পরিমাণ কম নয়। জমির ডেভেলপমেন্ট, বাড়িঘর তৈরির কাজ অনেকটাই করা যাবে। অন্য কেউ ব্যক্তিগত ভাবে টাকাপয়সা দিতে চাইলে দিতে পারে। তবে পরিবার বা পরিচিতজনের বাইরে কারও কাছ থেকে টাকা নেওয়া হবে না। কেউ যদি এই প্রজেক্টে যুক্ত হতে চান, তাঁকে তাঁর বুদ্ধি, পরিশ্রম নিয়ে যুক্ত হতে হবে। তিনি যা জানেন, তিনি যে কাজে পারদর্শী সেই কাজ তিনি প্রজেক্টের জন্য দেবেন। কেউ পড়াতে পারেন, কেউ গান শেখাতে পারেন, কেউ বাগান করতে পারেন, কেউ জঞ্জাল পরিষ্কার করতে পারেন। যেমন কমলকান্তি সেন এখনই কথা দিলেন, প্রজেক্ট এলাকার ভিতর যে নালা বানানো হবে, তিনি কোদাল চালিয়ে তার শুভ সূচনা করবেন। এ বিষয়ে কারও আপত্তি শোনা হবে না। এতে প্রমাণ হবে, সবাইকে সব কাজ করতে হবে এবং ভালো কাজে বয়স কোনও বাধা নয়।

আট) কারও দান, সরকারের অনুদান নয়। 'একটু পরে রোদ উঠবে' নিজের খরচ নিজেই তুলবে। এখানে যারা থাকবে, তাদের হাতের কাজের ট্রেনিং দেওয়া হবে। মাটি, বাঁশ, শোলা, কাঁসা-পিতল, ডোকরা, কাপড়, ছবি, পুতুল—সবরকম ট্রেনিং হবে। হস্তশিল্প, লোকশিল্পের বাজার খুব বড়। সেই বাজারকে পরিকল্পনামাফিক ধরতে হবে। এই কাজটা এলেবেলেভাবে করলে চলবে না। আবাসিকদের বানানো জিনিস নিয়ে শুধু একজিবিশন আর মেলা হবে এমন নয়। গোড়া থেকেই ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে নামতে হবে। কর্পোরেট ভাবনা চাই। বিভিন্ন জায়গায় কাউন্টার করতে হবে। জিনিস বাইরে পাঠাতে হবে। এই কাজের জন্য একটা পৃথক কোম্পানি বানানো হবে। ব্যাঙ্ক লোন নেওয়া হবে। লোনের জন্য 'একটু পরে রোদ উঠবে'-র জমি বন্ধক রাখা যেতে পারে। কোম্পানি চালাবে প্রফেশনালরা। তারা প্রোডাকশন, মার্কেটিং, প্রোমোশন সব দেখবে। উপযুক্ত বেতন, কমিশন সব পাবে। মনে রাখতে হবে, বিষয়টি এই প্রজেক্টের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হার্ট অফ দ্য প্রজেক্ট। গোটা শরীরে সে রক্ত সঞ্চার করবে। এই ব্যবসার টাকাতেই প্রজেক্ট চলবে।

এই পর্যন্ত লিখে কমলকান্তি সেন থামলেন। এক, পাঁচ আর আট নম্বরের পাশে বড় করে টিক মার্ক দিলেন। এই তিন পয়েন্ট ইমপর্টান্ট। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, ভাবনাচিন্তার ব্যাপার আছে। ব্যবসার বিষয়ে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে জড়ানো হবে না। একেবারে নতুন কোম্পানি হবে।

কমলকান্তি কাগজ ভাঁজ করলেন। মঁ ব্লা কলমের খাপ বন্ধ করে পাশের টেবিলে রাখলেন। ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। চোখে বুজলেন। ক্লান্ত লাগছে। সে তো লাগবেই। মনের জোরে তো আর বয়সের সমস্যা আটকে রাখা যায় না। একটানা অনেকটা কাজ করে ফেললেন। আচ্ছা, বৃষ্টিকে নতুন কোম্পানির দায়িত্ব দিলে কেমন হয়? বয়স কম? হোক বয়স কম। বয়স কম হলেই উৎসাহ-উদ্দীপনা বেশি হবে। নতুন নতুন জিনিস ভাবতে পারবে। ওর একজন বয়ফ্রেন্ড আছে। কী নাম ছেলেটার? প্লাবন? না না, মনে পড়ছে, শ্রবণ। ছেলেটা আঁকতে পারে। নানারকম ভাবতে পারে। গুণী ছেলে। বৃষ্টিই একদিন তাকে এই ছেলের কথা বলেছে। গোপন কথা।

'শ্রীমতী বারিধারা সেন, আজ আপনাকে এত খুশি খুশি লাগিতেছে কেন?'

'শ্রীযুক্ত কমলকান্তি সেন মহাশয়, আজ আমার জীবনে একটি আনন্দের ঘটনা ঘটিয়াছে।'

'মহাশয়া, আমার ধারণা, আজ আপনার কপালে ভালোমন্দ খাদ্যাদি জুটেছে।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'কেন? আমি কি শুধু খাবার পেলে খুশি হই?'

কমলকান্তি বলেছিলেন, 'না, তা নয়। খুশির পিছনে আরও কারণ থাকে। তবে তোকে যতটা চিনি, পছন্দের খাবার তোর খুশি হওয়ার একটা ইমপর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর।'

বারিধারা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'যাও দাদু, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না। আমাকে তুমি পেটুক বললে। তোমার সঙ্গে আড়ি।'

কমলকান্তি হেসে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে কথা বলতে হবে না। আজ কেন এত খুশি শুধু সেটা বল। এটা তো কোনও কথা নয়।'

বারিধারা চোখ বড় বড় করে বলল, 'ওমা! এটা কথা নয়! এটা তবে কী?'

কমলকান্তি বলল, 'এটা দাদু-নাতনির প্রেম।'

বারিধারা কমলকান্তির ইজিচেয়ারের পিছনে গেল। পিছন থেকে দাদুর গলা জড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'খুশির কারণ গোপন। তোমাকে বলা যাবে না।'

কমলকান্তি হাত নেড়ে বললেন, 'তাহলে থাক বাবা। গোপন কথা শোনবার অনেক ঝামেলা। ফাইন দিতে হয়। মিশরীয় সভ্যতায় এই নিময় চালু ছিল। কেউ গোপন কথা শুনলে তার সাজা হত। জরিমানা দিতে হত। ওই সময় গোপন কথা বলার থেকে গোপন কথা শোনাটাই অপরাধ ছিল বেশি।'

বারিধারা বলল, 'দুর যতসব বাজে কথা।'

'না, সত্যি। এসব ছিল রাজাদের নিয়ম। রাজ্য শাসনের জন্য সর্বদাই গোপন শলাপরামর্শ করতে হত। সেই পরামর্শ যাতে কেউ না শুনতে চেষ্টা করে, তার জন্য এই নিয়ম চালু হয়েছিল।'

বারিধারা কমলকান্তির কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'আমার গোপন কথা শুনলে তুমি জরিমানা দেবে।'

কমলকান্তি বললে, 'মোটেই না। সেই কারণে তো শুনতে চাইছি না। তুমি আনন্দে আছো, খুশিতে আছো এই যথেষ্ট। কারণ জেনে কী হবে।'

বারিধারা ঘুরে এসে কমলকান্তি সেনের সামনের চেয়ারে বসে পড়েছিল ধপ করে। এক গাল হেসে গলা নামিয়ে বলেছিল, 'দাদু, আজ আমার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কাটাকাটি হয়ে গেল। তাই এত আনন্দ।'

কমলকান্তি চোখ সরু করে নাতনির তাকিয়ে দিকে বললেন, 'ভেরি গুড।'

বারিধারা ঝুকে পড়ে, আরও গলা নামিয়ে বলল, 'তুমি কি সেই ছেলের নাম জানতে চাও?'

'না, চাই না।'

বারিধারা বলল, 'সেই ছেলের নাম শ্রবণ।'

কমলকান্তি সেন মনে মনে খুব মজা পেলেন। এই মেয়েকে তো সেদিন জন্মাতে দেখেছেন, এবার মেয়েটারও বয়ফ্রেন্ড হয়ে গেল! চমৎকার! ভারী চমৎকার! এই জন্যই তো মনে হয়, আরও কয়েকটা দিন বেঁচে থাকি। মনের মজা সেদিন মুখে প্রকাশ করেননি কমলকান্তি। বরং গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, 'ছেলের নাম শ্রবণ না হয়ে শ্রাবণ হলে ভালে হত। বারিধারার সঙ্গে শ্রাবণ মানাত।'

বারিধারা হেসে বলল, 'আর মানামানির প্রশ্ন ওঠে না। আমার সঙ্গে তো কাট। কেন কাট সেটা কি তুমি জানতে চাও দাদু?'

কমলকান্তি সেনের পেটের মধ্যে হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠল। এই মেয়ে তো বিরাট প্রেমে পড়ে আছে। প্রেমে পড়া মানুষই বেশি করে প্রেম ছাড়াছাড়ির গল্প বলতে চায়। যে ছাড়াছাড়ি তাদের কোনওদিনও হয় না।

'না, আমি জানতে চাই না।'

বারিধারা দাদুর এই কথা পাত্তা না দিয়ে বলেছিল, 'এই ছেলে অতি বোকা। ছবি আঁকে আর সর্বক্ষণ বিজ্ঞাপনের কনসেপ্ট নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে বলে রোজ বুদ্ধি কমে। এত বোকার সঙ্গে আমার চলবে না। আজ তাকে বলেছি, গুডবাই।'

boierpathshala.blogspot.com

কমলকান্তি বললেন, 'ভেরি গুড। আমাদের মোস্ট ইনটেলিজেন্ট লিস্টে এই ছেলের নাম ঢুকিয়ে দাও। তুমি কি আজ তার সঙ্গে দেখা করবে?'

বারিধারা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন?'

কমলকান্তি সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখা হলে তাকে জানিয়ে দিও, আমরা তার নাম লিস্টে রাখলাম। না জানিয়ে রাখাটা ঠিক হবে না।'

বারিধারা বলল, 'আজ দেখা করব না। কাল করব। কাল বোকাটার সঙ্গে নাটক দেখব, আইসক্রিম খাব। এক ঘণ্টা হাঁটব। তারপর বিদায়। লাস্ট সাপারের মতো।'

কমলকান্তি হেসে ফেলেছিলেন।

এই ছেলেকে প্রজেক্টে নিতে হবে। গুণী ছেলে। দ্রুত সব ভেবে নিতে হবে। এখন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। কমলকান্তি আবছা ঘুমের মধ্যে চলে গেলেন।

ঘুমের মধ্যে মৃত নীহারিকা এলেন।

'কেমন আছ নীহারিকা?'

'ভালো নেই।'

'সে কী, কী হয়েছে? ভালো নেই কেন? কী হয়েছে তোমার?'

'আজকাল খুব একা লাগে।'

ঘুমের মধ্যেই কমলকান্তির মন খারাপ হয়ে গেল। এরকমটা হয় মাঝে মাঝে। মৃতা স্ত্রী কথা বলতে এলে মন খারাপ হয়ে যায়। আগে এরকম ছিল না। আগে ভালো লাগত। মনে হত, মেয়েটা কোথাও চলে যায়নি। তার সঙ্গে আছে। কথা বলছে, ভাবনাচিন্তা ভাগ করছে। এখন মন খারাপই বেশি হয়। যদিও কমলকান্তি সেই ভাব গোপন রাখেন। আজও রাখলেন।

'একা লাগবার কী আছে নীহারিকা? এই তো আমার সঙ্গে কথা বলছ।'

নীহারিকা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'কথা বলি, তার পরেও একা লাগে। মাঝে মাঝে খুব কান্না পায় জানো। তখন কাঁদি।'

কমলকান্তিকে অশান্ত লাগল। আহারে, সত্যি তো, নিজের লোকজন ছেড়ে আছে। কতদিন হয়ে গেল। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

'এরকম করে না নীহারিকা। তুমি কষ্ট পেলে আমার যে কত খারাপ লাগে, সে কথা তুমি তো জানো। জানো না?'

'জানি। ভাবি, তোমাকে এসব বলব না। তার পরেও বলে ফেললাম। কিছু মনে কোরো না। কোনও কোনও সময় নিজেকে সামলাতে পারি না।'

'ছি ছি, এরকমভাবে বলো না। আমারও তোমার জন্য খুব মন কেমন করে নীহারিকা। ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে চলে যাই। নিজেকে শান্ত করি। বোঝাই, এ সম্ভব নয়। এই বুড়ো বয়সে তো আত্মহত্যা করতে পারি না। যদি ইচ্ছামৃত্যু বলে কিছু থাকত, তাহলে হয়তো...।'

নীহারিকা বলেন, 'বালাই ষাট। ওরকম বোলো না।'

কমলকান্তি বলেন, 'বলি না নীহারিকা। এত বছর পরেও জীবনকে উপভোগ করবার চেষ্টা করি। ভালোবাসতে চেষ্টা করি। জীবন আসলে একেকটা বয়েসে একেকরকম। নব্বই পেরিয়ে যাওয়া বয়েসে জীবন কেমন সেটাও একরকম অভিজ্ঞতা। আমার সৌভাগ্য নীহারিকা, অসুখ-বিসুখ আমার কম। কম কেন, বয়েসের তুলনায় নেই বললেই চলে। হয়তো রোগভোগের মধ্যে থাকলে এই বয়েসের জীবন বড় বিস্বাদ হত। শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন। সে বেঁচে থাকা অভিশাপের মতো।'

নীহারিকা বললেন, 'শুধু কি শরীর? তোমার চারপাশের মানুষ? তারাও যে বড্ড ভালো। তাদের মধ্যে থাকাটাই তো একটা বড় পাওনা।'

boierpathshala.blogspot.com

'অবশ্যই নীহারিকা, অবশ্যই। এই বাড়িতে থাকবার জন্য আমি পদে পদে বুঝতে পেরেছি, বেঁচে থাকা শুধু শরীর নয়, মনও। সেই মন তৈরি হয় চারপাশ থেকে। একটা গাছ যেমন মাটি, আকাশ, জল থেকে তার বাঁচার রসদ খোঁজে, মানুষও তাই।' একটু থামলেন কমলকান্তি। তারপর বললেন, 'নীহারিকা তুমি যদি বাঁচতে, এই আনন্দ তুমিও উপভোগ করতে।'

নীহারিকা মৃদু হাসলেন যেন। বললেন, 'তুমি যে পেয়েছ, তাতেই আমার পাওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া তুমি কাছ থেকে ওদের পাও, আমি দূর থেকে সবাইকে পাই। দূর থেকেই তাদের স্পর্শ করি।'

কমলকান্তি খুশি হলেন। নীহারিকা নিজেকে সামলে নিচ্ছে।

'ঠিকই বলেছ। পাওয়াটাই আসল কথা। জীবন যেমন সব পাওয়াকে স্পর্শ করতে পারে না, এড়িয়ে চলে, হারিয়ে ফেলে, মৃত্যুও তেমন অনেক এড়িয়ে যাওয়া ভালোবাসা, দু:খকে ছুঁতে পারে না। এই যে তোমার এই পৃথিবীর জন্য মন খারাপ হওয়া, সে তো খুব বড় পাওনা। বড় তৃপ্তি। মৃত্যু তো তাকে কাড়তে পারেনি। এ-ও এক আনন্দ। ভালোবাসার মানুষের জন্য মন খারাপ হওয়া খুব বড় প্রাপ্তি। একমাত্র মানুষই এই প্রাপ্তির অধিকারী। মৃত্যু তোমাকে বঞ্চিত করতে পারেনি।'

নীহারিকা অস্ফুটে বললেন, 'ঠিক বলেছ। এই জন্যই তোমার কাছে আসি।'

কমলকান্তি সামান্য হাসলেন। বললেন, 'জানো নীহারিকা, আমার নতুন প্রজেক্টের কাজ শুরু করে দিয়েছি। একটু পরে রোদ উঠবে। আমার কী ভালো লাগছে!'

'কতটা কাজ করলে?'

কমলকান্তি উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'মূল কাজটাই অনেকটা হয়ে গেছে। প্রজেক্টের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি।'

নীহারিকা খুশি গলায় বললেন, 'বা:। এবার তাহলে হাতেকলমে শুরু হয়ে যাবে?'

'অবশ্যই হবে। আজ একটু আগে খসড়া লিখে ফেললাম। এবার এটা ধরে এগোতে হবে। খসড়াটাই আসল কথা। ওটা ধরে এগোনো কোনও সমস্যাই নয়। আরেকটা বড় কাজ করেছি।'

নীহারিকা বললেন, 'কী কাজ?'

কমলকান্তি মিটিমিটি হেসে বললেন, 'বলো তো।'

নীহারিকা বললেন, 'আমার নামে যে টাকাপয়সা জমা আছে, সেই টাকা তুমি এই প্রজেক্টে লিখে দিয়েছ।'

কমলকান্তি বললেন, 'ঠিক বলেছ। ব্যাঙ্ককে জানিয়ে দিয়েছি। এবার থেকে তোমার টাকা খরচ হবে রোদ উঠবে প্রজেক্টের অ্যাকাউন্টে। শুধু টাকা নয়, ভুলাভেদার জমিটাও প্রজেক্টের নামে লিখে দিয়েছি। কেউ জানে না। খোঁজ নিলেই জানতে পারবে, সব খাতাকলমে করা আছে। আমার এই কাজে কে সাহায্য করবে জানো?'

নীহারিকা বলল, 'জানি।'

কমলকান্তি বললেন, 'তাও জানো?'

নীহারিকা হেসে বললেন, 'বা:, জানব না কেন? আমি কি তোমার বাড়ির বাইরের একজন হয়ে গিয়েছি নাকি? তোমাকে সব কাজে সাহায্য করছে মণিকুন্তলা।'

কমলকান্তি বললেন, 'বড় ভালো পুত্রবধূ আমার। ছেলেটার মতো সিরিয়াস হওয়ার অসুখে ভোগে না। অথচ কত যত্ন করে সব কাজ করে দিয়েছে। আমি বারণ করেছি বলে কাউকেও বলেনি।'

কথাটা ঠিক, একটু পরে রোদ উঠবে প্রজেক্টের জন্য টাকা, জমির পাকা কাজ করতে মণিকুন্তলা শ্বশুরমশাইকে সাহায্য করেছেন। গোপনে উকিল, রেজিস্ট্রি অফিস, ব্যাঙ্কে ছোটাছুটি করেছেন। যেদিন শ্বশুরমশাই তাকে ডেকে প্রজেক্টের বিষয়ে বলেন, মণিকুন্তলা এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, খানিকটা সময় কথা বলতে পারেননি। কমলকান্তি বলেছিলেন, 'কেমন ভেবেছি?'

boierpathshala.blogspot.com

মণিকুন্তলা উঠে গিয়ে শ্বশুরমশাইকে প্রণাম করেছিলেন। খুব বড় মানুষ না হলে এমন একটা কাজের কথা কেউ ভাবতে পারে না। তার নিজেও লেখাপড়ার সাধ মেটেনি। ইচ্ছে ছিল, কলেজ পাস করবার পর আরও পড়বেন। সংসারের চাপে সব ভেস্তে গেছে। পড়তে কেউ আপত্তি করেনি। নিজে থেকেই আর সময় পাননি। দুই মেয়েকে বড় করা এত বড় সংসার সামলানোর পর আরও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সময় হল না। তার ওপর সংসারে শাশুড়ি নেই। ফলে, গৃহকর্ত্রীর হাল তাকেই ধরতে হল। এই সব শেষ করে, কী করে মাস্টার ডিগ্রি করবেন? কমলকান্তির কাছে রোদ উঠবে প্রজেক্ট শুনে আপ্লুত হয়ে গেলেন।

'বাবা, আমি কি এখানে পড়তে পারব?' লজ্জা লজ্জাভাবে জানতে চেয়েছিলেন মণিকুন্তলা।

কমলকান্তি প্রবল উৎসাহে বলেছিলেন, 'অবশ্যই পারবে। তবে এমএ, এমএসসি পড়ানো বা গবেষণা করাবার মতো কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তো আমরা বানাতে পারব না মণিকুন্তলা। ইচ্ছে থাকলেও পারব না। পরে কী হবে জানি না, তবে এখনই যদি ওদিকে মন দিই, তাহলে আসল লক্ষ্য থেকে সরে যেতে হবে। তবে তুমি অন্য কিছু পড়তে পারো। যে পড়া চিরাচরিত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নয়। যে পড়া হাতেকলমে শেখবার পড়া। আমরা তো ওখানে হাতের কাজ শেখবার ট্রেনিং সেন্টার খুলব।'

মণিকুন্তলা চোখমুখ উজ্জ্বল করে বলেছিলেন, 'সেটাই ভালো হবে বাবা। আমি আঁকা শিখব। পটচিত্র দেখলে আমার খুব হিংসে হয়। মনে হয়, ইস আমি যদি একটু আঁকতে পারতাম!'

কমলকান্তি বললেন, 'বেশ তো, আঁকবে। কিন্তু তোমাকে ডেকেছি একটা গোপন কাজের জন্য।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'কী কাজ?'

কমলকান্তি গলা নামিয়ে বললেন, 'জরুরি কাজ। এখন কেউ জানবে না।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'কেউ জানবে না। আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।'

কমলকান্তি বললেন, 'আমি তোমার শাশুড়ির সব টাকাপয়সা এই প্রজেক্টের জন্য রেখে দিতে চাই। ঝাড়গ্রামের কাছে যে জমি আছে সেটাও। এই কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। সেই অর্থে তুমি হবে এই প্রজেক্টের প্রথম কর্মী।'

মণিকুন্তলা প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, 'দারুণ হবে! কী করতে হবে বলুন।'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'বাপরে, তুমি তো এখনই খুশিতে লাফাচ্ছ।'

'লাফাব না। এরকম একটা দারুণ কাজের সঙ্গে প্রথমেই আমি যুক্ত হচ্ছি...এই সুযোগ ক'টা মানুষের জীবনে আসে?'

কমলকান্তি গাঢ় স্বরে বললেন, 'তোমার মতো পুত্রবধূও ক'জন মানুষের বাড়িতে আছে, সেটাও একটা কথা মণিকুন্তলা। আমি সব না জানলেও এখনকার হালচাল কিছুটা জানি। এখনকার মেয়েরা মুখে আধুনিকতার বড়াই করে, আর চকচকে চোখে তাকিয়ে থাকে, কখন শ্বশুরবাড়ির জমি, শাশুড়ির গয়না, জমানো টাকা পাব। আমি জানি না, এমন একজন পুত্রবধূকেও পাওয়া যাবে কিনা, সে হেলায় শ্বশুর-শাশুড়ির সম্পত্তি ত্যাগ করে। অথচ শ্বশুর-শাশুড়িকে কত হেলায় তারা ত্যাগ করে। বিয়ের পরদিনই স্বামীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছাড়বার জন্য ছটফট করে। বলে, একসঙ্গে থাকাটা ওল্ড কালচার। মডার্ন সোসাইটিতে এসব চলে না। পরের বাড়ির মেয়ে কেন অন্য কোথাও মানিয়ে নেবে? জানো মণিকুন্তলা, আমিও এই ধারণায় বিশ্বাস করি। নিজের স্পেস চাই। একসঙ্গে থাকবার সিস্টেম ঠিক নয়। তবে আবার সেই সঙ্গে এটাও বিশ্বাস করি, তাহলে টাকাপয়সা, জমিজমার ওপর দাবি করাও ঠিক নয়। হায়রে, আধুনিক মেয়েরা ওটাকে তাদের আধুনিক লিস্ট থেকে সরিয়ে রেখেছে। তুমি আলাদা। শাশুড়ির টাকাপয়সা, জমি কত অবলীলায় ছেড়ে দিচ্ছ। শুধু ছেড়ে দিচ্ছ না, প্রবল উৎসাহের সঙ্গে দিচ্ছ। তোমার মতো মেয়ের পক্ষেই মানায়।'

মণিকুন্তলা লজ্জা পেয়ে বলল, 'এ আপনি কী বলছেন, বাবা! আমার অভাব কীসের? মায়ের টাকা এতবড় একটা কাজে লাগবে, এ তো আমাদের গর্ব। ছেড়ে দিচ্ছি কোথায়? আমিও তো আপনার এই কাজের একজন।'

boierpathshala.blogspot.com

কমলকান্তি বললেন, 'শোনো মণিকুন্তলা। এখনই প্রজেক্টের কাজ কিছু হয়নি। ফলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। আমার চেনাজানা একজন ল'ইয়ারকে দিয়ে একটা লিখিতভাবে ব্যবস্থা করব। সেখানে বলা থাকবে, এই টাকা এবং এই জমি শুধুমাত্র 'একটু পরে রোদ উঠবে' নামের প্রজেক্টের জন্যেই খরচ করা যাবে। এই কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

কয়েক দিনের মধ্যেই কাজটা হয়ে গেল। বাড়ির কেউ জানতেও পারল না। এক কাজের দিনের দুপুরে ফাঁকা বাড়িতে ল'ইয়ারকে দিয়ে লেখাপড়া হয়ে গেল।

নীহারিকা বললেন, 'সত্যি মণিকুন্তলা খুব ভালো।'

কমলকান্তি বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা হয়ে ভালোই হল। আমি ঠিক করেছি, 'একটু পরে রোদ উঠবে'র একটা দিকে হেড হিসেবে ছোট নাতনিকে রাখব। কেমন হবে?'

নীহারিকা হেসে বললেন, 'তুমি যা করবে সেটাই হবে। আমাকে বলবার দরকার নেই। তবে একটা কথা বলব?'

'বলো।'

নীহারিকা বললেন, 'মন খারাপ করবে না তো?'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'তুমি মন খারাপ না করলে আমিও করব না।'

নীহারিকা বললেন, 'তুমি যে ভাবছ সবাই তোমার এই কাজে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমনটা তো নাও হতে পারে। হতে পারে কেন, হবে না।'

কমলকান্তি বললেন, 'ও এই কথা? এতে মন খারাপের কী আছে নীহারিকা? এটাই তো স্বাভাবিক। যাদের ভাবছি, তারা সবাই থাকবে না, আবার যাদের কথা ভাবছি না, যাদের জানি না, তাদের কতজন এই কাজে যোগ দিতে আসবে? মানুষটা আসল নয়। কাজটাই আসল।'

নীহারিকা বললেন, 'বা:, খুব সুন্দর বললে তো।'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'এর মধ্যে সুন্দর-অসুন্দরের কিছু নেই নীহারিকা। এটাই নিয়ম। মানুষ থাকে না, কাজ থাকে। এই যে তুমি নেই, তারপরেও তো তুমি এই প্রজেক্টে ভীষণভাবে আছ। আছ না? আবার আমি এখন আছি, কাল যদি না থাকি, তার পরেও প্রজেক্ট হবে।'

নীহারিকা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি যাই তাহলে।'

'তোমার কি মন খারাপ কমেছে নীহারিকা?'

নীহারিকা একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, কমেছে।'

কমলকান্তির ঘুমের মধ্যে যেভাবে এসেছিলেন নীহারিকা, সেভাবেই কমলকান্তিকে ছেড়ে চলে গেলেন। কমলকান্তি পরম নিশ্চিন্তে পাশ ফিরলেন।

এই ঘুমের মধ্যেই মারা গেলেন সেনবাড়ির প্রবীণতম মানুষ কমলকান্তি সেন। মারা গেলেন নি:শব্দে এবং গোপনে। তার একটা হাত রইল 'একটু পরে রোদ উঠবে' লেখা খাতার ওপর।

চল্লিশ

'এ কথা মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা দেশের শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম করে অর্জন করেনি, যেমনভাবে লেলিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। তবে সেইদিক দিয়ে বিচার করলে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে, তা অনেকটাই যেন ওপর থেকে চাপানো। শুধু তাই নয়, গোড়া থেকেই সোবিয়েতের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল সাংঘাতিক ভাবে প্রবল। তাই মিখাইল গরবাচেভের নেতৃত্বাধীনে সোবিয়েত যখন রাজনৈতিক সংস্কার হিসেবে 'পেরেস্ত্রৈকা' এবং আর্থ সামাজিক সংস্কার হিসেবে 'গ্লাসনস্ত'

boierpathshala.blogspot.com

আত্মপ্রকাশ করল, তখন স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব ইউরোপের সকল দেশে এই ধরনের সংস্কার প্রবর্তনের জন্য প্রবল দাবি উঠল।

সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিএসইউ) সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ থাকার ফলে তারা মানুষের মধ্যে সংস্কার প্রবর্তনের আকুলতা অনুভব করতে পেরেছে এবং সেই অনুযায়ী তারা এই ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু পূর্ব ইউরোপ অন্যান্য দেশে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জনগণের যে সেই ধরনের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ, তা যদি থাকত, তা হলে এই সমস্ত দেশে এইভাবে বালির প্রাসাদের মতো একটার পর একটা রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটত না। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র পতনের পিছনে আর একটি অন্যতম বড় কারণ হল, এই সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব বলে কিছু ছিল না। রাষ্ট্রব্যবস্থা কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্যের পরিবর্তে কতিপয় 'টেকনোক্রয়াট' ও 'ব্যুরোক্রয়াটে'র দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে এ ঘটনা এমনভাবে ঘটেছে...'

এত পর্যন্ত পড়ে শেখর গুপ্ত থামল। বইয়ের নাম 'মার্কসের পর মার্কসবাদ'। লেখক শমিত কর। বইটি বেশ কিছুদিন আগের। শেখরের পড়া ছিল না। কিছুদিন আগে ইন্দ্রদা দিয়েছে। ইন্দ্রদা পার্টির পুরোনো লোক। এখন বসে গেছে। পার্টির লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই চলে। শেখরের কাছে মাঝে মাঝে আসে। গল্প করে, চা খায়। বই, পত্রিকা থাকলে ঘাঁটাঘাঁটি করে। মাঝে মাঝে কোনও বই পড়ে পছন্দ হলে দিয়ে যায়। এই বইটাও সেভাবে পেয়েছে শেখর। পড়া হচ্ছিল না। আজ ব্যাগে নিয়ে বেরিয়েছে। ব্যাগে বই নিয়ে বেরোনোর অভ্যেস শেখরের অনেক দিনের। একটা সময় পার্টির কাজে অনেক দূর দূর ট্রাভেল করতে হত। তখন সঙ্গে একটা বই না থাকলে অসুবিধে হত। বাসে, ট্রেনে সময় কাটতে চাইত না। সেই অভ্যেস রয়ে গেছে। খটমট প্রবন্ধের বইয়ের সঙ্গে কবিতার বইও থাকে। শেখরের মজা হল, যে-কোনও পরিস্থিতিতে বইতে ডুব মারতে পারে।

ইন্দ্রদা বসে গেছে প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। বসে গেছে একেবারে অদ্ভুত একটা যুক্তি দেখিয়ে। সেই সময় পার্টির অনেকেই বলেছিল, হয় মানুষটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নয় রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বাহানা খুঁজছে। ইন্দ্রদা অন্য জোনের হলেও পার্টির ওপর থেকে শেখরকে বলল, তুমি কথা বলো। সমস্যাটা বোঝবার চেষ্টা করো। এতদিনের পুরোনো একজন কর্মীকে পার্টি হারাতে চায় না।'

শেখর 'কিন্তু কিন্তু' করেছিল। বলেছিল, 'আমার কথা বলা উচিত হবে? ইন্দ্রদার জোনের সেক্রেটারি বললে ভালো করতেন না?'

'বলেছিল। লাভ হয়নি। উলটে সেক্রেটারি বিরক্ত হয়েছে। সে রিপোর্ট করছে ইন্দ্রর মাথার সমস্যা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা জানি উনি যেখানেই কাজ করুন, তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো।'

শেখর বলেছিল, 'পার্টি কি আমাকে দায়িত্ব দিচ্ছে?'

'ঠিক অফিসিয়ালি নয়, তবে দিচ্ছে।'

শেখর ইন্দ্রদার সঙ্গে কথা বলেছিল।

'তুমি হঠাৎ এরকম ঠিক করলে কেন?'

ইন্দ্রদা বলেছিল, 'এভাবে রাজনীতি করা যায় না, শেখর। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

শেখর অবাক হয়ে বলেছিল, 'কেন? সমস্যা কী?'

ইন্দ্রদা বলল, 'পাটি করাটা পার্ট টাইম কাজ নয়। কমিউনিস্ট পার্টি তো নয়ই। চাকরি করব, সংসার করব, সামাজিকতা রক্ষা করব, তারপর পার্টি করব—এটা হয় না।'

শেখর অবাক হয়ে বলল, 'কতজনই তো তাই করছে।'

ইন্দ্রদা বলল, 'কে কী করল, আমি জানি না। আমি বুঝতে পারছি, এটা হয় না।'

শেখর বলল, 'স্কুল কলেজ অফিসে কলকারাখায় আমাদের মেম্বার কত, তা তো তুমি জানো। কোটির কাছাকাছি।'

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রদা শুকনো হেসে বলেছিল, 'এখানেই আপত্তি শেখর। পার্টি প্রফেশনালদের হাতে চলে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ দরিদ্র সর্বহারাদের নিয়ে। আর আমরা কী করছি? দলকে দাঁড় করাচ্ছি, যারা উপার্জন করছে তাদের ওপর ভিত্তি করে। এটা ঠিক হচ্ছে না। এতে পার্টি তার মূল লাইন থেকে সরে আসছে। চাকুরে, ব্যবসায়ী-নির্ভর পার্টি যাদের আছে, তাদের সুযোগসুবিধে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের বেলাতেও তাই হচ্ছে। মাইনে, ডি এ, প্রোমোশন, ট্রান্সফার এই সব নিয়ে পার্টি মাথা ঘামাচ্ছে বেশি। মেইন ফোর্সটাই তো আরও চাই, আরও দাও-তে চলে যাচ্ছে। যাদের কিছু নেই, তাদের জন্য ভাবনা থাকলেও সময় দিতে পারছি কম।'

শেখর বলল, 'এ তোমার অদ্ভুত যুক্তি ইন্দ্রদা। সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট পার্টি অফিস কাছারি, কলকারখানায় অর্গানাইজেশন করেছে। তুমি রাশিয়ার ইতিহাস দেখো, চিনের মুভমেন্ট দেখো। পোলান্ড, চিলির দিকে তাকাও। সবসময়ই পার্টির একটা বড় অংশ প্রফেশনালদের হাতে ছিল।'

ইন্দ্রদা বলেছিল, ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। আমাদের সোশ্যাল, ইকনমিকাল স্ট্রাকচার একেবারে আলাদা। ওসব দেশে বিপ্লবের পরিস্থিতি ছিল। লেবারদের মিনিমাম ওয়েজ বলে কিছু ছিল না। এটাই সেই পরিস্থিতি। আমাদের তো তা নয়।'

শেখর বলেছিল, 'আমাদের তো অসংখ্য হোলটাইমারও আছে ইন্দ্রদা। আছে না? তারা শুধু পার্টির কাজই করে।'

ইন্দ্রদা বলল, 'আমিও ভেবেছিলাম তাই করব। তোর বউদিকেও সেরকম বলে রেখেছিলাম। অফিস ছেড়ে দিয়ে পুরো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম, তাতে কোনও লাভ হবে না। পার্টির বড় একটা অংশ পার্ট টাইমারদের হাতেই থাকবে।'

শেখর বিরক্ত হয়েছিল। বলেছিল, 'এ তোমার ঠিক কথা নয় ইন্দ্রদা। তথ্যের দিক থেকেও তুমি ভুল। সর্বসময় কর্মীরাই আমাদের পার্টির সম্পদ। এই তো আমি, আমার কি পার্টিতে কোনও সে নেই? আমার কথা শোনা হয় না?'

ইন্দ্রদা বলল, 'আমি তা বলিনি। কে নেতা, কে কমিটির মাথায় আছে, এটা ইমমেটেরিয়াল। আসলে কথা হল, কাদের নিয়ে পার্টি ব্যস্ত। কাদের দাবিদাওয়া মেটাতে উদগ্রীব। শেখর একটা কথা মনে রেখো তোমার মতো কয়েকজন কিছু করতে পারবে না। আজ পার্টি যাদের আরও পাইয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত, বিপদের সময় তারা সবার আগে সরে যাবে। কোটির হিসেব কোথায় দিয়ে তখন ঠেকে দেখবে। আমি এই হিপোক্রেসিতে নেই। আমি চাই পার্টির ভালো হোক।'

শেখর সেদিন ইন্দ্রদার কথার সঙ্গে একেবারেই একমত হয়নি। এই যুক্তি অতি দুর্বল যুক্তি। সে একথা স্পষ্ট করে বলেওছিল।

'ইন্দ্রদা তোমার যুক্তি ঠিক নয়। তুমি চাইছ, পার্টি শুধু শ্রমিক, সর্বাহারাদের সামনের সারিতে রেখে এগিয়ে চলুক। বাকি সবাইকে দূরে রাখুক। কেরানি, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, অফিসার, ছোট পুঁজির ব্যবসায়ী পিছনে থাকবে। এটা বাস্তব কথা হল না। তুমি আমার থেকে ভালো জানো যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের কোনও সম্ভাবনা এদেশে নেই। এদেশে কেন, এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীতেই কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। আমি যেটুকু বুঝি তা হল, আমাদের পার্টি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় কিছু রিলিফের ব্যবস্থা করতে পারে মাত্র। সরকারে গিয়ে তাই করছেও। এটা যেমন দরিদ্র মানুষের জন্য করছে, তেমন মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তদের জন্যও করা হচ্ছে। এই উদার অর্থনীতির সময় কনজিউমারলেস সোসাইটি একটা ইউটোপিয়া মাত্র। তার কোনও অস্তিত্ব নেই। চিনেও নেই। আমরা যদি উপভোক্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারি, তাহলে কৃষকের ফসল, শ্রমিকের তৈরি কাপড় জামা, কিনবে কে? তুমি কি কারখানা না করে পার্টি চালাতে বলছ ইন্দ্রদা?'

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রদা অন্যমনস্ক ভাবে বলেছিল, 'কারখানা বন্ধ করতে বলিনি, শিল্পের প্রয়োজন, কিন্তু পার্টির কাছে কে বেশি ইমপর্টান্ট? কারখানার মালিক না শ্রমিক? হাবভাব দেখে কোনও কোনও সময় মনে হচ্ছে, গুলিয়ে ফেলছি।'

শেখর হেসে বলেছিল, 'তাহলে তো তোমার সঙ্গে আর্গুমেন্টে গিয়ে লাভ নেই। কারখানা না হলে শ্রমিক কোথা থেকে পাব? তাদের নিয়ে পার্টি করবার প্রশ্নও উঠবে না। কারখানার জন্য মালিক চাই। আগে তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমার ভাবতে একটু অবাকই লাগছে, এতদিন পার্টি করবার পর তোমার কোথায় যেন কনফিউশন তৈরি হচ্ছে। যে কনফিউশনের কোনও বেস নেই। কিছু মনে কোরো না, তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, মূল বিশ্বাসে তুমিই গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছ ইন্দ্রদা। এখন পার্টির ঘাড়ে চাপাতে চাইছ।'

এইসব কড়া কথার পরেও ইন্দ্রদার সঙ্গে সম্পর্ক রয়ে গেছে শেখরের। ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তবে আজ মনে হয়, সেদিন ইন্দ্রদার একটা কথা খানিকটা হলেও ঠিক ছিল। পার্টি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর উপার্জনক্ষম সদস্য, কর্মী, সমর্থকরা পার্টির পাশ থেকে দ্রুত সরেছে। এটাই মধ্যবিত্ত চরিত্র। সে মূলত সুবিধাভোগী। ইন্দ্রদার এই দূরদৃষ্টিটুকু হয়তো ঠিক ছিল, কিন্তু পার্টি ছাড়বার জন্য অতি দুর্বল যুক্তি।

ইন্দ্রদা এই বইটা দিয়ে বলেছিল, 'পড়ে দেখিস। সঙ্কটের কথা সহজ করে বলা আছে।'

আজ বইটা পড়তে পড়তে শেখরের মনে হচ্ছে, তাদের পার্টির ক্রাইসিসের এই সময়ের কথাও ভালো করে লিখে রাখার দরকার। এখনও লেখা হচ্ছে। কিন্তু সেটা সংগঠনের রিপোর্ট নয়, শাসক দলের প্রতাপ। খুব বেশি হলে নেতারা প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখছেন। এতে হবে না। প্রতিটা পার্টি মেম্বারকে একটা করে ডাইরি দিয়ে দেওয়া উচিত। তারা প্রতিদিন পার্টি করতে গিয়ে কী সমস্যা হচ্ছে, কেন সমস্যা হচ্ছে সে কথা লিখে রাখবে। সবথেকে বড় কথা, এই সময়টা কেন কমিউনিস্ট পার্টি সঙ্কটের সময় বলছে, সেটাও তো জানা দরকার। ইতিহাস হয়তো পরে বিচার-বিশ্লেষণ করে বলবে, এটা সঙ্কটের সময় ছিল না। ক্ষমতায় না-থাকাটা কমিউনিস্টদের জন্য সমস্যা নয়। বরং এই সময়টাই পার্টির জন্য ভালো সময়। শত্রু-মিত্র চিনে নেওয়ার সময়। সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করবার সময়। সংগঠন করতে গিয়ে ভিতরে-বাইরে যত সংঘাত হবে, পার্টির জন্য তত শুভ। আচ্ছা, পার্টির ওপরের নেতাদের কাছে প্রস্তাবটা দিলে কেমন হয়? শুনবে? মনে হয় না। থাক, অত বলাবলির দরকার নেই। নিজের লোকাল কমিটিতে এই ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কেন পার্টি ক্ষমতা থেকে সরে গেল, সে বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে। অনেক রিপোর্ট হয়েছে। সম্মেলন হয়েছে। এখন দরকার ক্ষমতার বাইরে থেকে রোজকার অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করা।

ভাবনার এরকম একটা সময় হাবিলদার ধরনের একজন এল।

'বড়বাবু ভিতরে ডাকছে।'

শেখর গুপ্ত পাশে বসা অর্চিনকে বলল, 'চলো।'

থানায় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

একচল্লিশ

তমসা আরেক হাত ভাত তুলে দিল অর্চিনের প্লেটে। অন্য কোনও সময় হলে অর্চিন বারণ করত, আজ করল না। তার খিদে পেয়েছে। থানা থেকে বেরিয়ে ইউনিভার্সিটিতে চলে যাচ্ছিল অর্চিন। শেখর আটকাল।

'আমার বাড়িতে চল। খেয়ে নিবি।'

অর্চিন বলেছিল, 'থাক শেখরদা।'

শেখর বলল, 'কেন? থাকবে কেন? খিদে পায়নি?'

অর্চিন শুকনো হেসে বলল, 'তা পেয়েছে। ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নেব। তোমার বাড়িতে গিয়ে আবার ঝামেলা পাকাব না।'

boierpathshala.blogspot.com

শেখর সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ঝামেলার কী আছে? আমি খাব, তুইও খাবি। চল। তমসাকে একটা ফোন করে দিচ্ছি। ও আজ বাড়িতে আছে।'

মুখে বললেও স্ত্রীকে ফোন করতে ভুলে গেল শেখর। গোটা পথই সে কথা বলতে বলতে এল।

আগে থেকে না জানালেও তমসা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। শেখরও বসেছে। খাওয়া খুবই সাধারণ। ভাত, ডাল, একটা তরকারি। তমসা দুজনকে ডিম ভেজে দিল। অর্চিন বাধা দিয়েছিল।

'কিছু লাগবে না তমসাদি।'

হিসেবমতো শেখরের স্ত্রীকে অর্চিনের 'বউদি' সম্বোধন করা উচিত। ডাকে না। বিয়ের আগে থেকেই পরিচয়। তখন 'তমসাদি' ডাকত, এখনও তাই ডাকে। অনেকেই তাই করে। পার্টির সঙ্গে যাদের যোগাযোগ, তারা আগে যেমনভাবে তমসাকে চিনত, এখনও সেরকমভাবে চেনে। ফলে নতুন করে সম্বোধন বদলের প্রশ্ন ওঠে না।

তমসা সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'আজ মাছ-টাছ কিছু নেই। থানায় যাবে বলে তোমার দাদা বাজারে গেল না। ইস, তুমি যে কী করে খাবে অর্চিন?'

অর্চিন বলল, 'কী বলছ তমসাদি, আমি তো বেশিরভাগ দিন দুপুরে ভাতই খাই না। ইউনিভার্সিটিতে এটা-সেটা খেয়ে কাটিয়ে দিই। বাড়িতে মাসি রাগ করে। কী করব? লেট করে ফেলি। খেতে বসবার সময় কই? আজ যে ভাত পেলাম, এটাই অনেক। আর কিছু লাগবে না।'

তমসা কথা শোনেনি। সে ডিম ভেজে এনেছে। মনে মনে রাগও হয়েছে। শেখর কি কোনও দিন অভ্যেস বদলাবে না? চিরকাল আগে কিছু না বলে লোক এনে বলে, 'তমসা ভাত হবে নাকি? আজ আমার সঙ্গে সোমনাথ খাবে। আমারটাই দাও, ভাগ করে নিই।'

তমসা পরে রাগ করে, 'কেউ খেতে এলে আগে একটু জানাবে তো। তার সামনে ভাগ করে দাও কথাটা শুনতেও খারাপ লাগে।'

শেখর অবাক হয়ে বলে, 'ভাগ করে খাব বলবার মধ্যে খারাপ লাগবার কী আছে?'

তমসা থমথমে গলায় বলে, 'এটা পার্টির কমিউন নয় শেখর। সংসার। এখানে তোমার স্ত্রী, ছেলেও থাকে। সংসারের একটা নিয়ম আছে। বাইরের কাউকে খেতে বললে, তাকে আলাদা যত্ন করতে হয়। পার্টি কমিউনে কেউ বাইরের নয়। আলাদা যত্ন লাগে না।'

শেখর কাঁচুমাচুভাবে বলে, 'বুঝেছি। কিন্তু কী করব? আমি নিজেও তো জানতাম না সোমনাথ ভাত খায়নি। এইমাত্র জানলাম। বললাম তো, আমারটাই দুজনকে ভাগ করে দাও।'

তমসা আরও রেগে যায়। বলে, 'আবার এক কথা। একজনের ভাত ভাগ করা যায় নাকি? আর শুধু ভাত? ভাতের সঙ্গে ডাল-তরকারি, মাছ দিতে হবে না? সেটাও কি ভাগ করে হবে?'

শেখর মাথা চুলকে বলে, 'সরি, তোমাকে সমস্যায় ফেললাম।'

তমসা গম্ভীর গলায় বলে, 'সরি বলছ কেন? দুদিন অন্তরই তো ফেলো। আমি তো কাউকে আনতে বারণ করিনি। একটু আগে জানাতে সমস্যা কোথায়? মোবাইল থেকে একটা টেক্সট করে দিতে তো পারো। ভাতটা অন্তত বসিয়ে দিতে পারি।'

শেখর জিভ কেটে বলে, 'ইস, একদম মাথায় ছিল না। এরপর কাউকে খেতে ডাকলে তোমাকে আগে জানিয়ে দেব।'

পরের বারও একই কাজ করে শেখর। সে আবার কোনও রবিবার কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢোকে বেলা তিনটের সময়। ঢুকেই বলে, 'তমসা আমাকে আর সামন্তককে ভাত দাও। তাড়াতাড়ি দাও। খিদেতে পেট জ্বলছে দুজনের।'

তমসা রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলে। এই মানুষটার ওপর রাগ করে কী লাভ। তমসা অবশ্য এক্সট্রা লোক খাওয়ার বিষয়টা ছোটবেলা থেকেই দেখেছে। একাত্তর-বাহাত্তর সাল তখন। সরকারি স্কুলের শিক্ষক

boierpathshala.blogspot.com

বাবা পরিবার নিয়ে বারাসাতে। সরকারি বাধানিষেধ অমান্য করে পুরোদমে রাজনীতি করছে। তবে বেশিটাই করতে হচ্ছে গোপনে। সর্বত্র খুনোখুনি, পাড়াছাড়া, পুলিশের ধড়পাকড় চলছে। সেই সময় পার্টির অনেকেই লুকিয়ে খেতে আসত। কেউ আগে বলে আসত, কেউ আসত বিনা নোটিসে। চুপচাপ খেয়ে চলে যেত। প্রথম দিকে মা সমস্যায় পড়ত। পরে রোজই দু-তিনজনের জন্য বেশি করে ভাত বসানো হত। অনেকটা ডাল আর বড় করে একটা তরকারি। পালিয়ে বেড়ানো, না-খাওয়াদের জন্য ভাত-ডালই তখন বিরাট ব্যাপার।

আজ তমসার স্কুলে হাফছুটি হয়ে গেছে। স্কুল যে এলাকায়, সেখানকার কে একজন মারা গেছে। ছোটখাটো কোনও নেতা। গতকাল সেকেন্ড পিরিয়ডের পর ক'টা ছেলে এসে একরকম জোর করে বড়দির ঘরে ঢুকল। স্কুল ছুটি দিতে হবে। এলাকায় 'জনদরদি নেতা' মারা গেছে, পাড়ায় লেখাপড়া চলে কী করে? বড়দি তাদের বোঝাল, মেয়েদের স্কুলে এরকম হুটপাট ছুটি দেওয়া যায় না। অনেক মেয়ের বাড়ি থেকেই গার্জেনরা নিতে আসে। তারা একা বাড়ি ফেরে না। ফলে ছুটির পরও মেয়েদের স্কুলে আটকে রাখতে হয়। টিচারদেরও থাকতে হয়। প্রথম দিকে ছেলেগুলো বুঝতে চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত বুঝেছে। কাল ছেড়ে দিয়েছে, তবে তার বদলে আজ হাফ ছুটি দিতে হল। এই বিষয়টা নিয়ে কাল টিচাররুমে মালিনী আর অন্তরাদির মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে। মালিনীদি রাগ করছিল।

'কোথা কার কে দু-পয়সার নেতা মারা গেছে বলে স্কুল ছুটি দিতে হবে। এ কেমন কথা? এ তো গুন্ডামি। বড়দিই বা মেনে নিলেন কেন?'

অন্তরাদি বলল, 'এমন করে বলছ যেন আজই এমন প্রথম ঘটল। আগেও হয়েছে। আমি অন্তত দশটা ইনস্টান্স দেখাতে পারি। পলিটিক্যাল প্রেসার দিয়ে ছুটি।'

মালিনী বলল, 'তারা কেউ এরকম ফুটো নেতা ছিল না।'

অন্তরাদি বলল, 'ফুটো নেতা না আস্ত নেতা, তা বলতে পারব না, তবে সেটাও এক ধরনের গুন্ডামি ছিল।'

মালিনী তেড়েফুঁড়ে বলল, 'গুন্ডামি! তখন গুন্ডামি ছিল! কী বাজে বকছ? একটা উদাহরণ দেখাও অন্তরাদি, কবে গুন্ডামি করে স্কুল-কলেজ বন্ধ করা হয়েছে। এইভাবে মস্তানরা এসে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে ঢুকতে পারত?'

অন্তরাদি বলল, 'মালিনী, বিষয়টা ছোটবড় নয়, পলিটিক্যাল পার্টির নেতা মারা গেলে স্কুল-কলেজ, দোকান-বাজার বন্ধ করে দেওয়াটা আমাদের এখানকার একটা কালচার হয়ে গেছে। পাড়ার নেতা আর এমপি, এমএলএ-তে তোমার কাছে পার্থক্য থাকতে পারে লেখাপড়ার কাছে কী পার্থক্য? তা ছাড়া একটা সময় জোর করে বড়দির ঘরে ঢুকতে হত না। ফোন চলে আসত। তাতেই কাজ হত। সেটাও এক ধরনের গুন্ডামি ছিল।'

তমসা ইচ্ছে করেই চুপ করে ছিল। এই ঝগড়ায় ঢুকলেই সবাই ভাবত, রাজনীতি করছে। স্কুলের সকলেই তার পলিটিক্যাল আইডেন্টিটির কথা জানে। আবার এটাও জানে, এই পরিচিতি নিয়ে সে কখনও কোনও সুবিধে নেয়নি। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না, পার্টি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখনও স্কুলের প্রশাসনিক বিষয়ে কখনও নাক গলায়নি। তখন বড়দি মাঝে মাঝে ডাকতেন। রুটিন, পরীক্ষা, রেজাল্ট এসব নিয়ে মিটিং করতে চাইতেন। তমসা কোনওদিন একা যায়নি। আর পাঁচজন সিনিয়র টিচারকে নিয়ে ঘরে ঢুকত। বড়দি অসন্তুষ্ট হতেন। সে জানত, বড়দির এই একা ডাকার পিছনে 'ক্ষমতা'-কে খুশি করবার চেষ্টা থাকত।

'তোমার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাই তমসা। সবাইকে জুটিয়ে আসবে না।'

তমসা বলত, 'এটা হয় না। সিনিয়র কলিগদের বাদ দিয়ে আমি এইসব বিষয়ে একটা কথাও বলতে পারি না। বলবও না।'

বড়দি একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'রুটিন তৈরির সময় তো তোমার সঙ্গে আলাদা বসাই উচিত। তোমার অবস্থা তো আর পাঁচজনের মতো নয়। স্কুলের বাইরেও তোমাকে আর পাঁচটা কাজ করতে হবে। তোমার

boierpathshala.blogspot.com

পলিটিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তোমাকে স্কুলে আটকে থাকলে চলবে কেন?'

তমসা হেসে বলত, 'স্কুলে ঠিকমতো কাজ করাটাও আমার কাছে এক ধরনের পলিটিক্যাল রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে পড়ে বড়দি। মেয়েদের পড়ানোটা মিটিং, মিছিলের মতো আমি কম গুরুত্ব দিয়ে দেখি না। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি সবার মতোই রুটিন মেনে চলব।'

তারপর থেকে আর বড়দি এই বিষয়ে তমসাকে ঘাঁটাতেন না। বিষয়টা স্কুলের অন্য টিচাররা জানতেন। তমসার প্রতি তাদের মনোভাব অন্যরকম ছিল। কেউ কেউ বলত, 'তমসা তোমাদের দলে যদি তোমার মতো মানুষ আরও বেশি থাকত, তা হলে ভালো হত।' তমসা উত্তর দিত না। হাসত। মনে মনে দু:খ পেত। পার্টি সম্পর্কে মানুষের মনে খারাপ ধারণা!

আজ তমসার ছুটি না থাকলে মুশকিল হত। অর্চিনের খাবার নিয়ে মুশকিল।

শেখর গুপ্ত চাপা গলায় বলল, 'ক'টা দিন আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে কাজ করো অর্চিন।'

অর্চিন চুপ করে রইল। এই কথা থানা থেকে বেরিয়েও বলেছে শেখরদা। এখন আরও ঠান্ডা মাথায় বলছে।

'নিজের পড়াশোনাটা শেষ করো। তার মধ্যে টুকটাক যেটুকু কাজ করবার করবি। সিচুয়েশন যখন বদলাবে, তখন দেখা যাবে।'

অর্চিন মুখ তুলে বলল, 'পুলিশের হুমকিতে রাজনীতি ছেড়ে দিতে বলছ শেখরদা?'

শেখর বলল, 'তা বলিনি, বলেছি কৌশল করে চলতে। পলিটিক্সে কৌশলও মানতে হয়। এখন তোমার চুপচাপ থাকবার সময়। পুলিশ তোমার ওপর নজর রাখছে অর্চিন। এটা বোঝবার চেষ্টা করো। কোনও একটা কেস দিয়ে পুলিশ তোমায় ধরে রাখলে সেটা সুবিধের হবে?'

তমসা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। বলল, 'ঠিকই, অর্চিন এখন ক'টা দিন পলিটিক্সের মধ্যে তোমার না থাকাই ভালো।'

অর্চিন বলল, 'তোমরা তো আছো তমসাদি। তোমরা কি ভয় পেয়ে সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছ?'

শেখর বলল, 'আমাদের অবস্থানের সঙ্গে তোর অবস্থানের তুলনা চলে না। আমরা কীভাবে পার্টি করি, সবাই জানে। আমাদের দৌড় কতদূর তাও জানে। তোরা ফ্রেশ, আনপ্রেডিক্টেবল। ভয়ঙ্কর গোলমালে কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারিস। নিজেদের নিয়ে চিন্তাভাবনা তোদের কম। পলিটিক্যাল মুভমেন্টে যুক্তির থেকে আবেগকে তোরা বেশি পছন্দ করিস। স্বাভাবিকভাবেই তোদের নিয়ে মাথাব্যথা। সব যুগেই আগে ইয়ংদের ওপর নজর পড়েছে অর্চিন। এটা নতুন কিছু নয়। ছাত্রছাত্রী, যুবকদের নিয়ে রাষ্ট্র সবসময়ই উৎকণ্ঠিত থাকে।'

তমসা বলল, 'ক'টা দিন চুপচাপ থাকাই ভালো।'

পুলিশ সেরকমই বলেছে। বলেছে, এখনকার মতো কিছু করা হচ্ছে না, কিন্তু নজর রাখা হবে। দ্বিতীয়বার সন্দেহ হলে অ্যারেস্ট করা হবে। ক'দিন আগে পুলিশ যখন সেনবাড়িতে গিয়ে অর্চিনের খোঁজখবর নিয়েছিল, সেদিনই অর্চিন সোজা চলে আসে শেখর গুপ্তর কাছে।

শেখর বলে, 'দাঁড়া, থানায় আমার একজন চেনা অফিসার আছে। একসময় আমি ওর ঝামেলার বদলি সামলেছিলাম। ভদ্রলোক আমাকে মনে রেখেছেন। তাকে একবার ফোন করি। তোকে কেন খুঁজছে, আগে সেটা বুঝে নিই।'

শেখর গুপ্তকে সেই পরিচিত অফিসার বললেন, সুপর্ণ ভট্টাচার্যর কাছ থেকে খবর নিয়ে জানাবেন। উনিই অর্চিনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অফিসার শেখরকে ফোন করেন। অর্চিনের বিরুদ্ধে আর্মস পাচারের অভিযোগ এসেছে। মাসখানেক আগে কৃষ্ণনগরে একটা রেইডে কয়েকটা রিভলভার, কিছু গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তারা অর্চিনের পার্টির অ্যাক্টিভিস্ট। মারদাঙ্গায় থাকে। পার্টি সরকারি ক্ষমতা থেকে সরে গেলেও তারা পার্টি থেকে সরেনি। এদেরই একজন জেরায়

boierpathshala.blogspot.com

জানিয়েছে, কলকাতা থেকে আর্মস পাঠানো হয়। এই সূত্রে বেশ কয়েকজনের নাম তারা বলেছে। তার মধ্যে একজন অর্চিন। সুপর্ণ ভট্টাচার্য কেসটার একটা পার্ট তদন্ত করছে।

শেখর সুপর্ণ ভট্টাচার্যকে বললেন, 'অর্চিনকে নিয়ে আমি থানায় যাচ্ছি।'

অফিসার বলে, 'আজ আসতে হবে না। আমি সুপর্ণর সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি কাল সকালে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেবেন শেখরবাবু। আমি কথা বলে রাখব।'

শেখর উদ্বিগ্ন গলায় বলে, 'না, আমিও যাব।'

কমলকান্তি সেনের মৃত্যুর কারণে পরের দুদিন থানায় যাওয়া হয়নি। আজ গিয়েছিল।

সুপর্ণ ভট্টাচার্যই সেনবাড়িতে অর্চিনের খোঁজে গিয়েছিলেন। ঠান্ডা মাথার মানুষ। সম্ভবত কলিগের পরিচিত হওয়ার কারণে বেশি ঠান্ডা ভাব দেখালেন। তবে ঠান্ডা ভাবেই কড়া কথা বলতে ছাড়লেন না।

শেখর গুপ্ত বললেন, 'আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে। অর্চিন রাজনীতি করে ঠিকই, তবে সে একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হয়। সে আর্মস পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না।'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য বলেন, 'সেটাই তো আমাদের কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার। এত ভালো ছেলে এরকম একটা কাজে কীভাবে ইনভলভড হল?'

কেসটা সিআইডি-র। আমাদের ক্রশচেক করবার জন্য পাঠিয়েছে। সেই খোঁজে আমি সরাসরি ওর বাড়িতে চলে যাই।'

অর্চিন বলল, 'আমি এ সবের কিছুই জানি না।'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য বললেন, 'তুমি জানো না, কিন্তু যাদের কাছ থেকে অস্ত্রগুলো পাওয়া গেছে, তারা তোমাকে চেনে।'

অর্চিন বলল, 'রাজনীতি করতে গেলে তো অনেককেই চিনতে হয়। আমি কখনও কৃষ্ণনগরে যাইনি।'

সুপর্ণ ভট্টাচার্য বললেন, 'ওরা কলকাতা থেকে গেছে। যাওয়ার সময় আর্মস নিয়ে গেছে।'

এইভাবে আরও খানিকক্ষণ জেরা চলে। শেখর গুপ্ত দু-একবার কথার মাঝখানে ঢোকবার চেষ্টা করলে অফিসার তাকে চুপ করিয়ে দেন। একটা সময় অর্চিনকে বলেন, 'রাজনীতি-টাজনীতি বাদ দিয়ে লেখাপড়ায় মন দাও। তোমার সামনে ব্রাইট কেরিয়ার। আর্মস কেসে যদি একবার আটকে দিই, গোটা জীবনটাই তো বরবাদ হয়ে যাবে। অত বড় ঘরের ছেলে তুমি। নিজের ভালো-মন্দটা বোঝার চেষ্টা করো। এবারের মতো তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমার ওপর আমাদের নজর রইল। দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে না। অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণ করতে করতে তোমার অনেকটা ক্ষতি হয়ে যাবে।' তারপর শেখর গুপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি বোঝান। আমি খবর নিয়ে দেখেছি, আপনার এই শিষ্যটি কিন্তু ক্রমশ উগ্র রাজনীতির দিকে যাচ্ছে। আটকান। হাতে খুব প্রমাণ না থাকলেও আর্মস কেসে আটকে রাখা যায়। শুধু সন্দেহের বশেই আটকে রাখা যায়। আপনার মুখ চেয়ে আর ছেলেটির কেরিয়ারের জন্য করলাম না। আপনারা ভেটেরান পার্টিকর্মী। পার্টি পলিটিক্স নিয়েই থাকবেন। আপনাদের পলিটিক্স ছাড়বার কথা বলে লাভ নেই। এদের বারণ করুন।'

শেখরদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অর্চিন বুঝতে পারল, তার মুখ তেতো। সে একটা সিগারেট ধরাল। ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। হতাশ লাগছে। অস্থির লাগছে। ঋষার সঙ্গে দেখা করবে? তাতে কি মন খানিকটা শান্ত হবে? বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে অর্চিন ঠিক করল সে সল্টলেক যাবে। ঋষা ওখানে পেয়িং গেস্ট থাকে।

বিয়াল্লিশ

একতলা বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। তার মানে বাড়িতে কেউ নেই। তার পরেও অর্চিন বেল টিপল। কেউ দেখতে পেলে ভাবত, ছেলেটা বিরাট বোকা। দরজায় তালা, তার পরেও বেল বাজাচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

ঘটনা কিন্তু তা নয়। দরজায় তালা ঝোলানোর ব্যাপারটা আসলে একটা কায়দা। অচেনা কেউ এলে ভাববে বাড়িতে কেউ নেই। ঋষা আর কৃষ্ণকলি এই কায়দায় চলে। যাতে দুটো কমবয়সি মেয়ের বাড়িতে কেউ এসে জ্বালাতন না করে। সদর দরজার বাইরে থেকে তালা দিয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে ওরা যাতায়াত করে। এই গুপ্তকথা ওরা কাউকেই বলেনি। বাইরের ঘরের জানলাও ওরা চট করে খোলে না। ফলে উঁকি মারবারও সুযোগ নেই। দুনিয়া যতই আধুনিক হোক, যতই অ্যাপস আর কন্ডোম আজকাল সহজলভ্য ব্যাপার হোক, মেয়েদের এখনও সাবধানে থাকতে হয়। বাড়ির বাইরে নিজেরা কোথাও থাকলে তো বটেই। সেখানে হুটপাট লোক ঢুকতে দেওয়া যায় না। অচেনা কাউকে তো নয়ই, এমনকী চেনা লোককে অ্যালাও করতে নেই। কৃষ্ণকলি বলে, চেনা লোক বেশি পাজি। তারা ক্ষতি করে বেশি। ঋষাও একমত।

গোড়াতে এই বাড়িতে ঋষা আর কৃষ্ণকলি পেয়িং গেস্ট হিসেবে এসেছিল। দোতলায় ল্যান্ডলেডি থাকেন। তিনি দু'বেলা খাবার ব্যবস্থা করতেন। মাসের শুরুতে টাকা দিলেই হত। রান্নাবান্নার ঝামেলা ছিল না। তার থেকে বড় কথা, বাড়িতে এক ধরনের পাহারা আছে। ল্যান্ডলেডি সল্টলেকের এই ব্লকে শুধু পরিচিত মহিলা নন, ডাকসাইটেও বটে। এক সময়ে স্বামী বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন। ফলে স্বামীর সঙ্গে তারও দাপট ছিল। স্বামী মারা গেলেও সেই দাপট কমেনি। আশপাশে সবাই সমীহ করে। মহিলা যে টাকা পয়সার জন্য বাড়িতে পেয়িং গেস্ট রেখেছেন এমন নয়। স্বামীর পেনশন আর সঞ্চয়তেই দিব্যি চলে যায়। তার ওপর মেয়ে ডাক্তার। আমেরিকায় থাকে। সে বারবার মাকে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখতে চেয়েছে। মহিলাই রাজি হন না। নিজের বাড়ির বিছানায় না শুলে তার নাকি ঘুম আসে না। দোতলা বাড়ি ফাঁকা পরে থাকবে? এই চিন্তাতেই পেয়িং গেস্ট রাখা। ছেলেরা থাকলে হুল্লোড় হবে। সেই কারণে দুজন মেয়েকে খুব কম টাকাতেই একতলায় থাকতে দিয়েছেন। প্রথম প্রথম রান্নার লোক দু'বেলা রান্না করে নীচে খাবার পাঠিয়ে দিত। কিন্তু পরে ঋষা, কৃষ্ণকলি দুজনেরই বাড়ি ফেরা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। কে কখন ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই। বাইরেও কখনও কখনও ওরা যে যার মতো খেয়ে নিত। শেষ পর্যন্ত বাড়িউলি নিজেই খাবার পাঠানো থেকে সরে গেলেন। এখন ঋষারা রান্না করে নেয়। একেকদিন একেকজন। বাকিটা হোম ডেলিভারি।

এই বাড়িতে যে অল্প কয়েকজনের ঢোকবার অনুমতি আছে অর্চিন তাদের মধ্যে একজন। অর্চিন অবশ্য আসে খুবই কম। ন'মাসে ছ'মাসে একবার। এলে হয় ঋষার সঙ্গে আসে, নয় ফোন করে নেয়।

ঋষা ল্যান্ডলেডির সঙ্গে অর্চিনের আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মহিলা অর্চিনকে পছন্দ করছেন। পছন্দ করবার তিন-চারটি কারণ আছে। প্রথম কারণ ছেলেটি তার বান্ধবীর কাছে বুক ফুলিয়ে আসে। কোনও লুকোছাপার ব্যাপার নেই। দ্বিতীয় কারণ, ছেলেটি শান্ত প্রকৃতির। আর সব থেকে বড় কারণ হল, তার এক আত্মীয় অর্চিনের ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। সেখান থেকে তিনি এই ছেলের সম্পর্কে খবর জোগাড় করেছেন। ছেলেটি লেখাপড়ায় অতিশয় ভালো। ল্যান্ডলেডি এই বিষয়ে ঋষাকে গার্জেনের মতো জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন। মহিলাকে ঋষারাও পছন্দ করে। সম্মানও করে। তার এই ধরনের ব্যক্তিগত কৌতূহলে মজা পায়।

'অর্চিনকে তুমি বিয়ে করবে?'

'এখনই বলা যাচ্ছে না মাসিমা।'

'কেন?'

'পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে।'

'তোমার বাড়িতে কি জানে তুমি এই ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করো?'

'না।'

'সেকী! কেন!'

'আমার বাড়িতে কঠিন পরিস্থিতি। জেঠা, কাকারা নিজে ছেলে পছন্দ করাটা মেনে নিতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'এটা তো ঠিক নয়। ছেলেমেয়েদের নিজেদের পছন্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।'

boierpathshala.blogspot.com

'আপনি বলছেন মাসিমা, কিন্তু আমার বাড়িতে বলে, এতে নাকি ভুল হয়ে যায়।'

'তা কেন হবে? ঠিক ভুল যে-কোনও ক্ষেত্রেই হতে পারে। নিজে পছন্দ করো আর বাড়ির লোক খুঁজে এনে দিক। এই দেখো না, আমি যখন তোমার মেসোমশায়ের সঙ্গে মেলামেশা করতাম, বাড়িতে বিরাট আপত্তি। পুলিশের সঙ্গে মরে গেলেও বিয়ে দেওয়া হবে না। কী কারণ? পুলিশের নাকি সামাজিক কোনও জীবন নেই। আমি কি ভুল করেছি? তা ছাড়া মানুষ জীবনসঙ্গী বেছে নেয়, ঠিক ভুলের জন্য নয়, এটা পরীক্ষা নয়। জীবনসঙ্গী হওয়া উচিত বন্ধুর মতো। এমন বন্ধু যাকে নিজের ভালো-মন্দ, দোষ গুণ সব বলা যায়। প্রকাশ্য এবং গোপন সব কথাই সে জানবে মুক্ত মনে। তাকে ভালোবেসে বিয়ে না পছন্দ করে বিয়ে তাতে কিছু এসে যায় না।'

'দারুণ বলেছেন মাসিমা। কিন্তু আমার বাড়িতে একথা কে বোঝাবে?'

'দরকার হলে আমি বোঝাব। আমি যাব।'

ঋষা হেসে বলে, 'খুব ভালো হবে। সময় হলে আপনাকে নিয়ে যাব মাসিমা। তবে কী জানেন, অর্চিন যেমন ছেলে তাতে এই সময়টা চট করে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। আর আমিও বিশ্বাস করি, সঙ্গী মানে বন্ধু। তাকে যে স্বামী বা স্ত্রী হতেই হবে এমন কোনও কথা নেই।'

ল্যান্ডলেডি তিন মাসের জন্য আমেরিকায় মেয়ের কাছে গেছেন। এই কারণে ঋষারা বেশি সতর্ক থাকে। মিথ্যে তালা লাগানোর কায়দা বের করেছে।

অর্চিন এই তালার কায়দাটা ধরে ফেলেছে। একদিন হুট করে চলে এসেছিল। ঋষাকে জানায়নি। দরজায় তালা দেখে প্রথমটায় একটু অবাক হয়। এই সময়টা ঋষার ঘরে থাকবার কথা। তালা দিয়ে কোথায় গেল? মোবাইল বের করে ফোন করতে যায়, তখন চোখে পড়ে দরজার সামানে ঋষার জুতো। এই জুতো পরেই সাধারণত ঋষা বেরোয়। আজ কি তবে অন্য জুতো পরে বেরিয়েছে? হতে পারে। কিন্তু দরজায় তালা দিয়ে বেরোনোর সময় এই জুতোটাই বা বাইরে থাকবে কেন? ভুল করে? নাকি ভিতরে কেউ আছে? এরপর অর্চিন দরজায় চাপ দিল। চাপ দিতেই বুঝল, দরজা ভিতর থেকেও বন্ধ। মোবাইলে ঋষার নম্বর টিপে ছিল অর্চিন।

'দরজা খোল ঋষা।'

ঋষা অবাক গলায় বলে, 'তুই! তুই কোথায় অর্চিন?'

অর্চিন বলে, 'এই তো, তোদের তালা দেওয়া দরজার বাইরে।'

ঋষা পরে বলেছিল, 'তুই বুঝলি কী করে আমি ভিতরে আছি?'

অর্চিন বলল, 'তোর বোকামির কারণে। দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়েছিস, কিন্তু পরবার জুতোটা সরিয়ে রেখেছিস দরজার বাইরে।'

ঋষা জিব কেটে বলেছিল, ইস ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু জুতো তো আমার একটা নয়।'

অর্চিন অবহেলা করে বলেছিল, 'সেই জন্যই দরজায় ঠেলা দিলাম। দিয়ে বুঝলাম, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। তখন ফোন করলাম। যাক, ভবিষ্যতে এই বোকামি কোরো না।'

এই কারণেই আজ তালা দেখেও বেল টিপল অর্চিন। তবে শুধু বেল টিপল না, মোবাইল থেকে ঋষাকে টেক্সট পাঠাল।'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।'

বেলের আওয়াজ শুনে অন্য কেউ এসেছে ভেবে যদি দরজা না খোলে সেই কারণে টেক্সট।

এ বাড়িতে ঋষা আর কৃষ্ণকলির ঘর আলাদা। তবে এতক্ষণ দুজনে ঋষার ঘরেই ছিল। খাটের ওপর বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঋষা ল্যাপটপ ঘাঁটছিল। সে একটা হাফ প্যান্ট আর টি শার্ট পরে আছে। হাফ প্যান্ট নয়, হট প্যান্ট। দৈর্ঘ্যে ছোট। বাইরে চেনা কেউ এই পোশাকে ঋষাকে দেখলে চমকে উঠবে। বাইরে

boierpathshala.blogspot.com

বেরোলে ঋষা কখনওই খোলামেলা পোশাক পরে না। ঋষার টি শার্টের রং কালো। বুকের ওপর সাদায় লেখা—'আমি উড়ে বেড়াই, আমি ঘুরে বেড়াই।' শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন। কবিতার নাম 'তুমি'।

কৃষ্ণকলি পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। সে পরেছে পালাজোব আর কুর্তি। হাতে পেপারব্যাক। সে হল থ্রিলারের ভক্ত। গল্পের বইতে খুন-জখম সেক্স না থাকলে তার চলে না। বাংলা বই ছুঁয়েও দেখে না কৃষ্ণকলি। ঋষারা যে লিটিল ম্যাগাজিন নিয়ে লাফালাফি করে সে বিষয়ে তার তীব্র আপত্তি। যদিও প্রতি সংখ্যার জন্যই সে ঋষাকে চাঁদা দেয়। আবার ঝগড়াও করে। আজও করেছিল।

'এই সব ছেলেমানুষি এবার বন্ধ কর ঋষা। লিটিল ম্যাগাজিন ব্যাপারটাই উঠে গেছে। ও সব আজ থেকে বিশ-তিরিশ বছর আগের কনসেপ্ট। প্রাণের আবেগে লেখালেখি বলে এমন কিছু হয় না। লিখব কিন্তু বাজারে তার কোনও দাম পাব না, একথা এখন অর্থহীন। এভরিথিং ইজ মার্কেট। সেক্স কমোডিটি টু পোয়েট্রি।'

ঋষা পায়ের ওপর পা তুলে রেখেছে। তার ছিপছিপে ফর্সা পা দুটো খুবই সুন্দর। সুন্দর পা নাড়তে নাড়তে মেয়েটা বলল, 'যা বুঝিস না তাই নিয়ে কথা বলিস না কলি। লিটল ম্যাগাজিনের দাম কেনা বেচা দিয়ে হিসেব করা যায় না। এরপর তো বলবি, কবিতা বলে কিছু হয় না। কবিতার কোনও বিক্রি নেই। কবিতা না লিখে ব্রেস্ট অয়েলের বিজ্ঞাপন লেখা উচিত। এক শিশি ব্যবহার করুন, দেখবেন পুরুষ আর চোখ ফেরাতে পারছে না। অথবা ইটস ইওর লাস্ট চান্স। তাই তো? লিটিল ম্যাগাজিন কত ভালো ভালো কল্পনা, ভাবনা, গবেষণার আঁতুরঘর জানিস?'

কৃষ্ণকলি হাই তুলে বলে, 'বেশি লেখালিখিটাই তো মুশকিল। যে পারছে লিখছে। এত লেখক হওয়ার কারণেই বাংলা গল্প-কবিতার সর্বনাশ হয়েছে।'

ঋষা বলল, 'আবার না জেনে কথা। হালকা গোয়েন্দা গল্প পড়ছিস তাই পড়। কত বড় বড় কবি, গল্পকাররা লিটিল ম্যাগে লিখেছে তার ঠিক নেই।'

কৃষ্ণকলি বলে, 'সে লিখতে পারে। কিন্তু সে সব পাস্ট। পুরোনো ইতিহাস। যত বড় কবি গল্পকাররা লিখেছে, তার থেকে অনেক বেশি লিখেছে ফালতুরা। অপাঠ্য লেখা সব।'

ঋষা এবার জোর রেগে গেল। বলল, 'কে বলল ভালো লেখা সব অতীতে লেখা হত? তুই ক'টা ম্যাগাজিন পড়িস? আমি আনলে উলটে রেখে দিস। এখনও কত ভালো ভালো ম্যাগাজিন বের হয়। নাম বলব?'

কৃষ্ণকলি হেসে বলল, 'সেসব আর লিটল নেই বাছা, বিগ হয়ে গেছে। তারা লিটলের ফায়দা নেয় আবার বিগের মার্কেট ধরবার চেষ্টা করে।'

ঋষা বলল, 'তোর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আমাদের ম্যাগাজিনের জন্য আর তোকে চাঁদা দিতে হবে না। তুই সি গ্রেডের থ্রিলারগুলো নিয়ে পরে থাক। ওগুলো লিটারেচার? সফট পর্নো। তোর চাঁদায় ম্যাগাজিন বের করলে ম্যাগাজিনের অসম্মান হবে।'

কৃষ্ণকলি বলল, 'বাঁচালি। আর পয়সা নষ্ট হবে না। তুইও ও-সব থেকে বেরিয়ে আয়। সময় নষ্ট করিস না।'

ঋষা বলল, 'তোকে ভাবতে হবে না। আমি বুঝব। তুই চুপ কর, আমায় কাজ করতে দে। মেল থেকে কয়েকটা লেখা ডাউনলোড করব।'

এমন সময় বেল বাজল। ঋষা ভুরু কোঁচকাল। কে এল? কৃষ্ণকলি উঠে বসল। এক মুহূর্তের মধ্যেই অর্চিনের ফোন—'আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

ঋষা অবাক হয়ে বলল, 'অর্চিন! এই সময় অর্চিন কেন?'

কৃষ্ণকলি মুচকি হেসে বলল, 'মনে হয়, প্রেম জেগেছে। দাঁড়া আমি খুলে দিচ্ছি।'

boierpathshala.blogspot.com

ঋষা কোল থেকে ল্যাপটপ নামাল। খাট থেকে নেমে হাফ প্যান্টের ওপরই একটা পায়জামা গলিয়ে নিল। আয়নার সামনে গিয়ে হাত দিয়ে চুলটা গুছিয়ে নিল। তারপর ড্রইংরুমে গেল। ড্রইংরুমটা সাজানো। সোফা, টেবিল, শোকেস সবই আছে। ল্যান্ডলেডিই সাজিয়ে রেখেছেন। উনি বলেছিলেন, এই ঘরটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করবেন। প্রথম দিকে দু-একবার লোকজন এলে বসেওছিলেন। কিন্তু সে কয়েকদিন মাত্র। এখন কেউ এলে ওপরে চলে যায়। অর্চিন সোফায় বসে কৃষ্ণকলির সঙ্গে কথা বলছিল।

'কী ব্যাপার এবারও তো ফার্স্ট হলে, কই খাওয়ালে না তো?'

অর্চিন শুকনো হেসে বলল, 'ফার্স্ট হলে খাওয়ানোর কী আছে?'

কৃষ্ণকলি চোখ পাকিয়ে বলল, 'বা:, তুমি খুশি হয়েছ, খুশি হলে তো মানুষ খাওয়ায়।'

অর্চিন বলল, 'কে বলল আমি খুশি হয়েছি?'

'তা হলে কি দু:খ পেয়েছ?'

অর্চিন বলল, 'খুশি, দু:খ কিছুই হয়নি। পরীক্ষা দিয়েছিলাম। নম্বর পেয়েছি। বাই চান্স সেই নম্বর অন্যদের থেকে বেশি। ব্যস। এটা নিয়ে লাফালাফি করবার মতো কিছু হয়নি।'

কৃষ্ণকলি বলল, 'গুডবয়দের এই ঢপবাজিগুলো আমার খুব জানা আছে। এরপর তো ক্যাম্পাসিং-এ বেস্ট অফারটা পেয়ে যাবে। তার পরেই হুস। সে যাও। বড় চাকরি করো। আমাকে খাওয়ালেই হবে।'

অর্চিন হেসে বলল, 'সে তোমাকে এমনি খাওয়াতে পারি।'

ঋষা ঘরে ঢুকতে কৃষ্ণকলি তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'অ্যাই ঋষা, এক সপ্তাহের মধ্যে অর্চিন আমাকে ভালো রেস্তোরাঁয় যদি না খাওয়াতে নিয়ে যায়, তা হলে কিন্তু আমি একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। দেখব এ বাড়ির দরজা কে খোলে।'

কৃষ্ণকলি হাসতে হাসতে ঘর ছাড়বার পর ঋষা অর্চিনের উলটো দিকে বসল।

'কী হয়েছে? হঠাৎ এলি যে?'

অর্চিন বলল, 'কেন হঠাৎ আসতে পারি না?'

ঋষা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'তা পারবি না কেন? হাজার ডাকলেও তো আসিস না, তাই বলছি।'

অর্চিন চুপ করে রইল। ঋষা বলল, 'তোকে টায়ার্ড লাগছে।'

অর্চিন অন্যমনস্কভাবে বলল, 'একটু টায়ার্ড। সকাল থেকে ছোটাছুটি গেছে।'

'খেয়েছিস?'

অর্চিন বলল, 'হ্যাঁ, শেখরদার বাড়ি।'

ঋষা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোকে দেখে ভালো লাগছে না। ডাক্তার দেখিয়েছিস?'

অর্চিন অবাক হয়ে বলল, 'ডাক্তার দেখাব না কেন?'

এই কথার মাঝখানেই কৃষ্ণকলি আবার ঢুকল। এবার সে জিনস টপ পরে সেজেছে। কাঁধে ব্যাগ। হাত নেড়ে বলল, 'হাই গাইস। আমি মুভি দেখতে চললাম। তোমরা রিল্যাক্স করো। এই যে শ্রীমতী কবিতারাণী, এই গুডবয়টির ঠিকমতো যত্নআত্তি করবেন। তার আগে দয়া করে দরজাটায় তালা লাগিয়ে নিন।'

কৃষ্ণকলি মুখ ফিরিয়ে ঋষার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। নতুন নয়, এই কাণ্ড কৃষ্ণকলি আগেও করেছে। অর্চিন এলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। পরে ঋষা ধন্যবাদ জানাতে গেলে গম্ভীরভাবে বলেছে, 'ধন্যবাদ জানানোর মতো কিছু করিনি। এটাই নিয়ম। উইদাউট সেক্স প্রেম হয় না। নেকামি হয়। ছুকছুকানি হয়। আমি এসব পছন্দ করি না। তোদের চান্স করে দেওয়াটা আমার ডিউটি। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে থাকতে পারতাম। কিন্তু সেটা রিস্কি। ঘর থেকে বেরিয়ে হয়তো দেখলাম, তোরা ড্রইংরুমের সোফায় জামাকাপড় বিসর্জন দিয়ে জড়াজড়ি করে আছিস। সেই দৃশ্য আমার জন্য ঠিক হবে না। তাই বেরিয়ে যাওয়াই বুদ্ধির। খালি বাড়িতে তোরা কীভাবে থাকবি তোদের ব্যাপার।'

boierpathshala.blogspot.com

ঋষা বাইরে থেকে সদর দরজায় তালা লাগিয়ে ড্রইংরুমে এসে দেখল, অর্চিন সোফার পিঠে মাথা রেখে চোখ বুঁজে আছে। কী হয়েছে ছেলেটার? শরীর খারাপ? নাকি অন্য কিছু? কেমন যেন একটা অস্থির হয়ে আছে। চোখ বুঁজে থাকবার মধ্যেও সেই ভাবটা রয়েছে।

'চল ঘরে গিয়ে শুবি।'

অর্চিন চোখ খুলল। ঋষা এগিয়ে এসে হাত বাড়াল।

'আয়।'

অর্চিন ঋষাকে টেনে জড়িয়ে ধরতে গেল। ঋষা হাত ছাড়িয়ে বলল, 'এখানে নয়, আগে ঘরে আয়।'

তেতাল্লিশ

ঋষা গাঢ় স্বরে বলল, 'কী হয়েছে?'

অর্চিন বলল, 'কী হয়েছে নয়, কী হবে তাই ভাবছি।'

ঋষা ঝুঁকে পড়ে অর্চিনের কপালের ভাঁজে চুমু গেল। অস্ফুটে বলল, 'তোর ভাবনায় চুমু দিলাম।' তারপর হেসে বলল, 'খালি ভাবনা আর ভাবনা। এই ভাবুক ছেলেটার প্রেমে পড়ে যত মুশকিল হল আমার।'

অর্চিন চোখ বুজে বলল, 'তোকে প্রেমে পড়তে কে বলেছে? চারপাশে কত না-ভাবনার ছেলে আছে, তাদের কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে পারতিস।'

ঋষা বাঁ হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ডান হাত দিয়ে অর্চিনের নাক নেড়ে আদুরে গলায় বলল, 'তুই বলেছিস। তুই দায়ী। আমার কি প্রেমিক পেতে কোনও অসুবিধে ছিল? প্রেম-টেম নয়, কত ছেলে চাইত আমি একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাই।'

অর্চিন চোখ বোজা অবস্থাতেই পা নাড়াতে নাড়াতে বলল 'তাকালি না কেন?'

'তুই তাকাতে দিলি কই?'

অর্চিন চোখ খুলে ঋষার মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'এবার দেব।'

ঋষা মুখ নামিয়ে দিল অর্চিনের মুখের ওপর। নিজের নাক দিয়ে অর্চিনের মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, 'বয়ে গেছে।'

পৃথিবীর যাবতীয় প্রেম তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে দেখতে প্রধানত হাস্যকর। প্রেম দেখে কেউ মুচকি হাসেনি, এমন লোক পাওয়া মুশকিল। মুখে না হাসলেও মনে মনে হাসে তো বটেই। সিনেমা, থিয়েটার, গল্পের বইয়ের প্রেমের কথা ধরলে চলবে না। সেসব প্রেম ড্রইংরুমে রাখা বইয়ের তাকের মতো সাজানো গোছানো। কথার সঙ্গে কথা মিলিয়ে কথা, মিলনের সঙ্গে মানানসই করে গান, বিরহের সঙ্গে চোখের জল। আসল প্রেমে এইসব কারসাজি চলে না। কোনও প্রেমিক-প্রেমিকা দাবি করতে পারবে না, তারা ভেবেচিন্তে, কথা বা আচরণ সাজিয়ে প্রেম করতে পারে। হয়তো ভেবে আসে বিস্তর, এমনকী বাড়িতে রিহার্সালও দেয়, কিন্তু আসল সময় সব ভেস্তে যায়। সত্যি প্রেম সবসময়ই এলোমেলো, উলটোপালটা, অসঙ্গতিতে ভরা। তাই দুজনের কাছে মধুর, তিন নম্বর মানুষের কাছে হাসির। প্রেমরত দুজনকে দেখলে মনে হয়, মন দিয়ে বোকার অভিনয় করছে। পাল্লা দিচ্ছে, কার অভিনয় কত ভালো হয়। এই মুখে হাসি, তো এই মুখগোমড়া। এই চোখে মুগ্ধতা, তো এই চোখ কটমট। এই ঠোঁটে আহ্বান, তো এই ঠোঁট ফোলানো। পাহাড়ের আকাশ যেন। সর্বক্ষণ রোদ আর কুয়াশার মারামারি চলছে। প্রেমিক-প্রেমিকার আহ্লাদের কথা কানে এলে তো কথাই নেই। পেট গুড়গুড়িয়ে হাসি আসে। মনে হয়, দুজন মানুষ এমন কিছু কথা একটানা বলে যাচ্ছে, যার কোনও অর্থ নেই। পরম্পরা নেই। এরা পাগল নাকি! আর প্রেমের সঙ্গে যদি সেক্স থাকে, তা হলে মজার ষোলোকলা পূর্ণ। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রেমোন্মাদ দুই নরনারীর যৌনতা দেখলে সেখানে শুধুই হিউমার। সময় বিশেষে মানুষ যে কতটা অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করতে পারে তার বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

boierpathshala.blogspot.com

শুধু অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, অবাস্তব। আর সেই কারণেই তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে এই ঘটনা হাস্যকর। বুদ্ধিমান দুজনের বেলায় হাসির সঙ্গে খানিকটা বিস্ময়েরও। সর্বদা যারা ভেবেচিন্তে, আগুপিছু হিসেব কষে, যুক্তি শিক্ষা বোধের ফিতে মেপে চলে, প্রেমের সময় তারাও এ কী কাণ্ড করছে! বুদ্ধিমানের আবেগও নিয়ন্ত্রিত থাকে। এরা যে সেই আবেগকেও জলাঞ্জলি দিয়েছে। শুধু শরীরের নয়, মনেরও যাবতীয় আগল খুলে ফেলেছে। হাসি না পেয়ে উপায় আছে?

মজার কথা হল, যারা প্রেম করে, তারা তৃতীয় ব্যক্তির হাসি নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না। কে কী ভাবল, কে কী বুঝল, তাতে ভালোবাসায় মেতে থাকা নরনারীর কিছু যায় আসে না। তাদের যুক্তি, বুদ্ধি, বোধ তাদেরকে বলে, 'তোমরা শুধু ভালোবাসো, শুধু ভালোবাসো এবং শুধু ভালোবাসো'। সেই ভালোবাসা, তাকে সাজানো বইয়ের থেকে টেবিলে উজাড় করে রাখা অগোছালো বইপত্তর হতে বেশি মজা পায়। যেখানে একচোটে কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাসি, রাগ, অভিমান কিচ্ছু না। হাতড়াতে হবে, উলটোপালটে, টেনেহিঁচড়ে, ফেলে-ছড়িয়ে দেখতে হবে। ধীরে ধীরে সব পাওয়া যাবে। যা চেয়েছিল, যা চাওনি সব। কখনও কখনও চরম মুহূর্তে মনের সঙ্গে শরীরও আসবে।

ঋষা আর অর্চিন এইমাত্র শরীরের ভালোবাসা শেষ করেছে। এখন তার ঘোর নিয়ে বসে আছে। দুজনের জামাকাপড় খাটের পাশে, মেঝেতে পড়ে আছে। অর্চিন ঋষার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। তার বুক পর্যন্ত চাদর। সেই চাদরের মধ্যেই ঢুকে বসে আছে ঋষা। চাদর এবং অর্চিনে কোমর পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। কিন্তু বাকি শরীর তার উন্মুক্ত। মাথার চুল মাঝে মাঝে কাঁধ, বুক, পিঠের সামান্য অংশ ঢাকছে। না ঢাকবারই মতো। সেদিকে খেয়াল নেই ঋষার। সে এখন শরীরে আদরের ক্লান্তি নিয়ে অর্চিনের সঙ্গে আবেগ-আহ্লাদের খুনসুটি করছে। তার চোখে মুখে চুলে হাত বুলিয়ে, চুমু খেয়ে আদর করছে। মেয়েরা অপ্রিয় মানুষের কাছে মন ও শরীর দুটোই শক্ত করে নিতে জানে। মনে বর্ম বেঁধে নেয়, শরীরে লাগিয়ে নেয় কাঁটা। সেই বর্ম ও কাঁটা ভেদ করা অসম্ভব হয়। যদি কোনও পুরুষ জোর করে, সে হয় কিছুই পায় না, তারপরেও প্রেমিক, স্বামী বা ধর্ষক হিসেবে জোর করে কিছু আদায় করে তা হয় ক্ষতবিক্ষত। এই মেয়েই আবার প্রিয় মানুষের জন্য সব বর্ম খুলে ফেলে, উপড়ে ফেলে কাঁটা।

ঋষাকে এখন দেখলে তেমনটাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সে শরীর আর মনের সব বাধা ছুড়ে ফেলে অর্চিনের কাছে পরম ভরসা, ভালোবাসায় নিজেকে সর্মপণ করে বসে আছে।

অর্চিন চেয়েছিল। আদর চেয়েছিল ঋষার। অস্থির মন নিয়ে শেখরদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে বুঝেছিল, শুধু মন নয়, শরীর থেকেও অস্থিরতা দূর করতে হবে। তারপর ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঋষা অর্চিনকে বুঝতে পেরেছিল। ড্রইংরুম থেকে ঘরে নিয়ে। আজ প্রথম নয়, এর আগেও একবার শরীরে মিলেছে তারা। সেটা ছিল একেবারেই হঠাৎ করে। পরের পিরিয়ড পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে ছিল। তারপর থেকে ঋষা সাবধান থাকে। নিজের কাছে 'ব্যবস্থা' রাখে। কৃষ্ণকলি শিখিয়েছে।

'এরপর থেকে প্রোটেকশন সঙ্গে রাখবি।'

ঋষা লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'দুর, ও একবার হয়ে গিয়েছিল।'

কৃষ্ণকলি সিরিয়াস মুখ করে বলেছিল, 'আবার একবার হতে পারে।'

ঋষা বলেছিল, 'তুই বাজে বকা থামা তো। বেশি গার্জেনগিরি ফলাস না।'

কৃষ্ণকলি বলেছিল, 'এখন বাজে বলছিস, পরে কাজের বলবি। যা বলছি কর। গার্জেনরা বারণ করে, বন্ধুরা উৎসাহ দেয়। যাতে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে।' এই পর্যন্ত বলে কৃষ্ণকলি নাটকীয় ভঙ্গিতে গান ধরেছিল।

'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি যেন না করি ভয়...।'

ঋষা হেসে বলেছিল, 'তুই থামবি? নাকি মার খাবি? আমার কিচ্ছু লাগবে না।'

boierpathshala.blogspot.com

কৃষ্ণকলি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, 'বাঙালি মেয়েদের এই হল সমস্যা। হয় মন মন বলে হেদিয়ে পড়ল, নয় প্রেগন্যান্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে সিঁটিয়ে রইল। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই। শরীর ব্যাপারটা জানতেই পারে না। ভোগ করতে পারা তো দূরের। আর পারল না বলে, বানিয়ে বানিয়ে নানা ধরনের সোশ্যাল মরাল ট্যাবু তৈরি করল। সবাই মিলে ঘাড়ে চেপেও বসল। বাঙালি ললনারা নিজের শরীরকে যদি ঠিকমতো উপভোগ করতে দিত, তারা সত্যি দাম বুঝত, পুরুষমানুষদের এত নোংরামি, দাপট থাকত না। ওরা মানসিকভাবেই সিঁটিয়ে থাকত। ভোগ করার কথাই ভাবতে পারত না।'

ঋষা হেসে বলল, 'বাপরে, কী লেকচার। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, প্রোটেকশনই বাঙালির মেয়েদের শক্তির হাতিয়ার।'

কৃষ্ণকলি বলেছিল, 'হাসতে পারিস, কিন্তু ঘটনা সত্যি। প্রোটেকেশন এখানে সিম্বলের মতো। সমাজ, রাষ্ট্র, নারীবাদীরা আমাকে কি পাহারা দেবে? আমি কি অবলা? আমার প্রোটেকশন আমার কাছে?'

ঋষা হাততালি দিয়ে বলেছিল, 'খুব হয়েছে। এবার আপনি থামুন ম্যাডাম।'

মুখে যাই বলুক, তারপর থেকে ঋষা নিজের কাছে 'ব্যবস্থা' রাখে। নিজেকে সবলা প্রমাণ করবার জন্য নয়, গোলমাল থেকে বাঁচতে। আজও ছিল। অর্চিনের আদর করবার কায়দাটা বড় সুন্দর। তার নিজের চরিত্রের মতো। বাইরেটা ধীরস্থির, নরমসরম। ভিতরে কঠিন। আগের বারের মতোই অনেকটা সময় নিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে ব্যাকুল করে তুলেছে ঋষাকে। সবশেষে শরীরে তৃপ্তি আর ক্লান্তি নিয়ে এই গল্প করাটাও দারুণ লাগে। মনে হয়, এখনও অর্চিনের আদর শেষ হয়নি। ঋষাকে অর্চিনই প্রথম পছন্দ করে বসে। ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের ফাংশন ছিল। ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকবার কারণে, অর্চিন সেই ফাংশানের ব্যবস্থাপনায় ছিল। স্টেজের দায়িত্ব ছিল তার। কারণ, কী হবে, কতক্ষণ থাকবে—এইসব। ফার্স্ট ইয়ারে একটি রোগাপাতলা চেহারার মেয়ে স্টেজে আবৃত্তি করতে উঠল।

'আমি একটি মেয়েকে জানি
যে তার বেকার প্রেমিককে ছেড়ে যেতে পারেনি এখনও
আমি এক কিশোরকে জানি
পাঁচ গোল খাওয়া দলের যে হচ্ছে একজন সমর্থক
আমি এক যুবাকে চিনি
বৃদ্ধ পিতাকে যে আজ পৌঁছে দিতে পারেনি বৃদ্ধাশ্রম
আমি এক প্রৌঢ়াকে জানি
নির্বাচনে গোহারা হেরে যাওয়া দলের পতাকা
তিনি কাঁধ থেকে নামাতে পারেননি এখনও...।'

থমকে গিয়েছিল অর্চিন। সে কবিতা-টবিতা শোনবার লোক নয়। তার পরেও মেয়েটির আবৃত্তি তাকে থমকে দেয়। অর্চিন ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকে উইংসের পাশে। মেয়েটির কী নাম যেন ঘোষণা হল?

পরদিনই মেয়েটিকে ধরে অর্চিন।

'আমি তোমার নাম জানতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। আমার নাম ঋষা। ঋষা রায়।'

অর্চিন বলে, 'কাল নবীনবরণ অনুষ্ঠানে তুমি যে কবিতাটি পড়লে, সেটা তুমি কবে লিখেছ?'

ঋষা তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, ওটা আমার নয়। কবিতাটি অংশুমান করের লেখা। অংশুমানবাবু অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখেছেন।'

boierpathshala.blogspot.com

অর্চিন মনে হয় একটু আশাহত হল। সম্ভবত সে ভেবেছিল কবিতাটি মেয়েটির লেখা। ফলে তার সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, তাতে একটু চিড় খেল। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'ও।'

ঋষা উৎসাহ নিয়ে বলল, 'অংশুমান করের আরও অনেক ভালো ভালো কবিতা আছে।'

অর্চিন নিরুৎসাহ গলায় বলল, 'আচ্ছা।'

ঋষা এত সহজে ছাড়তে চাইল না। তার পছন্দের কবি সম্পর্কে এই সুন্দর ছেলেটিকে আরও দু-কথা শোনাতে চাইল।

অর্চিনের হালকা কৌতূহল হল। মেয়েটি নতুন ইউনিভার্সিটিতে এলেও আড়ষ্টতা নেই। অচেনা সিনিয়রের সঙ্গে দিব্যি কথা বলছে।

'আমি একটা অন্য কবিতা বলতে চেয়েছিলাম।'

'বললে না কেন?'

ঋষা রাগ রাগ গলায় বলল, 'কবিতাটা একটু বড়। বড় কবিতা বলব শুনে ইলেকট্রনিক্স না মেকানিক্যালের এক দিদি কড়া গলায় বলল, বলা যাবে না। বেশি সময় লাগবে। অনেকে আছে। সবাইকে সুযোগ দিতে হবে। বারণ আছে। আমি রেগে গিয়ে বললাম, কে বারণ করেছে? সে তখন অর্চিন না কী যেন একটা নাম বলল। সে কে? পরে শুনলাম, ওই অর্চিন নাকি এখানে পলিটিক্স করে। মজার কথা কী বলুন তো, যারা রাজনীতি করে তারা কবিতাকে বিচার করে লেন্থ দিয়ে। কবিতা দিয়ে নয়। এরকম একটা বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে যে এমন বোকা ছেলে আছে, আমার জানা ছিল না।'

অর্চিনের খুব মজা লাগল। সে হেসে ফেলল। বলল, 'খুব রেগে আছ মনে হচ্ছে।'

ঋষা অবাক হয়ে বলেছিল, 'রাগব না! আমার ভালো লাগার কবিতা বলতে পারলাম না। না হয় দুটো কবিতাই বলতাম।'

অর্চিন বলল, 'আচ্ছা অর্চিনের সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে বলে দেব, ভবিষ্যতে এরকম বোকামি যেন সে না করে। অবশ্য জানি না, সে শুনবে কিনা। বোকারা শুধু কবিতা নয়, কথাও শুনতে চায় না।'

অর্চিন চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। মেয়েটি ইন্টারেস্টিং। একে রাজনীতিতে আনতে হবে।

ঋষা বলল, 'আমার আবৃত্তি ভালো লাগবার জন্য ধন্যবাদ।'

অর্চিন থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'সরি। তোমার বলা আমার ভালো লাগেনি ঋষা। এমন একটা জোরালো কবিতা, অমন মিনমিন করে বলা উচিত নয়। কবিতা ভালো লাগলেই হয় না, তাকে বিশ্বাস করতে হয়। নইলে ঠিকভাবে বলা যায় না।'

সুন্দরী ঋষার মুখ শুকিয়ে গেল।

'আপনি আবৃত্তি করেন?'

অর্চিন হেসে বলল, 'কখনওই নয়। আমি কবিতাও পড়ি না। তেমন পছন্দও করি না।' একটু থমকে হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, 'যাই ক্লাস আছে।'

ঋষা মুখ লাল করে বলেছিল, 'আপনি কবিতা পড়েন না, পছন্দ করেন না, তার পরেও আবৃত্তি নিয়ে বলছেন। আশ্চর্য! আপনার নামটা কি জানতে পারি।'

অর্চিন হেসে বলেছিল, 'অবশ্যই পারেন। অর্চিন। ইলেক্ট[?]নিক্স সেকেন্ড ইয়ার। চলি তাহলে?'

ঋষার রাগ অপমান প্রেমে বদলে যেতে বেশি দেরি হয়নি। তবে সে কিছুতেই রাজনীতিতে ঢোকেনি। লেখাপড়া ছাড়া লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে থেকেছে। অর্চিন প্রথম দিকে দু-একবার বলেছিল। প্রথম প্রথম 'আপনি', 'তুমি' সম্বোধনে পরিচিতি পর্ব চললেও, বয়েসের ছোট-বড়র বাধা বিভিন্ন। ছোট-বড়র বাধা ডিঙিয়ে দুজনেই খুব দ্রুত 'তুই'-এর সম্পর্কে সহজ হয়েছে।'

ঋষা চুল সরিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই ছেলে, তোর কী হয়েছে?'

অর্চিন স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, 'ঋষা, আমি চলে যাব।'

boierpathshala.blogspot.com

ঋষা সোজা হয়ে বসল, অর্চিনের গলার এই জোর সে চেনে।

'কোথায় যাবি?'

'আমি গ্রামে চলে যাব। গ্রামে গিয়ে রাজনীতি করব।'

ঋষা বলল, 'তুই কি পাগল? পড়া শেষ করলেই তো কত ভালো চাকরি তোর জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর তো মোটে একটা বছর। একটা বছর পরে এসব ভাবলে হত না?'

এসব কথা শুনলই না অর্চিন। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'শেখরদারা পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে। আমরা সবাই ভয় পেলে কী করে হবে ঋষা? হবে না। আমি গ্রামে যাব। সেখানে সংগঠন করব। রক্তিম, বন্দনারা তো গেছে। ওরা যদি পারে, আমি পারব না কেন? এখানে থাকলে আমি শেষ হয়ে যাব। বড় চাকরি, বড় উপার্জন আমাকে সিস্টেমের মধ্যে ঢুকিয়ে আমার যাবতীয় বিশ্বাস নীতি আদর্শকে ছিবড়ে করে দেবে। ছিবড়ে করতে না পারলে আমাকে ভয় দেখাবে, মিথ্যে অভিযোগে জেলে পুরে দেবে। এই সিস্টেম থেকে পালাতে হবে। এই বয়েসে যদি না পারি, এই সময়ে যদি না পারি, আর কবে পারব?'

ঋষা চুপ করে বসে রইল। সে বুঝতে পারছে, অর্চিনকে আটকানো যাবে না। সবাইকে আটকানো যায় না। লোভ, ভয়, ভালোবাসা কিছু দিয়েই আটকানো যায় না। আটকাতে নেই।

একসময় অর্চিন হাত বাড়িয়ে ঋষার গাল ছুঁল।

'আমি যাই ঋষা? তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো?'

ঋষা অর্চিনের মুখের ওপর মুখ নামাতে নামাতে বলল, 'যাও। আমি অপেক্ষা করব।'

পরম শান্তি আর ভালোবাসায় অর্চিনবাবু ঋষাকে বুকের ওপর টেনে নিল।

চুয়াল্লিশ

মণিকুন্তলা ঘরে ঢুকে স্বামীর দিকে ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। লম্বা কাগজ। বিমলকান্তি বললেন, 'কী এটা?'

মণিকুন্তলা বললেন, 'পড়ে দেখো।'

বিমলকান্তি কাগজের ভাঁজ খুললেন। চোখ ওপর থেকে নীচে নামালেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মণিকুন্তলা চুপ করে রইলেন।

কমলকান্তি সেনের মৃত্যুর ঘটনা বাড়ির সকলেই মোটামুটি সামলে নিয়েছে। মণিকুন্তলার সময় লাগছে। পুরোটা স্বাভাবিক হতে পারছেন না। ঘুরেফিরে মানুষটার কথা মনে পড়ে। কমলকান্তি সেন শুধু তাঁর শ্বশুরমশাই ছিলেন না, বন্ধু ছিলেন। তার থেকে বেশিও হতে পারে। মেয়েরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

বারিধারা বলে, 'মা, দাদু কিন্তু মুখ গোমড়া করে থাকা মোটে পছন্দ করত না। দাদু যদি বেঁচে থাকত, তোমাকে ধমক দিত।'

মণিকুন্তলা হেসে বললেন, 'আমি মুখ গোমড়া করে আছি কোথায়? এই তো হাসছি।'

মেঘবতী বলে, 'এটা তোমার আসল হাসি নয়, নকল হাসি।'

মণিকুন্তলা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আবার হাসেন। বলেন, 'দুর হাসি হাসি-ই। তার আবার আসল নকল কী? আমি কি অভিনয় করি যে, বানিয়ে হাসব?'

বারিধারা বলে, 'দাদুর চলে যাওয়া আমরা কেউ মেনে নিতে পারি না, কিন্তু এটা তো ইনএভিটেবল ছিল।'

মেঘবতী বলল, 'সত্যি কথা বলতে, মানুষটা সুস্থ শরীরে যেতে পারলেন, এটাও একটা ভালো কথা। কত মানুষ তো রোগে দীর্ঘ দিন কষ্ট পায়। সেটা আমাদের সকলের জন্য বেশি খারাপ হত।'

বারিধারা বলল, 'দাদু শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করেছে। একটু পরে রোদ উঠবে-র প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করেছে। এই বয়সে অমন একটা রিপোর্ট তৈরির কথা ভাবা যায়! সবদিক খেয়াল রেখেছে।'

boierpathshala.blogspot.com

মেঘবতী বলল, 'মা, এবার তুমি মন শক্ত করো।'

বারিধারা বলল, 'হ্যাঁ, এবার ঠিক না হলে মুশকিল। একটু পরে রোদ উঠবে-র কাজ শুরু করতে হবে না? তোমাকে মেজর দায়িত্ব নিতে হবে মা।'

মেঘবতী বলল, 'জ্যোতিষ্ক বলেছে চাকরি ছেড়ে দেবে। তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবে।'

বারিধারা বলল, 'একটু পরে রোদ উঠবে প্রোজেক্টের মধ্যে দিয়ে দাদু আবার বেঁচে উঠবে।'

মণিকুন্তলা সামান্য হাসলেন। মেয়েরা তাঁর মন ভালো করার চেষ্টা করছে। জোর করে হবে না। সময় লাগবে। ওরা জানে না, কমলকান্তি সেন কী ভয়ঙ্কর একটা সময় তাদের মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। জানলে বুঝত, এখনও কেন মানুষটাকে মন থেকে সরাতে পারছেন না। মেয়েরা এই জিনিস জানবেও না। মায়ের অতীত প্রেমের কথা মেয়েদের জানার দরকার নেই। জেনেছিলেন কমলকান্তি সেন। জানার পর অত বড় কোম্পানির মালিক, অমন দাপটের একজন মানুষ পরম মমতা নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মাথায় হাত রেখেছিলেন। এই সমর্থন না পেলে মণিকুন্তলাকে সেদিন হয় আত্মহত্যা করতে হত, নয়তো এই সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হত। আধুনিক চিন্তা, যুক্তি, মানুষকে বুঝতে পারার গভীর ক্ষমতা দিয়ে কমলকান্তি সেদিন পুত্রবধূকে ঘিরে রেখেছিলেন। তাকে বুঝিয়েছিলেন, যা ঘটেছে তাতে কোনও অপরাধ নেই। মণিকুন্তলার মনে হয়, আজ যারা আধুনিকতার বড়াই করে, তাদের সেই ঘটনা জানা উচিত। বোঝা উচিত, আধুনিকতা মানে জামাকাপড় খুলে ঘুরে বেড়ানো নয়, আধুনিকতা মানে মনের ভেতর থেকে সত্যকে উপলব্ধি করা।

তখন বিয়ের সবে এক বছর হয়েছে। একদিন দুপুরে খেতে বসে কমলকান্তি সেন বললেন, 'কী হয়েছে মা? এত চিন্তা কীসের?'

মণিকুন্তলা শুকনো মুখে বলেছিলেন, 'কিছু হয়নি।'

কমলকান্তি স্বাভাবিক গলায় বলেছিলেন, 'কিছু না হওয়া ভালো না। মাঝে মাঝে কিছু হলে তবেই বোঝা যায় বেঁচে আছি। সেটা ভালোও হবে। মন্দও হবে।'

মণিকুন্তলা চুপ করে রইলেন। তিন দিন স্বামী তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন না। না বলার কারণ আছে। শনিবার বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন মণিকুন্তলা। বাড়ির কাউকে বলেননি। তিনি গিয়েছিলেন কৌরবকে দেখতে। কৌরব অসুস্থ হয়ে সেখানে ভর্তি আছে। তার কঠিন ধরনের জন্ডিস হয়েছে। কৌরব এক বান্ধবীকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল।

'বাঁচব কি না ঠিক নেই, মণি যদি একবার আসে।'

যাব না, যাব না, এখন আর যেতে নেই। বারবার ভেবেছিলেন মণিকুন্তলা। তার পরও শনিবার বিকেল চারটের সময় তৈরি হয়ে নিলেন। নি:শব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন একরকম চুপিচুপিই। অতটা চুপিচুপির দরকার ছিল না। কাজের লোকজন, দারোয়ান ছাড়া এই সময় সেনবাড়িতে কেউ থাকে না। মণিকুন্তলা ট্যাক্সিতে উঠে বুঝতে পারেন, কাজটা ঠিক হল না। এখন তিনি বিবাহিত। সেনবাড়ির বউ। কৌরব এখন আর তাঁর কেউ নয়। এক সময় ভালোবেসেছিলেন এটা সত্য, তার বেশি নয়। ট্যাক্সি কি ঘুরিয়ে নেবেন? তাই উচিত।

এই পর্যন্ত ভেবেও ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিতে পারেননি মণিকুন্তলা। শান্ত, নিস্তরঙ্গ, শুকিয়ে আসা ছোট নদীতে চোরা টান তৈরি হয়। সেই টান ওপর থেকে বোঝা যায় না। নদীও পারে না। সর্বনাশের টান। যা অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী। মানুষ বা প্রকৃতিকে এই আকর্ষণ অস্বীকার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এর কাছে আত্মসমর্পণই একমাত্র উপায়।

কৌরবের বেডের সামনে গিয়ে মণিকুন্তলা বুঝতে পেরেছিলেন, ভালোবাসা কখনও পুরোনো হয় না। সে ভুলে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে। সে হারিয়ে যায়, কিন্তু টিকে থাকে। বেডের সঙ্গে মিশে যাওয়া কৌরবের একটা হাত চেপে ধরেছিলেন মণিকুন্তলা। তাঁর চোখে জল এসেছিল। সেই জলের খেয়াল ছিল না, মণিকুন্তলা এখন

boierpathshala.blogspot.com

আর কলেজে পড়া, বিনুনি ঝোলানো মেয়ে নন। তিনি কলকাতা শহরের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের বউও। সেদিন নিজেকে সামলে নিতে সময় লেগেছিল মণিকুন্তলার। তিনি জানতে পারেননি, একটু দূরেই তাঁর স্বামী বিমলকান্তি বিস্মিত হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনিও নার্সিংহোমে এসেছিলেন এক পরিচিত রোগীকে দেখতে। এসেছিলেন অফিসের ফাঁকে। নববিবাহিত স্ত্রীকে এভাবে একজন অপরিচিত যুবকের হাত ধরে কাঁদতে দেখে তিনি এতটাই হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন যে, ডাকার কথাও মনে পড়েনি। সম্ভবত তাঁর ভেতর থেকে কেউ বারণ করে—ডেকো না, এই সময় ডাকতে নেই।

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে মণিকুন্তলার সংবিৎ ফিরে আসে। তিনি যেমন নিজেকে স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করেন, তেমন ভয় পান। কেউ দেখে ফেলল না তো? দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে থাকেন। জানতেও পারেন না, রাস্তার ওপরই সেনবাড়ির গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে বিমলকান্তি বলেছিলেন, 'লোকটা কে?'

মণিকুন্তলা চমকে উঠে বলেছিলেন, 'কোন লোক?'

'সাউথ পার্ক নার্সিংহোমে আজ যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে, সেই লোকটা কে?'

মণিকুন্তলা চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'তুমি কী করে জানলে?'

বিমলকান্তি আরও গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'আমিও তখন ওখানে ছিলাম। তোমার থেকে খানকতক বেড দূরেই ছিলাম।'

মণিকুন্তলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি ঢোঁক গিলে বললেন, 'কই দেখতে পাইনি তো!'

বিমলকান্তি ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'দেখবে কী করে? যেভাবে পেশেন্টের হাত ধরে ছিলে এবং কাঁদছিলে, তাতে স্বামীকে দেখতে পাওয়া যায় না।'

'ডাকলে না কেন?'

'ডাকব কী করে? প্রায় ছুটেই তো বেরিয়ে গেলে। আমি পিছু পিছু গিয়ে দেখলাম, রাস্তা পার হয়ে লাফ দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লে। যেন বিরাট অন্যায় কিছু করেছ।'

মণিকুন্তলা এবার কঠিন গলায় বললেন, 'অন্যায়! অন্যায় করব কেন! তুমি কী বলতে চাইছ?'

বিমলকান্তি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কিছুই না। শুধু জানতে চাইছি, লোকটা কে? বলতে ইচ্ছে না করলে বোলো না।'

মণিকুন্তলা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার পরিচিত। বিয়ের আগে থেকে পরিচয়। অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম।'

বিমলকান্তি হাতের চায়ের কাপ নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন, 'এতে লুকোচুরির কী আছে? বাড়ির গাড়ি নিয়ে গেলেই পারতে। বিয়ের আগে যার সঙ্গে পরিচয়, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে স্বামীর গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না, এমন কোনও নিয়ম নেই। মণিকুন্তলা, তুমি বোধহয় এতদিনে জেনে গেছ, আমি সব কাজেই সিরিয়াসনেস পছন্দ করি। সেটা অন্যায়, অনুচিত হলেও।'

ব্যস, এইটুকু বলেই বিমলকান্তি চুপ করে যান। কমলকান্তি সেন পুত্রবধূর মুখ দেখে আঁচ করেছিলেন।

'বুঝলে মণিকুন্তলা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ভালো লক্ষণ। এতে সংসারের জোর বাড়ে। ভয়টা কী জানো মা, আমার গাধা ছেলেটা আবার সবকিছু অতিরিক্তি সিরিয়াসভাবে নেয়। এতেই সমস্যা।'

মণিকুন্তলা একটু চুপ করে রইলেন। তিন দিন ধরে অসম্ভব মন:কষ্টে ভুগছেন। পাপবোধ মনের ভেতর বড় হচ্ছে। দৈত্যের আকার নিচ্ছে। মনে হচ্ছে, বিরাট একটা অন্যায় হয়ে গেছে। বিমলকান্তি নিশ্চয় এতক্ষণে সব জেনে গেছেন। জেনে গেছেন, তাঁর স্ত্রী প্রেমিকের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে গিয়েছিল। ছি ছি। এর পরিণতি কী? সেনবাড়ি ছাড়তে হবে? তা হলে তো গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না। এই কথা শ্বশুরমশাইকে কি বলা যায়? যায় না। কিছুতেই যায় না। তার পরেও মনে হচ্ছে, এই মানুষটাই তাঁর শেষ সম্বল।

boierpathshala.blogspot.com

মণিকুন্তলা মাথা নামিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, একটা অন্যায় করে ফেলেছি। খুব বড় অন্যায়।'

কমলকান্তি মুখ তুলে পুত্রবধূর দিকে তাকালেন। মেয়েটার চোখ ছলছল করছে।

'খাওয়া শেষ করি। তার পর তোমার অন্যায় শুনব মা। তরকারিটা আজ বড্ড চমৎকার হয়েছে। ভাগ্যিস বয়স হয়েছে, আর সেই ছুতোয় অফিস থেকে লাঞ্চ করতে বাড়ি আসতে পারি। বয়স কম ছিল যখন, তখন তো পারতাম না। হাবিজাবি খেতে হত। বিমলের এখন যা অবস্থা। বেটা ক্যান্টিনের ছাইভস্ম খায়, আর বাবাকে হিংসে করে।'

কথাটা বলে গলা তুলে হেসে উঠলেন কমলকান্তি। মণিকুন্তলা বুঝতে পারলেন, এই চমৎকার মানুষটা ইচ্ছে করে খাওয়ার প্রসঙ্গ আনছেন। ভাবটা এমন, যেন পুত্রবধূর অন্যায়ের থেকে তরকারি তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে মানুষটা খাওয়া নিয়ে ভাবনাচিন্তাই করেন না, যা দেওয়া হয় তা-ই চুপ করে খেয়ে নেন, তিনি তরকারি নিয়ে এত ভাববেন কেন?

চোখ বুজে ঘটনা শুনলেন কমলকান্তি।

'মণিকুন্তলা, তোমাকে ক'টা কথা জিগ্যেস করব। তুমি কি মা সঠিক উত্তর দেবে?'

মণিকুন্তলা মাথা নামিয়ে বললেন, 'দেব।'

'তুমি কি আমাকে বন্ধু বলে মনে করো?'

মণিকুন্তলা কান্না চেপে বললেন, 'করি বাবা, করি বলেই তো আপনাকে ঘটনাটা বলতে পারলাম। এটা কি শ্বশুরমশাইকে বলার মতো?'

কমলকান্তি বললেন, 'তোমাকে কি বিমলের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

মণিকুন্তলা মুখ তুলে বললেন, 'না! ওই ছেলেটি বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না। তা ছাড়া ওর সংসার করার মতো অর্থিক সামর্থ্য নেই। তার পরেও আমি বলেছিলাম। ও রাজি হয়নি। আমি সম্পর্ক ত্যাগ করি।'

কমলকান্তি বললেন, 'তুমি কি ওই ছেলেটিকে এখনও ভালোবাসো?'

মণিকুন্তলা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, বাসি। তবে তার প্রাপ্য যেটুকু সেটুকুই বাসি। কোনও যোগাযোগ রাখি না। অসুখের খবর শুনে তাকে দেখতে চলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। আমি স্বীকার করছি, আমার অন্যায় হয়েছে। আমি কি আপনার ছেলেকে এ কথা বলব?'

কমলকান্তি এবার সোজা হয়ে বসলেন। গলায় জোর এনে বললেন, 'আলবাত ঠিক হয়েছে। বেশ করেছ তাকে দেখতে গেছ। কীসের অন্যায়? অন্যায় কে ঠিক করবে? ভালোবাসা কি অন্যায়?'

মণিকুন্তলা চমকে উঠেছিলেন। মানুষটা এসব কী কথা বলছেন!

'বাবা, এ আপনি কী বলছেন?'

কমলকান্তি বললেন, 'ঠিক বলছি। তোমার বিয়ে হয়েছে বলে, তোমার যাবতীয় সুখ-দু:খ-ভালোবাসা-কষ্ট রাস্তায় ফেলে দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকতে হবে নাকি? তুমি ওই ছেলেটাকে ভালোবাসো, এর মধ্যে কোনও অপরাধ নেই। পরিস্থিতি বদলেছে। তুমি আর আগের মণিকুন্তলা নেই। তুমি এখন এ বাড়ির বউ, গৃহকর্ত্রী। আগে যে আচরণ তুমি করতে পারতে, এখন তা পারো না। অনেক লিমিটেশন আছে। তার মানে এই নয়, তুমি কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। বাইরের মানুষকে তো তুমি তোমার ঘরে এনে তুলছ না। তার ঘরেও তুমি যাচ্ছ না। তাকে তার মতো করে ভালোবাসছ। বেশ করেছ। আমার তো তোমাকে হিংসে হচ্ছে মা। ইস, আমার কোনও ভালোবাসার মানুষ নেই কেন?'

মণিকুন্তলা আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, 'আপনি ঠিক বলছেন বাবা? আমি কৌরবকে নার্সিংহোমে দেখতে গিয়ে কোনও ভুল করিনি?'

'ভুল! কে বলে ভুল করেছ? আমার গাধা পুত্র বলে না, সব কাজ সিরিয়াসভাবে করতে হবে? বলে না সে? তুমি তো সিরিয়াস মনোভাবই দেখালে। বন্ধুর অসুস্থতার খবরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছ।'

boierpathshala.blogspot.com

মণিকুন্তলা বললেন, 'অত কিছু নয় বাবা, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে গিয়েছিলাম। আমার বাড়িতে যদি জানে...আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি।'

কমলকান্তি বললেন, 'সামলাবে কেন? কার ভয়ে?'

'না আমার ওভাবে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।'

কমলকান্তি প্রায় গর্জে উঠলেন। বললেন, 'আবার যাবে। শুধু যাবে-ই না, কাউকে কৈফিয়তও দেবে না। বিমল কার কাছে কখন যায়, তার ফিরিস্তি তোমাকে দেয়? তুমি কেন দেবে?'

মণিকুন্তলা মাথা নামিয়ে বললেন, 'উনি তো গোপনে যান না।'

কমলকান্তি বিরক্তভাবে বললেন, 'গোপনে গেলে খারাপ মানুষের কাছে যাওয়া হয়, এই যুক্তি তুমি কোথা থেকে শিখলে? যাই হোক, আমি তোমার পাশে আছি মা। আমি তোমাকে সমর্থন করি। তোমাকে এ বাড়িতে এনেছি মানে তোমার মনটাকে কিনে ফেলেছি, এমন নয়। কেনা যায়ও না। মন বড় রহস্যময়। সেই কারণে সুন্দর। সে শুধু একজনকে ভালোবাসবে, একজনকে ঘৃণা করবে—এমন কোনও নিয়ম নেই। তার নিজের জগৎ থাকে। সেখানে হাসি থাকে, কান্না থাকে। সবই তার নিজের। তুমি নিজেও তার খবর রাখো না। বিমলের প্রতি তোমার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যদি যথার্থ হয়, তা হলে তা এমনিই হবে। তাকে যেমন জোর করে আনা যায় না, আবার জোর করে আটকানোও যায় না। আমি বিমলের সঙ্গে কথা বলব। সে তোমার সঙ্গে যে আচরণ করছে, সেটাই অন্যায়। লজ্জারও। শিক্ষা মানুষের বোধবুদ্ধি তৈরি করে। যে বোধবুদ্ধি পাশের জনকে বুঝতে শেখায়। গাধাটার উচিত তোমাকে বোঝা। তোমার ভালোবাসাকে সম্মান না করলে সে নিজে ভালোবাসা পাবে কী করে?'

মণিকুন্তলা সেদিন উঠে গিয়ে কমলকান্তির পায়ে হাত দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন।

কৌরবের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। বিমলকান্তিকে তাঁর বাবা ডেকে কী বলেছিলেন, তা-ও মণিকুন্তলা জানেন না, তবে সেদিন রাতেই বিমলকান্তি তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। যে ঘটনা ভয়ঙ্কর পরিণতিতে শেষ হতে পারত, তা খুব মসৃণভাবে হারিয়ে গেল। বিমলকান্তি কোনওদিনও এ প্রসঙ্গ তোলেননি। সম্ভবত তিনি তাঁর বাবার কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

এই ঘটনা বারিধারা, মেঘবতীরা জানবে কী করে?

পঁয়তাল্লিশ

পূজনীয়া মণিকুন্তলা মাসি,

আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

উচিত ছিল দেখা করে নিজের মুখে তোমাদের কথাটা বলে যাওয়া। আমি পারলাম না। তার কারণ তোমরা বারণ করলে আমি দ্বিধার মধ্যে পড়তাম। পৃথিবীর সবাইকে অস্বীকার করবার মতো মনের জোর আমার হয়েছে, কিন্তু এ বাড়িকে অস্বীকার করবার মতো ক্ষমতা আমি এখনও অর্জন করতে পেরেছি কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। সম্ভবত পারিনি। তাই কাউকে না জানিয়েই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাকে ক্ষমা কোরো মাসি। মাসি আমি জানি, তোমরা বারণ করতে। তুমি, মেসোমশাই, বৃষ্টি, মেঘদি সবাই মিলে আমাকে বোঝাতে। বলতে, আমি যেন লেখাপড়া শেষ না করে এই ধরনের হঠকারী কাজ না করি। বাইরে যে ক'জন আমার চলে যাওয়ার কথা জানে তারাও বারণ করেছে। এমনকী আমার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরুও। তাঁরা ঠিক কাজই করেছেন। তোমরাও করতে। তোমরা বেশি জোর করতে। সে অধিকার তোমাদের আছে।

মাসি, তুমি তো জানো আমি ছোটবেলা থেকেই অন্যরকম। শুধু নিজের মতো থাকতে পারি না। বিচার বুদ্ধি, ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দ বোধ তৈরি হওয়ার পর থেকে চারপাশের মানুষ, সমাজ, দেশ, সময় আমাকে ভাবায়। আমি মন দিয়ে যেমন

boierpathshala.blogspot.com

লেখাপড়া করেছি, মন দিয়ে দেশের মানুষের দু:খ, কষ্ট, শোষণ, বঞ্চনা বোঝবার চেষ্টা করেছি। বারবারই মনে হয়েছে, আমিও তো একজন হতদরিদ্র মানুষ হতে পারতাম। হয়তো আমার বাবা একজন সামান্য ভাগচাষী বা মজুর হতে পারত। অথবা আমি এমন একজন শ্রমিকের ঘরের সন্তান হতে পারতাম যার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। দিনের পর দিন যাদের না খেয়ে, আধখানা খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। পথ চলতে গিয়ে নিজেকে কতদিন ফুটপাথের ছিন্নমূল পরিবারের ছেঁড়া কাঁথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছি তার ঠিক নেই।

মাসি, আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি না। আমি কোন ঘরে জন্মাব, কোন ঘরে মানুষ, আমার বুদ্ধিকে লেখাপড়া করে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারব কিনা সবটাই একটা চান্স। আমি যদি তোমাদের মতো মানুষ না পেতাম, আমার কী হত বলো তো? আমি বিশ্বাস করি, আমরা যারা দুবেলা পেট ভরে খেয়ে, মাথার ওপর নিশ্চিন্ত ছাদ পেয়ে, লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়েছি, তাদের অনেক দায়িত্ব, অনেক। যারা কিছু পায়নি, তাদের কথা আমাদেরই তো ভাবতে হবে। তাই না?

নিজেকে অনেকবার জিগ্যেস করেছিলাম, লেখাপড়া শেষ করলে সমস্যাটা কোথায়? লেখাপড়ার সঙ্গে মানুষের জন্য কাজ করায় তো কোনও বিবাদ নেই। না নেই। বরং তাই ভালো। যত শেখা যাবে, শিক্ষাকে তত কাজে লাগানো যাবে। তারপরেও অনেক ভেবেছি। ভেবে আমার ভয় করেছে। মাসি, আমি যদি আমার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার লেখাপড়া শেষ করি, এরপরই আমাকে কেরিয়ারের ফাঁদে পড়তে হবে। হবেই। এরকম হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আছে, যারা ছাত্রজীবনে রাজনীতি করে কেরিয়ারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। একসময় যারা গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেয়, মাইলের পর মাইল মিছিল করে, একটা সময় রাজনীতি তাদের কাছে মুখরোচক আলোচনা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তোমারা যাকে 'ব্রিলিয়ান্ট' বলো, তারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাশনের পলিটিক্স সেরে নিজেরটা গোছানোর জন্য হাঁকপাক করতে থাকে। একসময় আমাদের দেশে উগ্র বামপ্রন্থী দলের সঙ্গে কত ভালো ছেলেমেয়েই না জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই আজ পুঁজির কাছে আপস করেছে। শুধু আপস করেনি, ধনীকে কীভাবে আরও ধনী করা যায় তার জন্য নিজেদের মেধা বুদ্ধি খরচ করছে। সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও বলে যারা কলেজ স্ট্রিট তোলপাড় করেছিল, তাদের অনেকেই এখন যোগ্যতার সঙ্গে আমেরিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। সেখানকার নাগরিক হয়ে গেছে। বাংলার গ্রামের ভাঙা প্রাথমিক স্কুলের আধপেটা খাওয়া ছেলেমেয়ের কথা আর তাদের মনে পড়ে না। পড়লে প্রবন্ধ লিখে কুমিরের কান্না কাঁদে।

মাসি, আমি যে রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, তা উগ্র নয়। তা মানুষকে নিজের অধিকার, নিজের প্রাপ্য সম্পর্কে সচেতন করে। দেশের সংবিধান মেনে, নিয়মকানুন মেনে, নিজের প্রাপ্য কীভাবে বুঝতে হয় এবং আদায় করে নিতে হয় সেই শিক্ষা দেয়। আমি যতটা লেখাপড়া শিখেছি, তাতে এই কাজ আমি পারব। আমার কয়েকজন বন্ধু গ্রামে চলে গিয়ে কাজ করছে। আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেব। আমাদের পার্টি এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে তাতে গ্রামের মানুষকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার কাজটা সবথেকে জরুরি। শহরের মসৃণ রাজনীতি আমার আর ভালো লাগছে না।

মাসি, ভয় করে। আমি যদি লেখাপড়ার শেষ ডিগ্রি নিই, তাহলে আমিও হয়তো একজন শখের রাজনীতি করা ছাত্র হয়ে যাব। ভালো রেজাল্ট করার ফলে, আমার কাছে হাতছানি আরও লোভনীয়ভাবে আসবে। তার থেকে এই ভালো। পড়াশোনা ভালো হল, কিন্তু ডিগ্রিটা হল না। আমি যা চেয়েছি আমাকে তোমরা তাই করতে দাও।

অনেক কথা লিখে ফেললাম। হয়তো নিজেকে কৈফিয়ত দিলাম। রাগ কোরো না। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে আসব। তবে পরিস্থিতি যা তাতে নানারকম অজুহাতে পুলিশ আমাকে হেনস্থা করবে। এটা পার্ট অফ মাই পলিটিক্স। সবসময়ে সোনার চামচ নিয়ে রাজনীতি করা যায় না। এসব তো খুব সামান্য। ব্রিটিশদের দেশছাড়া করতে গিয়ে আমার থেকেও ছোট ছেলেমেয়েরা সব ছেড়েছুড়ে জেলে জীবন কাটিয়েছে। একজন-দুজন নয়, হাজার হাজার। একজনকে দেখে, আর-একজন উৎসাহিত হয়েছে। আমি তো অতি সামান্য, যাই হোক, আমি চাই না পুলিশি হুজ্জুতির মধ্যে সেনবাড়ি থাকুক।

তোমরা ভালো থেকো। কমলকান্তিদাদুর 'রোদ উঠবে' প্রজেক্ট সফল হোক এই কামনা করি। আমি যদি সরাসরি রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে না থাকতাম, তাহলে অবশ্যই এখানে কাজ করতাম। জানি না, ভবিষ্যতে কী হবে। যদি সেরকম

boierpathshala.blogspot.com

হয়, হয়তো কয়েক বছর পরে ঝাড়গ্রামে গিয়ে আমি হাজির হয়ে যাব।

তুমি প্রণাম জেনো। বড়দের প্রণাম দিও। মেসোকে বোলো তার স্নেহ আমি কোনওদিন ভুলব না। বারিধারা আর মেঘবতীর মতো বোন পাওয়া খুব ভাগ্যের ব্যাপার। ওদের বোলো আমাকে যেন ভুল না বোঝে। আমি কোন গ্রামে কাজ করব জানিয়ে দেব। যদি কোনওদিন চায় ওরা বেড়াতে আসতে পারে। যে ভালোবাসা তোমরা আমাকে দিয়েছ তা আমার মতো অভাগাজনের পাওয়ার কথা নয়। আমার যে আশ্রয়ের খুব কিছু প্রয়োজন ছিল এমন নয়। আমি আমার কলেজের হস্টেলেই জায়গা পেতে পারতাম। নিজের খরচ চালিয়ে নেওয়ার মতো স্কলারশিপ এবং টিউশন দুটোই আমার ছিল। তার পরেও সেনবাড়ি আমাকে পরম যত্নে তার বাড়ির একজন করে রাখতে চেয়েছিল তাকে আমি এড়াতে পারিনি। অথচ আমার যা স্বভাব তাতে আমার একা থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। হয়তো শুধু ভালোবাসা নয়, আমি নিজেও একটা পরিবারের মধ্যে থাকতে চেয়েছিলাম। যারা অনাথ হয় তারা পরিবারে স্নেহ-ভালোবাসার জন্য মুখিয়ে থাকে।

ইতি
অর্চিন

পু: মাসি, এতদিন জানাইনি, আজ জানাচ্ছি। আমি আমার পরিচয় জেনে ফেলেছি। কীভাবে জেনে ফেলেছি সে প্রসঙ্গ অবান্তর। যতই হোক, আমি তো একজন বুদ্ধিমান ছেলে। তাই না? আর একটা কথা। একজন মহিলা মাঝে মাঝে এই বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করেন। একদিন আমি তার পিছু নিই। উনি কায়ত পালিয়ে যান। ভিড়ে মিশে যান। আরেক দিনও চেষ্টা করেছিলাম। সেদিন ভদ্রমহিলা একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়েন। আর পিছু নিইনি। যিনি নিজে আড়ালে থাকতে চান, তাকে আড়ালে থাকতে দেওয়াটাই সম্মানের। নিজের মা হলেও। তাই না?

চিঠি পড়া শেষ করে বিমলকান্তি মুখ তুললেন।

'ভুল করল। খুব ভুল করল। এমন ভালো একটা ছেলে...ছি ছি।'

মণিকুন্তলা হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন। বললেন, 'কী আর করা যাবে।'

বিমলকান্তি বিরক্ত মুখে বললেন, 'কী আর করা যাবে মানে! তোমার আটকানো উচিত ছিল। একটি ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এলেই হয় না, তাকে দু'বেলা খাওয়া-পরা দিলেই হয় না, সে যাতে বিপথে না যায় সেটাও দেখতে হয়।'

মণিকুন্তলা অবাক হয়ে বললেন, 'আমি কি জানতাম ও এরকম একটা হঠকারী কাজ করবে?'

'জানতে না কেন? ছেলেটা তো আমাদের বাড়িরই একজন ছিল, তার খোঁজখবর রাখবে না, সে কী করে? কোথায় যায়? কখন বাড়ি ফেরে?'

মণিকুন্তলা বললেন, 'একজন লেখাপড়ায় খুব ভালো, শান্ত প্রকৃতির, ভদ্র ছেলের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে হয় জানতাম না। তাছাড়া জেনেই বা কী করতাম। ও যে পলিটিক্স করে সেখান থেকে আমি ওকে ফেরাতে পারতাম? পলিটিক্সের আমি কী বুঝি? আমার কথা অর্চিন শুনতই বা কেন?'

বিমলকান্তি মুখে চুকচুক আওয়াজ করে নিজের মনে মাথা নাড়তে লাগলেন। অর্চিনের এভাবে চলে যাওয়াটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর খারাপ লাগছে। তিনি মুখে স্ত্রীকে বকাঝকা করলেও, মনে মনে নিজেকে দায়ী করলেন। বাড়িতে পুলিশ এসে অতবড় একটা অভিযোগ করবার পরই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। বোঝা উচিত ছিল তলে তলে কোনও একটা গোলমাল চলছে। ছেলেটাকে ডেকে বোঝানো উচিত ছিল। বাবার মৃত্যু, কোম্পানির ঝামেলায় এসব কথা মাথায় এল না। কোম্পানিতে একটা ঝামেলা হয়েছে। বিচ্ছিরি ঝামেলা। ভাগ্যিস কমলকান্তি সেন বেঁচে নেই! শুনলে আঘাত পেতেন।

boierpathshala.blogspot.com

বিমলকান্তি নীচু গলায় বললেন, 'আমাদের দেশে পলিটিক্স সবথেকে ক্ষতি করেছে। কীভাবে ভালো ছেলেগুলোকে মাথা খেয়ে নষ্ট করছে। ছিছি। লেখাপড়ার একেবারে শেষ স্টেজে এসে এই পাগলামি! নেতাগুলো এর জন্য দায়ী। দেখবে পেছনে কেউ আছে, কেউ উসকেছে।'

মণিকুন্তলা চাপা গলায় বললেন, 'চিঠির শেষটা পড়েছ?'

বিমলকান্তি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'অতটা খেয়াল করিনি। অর্চিন কোনও একজন মহিলার কথা লিখেছে। কে বলো তো?'

মণিকুন্তলা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'অর্চিন যা বলেছে তা যদি ঠিক হয় তাহলে সমস্যা। অর্চিনের মা ঝামেলা পাকাবে। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে।'

বিমলকান্তির মনে পড়ল, ক'দিন আগে সকালে এক মহিলা দেখা করতে এসেছিল। সেই মহিলা নয় তো? অর্চিনের মা?

'ওসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। ওই ধরনের চিটিংবাজ বদ মহিলাকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমার জানা আছে। তার ছেলে তাকে নিয়ে ইমোশনাল হতে পারে, আমি হব না। নেহাত মহিলাকে আমি চিনি না, দেখিনি কোনওদিন। মুখোমুখি দেখা হলে তাকে আমি জেলে দেব। এবার একবার বাড়িতে এসে দেখুক না। এখান থেকে থানায় ফোন করব। যাক, ওসব বাজে কথা থাকুক। দেখো, ছেলেটাকে ট্রেস করতে পারো কিনা। ধরে আনতে হবে। পড়াশোনা শেষ করে যেখানে খুশি যাক, যত খুশি দেশোদ্ধার করুক। আমাদের দায়িত্ব পালন করব।'

মণিকুন্তলা অসহায় গলায় বললেন, 'কোথায় খুঁজব?'

বিমলকান্তি বললেন, 'আহা, ওর কোনও বন্ধু টন্ধুকে চেনো না? বৃষ্টি কিছু বলতে পারবে না?'

মণিকুন্তলা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'আচ্ছা দেখছি।'

বিকেলেই বারিধারা ঋষার সঙ্গে দেখা করল। পরিচয় খুব গভীর নয়। এক-দু'বারই দেখা হয়েছে। বন্ধুদের সূত্রেই তার কাছে খবর আছে অর্চিন এই মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করে। বাড়িতে দিদি আর মাকেও বলেছিল।

'জানো মা, অর্চিদার একজন গার্লফ্রেন্ড আছে।'

মণিকুন্তলা চোখ বড় বড় করে বলেছিলেন, 'ওমা! তাই নাকি! ওই ছেলেকে তো দেখলে মনে হয় না, প্রেম টেম করতে পারে। অমন ভালো ছেলে।'

মেঘবতী সেই আড্ডায় ছিল। বলেছিল, 'ভালো ছেলেরা প্রেম করে না এমন কথা তোমায় কে বলল মা?'

মণিকুন্তলা থতমত খেয়ে বলেছিলেন, 'না, তা নয়। অনেক সময় হয় না?'

বারিধারা হেসে বলল, 'কী হয়? ভালো ছেলেরা প্রেম দেখলে পালায়?'

দুই বোন হেসে উঠল। মেঘবতী বলল, 'বাদ দে তো বৃষ্টি। মেয়েটা কে? কেমন দেখতে? কী করে?'

বারিধারা দিদির উৎসাহে মজা পেল। পৃথিবীর যে-কোনও মেয়েই অন্যের প্রেমের ব্যাপারে কৌতূহলী। চরম শত্রু হলেও ছাড়বে না। কানে একবার কথাটা এলেই হল। সব জানা চাই।

বারিধারা বলল, 'যতদূর খবর পেয়েছি, মেয়েটির নাম ঋষা। আমার থেকে খারাপ কিন্তু তোর থেকে ভালো দেখতে দিদি। আর করার মধ্যে মেইন কাজ হল কবিতা লেখা।'

ঋষার সঙ্গে তারপর দু-একবার যোগাযোগ হয়েছে। একবার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ফেস্টে এসেছিল। একবার নন্দনে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। অর্চিনের মাসতুতো বোন জেনে ফোন নম্বরও দিয়েছিল ঋষা।

'তোমার আর মেঘদির কথা খুব শুনেছি।'

বারিধারা হেসে বলেছিল, 'আমরা কিন্তু তোমার কথা কিছুই শুনিনি। অর্চিনদা কথাই বলে না। মনে হয় আমাদের মোটে পছন্দ করে না।'

ঋষা হাত ধরে বলেছিল, 'মোটেও না। তোমাদের খুব পছন্দ।'

বারিধারা বলেছিল, 'ঠিক আছে, একদিন বাড়িতে এসো।'

boierpathshala.blogspot.com

তারপর আর যোগাযোগ হয়নি। মায়ের কাছ থেকে সব শুনে রাতেই ফোন করল ঋষাকে।

ছেচল্লিশ

ঋষা বলল, 'কী খাবে?'

বারিধারা বলল, 'কিছু খাব না, শুধু কফি।'

ঋষা বলল, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, খিদে পেয়েছে।'

বারিধারা সামান্য হেসে বলল, 'সত্যি খিদে পেয়েছে।'

ঋষা টেবিল থেকে উঠে কাউন্টারের কাছে গেল। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে কফি আর স্যান্ডুইচ বলল। ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে বসতে চেয়েছিল বারিধারা। ঋষাই রাজি হয়নি।

'বড্ড ভিড়। চলো পাশেই কফিশপ। ওখানে গিয়ে বসি। নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।'

একসময় কলকাতায় কফির দোকান বলতে কফিহাউসই বোঝাত। একটা কফি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানোর জায়গা। কবিতা, গল্প, লিটল ম্যাগাজিন, ডকুমেন্টারি, বিপ্লব কী নেই সেখানে! সেইসঙ্গে পকৌড়া, টোস্ট, কবিরাজি। কিছু না নিলেও চলে। এমনি বসে থাকা যায়। সর্বক্ষণ একট গমগম আওয়াজ। সিগারেটের ধোঁয়া। একটা বয়স পর্যন্ত ঘোরের মতো লাগে। এখন গোটা শহরে নামিদামি কফিশপ ছড়িয়ে পড়েছে। এয়ার কন্ডিশন ঘরে, নরম সোফায় বসে কফি খাওয়া যায়। এসব জায়গায় অনেক ধরনের বিজনেস মিটিংও হয়। শহরের চেহারাটা বাইরে থেকে নানাভাবে পালটে যাচ্ছে।

বারিধারা ও ঋষা মুখোমুখি বসেছে। কফিশপটা প্রায় ফাঁকা। এক কোণে সোফায় দুজন ছেলেমেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। নীচু গলায় গল্প করছে। তাদের প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। বারিধারা, ঋষা বসেছে মাঝখানের একটা টেবিলে। দুই সুন্দরীর জন্য কফিশপটা যেন ঝলমল করছে।

ঋষা বলল, 'তোমার দাদুর মৃত্যুর খবর শুনে খুব খারাপ লেগেছিল।'

বারিধারা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'উনি বিরাট পণ্ডিত বা দার্শনিক ছিলেন না। তেল, সাবান, শ্যাম্পুর ব্যবসা করলে তো এসব হওয়া যায় না। তারপরেও দাদু ছিলেন একজন গ্রেট মানুষ। ওনার যাবতীয় পাঠ জীবন থেকে। জীবন তাঁকে শুধু বাঁচাতে শেখায়নি, ভালোভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে। অন্যকেও তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন।'

ঋষা বলল, 'খাঁটি মানুষরা এমনই হয়। তোমরা খুব লাকি বারিধারা এমন একজন মানুষকে পরিবারে পেয়েছিলে।'

বারিধারা বলল, 'এখনও উনি আমাদের সঙ্গেই আছেন।'

ঋষা বলল, 'অবশ্যই। এই সব মানুষদের মৃত্যু হয় না।'

কফি এসে গেলে দুজনে চিনি মিশিয়ে মগ হাতে তুলে নিল। বারিধারা মগে চুমুক দিয়ে বলল, 'ঋষা, অর্চিনদার ব্যাপারটা কী? সত্যি সে গ্রামে চলে গেছে?'

ঋষা বলল, 'আমি যতদূর জানি গেছে। আজ সকালেই রওনা হয়ে গেছে। নোনাজল।'

'নোনাজল! সেটা কোথায়?'

ঋষা বলল, 'সুন্দরবনে। সজনেখালি থেকে আরও ঘণ্টাখানেক যেতে হয়।'

বারিধারা চুপ করে খানিকক্ষণ কফি খেল। ন্যাপকিন তুলে মুখ মুছে বলল, 'অর্চিনদা আর লেখাপড়া করবে না?'

ঋষা বলল, 'আমাকে তো সেরকমই বলেছে।'

'মা-বাবা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে।'

ঋষা বলল, 'স্বাভাবিক। ওনারা অর্চিনের জন্য যা করেছেন, তাতে...'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা বলল, 'একটা কথা বলব ঋষা?'

ঋষা হেসে বলল, 'এ আবার কেমন কথা? বলবে না কেন?'

বারিধারা তারপরেও একটু চুপ করে রইল। চামচ নিয়ে কফি মগে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'তুমি অর্চিনদাকে আটকালে না কেন?'

ঋষা হাসল। বলল, 'আমার সে জোর কই?'

বারিধারা নরম গলায় বলল, 'এটা কি ঠিক কথা হল?'

'হ্যাঁ, ঠিক কথাই হল। বারিধারা, তুমি তো জানো কিছু সম্পর্কে জোর থাকে না। ভালোবাসলেই জোর খাটানো যায় না।'

বারিধারা বলল, 'অর্চিনদা তো জোরই খাটাল। কারও বারণ না শুনে চলে গেল।'

ঋষা অস্ফুটে বলল, 'আমি বারণ করিনি, আবার হ্যাঁ-ও বলিনি।'

বারিধারা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন করোনি? লেখাপড়ায় ইতি টেনে অর্চিনদার মতো একজন ব্রিলিয়ান্ট ছেলের চলে যাওয়াকে তুমি আটকাবে না!'

ঋষা শান্তভাবে বলল, 'সবাই সব পারে না বারিধারা। মানুষ বকাবকি করলে বা দুর্বল ভাবলেও পারে না।'

বারিধারা লজ্জা পেল। ঋষাকে এভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। ও ভাবল, ওকে দুর্বল ভাবা হচ্ছে। বয়ফ্রেন্ডের ব্যাপারে সবাই তার মতো প্রজেসিভ হবে এমন মনে করবার কারণ নেই। সে যেভাবে শ্রবণকে কন্ট্রোল করে, ঋষা তা নাও পারে। নিজের মতো করে সবাইকে ভাবা যেমন ঠিক নয়, অর্চিনদা আর শ্রবণকে একরকম ভাবাটাও ঠিক নয়। রাজনীতি করা মানুষরা অন্যরকম হয়। শিল্পীরাও অন্যরকম হয়। দুটো অন্যরকম মানুষের মধ্যে যেমন তুলনা চলে না, তাদের সঙ্গে ব্যবহারও একরকম হবে না। বারিধারা হাত বাড়িয়ে ঋষার হাতের ওপর হাত রাখল।

'সরি, আমি তোমাকে ওভাবে বলতে চাইনি। বুঝতেই তো পারছ, অর্চিনদার ঘটনাটা নিয়ে আমরা ডিসটার্বড। তাছাড়া দোষ তো আমাদেরও। অর্চিনদা তো আমাদের বাড়ির লোক। আমরাও তো বুঝতে পারিনি, সে এতদূর ভেবে ফেলেছে। জানাতে পারলে মা নিশ্চয় আটকাত। তুমি কিছু মনে করো না। আমার এভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। তোমার মনের অবস্থা আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি আবার দু:খ প্রকাশ করছি।'

ঋষা বলল, 'ইটস ওকে। আমি কিছু মনে করিনি। তোমাদের উৎকণ্ঠা আমি বুঝতে পারছি।'

বারিধারা এবার ঝুঁকে পড়ে, গলা নামিয়ে বলল, 'ঋষা, আমরা যদি ওই নোনাজল গ্রামে গিয়ে অর্চিনদাকে চেপে ধরি? জোর করি? ফিরে আসবে না? চলো না, একবার চেষ্টা করি।'

ঋষা হাসল। বলল, 'লাভ হবে না বারিধারা। আমি যতদূর জানি, অর্চিন মন শক্ত করেই গেছে। লাভ হলে তো আমিই তাকে আগে আটকাতে পারতাম।'

বারিধারা বলল, 'তাও একবার চেষ্টা করতে অসুবিধে কী? চলো কালই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মা-ও যাবে।'

ঋষা এবার মুখ কঠিন করে বলল, 'না বারিধারা। আমি যাব না।'

বারিধারা সোজা হয়ে বসল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন? যাবে না কেন?'

ঋষা বলল, 'আমি তাকে জোর করবার বিপক্ষে। সে ছোট নয়, বোকাও নয়। ঠিক ভুলের পার্থক্য সে জানে। তাছাড়া...তাছাড়া... তার কাছে রাজনীতি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা সেখান থেকে তাকে সরে আসতে বলবার কে বারিধারা? আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি না বলে? কেউ যদি এখন আমাকে বলে কবিতা, লিটল ম্যাগাজিন সব ছেড়ে দিতে, কোনও দাম নেই এসবের, আমি ছেড়ে দেব? সরি, বারিধারা। অর্চিন শুধু তার লেখাপড়া, রেজাল্ট নিয়েই অর্চিন নয়, তার বিশ্বাস, আদর্শ নিয়েই সে অর্চিন। আমি গোটা অর্চিনকেই ভালোবাসি। এতে আমার ক্ষতি হলে মেনে নিতে হবে। তাকে তার পথে চলতে দেওয়াই উচিত।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা চুপ করে রইল। সে মুগ্ধ। ঋষা এতটা পরিণত! সত্যি তো সে যা বলছে, সবক'টা কথাই যুক্তিযুক্ত। অর্চিনদা নিজের বিশ্বাসমতো জীবন কাটাতে চাইছে। তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে কেন? শ্রবণের কাজ নিয়েও তো তার বাড়ি থেকে আপত্তি আছে। তার মানে শ্রবণকে আঁকাজোকা ছেড়েছুড়ে সাধারণ একটা চাকরি নিতে হবে? এবারও সে ভুল কথা বলে ফেলল। বারিধারার নিজের ওপর রাগ হচ্ছে আবার ঋষার জন্য গর্বও হচ্ছে। ঠিক মেয়েই অর্চিনদা পছন্দ করেছে।

বারিধারা বলল, 'ঠিকই বলেছ ঋষা। আমারই বুঝতে ভুল হয়েছিল। আসলে আমার মা এমনভাবে বলল... বলল... দেখ না, অর্চিনের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে যদি ওর খোঁজ পাওয়া যায়... আমরা গিয়ে একবার... এখন বুঝতে পারছি কাজটা ঠিক হবে না...।'

ঋষা হেসে বলল, 'মায়েদের মন তো এমনই হবে।'

বারিধারা হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল। বলল, 'চলো ওঠা যাক।'

দুজনেই উঠে দাঁড়াল, আর তখনই একজন লোক কাচের দরজা খুলে হুড়মুড়িয়ে কফিশপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কাউন্টারের কাছে প্রায় ছুটে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমাকে বাঁচান। আমাকে ওরা মেরে ফেলবে।'

কফিশপ এখন পুরো ফাঁকা। কোণে বসা দুজন ছেলেমেয়ে কখন উঠে গেছে।

বারিধারা চমকে লোকটার দিকে তাকাল। মলিন, বিধ্বস্ত জামাকাপড়ের একজন ভয় পাওয়া মানুষ। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। কাঁধের ঝোলাটা কোনওরকমে চেপে ধরে আছে। এই চকচকে কফিশপের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। কাউন্টারে একজন কমবয়সি মেয়ে আর একজন ছেলে। দুজনেই ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ানোই স্বাভাবিক। দিনদুপুরে এ কী ঘটনা! লোকটা কোথা থেকে এল?

বারিধারা ঘুরে তাকাল। কাউন্টারের ছেলেটি বলল, 'আপনি কে? কী চান এখানে?'

বিধ্বস্ত লোকটা কাচের দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'প্লিজ, আমাকে একটা লুকোনোর জায়গা করে দিন। পায়ে পড়ি আপনাদের।'

কাউন্টারের মেয়েটি কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'কে আপনি? চলে যান, চলে যান বলছি। এসব এখানে হয় না।'

লোকটার চোখমুখ আরও কুঁকড়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'না না, আমি যাব না। ওরা আমাকে বাসস্ট্যান্ড থেকে তাড়া করেছে, এক্ষুনি এখানে এসে ঢুকবে। বাথরুমটা কোনদিকে?'

বারিধারা এগোতে গেলে ঋষা ওর কাঁধ চেপে ধরল। আতঙ্কিত গলায় বলল, 'যেও না।'

বারিধারা কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কিছু হবে না।'

বারিধারা কয়েক পা এগিয়ে পিছন থেকে বলল, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে আপনার? কারা আপনাকে তাড়া করেছে?'

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। চমকে উঠল বারিধারা। তার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। বংশীবাদক! এই সেই বংশীবাদক লোকটা। দিদির বাড়ির থেকে সব চুরি করে পালিয়েছে।

'আপনি!'

বংশীবাদকের চেহারা অনেক বদলেছে। চোখমুখের ঢুলু ঢুলু ভাবটা নেই। বরং একমুখ খোঁচা দাড়িতে চোয়াড়ে মার্কা ভাব। চুল এলোমেলো। পোশাকও অন্যরকম। পায়জামা, কুর্তির বদলে ফতুয়া। কাঁধের ব্যাগটাই যা একরকম আছে। চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে গেছে।

বারিধারা এগিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে ডান হাত তুলে বলল, 'আপনি সেই বাঁশিবাজিয়ে না? আপনিই তো। দিদির বাড়িতে ডাকাতি করেছেন।'

ঋষা প্রায় ছুটে এসে বারিধারাকে চেপে ধরে। বারিধারা ঝটকা মেরে ঋষাকে সরিয়ে দেয়। কাউন্টারের ছেলেমেয়ে দুটো ফোন করবার চেষ্টা করছে। সম্ভবত পুলিশকে। মনে হয় নম্বর মনে করতে পারছে না।

boierpathshala.blogspot.com

বংশীবাদক পিছোতে গিয়ে একটা চেয়ারে ধাক্কা খেল। চেয়ারটা উলটে পড়ল।

'কী বলছেন দিদি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি কেন বাঁশি বাজাতে যাব! কী বলছেন!'

বারিধারা দাঁত মুখ শক্ত করে বলল, 'কী বলছি বুঝতে পারছ না? তুমি সে-ই বাঁশিওয়ালা। দিদির বাড়িতে ডাকাতি করেছ। দাঁড়াও সব মনে করাচ্ছি।'

বংশীবাদক বলল, 'আপনি ভুল করছেন দিদি...আমি বাঁশি বাজাই না...।'

বারিধারা মোবাইলটা তুলে বলল, 'দাঁড়াও আমি দেখাচ্ছি, তুমি বাঁশি বাজাও কিনা।'

এবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যা ঘটল সেটা শুধু সিনেমাতেই দেখা যায়। অথবা এই ধরনের ঘটনা বাস্তবেও এমনটাই হয়। কেউই তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

বংশীবাদক একটা লাফ দিল। হাত ছুড়ল এমনভাবে যাতে বারিধারা মুখে আঘাত পায়। ঋষা টেনে না সরিয়ে নিলে বিপদ হত। বংশীবাদক একটা টেবিল উলটে ছুটে গেল দরজার দিকে। দরজা খুলে বেরিয়েই পড়ল রাস্তায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মোটরবাইক এসে দরজার বাইরে দাঁড়াল। দুটো লোকের মাথায় মুখঢাকা হেলমেট। পেছনের লোকটা বাঁ হাত তুলল। হাতে রিভলভার। বংশীবাদক ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বাঁ হাত তোলা লোকটা গুলি চালাল, চাপা আওয়াজ, আগুনের ঝলকানি। আবার গুলি।

নিমেষে মোটরবাইক মুখ ঘুরিয়ে উলটোদিকে চলে গেল ঝড়ের বেগে।

গায়ে দু'বার গুলি লাগবার পরও বংশীবাদক উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে। পারে না। মুখ থুমড়ে পড়ে।

কাচের দরজার ভেতর থেকে গোটা ঘটনা দেখে বারিধারা আর ঋষা। ঋষা চেপে ধরে আছে বারিধারাকে। সে ভয়ে কাঁদছে।

বারিধারা ফিসফিস করে বলল, 'ডাকাত হলেও, লোকটা গুণী ছিল। বড় ভালো বাঁশি বাজাত।'

সাতচল্লিশ

বিমলকান্তি সেন একই সঙ্গে বিস্মিত এবং মুগ্ধ।

সাইকিয়াট্রিস্টদের সম্পর্কে তেমন কোনও ধারণা নেই বিমলকান্তির। বরং 'পাগলের ডাক্তার' হিসেবে অস্বস্তিই আছে। এর আগে এই ধরনের ডাক্তারের সঙ্গে একবারই মুখোমুখি হতে হয়েছে। সে অভিজ্ঞতা মোটে ভালো নয়।

তখন কলেজে পড়ছেন বিমলকান্তি। বাবার এক দূর সম্পর্কের ভাই থাকতেন গ্রামে। চুপচাপ ধরনের এই ছেলের ছোটবেলা থেকেই আচরণ স্বাভাবিক ছিল না। একা থাকতেই ভালোবাসত। ভিড় দেখলে সরে যেত। বনবাদড়ে ঘুরত, নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকত। বন্ধুরা হাসাহাসি করত, খেপাত। বলত মাথায় 'ছিট' আছে। বড় হওয়ার পর হঠাৎ সেই ছেলের স্বভাব বদলাল। শান্ত ছেলে হয়ে গেল ভায়োলেন্ট। পরিচিত, অপরিচিত কাউকে দেখলেই তেড়ে যেত। আক্রমণ যে কিছু করত এমন নয়, কিন্তু 'ধর-ধর' বলে তাড়া করতে ছাড়ত না। যেন চোরকে তাড়া করছে। উন্মাদ যুবকের ভাবটা এমন ছিল, যেন ভালো সেজে যারা চারপাশে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যেই 'চোর ছেঁচড়' বেশি। ধরতে হলে তাদের আগে ধরতে হবে। বাইশ-চব্বিশ বছরের একজন তাগড়াই ছেলে কাউকে 'চোর' সন্দেহে তেড়ে গেলে ঘটনা ভালো হয় না। এ ক্ষেত্রেও হল না। একটা সময়ের পর তাকে দেখলে পাড়ার ছেলেপিলেরা ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করল। খানিকটা ভয়ে এবং বেশিটাই মজায়। দু-চারজন লাঠি দিয়েও মারল। সেই সময় পাড়াগাঁয়ে মানসিক রোগীকে লাঠি মারা কোনও অপরাধ ছিল না। বরং সেটাই নিয়ম ছিল। এখনও যে অপরাধ এমন নয়। এই গরিব, অশিক্ষিতদের দেশে আজও অনেকে মনে করে, লাঠি ছাড়া 'উন্মাদ' নামক অসুস্থতার আর কোনও চিকিৎসা নেই। যাই হোক, দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলে গ্রাম থেকে কলকাতার সেনবাড়িতে খবরাখবর সবসময় আসত না। লাঠি

boierpathshala.blogspot.com

দিয়ে জোর পিটুনির পর এল। কমলকান্তি সেন খুব রাগারাগি করলেন। যে মানুষটা খবর নিয়ে এসেছিল কমলকান্তি তাকে এই মারেন তো সেই মারেন।

'আমাকে আগে বলোনি কেন? কেন বলোনি? একজন অসুস্থ মানুষকে ট্রিটমেন্ট না করে এতদিন বাড়িতে রেখে দিয়েছ। মূর্খের দল। এটা একটা অসুখ এটা বোঝো? নাকি তাও বোঝো না? জ্বর, পেট ব্যথার মতো এই অসুখেরও ট্রিটমেন্ট আছে জানো সেটা?'

গ্রামের বাড়ি থেকে আসা মানুষটা মিনমিন করে বলল, 'পাগল তো ভালো হয় না বড়কর্তা। তবে ওঝা ডেকে এবার ঝাড়ফুঁক করানোর কথা ভাবছি।'

কমলকান্তি সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে তাকে সত্যি সত্যি মারতে যান। বাকিরা আটকায়।

'শাট আপ। কে বলল মানসিক রোগ ভালো হয় না? কে বলল তোমাদের? আজকাল কতরকম ওষুধ বেরিয়েছে। আর একবারও যদি এইসব ওঝা টোঝার কথা মুখে এনেছ, পুলিশ ডেকে ফাটকে পুরে দেব। আমি চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিলাম। পেশেন্টকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব, ডাক্তার দেখাব। ডাক্তার যদি বলেন, বড় হাসপাতালে ভর্তি করাব। যতদূর যেতে হয়, যাব। তারপর ওই গ্রামে সুস্থ অবস্থায় ফেরত পাঠাব।'

এই উন্মাদ চিকিৎসা সফরে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলেন বিমলকান্তি। বাবাই অর্ডার দিয়েছিলেন। এইরকম একটা রোগী নিয়ে ছোটাছুটি করতে তার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। তার ওপর ওই পাগলা কাকা নাকি তেড়ে যায়। কামড়ে, খিমচে দিলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। কিন্তু বাবার মুখের ওপর 'যাব না' বলবার সাহস ছিল না বিমলকান্তির। কমলকান্তি সেন মুখ দেখে ছেলের আপত্তি বুঝেছিলেন। গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'জীবনের সব দিকটাই দেখতে হয়, সামলাতে হয়। শুধু সুস্থ মানুষ নিয়ে বাঁচা যায় না, বাঁচার জন্য পাশে কিছু অসুস্থ মানুষও দরকার। এতে সত্যি বেঁচে আছি, নাকি বাঁচবার ভান করে আছি তার একটা পরীক্ষা হয়। কথা না বাড়িয়ে আমার সঙ্গে চলো। গাড়িতে যাব। প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে দেখাব, সেখানে ডাক্তার যা পরামর্শ দেবে, সেই অনুযায়ী পরবর্তী স্টেপ নেব।'

অদ্ভুত ব্যাপার হল, কাকা বাবাকে দেখবার পর থেকে একবারে শান্ত হয়ে গেলেন। সদর হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যেতে কোনও সমস্যাই হয়নি। সমস্যা হল হাসপাতালে পৌঁছে। সেখানে মানসিক রোগের ডাক্তার একজনই। খবর নিয়ে জানা গেল, বেশিরভাগ সময় তাকে পাওয়া যায় না। হয় হাসপাতালে আসেন না, নয়তো নিজের জায়গায় থাকেন না। পেশেন্টও আসে কম। অবহেলা, ওঝা, ঝাড়ফুঁক, ঘরে বেঁধে রাখা ধরনের চিকিৎসা টপকে দূর দূর গ্রামগঞ্জ থেকে কে আসবে? কেনই বা আসবে? তারপরেও কখনও কোনও পেশেন্ট এলে তার বাড়ির লোকদের ডাক্তারবাবু ভাগিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেন, এসব জটিল চিকিৎসা এখানে হবে না। অন্য কোথাও পথ দেখো বাপু।

সেদিন বিমলকান্তিরা ডাক্তারকে পেয়ে গেলেন। পেশেন্ট দেখে তো তিনি রেগে আগুন। তাকে যা-ই বলা হয়, তিনি খিঁচিয়ে ওঠেন। যেন হাসপাতালে রোগী আনা খুব অন্যায় হয়েছে।

'পেশেন্টের অবস্থা তো ভয়ঙ্কর। একে এখানে এনেছেন কেন?'

কমলকান্তিও এই ব্যবহারে মেজাজ হারালেন। বললেন, 'হাসপাতাল বলে এনেছি। রোগীকে নিয়ে কোথায় যাব? ফুটবল মাঠে? নাকি হরিসভার কীর্তন শোনাতে?'

ডাক্তার দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'যেখানে খুশি যান। এখানে একটা এক্সরে মেশিন নেই, ব্যান্ডেজ বাঁধবার তুলো নেই... উনি এসেছেন মাথার অসুখের চিকিৎসা করাতে? ছো:। যান গভর্নমেন্টকে গিয়ে বলুন, আগে ব্যবস্থা, তারপর চিকিৎসা।'

বিমলকান্তি আর চুপ করে থাকতে পারেনি। অবাক গলায় বললেন, 'কাকার তো মাথার সমস্যা। এক্সরে মেশিন, ব্যান্ডেজ দিয়ে কী হবে?'

boierpathshala.blogspot.com

ডাক্তার হাত তুলে বললেন, 'মুখ সামলে কথা বলবে ছোকরা। ডাক্তার তুমি না আমি? কোন অসুখে এক্সরে লাগে, কোনটায় ব্যান্ডেজ লাগে আমি তোমার থেকে অনেক বেশি জানি।'

কমলকান্তির রাগ বাড়ল। বাড়াটাই স্বাভাবিক। বললেন, 'আপনিও মুখ সামলে কথা বলবেন। ডাক্তার হয়েছেন বলে মাথা কিনে নেননি। এখানে তো দেখছি আপনার মাইনে ছাড়া আর কিছুই নেই। সেটাই বা রেখেছেন কেন। এক্স রে মেশিনের মতো সেটাও তুলে দিন। মনে রাখবেন, মাইনেটা আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় হচ্ছে। সার্ভিস দিতে আপনি বাধ্য। যদি মনে করেন হাসপাতালে কিছু নেই, কাজ করতে পারছেন না, তাহলে মাইনে নেওয়া বন্ধ করুন।'

এবার তুলকালাম লেগে গেল। ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। জামার হাত গুটিয়ে এগিয়ে এলেন। ভিড়টিড় হয়ে একাকার কাণ্ড। এর মধ্যে আবার কাকা গেলেন খেপে। তিনি ডাক্তারের দিকে গেলেন তেড়ে। ডাক্তার কোনওরকমে গিয়ে পুলিশে ফোন করলেন। সে এক হুলুস্থুলু ব্যাপার।

কমলকান্তি সেন শেষ পর্যন্ত উদ্মাদ ভাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করেন। তবে দু:খের কথা... থাক, সে অন্য গল্প। তবে এরপর থেকে সাইকিয়াট্রিস্ট সম্পর্কে ধারণাটাই তেতো হয়ে গিয়েছিল বিমলকান্তির। যদিও এর পেছনে তেমন কোনও যুক্তি ছিল না। এই আচরণ অন্য কোনও ডাক্তারও করতে পারতেন, নাও করতে পারতেন। একজনকে দেখে সবাইকে বিচার করা উচিত নয়। অনেক ধরনের পেশেন্টই তো ওই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যায়। চিকিৎসা হয় বলেই যায়। আবার এমনটাও হতে পারে, এই ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে হয়তো সেই সময় সত্যি-সত্যি মানসিক রোগের চিকিৎসা করবার মতো যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। বেচারি ডাক্তারবাবু হয়তো বলে বলে ক্লান্ত, হতাশ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হলেও তিনি সম্ভবত বলতে চেয়েছিলেন যেখানে সামান্য এক্স রে মেশিন, ব্যান্ডেজ বাঁধবার তুলো পাওয়া যায় না, সেখানে মাথার অসুখের মতো জটিল জিনিসের চিকিৎসা কী করে হবে? কথাটা নরমভাবে না বলে রেগে গিয়ে বলে ফেলেছেন। একজন ডাক্তারকে বসিয়ে রাখতে হয় তাই রেখেছে। এই সবক'টা সম্ভাবনাই আছে। হয়তো সবই সত্যি। কিন্তু তারপরেও সেই ডাক্তারের আচরণ মনের ভেতর এক ধরনের বিশ্রী ছাপ ফেলেছিল। উনি যদি ব্যবহার অন্যরকম করতেন, তা হলে হয়তো এমনটা হত না। বাবাও বুঝতেন। রোগী নিয়ে কাজ খুব জটিল জিনিস। শুধু ওষুধ বা ধমক দিয়ে হয় না।

আজ কিন্তু একেবারে উলটো ঘটনা। সামনে বসা সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোককে দেখে বিমলকান্তি সেন মুগ্ধ। বয়স তারই মতো হবে। শান্ত, সৌম্যদর্শন। মুখে হাসি। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। তার ওপর ব্যবহারটি বড় মধুর। ঘরে ঢুকতে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমি ডা. মণীশ রায়। বসুন। চা বা কফি কিছু খাবেন? আমি সাজেস্ট করব চা। আমার এখানে যে ছেলেটি চা-কফি বানায়, সে কফি বিষয়টি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নার্ভাস। তার ধারণা, এটি ইংরেজিতে কথা বলবার মতো। ভিন দেশি ব্যাপার। সে চা বানানোয় স্বচ্ছন্দ।'

কথা শেষ করে ডাক্তারবাবু 'হো হো' আওয়াজ করে হাসলেন।

বিমলকান্তি খুব আশ্বস্ত হলেন। ডাক্তারবাবুকে দেখে মনে হচ্ছে না উনি বাইরের কেউ, মনে হচ্ছে এর সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাব কি না এই বিষয়ে এতদিন মনের ভিতর যে দোলাচল ছিল, মুহূর্তে কেটে গেল। মনে হল, তিনি ঠিক জায়গায় এসেছেন। এই মানুষটা তাকে সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারবে।

ডাক্তার মণীশ রায়ের সন্ধান দিয়েছে কর্ণিকা। সেক্রেটারি কাম অ্যাডভাইসার টু দ্য এম ডি। বিমলকান্তি ইচ্ছে করলে অফিসের সিনিয়র কেউ বা বাড়িতে মেয়ে-জামাইয়ের কাছ থেকে ডাক্তারের খোঁজ নিতে পারতেন। তিনি তা করেননি। অফিসের বড় কাউকে জিগ্যেস করলে তারা অতিরিক্ত কৌতূহল দেখাত। যত না চিন্তিত হত তার থেকে বেশি চিন্তা দেখাত।

'স্যর কী হয়েছে? কার হয়েছে? কোনও চিন্তা করবেন না, সঙ্গে আমি থাকব। আমার মনে হয় স্যর, এখানে না দেখিয়ে স্ট্রেট নিমহান্সে চলুন। মাথার কাজে ওরা দারুণ। বাইরে কোথাও ব্যবস্থা করব? বিদেশে?

boierpathshala.blogspot.com

স্টেটসে মেন্টাল হেলথ নিয়ে আজকাল খুব ভালো কাজ হচ্ছে। যাবেন স্যর?'

এই ঝামেলায় বিমলকান্তি পড়তে চাননি।

বাড়িতে মেঘ, বৃষ্টি বা জ্যোতিষ্ককে ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে বললে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত। বাবার মৃত্যুর পর থেকে সেনবাড়ির অবস্থা একটু নড়বড়ে হয়ে আছে। এখনও সবাই পুরো স্বাভাবিক হতে পারেনি। বিশেষ করে মণিকুন্তলা। যদিও আগের থেকে অনেকটা সামলেছে, তাও কিছুটা মনমরা তো হয়েই আছে। এই অবস্থায় এসব শুনলে আরও ডিপ্রেসড হয়ে পড়বে। তার ওপর ক'দিন আগে আরও একটা ঘটনা ঘটল। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও বাড়িতে পরোক্ষভাবে তার একটা এফেক্ট পড়েছে। জ্যোতিষ্কর রাস্তা থেকে ধরে আনা বাঁশিওয়ালা খুন হয়েছে। লোকটা ডাকাত ছিল। বড় মেয়ের বাড়িতে ডাকাতি করেছিল। পুলিশ খুঁজছিল। ইন্সিডেন্টালি বারিধারা নিজের চোখে সেই খুন দেখেছে। মেয়েটার মনের জোর বেশি বলে সে কোনওরকম ট্রমার মধ্যে পড়েনি। পুলিশ জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা খুনিদের একজনকে ঘটনার দিনই ডক এলাকা থেকে ধরে ফেলেছে। কপিশপের সামনে থেকে খুনিরা যখন বাইক ঘুরিয়ে পালাচ্ছিল, তখন এক ট্রাফিক সার্জেন্টের সন্দেহ হয়। সে ওয়াকিটকিতে সহকর্মীদের জানায়। পুলিশ বাইকটিকে ফলো করে। যে লোকটাকে পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তাকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, বাঁশি-বাজিয়ে-লোকটা গ্রাম থেকে এসে কলকাতায় এক মাফিয়া দলের চক্করে পড়ে। বাড়ি, ব্যাঙ্ক, গয়নার দোকান—কোথায় চুরি, ডাকাতি করতে সুবিধে সেই খবর জোগাড় করে দিত। এদের পুলিশের ভাষায় বলা হয় 'টিপার'। ক'দিন আগে সে আর এই কাজ করবে না বলে জানায়। মাফিয়ারা তাকে তাড়া করে এবং গুলি করে মারে। ক্রিমিনালদের দলে একবার ঢুকলে আর বেরোনো যায় না। কলকাতা শহর বাইরে থেকে যতই চকচকে, আলো ঝলমলে দেখাক না কেন, ভিতরে চাপ চাপ অন্ধকার রয়েছে। গোটা ঘটনা জানার পর বারিধারাও আপসেট। তার বিশ্বাস, বাঁশিওয়ালা লোকটা ভালোভাবে জীবন কাটাতে চেয়েছিল, পারল না। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার হালকা তর্কও হয়েছে।

'এই ধরনের লোকের এরকমই পরিণতি হয়। হয় জেলে বাকি জীবনটা থাকতে হয়, নয় নিজের দলের হাতে খুন হতে হয়।'

বারিধারা বলেছিল, 'সেটাই দু:খের বাবা।'

বিমলকান্তি বলেছিলেন, 'একজন ডাকাত সম্পর্কে দু:খ না করাই ভালো বৃষ্টি। ওই লোকটা তোমার দিদি-জামাইবাবুকে মেরেও ফেলতে পারত।'

বারিধারা বলল, 'আমি তো ডাকাতের জন্য দু:খ করছি না, আমি একজন শিল্পীর জন্য দু:খ করছি। তা ছাড়া আমার কী ধারণা জানো বাবা, আমার ধারণা লোকটা দিদি-জ্যোতিষ্কদাকে পছন্দ করে ফেলেছিল, সেই কারণে গোটা অপারেশনটা ওদের অ্যাবসেন্সে করে। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি।'

বিমলকান্তি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'ডাকাতের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করাটা বাড়াবাড়ি হয়।'

বারিধারা অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, 'মানুষ বড় অদ্ভুত। একই সঙ্গে তার মন ভালো এবং মন্দ। সে একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বাজাতে পারে, আবার লোকের হাত-মুখ বেঁধে ডাকাতিও করতে পারে। আমার মনে হয় বংশীবাদকের আপশোস হচ্ছিল।'

বিমলকান্তি বলেছিলেন, 'হয়তো তাই, কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। মন্দ লোকদের ভালো হওয়ার ইচ্ছে থাকে না, এমন নয়, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই দেরি হয়ে যায়।'

বারিধারা বলল, 'বাবা, আমরা তো সবাই কমবেশি মন্দ? নই?'

বিমলকান্তি থমকে গেলেন। তার ছোট মেয়েটা গোলমেলে। তর্কের সময় কখন যে কী যুক্তি টেনে আনে, তার ঠিক নেই।

'ঠিকই, আমরাও মাঝে মাঝে মন্দ হয়ে যাই, কিন্তু ডাকাতি করি না।'

বারিধারা খানিকটা উদাসীনভাবেই বলল, 'কী জানি? হয়তো তাও করি। ভাবি ভালো কিছু করছি।'

boierpathshala.blogspot.com

বিমলকান্তি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর বেশিদূর এগোননি। তবে বুঝেছিলেন, এই অবস্থায় বাড়িতে ডাক্তার বদ্যির কথা বলা উচিত হবে না। তা ছাড়া আগে সমস্যাটা ঠিক কী, আদৌ সমস্যা কি না, সেটা জানা দরকার।

সব দিক বিচার করে কর্ণিকাকে অনেক বেশি 'সুবিধের' বলে মনে করেছেন বিমলকান্তি। যতদিন যাচ্ছে বিমলকান্তির মনে হচ্ছে, মেয়েটি বুদ্ধিমতী এবং সিরিয়াস। সে তার বসের খবর গোপন রাখতে জানে। এখন পর্যন্ত অফিসের বড় কোনও বিষয়ে তার কাছে থেকে বিমলকান্তি পরামর্শ নেননি ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনে নেবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন।

চা খেতে খেতেই ডা. মণীশ রায় বললেন, 'নিন, এবার আপনার কথা বলুন মিস্টার সেন।'

বিমলকান্তি মনে মনে সাজিয়ে এসেছিলেন কীভাবে শুরু করবেন, এখন খানিকটা গুলিয়ে যাচ্ছে। তিনি খানিকটা থমকেই যান। তিনি এমন একটা সমস্যা নিয়ে এসেছেন যেটা কাউকে বলাটা সঙ্কোচের। বোধহয় পাগলামির ঊর্ধ্বে।

ডা. রায় হেসে বললেন, 'কর্ণিকা টেলিফোনে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড খানিকটা বলে রেখেছে। আপনার অফিস, আপনার ফ্যামিলি। কয়েকদিন হল আপনার পিতা গত হয়েছেন। মোটামুটি আমি আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা করে রেখেছি। বাকিটা আপনার মুখে শুনব।'

বিমলকান্তি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। কর্ণিকা কাজ এগিয়ে রেখেছে। এই কারণেই মেয়েটিকে তাঁর এতটা পছন্দ হয়। মেয়েটি সিরিয়াস। যে কাজ করে মন দিয়ে করে। পুরো কাজটা করতে চায়। এই বয়েসে বাইরের অনেক কিছু মনে নাড়া দেয়। এটাই বয়েসের ধর্ম। কাজের সময় সেটাকে সামলে রাখাটাই গুণ। বৃষ্টি, মেঘের বেলাতে এই ঘটনা উলটো। লেখাপড়া মন দিয়ে করলেও তারা বাইরের নানা বিষয়ে সহজেই ইনভলভ হয়ে পড়ে। এটা যদি না করত তাহলে ওদের কেরিয়ার অনেক ভালো হত। বড় মেয়েটা তো কেরিয়ার কিছু করলই না। বিয়ে-থা করে বাড়িতে বসে গেল। অথচ মেয়েটা অতি বুদ্ধিমতী। কলেজে পড়তে পড়তেই পাগল টাইপ ছেলের প্রেমে পড়ে গেল। জ্যোতিষ্ক পাগল ছাড়া কী? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়। মাঝখান থেকে মেঘের আর পড়াশোনাই হল না! বিয়ের কথা যখন হচ্ছে মেয়েকে বিমলকান্তি এ কথা বলেছিলেন।

'বিয়ের পর তুমি লেখাপড়া করবে তো?'

মেঘ বলেছিল, 'খেপেছ? আমি একজন সিরিয়াস বাবার সিরিয়াস মেয়ে। আমি সিরিয়াসলি সংসার করতে চাই।'

বিমলকান্তি অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'সে কী! আমি তো ভেবেছিলাম আরও লেখাপড়া করে তুমি সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসে জয়েন করবে!'

মেঘ বলেছিল, 'ওরে বাবা, ব্যবসা ট্যাবসা আমার কম্ম নয়। আমি পরীক্ষায় খাতায় ঠিক আছি, তার বাইরে আমার যোগ-বিয়োগ সব ভুল হয়ে যায়। ব্যবসা দুদিনে লাটে উঠবে। আমাকে ওইসব থেকে রেহাই দাও বাবা। তোমার চিন্তা কী? বৃষ্টি তো আছে।'

বিমলকান্তি বিরক্ত হয়েছিলেন। এটা একটা সিরিয়াস কথা হল? বৃষ্টির মধ্যেও এই ব্যাপারে ঘাটতি আছে। সে তো এককাঠি বেশি। নানারকম অর্থহীন বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে ভালোবাসে। বাবা একটা কী উদ্ভট প্রজেক্টের কথা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন, কী রোদ উঠবে না কী, তাই নিয়ে লাফালাফি করছে। কোনও মানে আছে? হ্যাঁ, এটা ঠিক দুটো মেয়েই খুব ডিউটিফুল হয়েছে। কিন্তু তারা বেশিরভাগ ডিউটিই সারে খেলাচ্ছলে। হাসতে হাসতে। এটা একেবারেই পছন্দ নয় বিমলকান্তির। ডিউটিতে সিরিয়াস ভাব চাই। তাতে কাজে ভুল হলে ক্ষতি নেই। এসব দিক থেকে কর্ণিকা ভালো। আজ ওকে ঘরে ডেকেছিলেন।

'কর্ণিকা, একটা জরুরি কাজের জন্য তোমাকে ডেকেছি।'

boierpathshala.blogspot.com

কর্ণিকা অবাক হল। স্যার তাকে নিশ্চয় ঘরে খোশগল্প করবার জন্য ডাকবেন না। জরুরি কাজের জন্যই ডাকবেন। এটা আলাদা করে বলবার কী আছে? এমন কথা কখনও উনি বলেনও না। স্যার, আজ কি কোনও কারণে অন্যমনস্ক? কোনও সমস্যা হয়েছে? দুদিন হল তার মনও খুব খারাপ। সে জানতে পেরেছে, অর্চিন কলকাতা থেকে বাইরে চলে গেছে। গ্রামে না কোথায় গিয়ে রাজনীতি করবে। অর্চিন তার মোবাইল ফোনটা বন্ধ করে রেখেছে। খবরটা যখন শোনে কর্ণিকা বিশ্বাস করতে পারেনি। ফেসবুকে অর্চিনের কলেজের এক বন্ধু পোস্ট দিয়েছে।

'উই ফিল প্রাউড ফর অর্চিন। তার সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাই।'

অর্চিনের খবরাখবর জানবার জন্য কর্ণিকা তার বন্ধুদের ফেসবুকে মাঝে মাঝে চুপচাপ উকি দেয়। কর্ণিকা থমকে গিয়েছিল। অর্চিন কী সিদ্ধান্ত নিল? নিজে কিছু জানতে যাওয়া ঠিক হবে না। অর্চিন জানতে পারলে রাগারাগি করতে পারে। একটি ছেলে তার থেকে বয়েসে খানিকটা ছোট। তারপরেও তাকে ভয় পায়! এই কারণে কর্ণিকা নিজেই কতবার অবাক হয়েছে। ভালোবাসাই পারে যাবতীয় রীতিনীতি, নিয়মকানুন গুলিয়ে দিতে। কম বয়েসের ছেলেকে যদি ভালোবাসতে পারে, তাকে মন আর শরীর দুটো দেওয়ার জন্যই উদগ্রীব হয়ে থাকতে পারে, তাহলে আর ভয় পেতে অসুবিধে কী?

কর্ণিকা ফেসবুক থেকে অর্চিনকে ফোন করে। সুইচড অফ। এর পরে আর না পেরে ফেসবুকেই ছেলেটিকে জিগ্যেস করে বসে। একটু ঘুরিয়ে জিগ্যেস করে।

'অর্চিন কে?'

'আমাদের সহপাঠী। একজন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। পাস করলে একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হত।'

কর্ণিকা খুব নির্লিপ্তভাবে জানতে চায়, 'সে কী করেছে? তোমরা তার জন্য গর্ববোধ করছ কেন? ভালো রেজাল্ট করেছে?'

ছেলেটি জবাব পাঠায়, 'না, আমাদের প্রিয় বন্ধু কেরিয়ারের লেখাপড়া ছেড়ে গ্রামে চলে গেছে। জীবনের লেখাপড়া শিখতে।'

কর্ণিকা এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না। উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চায়, 'মানে! চলে গেছে মানে? কী হয়েছে তার?'

জবাব আসে, 'নিজের আদর্শ, নীতির জন্য গেছে। সে পুরোপুরি রাজনীতি করবে বলে ঠিক করেছে। আমরা তো এমন পারব না। আমাদের না আছে নীতি, না আছে আদর্শ। আমরা শুধু নিজেকে নিয়ে আর নিজের লোভ নিয়ে বেঁচে থাকতে শিখেছি। তাই অর্চিনকে কুর্নিশ জানাই।'

এরপর কর্ণিকা ফেসবুকেই ঋষার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ঋষা এড়িয়ে যায়। বরং তাকেই প্রশ্ন পাঠায়, 'তুমি অর্চিনকে কতটা চেনো?'

এরপর থেকে কর্ণিকার মন খুব খারাপ। ছেলেটা কোথায় গেল? যাওয়ার আগে তাকে একবার বলে গেল না? সে কি এতটাই ফালতু? সে অর্চিনের সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। তাকে বলতে চায়, 'আমি তো তোমার কাছ থেকে কিছু চাইনি অর্চিন। তবু তুমি কেন আমাকে এত অবহেলা করো?'

এরপরেও মন খারাপ হবে না! তবে অফিসে এসে কর্ণিকা নিজের কথা ভুলে কাজ করবার চেষ্টা করে। আজও করছে। স্যর ডাকায় ঘরে এসেছে।

বিমলকান্তি টেবিলের ওপর রাখা পেপারের ওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে করতে গলা নামিয়ে বললেন, 'আমার একটা সমস্যা হয়েছে কর্ণিকা। সমস্যার কথা কাউকে আমি কখনও বলিনি। কারণ সমস্যাটা ঠিক স্বাভাবিক সমস্যা নয়। মনের সমস্যা। মনে হচ্ছে, এবার আমার একজন সাইকিয়াট্রিস্ট কনসাল্ট করা উচিত।'

বস মাথার ডাক্তার খোঁজ করছেন শুনলে অন্য যে কেউ ঘাবড়ে যেত, কর্ণিকা ঘাবড়াল না। অফিসে কাজ করতে করতে এই একটা জিনিস সে অভ্যেস করে নিয়েছে। চট করে ঘাবড়ায় না।

boierpathshala.blogspot.com

বিমলকান্তি বললেন, 'তোমাকে না বলে ব্যাপারটা আমি বাড়িতে বা অফিসের সিনিয়র কাউকে বলতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তাতে টেনশন তৈরি হত। তার থেকেও বড় কথা, খবরটা ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের মালিকের মাথার গোলমাল হয়েছে, এই খবরটা ছড়ালে আমার কোনও ক্ষতি নেই, বিজনেসের ক্ষতি নেই। আমি সেটা চাই না। আমি জানি, তুমি কথাটা গোপন রাখতে পারবে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।'

কৃতজ্ঞতায় কর্ণিকার মন ভরে উঠল। বাবার বয়সি এই মানুষটা তাকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস আর ভরসা করে। আর সেই কারণেই এত কম বয়েসে তাকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে বসিয়েছে। বস বকাঝকাও করে খুব। মাঝে মাঝে বাথরুমে গিয়ে চোখের জল মুছতে হয়। তার পরেও মনে হয়, এই মানুষটার জন্য যদি কোনওদিন জীবনের ঝুঁকিও নিতে হয়, সে নেবে। কেউ আটকাতে পারবে না। জীবনটা কী অদ্ভুত, যাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সেই অর্চিন তার ভালোবাসার কোনও মূল্য দিল না, অথচ একজন দূরের মানুষ তাকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে!

'আমি কী করতে পারি স্যার?'

বিমলকান্তি একটু ভেবে বললেন, 'আমাকে একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্টের অ্যাপয়েনমেন্ট করে দিতে পারো? ডাক্তার চেনাজানা হলে সুবিধে হয়। তাছাড়া আমার ঠিক এরকম কাউকে চেনা নেই। যাদের আছে তাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইছি না। কর্ণিকা, আমার ডাক্তার ঠিক করে দেওয়াটা তোমার কাজ নয়। তুমি আমার অফিসের কাজ করবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার দ্রুত সমস্যা কাটিয়ে ওঠাটা শুধু আমার জন্য নয়, আমার অফিসের জন্যও প্রায়োজন। সেটা ঠিকমতো করতে গেলে এমন কাউকে নিয়ে করতে হবে যাকে আমি বিশ্বাস করি। সেই অর্থে কাজটা খানিকটা অফিসেরও বলতে পারো। তবে তারপরেও যদি তোমার কোনও অসুবিধে হয় বলো। আই ডোন্ট মাইন্ড। বরং স্পষ্ট কথা বললে খুশি হই।'

কর্ণিকা মাথা নাড়িয়ে বলল, 'স্যর, এ আপনি কী বলছেন! এটা আমার ডিউটি। তাছাড়া...তাছাড়া।' এই পর্যন্ত থমকে গেল কর্ণিকা। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমার এক মামা সাইকিয়াট্রিস্ট। মণীশ রায়। খুব নাম টাম নেই, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে দারুণ। মানুষ হিসেবেও। আপনি যদি বলেন, আমি এখনই তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারি।'

বিমলকান্তি মুহূর্তখানেক ভাবলেন। বললেন, 'করো। উনি যদি আজ সন্ধেবেলা সময় দেন খুব ভালো হয়। যত দ্রুত সম্ভব সমস্যাটা আমি ক্লিয়ার করে ফেলতে চাই। এটাকে ক্যারি করতে আমার ভালো লাগছে না।'

কর্ণিকা শান্ত গলায় বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। মণীশ মামার সঙ্গে আমি এখনই কথা বলছি।'

বিমলকান্তির ভালো লাগল। একেই বলে এফিসিয়েন্ট। অতিরিক্ত কথা নেই। কৌতূহল নেই। আবেগ নেই। নি:শব্দে নিজের কাজটুকু করে যাওয়া।

ডাক্তারের সঙ্গে কর্ণিকা শুধু কথা বলেনি, বিমলকান্তির পরিচয়টাও দিয়ে রেখেছে। সে বলেছিল, 'স্যর, আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?'

বিমলকান্তি ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, 'না, তার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'যাই না।'

বিমলকান্তি সামান্য কঠিন গলায় বললেন, 'বললাম তো প্রয়োজন নেই। আমি অফিসের কাজ ছাড়া কাউকে কোনওদিন বাইরে নিয়ে যাই না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনি নি:সঙ্কোচে বলতে পারেন মিস্টার সেন।'

বিমলকান্তি বললেন, 'কোথা থেকে শুরু করি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ডাক্তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'যেখান থেকে খুশি।'

বিমলকান্তি গলাখাকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন।

boierpathshala.blogspot.com

'সপ্তাহে একদিন করে আমি বাড়িতে লোকজন মিট করি। কারও কোনও পার্সোনাল প্রবলেম থাকলে শুনি। সেদিন আমার অফিসের এক কর্মচারী, প্রহ্লাদ নাম, আমার কাছে আসে। বাড়ি বা ওই ধরনের কিছুর জন্য তার লোন দরকার। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা সময় আমার মনে হয়, আমি আর ঠিক আমি নেই, আমি প্রহ্লাদ হয়ে গিয়েছি।'

এতটা বলে থামলেন বিমলকান্তি।

ডাক্তারবাবু সোজা হয়ে বসলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনি প্রহ্লাদ হয়ে গেছেন! সেটা ঠিক কেমন?'

বিমলকান্তি বললেন, 'ঠিক কেমন আমি বলতে পারব না ডাক্তারবাবু...কিন্তু মনে হল, আমি যেন আমি নই...আমি মানুষটা বদলে গিয়েছি...।'

ডাক্তার রায় স্থিরচোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি প্রহ্লাদের মনের কথা বুঝতে পারছিলেন?'

বিমলকান্তি গলা নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, পারছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আমার সামনে যে বিমলকান্তি সেন মানুষটা বসে আছেন, তিনি একজন ভালো মানুষ। বাইরে রাগারাগি করলেও ভেতরে নরম। উনি আমার কথা শুনবেন। আমার টাকার ব্যবস্থা করবেন।'

ডাক্তার রায় একটু ভাবলেন। বললেন, 'এই কথাগুলো যে ওর, আপনার নয়, সেটা বুঝলেন কী করে?'

বিমলকান্তি বললেন, 'ডাক্তারবাবু, শুধু মনের কথা নয়, আমি ওই লোকটির ব্যথা-বেদনাও অনুভব করেছি।'

ডাক্তারবাবু বড় করে শ্বাস টানলেন। চেয়ারে হেলান দিলেন। বললেন, 'এরকম আপনার কতবার হয়েছে মিস্টার সেন?'

'বেশ কয়েকবার। সামনের মানুষটার সঙ্গে আমার যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। আমার বাবার সঙ্গে পর্যন্ত হয়েছে। চিন্তার কথা হল, শুধু যে নর্মালভাবে ব্যাপারটা ঘটছে এমন নয়। গোলমালও হচ্ছে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'গোলমাল! সেটা কীরকম?'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'আমাদের বিজনেসে খুব সিনিয়র একজন আছেন। আমার বাবার আমলের মানুষ। মিস্টার উপাধ্যায়। কোম্পানি ক্রিটিকাল কোনও সমস্যায় পড়লে তিনি পরামর্শ দেন। কিছুদিন আগে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খুব জোর ধাক্কা খেলাম। তখনও বাবা বেঁচেছিলেন।'

'ধাক্কা! কীরকম?'

বিমলকান্তি খানিকটা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মনে হল, আমি যেন মিস্টার উপাধ্যায়। আমার বাবাই গোপনে আমাকে এই কোম্পানিতে রেখেছেন। যাতে তার ছেলের কোনও অসুবিধে না হয়। তার থেকে বড় কথা...বড় কথা...আমি যেন কোম্পানির বড় কোনও ক্ষতি চাইছি।'

ডাক্তার রায় বললেন, 'আপনি আরও কয়েকটা ঘটনা মনে করে বলতে পারেন?'

বিমলকান্তি সেন বলেন, 'পারব।'

'তাহলে বলুন।'

পরপর প্রায় সবক'টা ঘটনা বললেন বিমলকান্তি। ডাক্তারবাবু মন দিয়ে শুনলেন। তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে নীচু গলায় বললেন, 'আমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে একজন মানুষের দুজন হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। একে বলে স্প্লিট পার্সোনালিটি। দ্বিখণ্ডিত সত্তা। কিন্তু আপনার যা হচ্ছে তার সঙ্গে এই অসুখের ঠিক মিল নেই। আপনি পুরোপুরি অন্য একজন মানুষ হয়ে যাচ্ছেন বলে আপনার মনে হচ্ছে। তার চোখ দিয়ে পৃথিবীটা দেখছেন। অন্যদের দেখছেন। এমনকী নিজেকেও দেখছেন। তাই তো?'

বিমলকান্তি মাথা নাড়লেন।

'এই ফেজটা কতক্ষণ থাকছে মিস্টার সেন? মানে অন্য একজন হয়ে যাওয়াটা?'

বিমলকান্তি বললেন, 'খুব অল্প সময়, কয়েক মুহূর্ত। আবার নর্মাল। আমি...আমি আবার বিমলকান্তি সেন হয়ে যাচ্ছি।'

boierpathshala.blogspot.com

ডাক্তার মণীশ রায় চুপ করে থেকে টেবিলের ওপর রাখা একটা পেনসিল দিয়ে টোকা দিতে লাগলেন। তিনি ভাবছেন। বললেন, 'আমাকে একটু সময় দিতে হবে মিস্টার সেন। দুদিন পরে আপনাকে আর একবার আসতে হবে। আমি বইপত্র জার্নাল ঘেঁটে দেখব। নিজেও ভাবব। সমস্যাটা আমাকে বুঝতে হবে। তার আগে আপনাকে হালকা একটা ওষুধ দিচ্ছি। রাতে খেয়ে শোবেন। আপনার স্ট্রেস কমানো দরকার।'

বিমলকান্তি সেন উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'ডাক্তারবাবু আমি ভালো হয়ে যাব তো?'

মণীশ রায় সামান্য হেসে বললেন, 'আগে আমাকে জানতে হবে, আদৌ আপনার কোনও অসুখ করেছে কিনা। এই বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই। মানবমনের যাবতীয় অস্বাভাবিকতাই যে অসুখ এ কথা বলা যায় না। তাহলে যে মানুষ অন্য ধরনের ভাবনাচিন্তা করেন, কল্পনা করেন, যা ঘটেনি তা নিয়ে চিন্তা করেন, তাকে অসুস্থ ধরতে হয়। তা তো একেবারেই নয়। মিস্টার সেন, এটাও তেমন হতে পারে। আপনার এটা অসুখ নাও হতে পারে।'

বিমলকান্তি অস্ফুটে বলেন, 'তবে কী?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সেটাই তো খুঁজে বের করতে হবে। ঠিক দুদিন পর, এই সময় আসবেন। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিখে রাখলাম।'

বিমলকান্তি ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে হালকা বোধ করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, এটা কোনও অসুখ নাও হতে পারে। এটা খুব ভালো কথা। ডাক্তার রায় চমৎকার একজন মানুষ। কী সুন্দর কথা বলেন। মনের চাপ অনেকটা কমিয়ে দিলেন। মনে মনে কর্ণিকাকে ধন্যবাদ দিলেন বিমলকান্তি। হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। আটটা বেজে গেছে। তাও একবার অফিসে গেলে ভালো হত। এই সপ্তাহে একটা বড় অর্ডার সামলাতে হবে। থাক, আজ যাবেন না। ক্লান্ত লাগছে।

আটচল্লিশ

শ্রবণ বিশ্বাস করছে না। তার কারণ এই ঘটনা বিশ্বাস করা যায় না। মুম্বইয়ের বিখ্যাত এক বিজ্ঞাপন সংস্থা প্রতি বছর একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিজ্ঞাপন বানানোর প্রতিযোগিতা। ওরা নাম দেয় 'ট্যালেন্ট হ্যান্ট'। প্রতিভার সন্ধান। বয়স তিরিশ বছরের কম হলে যে-কোনও ছেলেমেয়ে অংশ নিতে পারে। যে-কোনও ভাষায় বিজ্ঞাপন বানানো যায়। স্টিল হতে পারে, আবার মুভিও হতে পারে। যার যেটা পছন্দ। পুরস্কার বিরাট। প্রথম হলে এক লক্ষ টাকা। সঙ্গে ট্রফি তো থাকেই। তারপরে আরও দশটা পুরস্কার রয়েছে। সারা দেশের কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিজ্ঞাপন সংস্থা তিনটে বিষয় বলে দেয়। তার মধ্যে থেকে কোনও একটা বেছে নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। তবে কাজটা মৌলিক হতে হবে।

শ্রবণ এর আগে বার তিনেক ট্যালেন্ট হান্টে অংশ নিয়েছে। কিছুই হতে পারেনি। এমনকী ওরা এক হাজার জনকে যে মেরিট সার্টিফিকেট দেয়, তাও পায়নি। শ্রবণ অবশ্য এতে ভেঙে পড়ে না। আবার পাঠায়। সে মনে করে, এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে হার-জিতটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল, নতুন কাজ ভাবা। এটা কল্পনার প্র্যাকটিশ।

এবারও প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয় ছিল—আইসক্রিম, গাড়ি আর রং।

শ্রবণ 'গাড়ি' বেছে কাজ করেছিল।

নানারকম বিজ্ঞাপন বানিয়েছিল। মুভি নয়, স্টিল। কোনওটায় হাতে আঁকা, কোনওটা ফটোগ্রাফ দিয়ে। নীচে ক্যাপশন। কোনওটা আবার ফটোগ্রাফ আর হাতে আঁকা ছবি মিলিয়ে। শেষপর্যন্ত শ্রবণ হাতে আঁকা কাজটাই পছন্দ করে পাঠিয়ে দেয়। পাঠানোর আগে বারিধারাকে ফোন করে।

'ট্যালেন্ট হান্টে পাঠানো কাজটা কি তুমি একবার দেখবে বারি?'

ওপাশ থেকে বারিধারা হাই তুলে বলে, 'একেবারেই নয়। আমি দেখব না।'

boierpathshala.blogspot.com

শ্রবণ বলে, 'কেন? আমার কাজ কি খারাপ, ধারা?'

বারিধারা বলল, 'না, খারাপ না। খারাপ হয় না বলে, তুমি প্রাইজও পাও না। খারাপ হলে পেতে।'

শ্রবণ হতাশ গলায় বলে, 'তুমি যে কী হেঁয়ালি করো বারি, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। যাক, এবারের কাজটা একবার দেখো।'

বারিধারা ফোঁস করে নি:শ্বাস ফেলে বলে, 'তোমার এই বারি আর ধারার প্রবলেমটা কোনও দিনই কি মিটবে না? তুমি কি কিছুতেই একটা নামে স্থির থাকতে পারবে না? যাক এতদিন যখন পারোনি, আর পারতেও হবে না। বিজ্ঞাপনটা মেলে পাঠাও, দেখে নিচ্ছি।'

কাজ পাঠানোর মিনিটখানেকের মধ্যেই বারিধারা মেসেজ পাঠাল।

'কাজটা খুবই খারাপ। আমি নিশ্চিত, এবার তুমি প্রাইজ পাবে। বড় কোনও প্রাইজ। খারাপ কাজ করবার জন্য অনেক আদর। এখনও প্রাইজ পাওনি বলে ভারচ্যুয়াল আদর করলাম। প্রাইজ পেলে রিয়েল আদর করব।'

শ্রবণ আর দেরি করল না। বিজ্ঞাপনটা পাঠিয়ে দিল। বারিধারা খারাপ বলেছে, নিশ্চয় তার খুব পছন্দ হয়েছে। সে একটা উলটো বলা মেয়ে। উলটো বলা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে সমস্যা। মেয়ে যা বলে, তা মাথা খাটিয়ে বুঝতে হয়। বেশিরভাগ সময়েই তা বোঝা যায় না। তখন খেতে হয় বকুনি। উলটো বলা মেয়ের এই বকুনি অতি আনন্দদায়ক। এই বকুনি শোনবার জন্য ছেলেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে পারে।

শ্রবণের কাজটা এরকম—

বৃষ্টিতে শহরের রাস্তায় এক কোমর জল জমেছে। বাস, গাড়ি, টেম্পো, বাইক জলে নাক ডুবিয়ে কেতরে পড়েছে। হাতেটানা রিকশর সিট পর্যন্ত জল। এমনকী শহরের পথে নৌকা পর্যন্ত নেমেছে। রাস্তার ধারের নীচু ঘরবাড়ি ডুবে গেছে। শুধু একটা গাড়িই দুপাশে জল ছিটিয়ে ছুটছে। গাড়ির মাথায় গোল করে পাকানো ছেঁড়া মাদুর, ভাঙা টিনের সুটকেস, তাপ্পিমারা স্কুলব্যাগ, জীর্ণ লেপকম্বল বাঁধা। গাড়ির তিন জানলা দিয়ে কয়েকটা ছেলেমেয়ে আর তাদের বাবা-মায়েরা মুখ বের করে মহা ফুর্তিতে হাত নাড়ছে। বোঝাই যাচ্ছে পথের ধারের নীচু বাড়ি থেকে এদের উদ্ধার করা হয়েছে। ছবিটায় রিয়েল ড্রইং আছে, আবার খানিকটা কার্টুন ভাবও রয়েছে। নীচে ক্যাপশন—

'আমাকে কেউ আটকাতে পারে না, কারণ আমি সবাইকে নিয়ে চলতে জানি।'

কাল মুম্বই থেকে মেলে খবর এসেছে, শ্রবণ রায়ের বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে।

টুকরো টাকরা অর্ডারের জন্য শ্রবণকে ঘনঘন মেল দেখতে হয়। তাছাড়া যে অফিসের হয়ে ফ্রিলান্স কাজ করে, তারাও মেল করে নানারকম ইনস্ট্রাকশন পাঠায়। সেই কারণে মেল দেখা। এবং চমকে ওঠা।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠেছিল শ্রবণ। সে কি ঠিক পড়ছে? হতেই পারে না। সে নিশ্চয়ই ভুল পড়ছে। ইংরেজিতে সে এমনিতেই কাঁচা। প্যাঁচপয়জার বোঝে না। সংক্ষিপ্ত এবং সহজ চিঠিটি যে লেটার প্যাডে এসেছে, সেটি 'ট্যালেন্ট হান্ট' আয়োজকদের। ঠিকানা, ফোন নম্বর, সবই আছে, সেখানে যে বাক্যটি লেখা আছে তার মানে হল—

অভিনন্দন আপনাকে। আপনি আমাদের ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন।

প্রথম। মানে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার! এক লক্ষ টাকাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল, দেশের এত বড় একটা নামকরা বিজ্ঞাপন সংস্থা তার কাজকে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিল। তার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে? আবার ভয়ও করছে। শ্রবণের পেটের মধ্যে গুড়গুড় করছে। বুকও কি ধুকপুক করছে না। শ্রবণ ডিভানের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে। সে বুকে হাত দিল। হ্যাঁ, কেমন একটা করছে যেন।

হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। অবশ্যই কোথাও ভুল হয়েছে। ভুল ঠিকানায় মেল চলে এসেছে। গোটা দেশ থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে তাদের কাজ পাঠায়। তাদের মধ্যে আর কারও নাম শ্রবণ

boierpathshala.blogspot.com

রায় হতে পারে। এত বড় একটা দেশে একজনের নামই কি শুধু শ্রবণ? এমন কোনও কারণ নেই।

আর যদি তা না হয়? যদি তাকেই এই মেইল পাঠানো হয়? সত্যি যদি সে ফার্স্ট হয়ে থাকে?

কপালের ঘাম মুছে বারিধারাকে ফোনে ধরল শ্রবণ। বারিধারা চাপা গলায় কথা বলল।

'ব্যস্ত। পরে কথা বলব।'

শ্রবণ প্রায় আর্তনাদ করবার মতো করে বলে উঠল, 'বারি, একটা বিপদ হয়েছে।'

'বিপদ! কী হয়েছে?'

শ্রবণ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

বারিধারা চাপা গলায় এবার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'বললাম না ব্যস্ত? দেখা হবে না। কী হয়েছে বলো। চট করে বলবে। নিশ্চয় তুমি তোমার মতো কোনও উদ্ভট বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছ।'

শ্রবণ হতাশ গলায় বলল, 'তাই হয়েছে মনে হয়। আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ধারা, আমি তোমাকে একটা মেল ফরোয়ার্ড করছি। তুমি দেখে এর অর্থ আমাকে বলো। এখনই বলবে।'

বারিধারা বলল, 'পাঠাও। তবে এখন কিছু বলতে পারব না। এখন আমি লেখাপড়া করছি। দুদিন পরে আমার ফাইনাল পরীক্ষা। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে, তেমন কিছু হয়েছে। কিন্তু আমি যদি পরীক্ষায় ফার্স্ট না হতে পারি আমার বিপদ আছে।'

শ্রবণ মুম্বইয়ের মেল বারিধারাকে ফরোয়ার্ড করল। একটা নয়, ইতিমধ্যে আরও দু-দুটো মেল চলে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে—এই আগামী ২৫ তারিখ আমাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠাদিবস। ওই দিন আমরা আপনার হাতে পুরস্কার তুলে দিতে চাই। আপনার যাতায়াত এবং আতিথেয়েতার যাবতীয় দায়িত্ব আমাদের। আপনি যদি চান সঙ্গে একজনকে আনতে পারেন। তার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি জানালে আমরা যথাসময়ে প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করব।'

শ্রবণের মাথা ঘুরছে। গা-হাত-পা ঝিমঝিম করছে। সে তার ডিভান থেকে নেমে বাথরুমে গেল। চোখে মুখে জল ছিটোল। ঘরে ফিরতেই মোবাইল ফোন বেজে উঠল। বারিধারা।

'বলো বারি। মেলগুলো দেখলে? নিশ্চয় কেউ ঠাট্টা করেছে।'

ওপাশ থেকে বারিধারা শান্ত অথচ কান্না ভেজা গলায় বলল, 'অভিনন্দন শ্রবণ।' আমি বলেছিলাম, কাজটা মারাত্মক হয়েছে, তোমাকে এবার আটকাতে পারবে না।'

শ্রবণ বলল, 'কী বলছ ধারা! ঘটনা সত্যি?'

বারিধারা বোধহয় আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলল, 'না, সত্যি নয়। তুমি আগে বাড়িতে সবাইকে বলো। তারা সব থেকে খুশি হবেন।'

শ্রবণ অস্ফুটে কিছু বলতে গেল। বারিধারা এবার প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'আগে যাও।'

শ্রবণ নীচে নামল।

ছেলের সুখবর শুনে সুঙ্গমাদেবী হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন।

মেয়েদের এই এক বিচ্ছিরি স্বভাব। ভালোবাসার জনের ভালো কিছু হলে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। কেউ বারিধারার মতো নি:শব্দে কাঁদে, কেউ মায়ের মতো হাউমাউ করে।

সুরঙ্গমাদেবী কপালে হাত ঠেকিয়ে বারবার বলতে থাকলেন, 'সবই ঠাকুরের কৃপা...সবই ঠাকুরের কৃপা...। হ্যাঁ গো, আমি তোমায় বলেছিলাম না, আমার ছোটছেলে একদিন ফার্স্ট হবে? কী গো বলিনি? চুপ করে আছ কেন, বলো?'

দীপ্ততোষবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'তুমি যে ফার্স্টের কথা বলতে এটা সে ফার্স্ট নয় সুরঙ্গমা। তুমি লেখাপড়ায় ফার্স্ট হওয়ার কথা বলতে। শ্রবণ লেখাপড়ায় খুবই খারাপ একজন স্টুডেন্ট ছিল।'

সুরঙ্গমাদেবী বললেন, 'ওই একই হল। ফার্স্ট ফার্স্টই। তার আবার লেখাপড়াই বা কী, আর না লেখাপড়াই বা কী; সবই ঠাকুরের কৃপা।'

boierpathshala.blogspot.com

দীপ্ততোষবাবু বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'একটু চুপ করো। ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও।'

সুরঙ্গমাদেবী বললেন, 'ব্যাপার বুঝে আমার কাজ নেই। তুমি বোঝো। আমি আগে মন্দিরে পুজো দিতে চললাম।'

দীপ্ততোষবাবু খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থাকলেন। তারপর ছোটছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কত টাকা বললে?'

শ্রবণ মাথা নামিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, 'যতদূর জানি এক লক্ষ টাকা।'

শ্রবণের কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হবে, সে বিরাট কোনও অপরাধ করে ফেলেছে।

দীপ্ততোষবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন। সম্ভবত দেখার চেষ্টা করলেন, এমন একটা অবিশ্বাস্য কথা আর কেউ শুনছে কি না। তারপর অবাক গলায় বললেন, 'তুমি কী এমন কীর্তি করেছ, যাতে তোমাকে এতগুলো টাকা দেওয়া হচ্ছে?'

শ্রবণ মাথা চুলকে বলল, 'বাবা, আমি একটা গাড়ি...আমি একটা গাড়ির ছবি এঁকেছি...।'

দীপ্ততোষবাবু চোখ বড় করে বললেন, 'গাড়ির ছবির জন্য এক লক্ষ টাকা!'

শ্রবণ মাথা চুলকে বলল, 'না, ঠিক গাড়ির ছবি নয়, আমি একটা বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় কনসেপ্ট পাঠিয়েছিলাম। সেটায় আমি ফার্স্ট হয়েছি।'

দীপ্ততোষবাবু বললেন, 'কী বিজ্ঞাপন?'

'গাড়ির'। বলে শ্রবণ হাতে-রাখা খাম খুলে ছবিটা বের করে বাবার দিকে এগিয়ে দিল। দীপ্ততোষবাবু অনেকটা সময় নিয়ে ছবিটা দেখলেন। নীচের ক্যাপশনটা পড়লেন। মুখ তুললেন। তিনি একই সঙ্গে খানিকটা হতচকিত, খানিকটা অবিশ্বাসী, আর খানিকটা মুগ্ধ।

'ওটা তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে?'

শ্রবণ কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, সবটাই আমার। প্রথমে ভেবেছি, তারপর সেটাকে ছবিতে...।'

দীপ্ততোষবাবু বললেন, 'তুমি কি মনে করো, এতে গাড়িটার বিক্রি বাড়বে? কতগুলো গরিব মানুষের বাক্সপেঁটরা যে গাড়ির ছাদে থাকে, সেই গাড়ি মানুষ কিনবে কেন? মানুষ গাড়ি কেনে সব দিক বিচার করে। গাড়ির বাইরের চেহারা, ভিতরের যন্ত্রপাতি, তার চলবার যোগ্যতা, পরিশ্রমের ক্ষমতা, যাত্রীদের আরামের কথা বিবেচনা করে একজন এতটাকা খরচ করে। তোমার এই বিজ্ঞাপনে তো সেসব কিছুই নেই!'

শ্রবণ এতক্ষণে যেন তার জানা প্রশ্ন পেল। সে বলল, 'বিজ্ঞাপনের জন্য কেউ গাড়ি কেনে না। বিজ্ঞাপন নজর কাড়ে। বাইরে থেকে নজর কাড়ে। আমি ভেতর থেকে সেই মনোযোগ পেতে চেয়েছি। মানুষের একসঙ্গে থাকবার ইচ্ছেকে দেখাবার চেষ্টা করেছি। তার ওপর...তার ওপর বলবার চেষ্টা করেছি, এই গাড়িটা একটা ভালো গাড়ি...কারণ এটা দিয়ে ভালো কাজ করা যায়... বিপদে-পড়া মানুষকে উদ্ধার করা যায়...।'

দীপ্ততোষবাবু খানিকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এদিকে এসো। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব। এতদিন ভেবেছিলাম, তুমি হাবিজাবি কাজ করো। আজকাল ছেলেছোকরারা এসব ছবিটবির নামে আসলে কোনও কাজই করে না। আজ বুঝতে পারছি, ভুল ভাবতাম। কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে বলে নয়, এমন একটা বিষয় তোমার মাথায় এসেছে বলে, পিতা হিসেবে আমি গর্ববোধ করছি। এসো।'

দাদা পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'দেখিস প্রাইজ মানিটা উড়িয়ে দিস না। চাকরির অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে লাগবে। চাকরিবাকরি তো একটা করতে হবে। এক লক্ষ টাকা দিয়ে তো জীবন চলবে না!'

বউদি লাফিয়ে উঠে বলল, 'ইস তুমি মুম্বই যাবে? কত ফিল্ম স্টার দেখতে পাবে!'

বিকেল হওয়ার মুখে শ্রবণ আরও একটা দারুণ খবর পেল। এবার শ্রবণের মনে হল, সত্যি তার হার্ট অ্যাটাক হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। বিপদ পরপর আসে, আনন্দ কখনও পরপর আসে না।

ঊনপঞ্চাশ

boierpathshala.blogspot.com

'আমার ভয় করছে বারি। আমি কি পারব?'

বারিধারা বলল, 'ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি একজন বোকা মানুষ। বোকা মানুষরা অনেক কিছু পারে। তুমিও পারবে।'

শ্রবণ অসহায় গলায় বলল, 'এরকম একটা সিরিয়াস সময়ে ঠাট্টা কোরো না ধারা।'

বারিধারা হাত বাড়িয়ে শ্রবণের নাক নেড়ে বলল, 'ঠাট্টা করব না তো কী করব? প্রাইজ পেয়ে একজনকে এত নার্ভাস হতে কেউ কখনও দেখেছে! বোকা একটা।'

শ্রবণ আগ্রহ নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, বারি কেউ আমার সঙ্গে রসিকতা করছে না তো? আমাদের কোনও বন্ধু?'

বারিধারা বলল, 'আমি তোমার ওই কম্পিটিশনওলাদের সাইট চেক করে সব দেখে নিয়েছি। তুমি দেখবে? মোবাইলে খুলব?'

শ্রবণ তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বলল, 'না না, আমাকে আর দেখাতে হবে না। আমিও ওদের সাইটে ঢুকে দেখে নিয়েছি। আমার নাম আছে। আমার বাবার নাম আছে। আমার বাড়ির ঠিকানা আছে। ভুল হওয়ার কোনও উপায় নেই। তারপরেও ভাবছিলাম...যাক আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে ধারা...তার ওপর দ্বিতীয় মেইলটা...বাপরে...মাথা ঘুরছে...।'

শ্রবণ আর বারিধারা বসে আছে বালিগঞ্জের এক আইসক্রিমের দোকানে। বড় কোম্পানির দোকান। দোকান না বলে আউটলেট বলা ভালো। কাচে ঘেরা এই আউটলেটের নাম 'বি কুল'। যার মোটামুটি একটা বাংলা হল 'ঠান্ডা হও'। ভিতরে নরম আলো। একটা আবছা ভাব।

শ্রবণকে 'ঠান্ডা' করতে বারিধারা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু শ্রবণ ঠান্ডা হচ্ছে না। যত সময় যাচ্ছে, তার অস্থিরতা বাড়ছে। বাড়াটাই স্বভাবিক। তার ওপর দিয়ে আজ একটার পর একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ঝড় সাধারণত হয় ক্ষতির। শ্রবণের এই ঝড় সৌভাগ্যের ঝড়। দুপুরবেলা মুম্বই থেকে আবার যে খবর এসেছে সেটা দেখে শ্রবণের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার মতো অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে সে বারিধারাকে টেলিফোন করল।

'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই বারি এবং সেটা এখনই চাই।'

বারিধারা শ্রবণের এই ধরনের কথায় অভ্যস্ত। ছেলেটা খাঁটি, তাই নার্ভাস। নিজের সাফল্য সামলাতে পারছে না। বেচারি, এতদিন কাজের তো তেমন কোনও স্বীকৃতি জোটেনি। শিল্পী মানুষের এটাই হয়। অনেক অবহেলার মধ্যে থাকতে হয়। তারপর যেদিন সবাই হাততালি দেয় তখন বিশ্বাস হয় না।

বারিধারা বলল, 'এখনই কেন?'

শ্রবণ বলল, 'মনে হচ্ছে, এটা আমাদের শেষ দেখা হবে ধারা।'

বারিধারা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল, 'এরকম মনে হওয়ার কারণ?'

শ্রবণ অসহায় গলায় বলল, 'আমার সম্ভবত একটু পরেই হার্ট অ্যাটাক হবে। আমি মারা যাব। সম্ভবত সেটা হয়ে গেছে।'

বারিধারা ঠান্ডা গলায় বলল, 'ও তাহলে তো তুমি এখন ভূত। তোমাকে ভূতেদের ভাষাতে বলি, আই লাঁভ হুঁউ শ্রঁবণ।'

শ্রবণ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'ধারা, ঠাট্টা ভালো লাগছে না। সত্যি মনে হচ্ছে, আমি মরে যাব।'

বারিধারা গম্ভীর গলায় বলল, 'প্রাইজ নিয়ে মারা যাবে? নাকি প্রাইজ না নিয়ে মারা যাবে? মারা যাবার পর প্রাইজ নট ব্যাড। মরণোত্তর পুরস্কারে দাম বেশি।'

শ্রবণ কাঁপা বলল, 'প্রাইজ নয় বারিধারা, মুম্বই থেকে আবার একটা মেইল এসেছে।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা এবার হালকা চিন্তিত হল। বলল, 'আবার মেইল! কী বলেছে, প্রাইজ ক্যানসেল? সেকেন্ড থটে বাদ পড়েছ?'

শ্রবণ বলল, 'না তা নয়। তাহলে তো বেঁচে যেতাম। এবার মেইলে...আগে বলো কোথায় দেখা করবে, মুখোমুখি বলতে চাই।'

বারিধারা একটু চিন্তা করে বলল, 'তোমার অবস্থা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে, শ্রবণ। আগে তোমার মাথা ঠান্ডা হওয়া দরকার। এমন একটা জায়গায় তোমাকে নিয়ে যেতে হবে যেখানে তোমার মাথা ঠান্ডা হয়।'

তারপরই বারিধারা এই 'বি কুল'-এ আসবার কথা বলছে। শ্রবণ একটু দেরি করেছে। বারিধারা এসেছে ওলা ক্যাব ডেকে। ছেলেটা যখন এতটা ঘাবড়ে ডাকাডাকি করছে তখন সিরিয়াসভাবেই নেওয়া উচিত। আজ দেখা করতই। এমন একটা খুশির দিন। তবে হয়তো খানিকটা পরে যেত। যাক, খাতাবই সরিয়ে বারিধারা বেরিয়ে পড়েছে। বেরোনোর সময় মণিকুন্তলা বললেন, 'কী রে আবার কোথায় যাচ্ছিস? এই তো বললি আজ বাড়িতে বসে পড়ব, আমাকে বিরক্ত কোরো না। বললি না?'

বারিধারা গম্ভীরভাবে বলল, 'না বেরিয়ে উপায় নেই মা। আমাকে বেরোতেই হবে।'

মেয়ে বড় হয়েছে, কোথায় যাচ্ছে সবসময় জিগ্যেস করা ঠিক নয়। তারপরেও মণিকুন্তলা সবসময় 'মাতৃ টেনশন' সামলাতে পারে না।

'কোথায় বেরোচ্ছিস?'

বারিধারা ঠান্ডা গলায় বলল, 'মুম্বই।'

মণিকুন্তলা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'মুম্বই! কী বলছিস?'

বারিধারা বলল, 'হ্যাঁ মা, আমি মুম্বই চলে যাচ্ছি।'

মণিকুন্তলার হাত নিশপিশ করে উঠল। ফাজলামির অপরাধে এখনই তার ছোট মেয়ের কান দুটো ভালো করে মুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু তাহলে এই মেয়ের কান দিনে যে ক'বার মুলতে হবে তার ঠিক নেই। মুশকিলের হল, বারিধারা ফাজলামি করতে করতে নানারকম কঠিন কাজ করতে পারে। এমন সব কঠিন কাজ যে অন্যরা করবার কথা ভাবতেও পারবে না। তার বাবা জীবনটাকে সিরিয়াস রাখবার যে ব্রত নিয়ে চলে, মেয়েটা তার উলটো।

এই তো কিছুদিন আগেই বারিধারা তার একটা ঝামেলা সামলে দিয়েছে। মণিকুন্তলার এক পিসতুতো দাদা, মাঝে মাঝে এসে টাকাপয়সা নিয়ে যেত। এক-একদিন এক-একটা বাহানা। কোনওদিন বলত, মেয়ের শরীর খারাপ, কোনওদিন বলত বাড়ি ভাড়া বাকি, কোনওদিন বলত, ব্যবসায় লাগবে। মণিকুন্তলা পাঁচশো, হাজার টাকা দিয়ে বিদায় করতেন। কাউকে বলতেন না। ভাবতেন, আহা রে দরিদ্র মানুষ। যতই হোক আত্মীয় তো। বছরখানেক এভাবে চলার পর, সেই দাদাটি টাকার অ্যামাউন্ট বাড়াতে বলল। পাঁচশো, হাজারে আর সে সন্তুষ্ট নয়।

'মণি, তোর বরের কাছ থেকে হাজার বিশেক টাকা জোগাড় করে দে। ব্যবসার ধার শোধ করব। নইলে ঘটিবাটি সব যাবে।'

প্রমাদ গুনলেন মণিকুন্তলা। তিনি বললেন, 'অত টাকা কোথা থেকে পাব!'

সেই দাদা ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলল, 'মজা করছিস মণি? বিশ হাজারকে বলছিস অত টাকা! এত বড় একটা কোম্পানির মালিক। বিশ হাজার কেন, বিশ লাখও কোনও ব্যাপার নয়।'

মণিকুন্তলা প্রমাদ গুনলেন। তিনি বুঝলেন, এই লোককে টাকা দিয়ে দিয়ে মাথায় তিনিই তুলেছেন। তিনি কড়া হলেন।

'আমার কাছে এত টাকা নেই। আর থাকলেও দিতে পারব না।'

'দিতে পারবে না বললে কী করে হবে মাই সিস্টার? টাকা তো আমার চাই।'

'বললাম তো পারব না।'

boierpathshala.blogspot.com

'ঠিক আছে, তাহলে আমি বিমলকান্তির সঙ্গে দেখা করে, তার থেকে চাই। তার তো টাকা আছে। নাকি সে-ও আমার মতো ভিখিরি।'

মণিকুন্তলা বুঝলেন, এটা একটা বিপদের কথা। স্বামীর কাছে যাওয়া মানেই সে সব জানবে। বিরাট রাগারাগি শুরু করবে। সে টাকাপয়সা বিলোনোর সাহায্য মোটে পছন্দ করে না। তার শ্বশুরমশাইও এসবের বিরুদ্ধে। মেয়েরা শুনলেও ছাড়বে না। তাহলে কী করা যাবে? মণিকুন্তলা তার সেই দাদাটিকে বললেন, 'দুদিন পরে ফোন করে যোগাযোগ করো, দেখছি।'

'ফোন নয়। আমি দুদিন পরে নিজেই চলে আসব।'

রাতে বারিধারাকে কাঁচুমাচু মুখে সব বলেছিলেন মণিকুন্তলা।

'কাজটা ভুল হয়ে গেছে। আসলে এমনভাবে এসে বলত...।'

বারিধারা মুখের সামনে থেকে মুখ না সরিয়েই বলেছিল, 'ভুল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অমন কাঁচুমাচু হবার মতো কিছু ভুল হয়নি মা।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'তোর বাবা শুনলে খুব রাগারাগি করবে।'

বারিধারা বলল, 'রাগারাগি করলে সেটাও ভুল হবে। একজন আত্মীয় অসহায়তার কথা বলে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, এর জন্য বাবার রাগ করবার কী আছে? একেকজনের সাহায্য করবার প্যাটার্ন এক-একরকম। বাবা মানুষকে সাহায্য করে। বুধবার সকালে বাড়িতে যে দরবার খুলে বসে সেখানে কী করে? তবে বাবার কায়দাটা অন্য। টাকা বিলোনোর নয়। বুদ্ধিমানের। তোমারটা বোকামির। তার মানে অন্যায় নয়।'

মণিকুন্তলা চিন্তিত গলায় বললেন, 'লেকচার থামা। এখন কী করব সেটা বল। তোর বাবাকে সব বলে দিই।'

বারিধারা বলল, 'কোনও দরকার নেই। বাবা কী করবে? আমি ব্যবস্থা করব। তুমি ওনার ফোন নম্বরটা দাও।'

মণিকুন্তলা অবাক হয়ে বললেন, 'তুই! তুই কী করবি বৃষ্টি?'

বারিধারা মুচকি হেসে বলল, 'মামা যাতে আর তোমাকে টাকা চেয়ে বিরক্ত না করে তার ব্যবস্থা করব।'

মণিকুন্তলা ভয় পেয়ে বললেন, 'গালমন্দ করবি নাকি?'

বারিধারা হাই তুলে বলল, 'তাই করা উচিত। গালমন্দ তেমন নয়, হালকা থ্রেট করলেই কাজ হয়ে যাবে। এই ধরো বাড়ির এক কিলোমিটারের মধ্যে দেখলে পা ভেঙে দেব গোছের কিছু। কিন্তু সেটা করা যাবে না। এতদিন ধরে তুমি তাকে যেভাবে সাপোর্ট দিয়েছ, তার সঙ্গে পা ভেঙে দেবার ব্যাপারটা যাবে না। তাছাড়া ভাগ্নি হয়ে মামার পা ভেঙে দেওয়াটা ঠিকও নয়। অন্য পথে যেতে হবে।'

মণিকুন্তলা বলল, 'সেটা কী?'

বারিধারা হাত বাড়িয়ে মণিকুন্তলার গায়ে হাত রাখল। হেসে বলল, 'চিন্তা কোরো না। মেয়ে তোমার বড় হয়ে গেছে মা। মাকে প্রোটেক্ট করবার মতো জোর তার আছে। তুমি ফোন নম্বরটা লিখে দিয়ে কেটে পড়ো, আমাকে পড়তে দাও। বাবাকে এসব বলে আর বিরক্ত কোরো না। যাও এবার।'

সেই 'দাদা' মণিকুন্তলার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি। মণিকুন্তলা মেয়েকে চেপে ধরে ঘটনা জানতে পেরেছে।

বারিধারা হেসে বলেছিল, 'একে বলে অ্যাকশন উইদাউট ব্লাড শেড। তোমার দাদাকে ফোন করে থিয়েটার করলাম। গলায় টেনশন আর ফিসফিসানি নিয়ে বললাম, বড়মামা, আমি বৃষ্টি বলছি। একটা বিরাট বিপদে পড়ে তোমায় ফোন করেছি। আগামী শনিবার আমি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করছি। তুমি তো জানো বড়মামা এসব আমাদের বাড়িতে চলে না। বাবা শুনলে গুলি করে মারবে। মা শুনলে ঝুলঝাড়া পেটা করবে। যাকে বিয়ে করছি, সেই ছেলের বাড়ি আরও কড়া। বাড়ির এক মাইলের মধ্যে ঘেঁষতে পারবে না। তাই আমি ঠিক করেছি, বিয়ে করে আমি আর আমার বর তোমার বাড়িতে গিয়ে উঠব। ওখানেই বাসর, বউভাত, ফুলশয্যা

boierpathshala.blogspot.com

করব। এসব তো বন্ধুদের বাড়িতে হয় না, গার্জেন লাগে। তুমি আর বড়মামি আমাদের গার্জেন হবে। মনে রাখবে মামা, মা যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে। তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। আমার বয়ফ্রেন্ড আবার পার্টি পলিটিক্সের লোক। রগচটা গুন্ডা একটা। দু'বার জেল খেটে এসেছে। কিন্তু ছেলে খুবই ভালো। বড়মামা, শনিবার বিকেলে তাহলে তোমার বাড়িতে গিয়ে উঠছি। তাই তো? পরে একবার ফোন করে টাইমটা ফাইনাল করে নেব। দেখো, বড়মামা আমাকে তুমি ডুবিও না। আমার বয়ফ্রেন্ড আবার গদ্দারি একেবারে মেনে নিতে পারে না। হিন্দি সিনেমার ভিলেনদের মতো। ব্যস, তারপর থেকে তোমার দাদা ফোন বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি সিওর উনি আপাতত কয়েক মাস তোমার ধারেকাছে ঘেঁষবে না।'

কথা শেষ করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। এই মেয়েকে শুধু ফাজিল বলা যায়?

মুম্বই যাবার রসিকতা শুনে মণিকুন্তলা মেয়ের ওপর রাগ দেখিয়ে চটি ফটফটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বারিধারা কাউন্টার থেকে দুটো ককটেল আইসক্রিম নিয়ে এল। এরা বিভিন্ন ফ্লেভারের আইসক্রিম মিলিয়ে মিশিয়ে দারুণ ককটেল বানায়। দিদির সঙ্গে মাঝে মাঝে এসে খেয়ে যায় বারিধারা। মেঘবতীর আইসক্রিম সহ্য হয় না। খেলেই গলা ধরে। তারপরেও খায়।

বারিধারা খানিকটা আইসক্রিম মুখে দিয়ে বলল, 'নাও এবার বলো, দ্বিতীয় মেইলে কী এসেছে?'

শ্রবণ হাত বাড়িয়ে বারিধারার হাতটা ধরল। বারিধারাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। সে একটা সবুজ রঙের পালাজো পরেছে। সঙ্গে স্লিভলেস টপ। সেটাও সবুজ। তবে অন্য একটা শেড।

শ্রবণ কাঁপা গলায়, 'বারিধারা, ওরা আমাকে চাকরি অফার করেছে।'

বারিধারা বলল, 'চাকরি! কারা?'

শ্রবণ বলল, 'যারা এই কম্পিটিশনটা করে তারা। অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি।'

বারিধারা শ্রবণের হাত চেপে ধরে বলল, 'কনগ্রাচুলেশন! কনগ্রাচুলেশন শ্রবণ!'

শ্রবণ বলল, বারি, রাখো তোমার কনগ্রাচুলেশন। ধারা, আগে তুমি মোবাইলে আমার মেইলটা খুলে চিঠি পড়ো।'

বারিধারা দ্রুত হাতে নিজের মোবাইল ঘাঁটতে লাগল। মেইলটা বের করে নিমেষে পড়েও ফেলল। অল্প কথায় যা লেখা আছে তার মানে হল—

'...আমরা এর আগেও এই কম্পিটিশনের টপারদের আমাদের সংস্থায় যোগ দেবার জন্য অফার করেছি। কেউ এসেছেন, কেউ পারেননি। যাদের কাজ দেখে আমাদের অতিরিক্ত ইনোভেটিভ বলে মনে হয়, তাদেরই ডাকি। আপনাকেও ডাকছি। আপনি যদি আমাদের সংস্থার 'কনসেপ্ট অ্যান্ড ডিজাইন' ডিভিশনে যোগ দেন আমরা খুশি হব।'

এর সঙ্গে বেতন, গাড়ি, ভাসিতে কোম্পানির ফ্ল্যাট এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধের কথা বলা আছে। বারিধারা মোবাইল থেকে মুখ সরিয়ে শ্রবণের দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকাল।

শ্রবণ মনে মনে লজ্জা পেল। একটু হাসল। বলল, 'সামান্য একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া...তাতে ওরা যে কী পেল...।'

বারিধারা বলল, 'একেই বলে প্রফেশনাল। হীরে চেনবার চোখ। সাধে সবাই ওসব জায়গায় গিয়ে কাজ করতে চায়? গুণী মানুষকে বাইরে রাখতে চায় না। আমাদের এখানে উলটো হয়। গুনী মানুষকে সবাই মিলে ঠোকরায়। আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে উঠতে না পারে। তোমাদের মতো প্রতিভাধরদের ছোট চোখে দেখাটা বাঙালির একটা অভ্যেস। গুণের বিচারে বেশিরভাগ সময়েই হয় না। বুঝতেও পারে না ছাই। মিডিওক্রেসির যুগ। তারাই সবক্ষেত্রে মাথার ওপর বসে থাকে। যে পয়সাওলাকে আর ক্ষমতাওলাকে ম্যানেজ করতে পারবে সে-ই বাংলায় সব থেকে গুণী।'

শ্রবণ গলা নামিয়ে বলল, 'বারি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো?'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা ভেজা চোখে বলল, 'কোথায়?'

'কেন, যেখানে আমি চাকরি করতে যাব। মুম্বইতে? তুমি না গেলে আমি কিন্তু কিছু পারব না।'

বারিধারার শরীরের ভিতর ঝিমঝিম করে উঠল। আজই মাকে বলে এসেছে না সে মুম্বই যাচ্ছে! একেই বলে কোইনসিডেন্স।

বারিধারা ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, যাব, কিন্তু তার আগে আমি একটা কাজ করব।'

শ্রবণ বলল, 'কী কাজ?'

বারিধারা উঁচু চেয়ার থেকে ঝুঁকে পড়ে শ্রবণের মুখটা দুহাত দিয়ে টেনে আনল নিজের কাছে। তারপর আইসক্রিম ভেজা ঠোঁটে লম্বা চুমু খেল।

বারিধারা আর শ্রবণ দুজনেই বুঝতে পারল, প্রকাশ্যে হলেও এই চুম্বনে কোনও লজ্জা নেই। কারণ তাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না। গভীর ভালোবাসা তাদের আব্রু হয়ে ঘিরে আছে। কেউ সেখানে উকি মারবে তার সাধ্যি কী?

পঞ্চাশ

শেখর আজ পার্টি অফিসে যায়নি।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই শেখর বুঝতে পেরেছে, শরীর ভালো নেই। গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। সম্ভবত জ্বর আসছে। তমসাকে কিছু বলেনি। সে স্কুলে চলে গেছে।

তমসাদের স্কুলে একটা গোলমাল চলছে। অতিরিক্ত খারাপ নম্বর পাওয়ার কারণে হায়ার সেকেন্ডারি টেস্ট পরীক্ষায় কয়েকজন মেয়েকে আটকানো হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, আবার পরীক্ষা দিতে হবে। পাস করলে তবেই ফাইনাল পরীক্ষায় বসবার সুযোগ মিলবে। এরপরই ফেল করা মেয়েদের বাড়ি থেকে গার্জেনরা এসে স্কুলে গোলমাল করেছে। তারা এক দুপুরে জোর করে হেডমিসট্রেসের ঘরে ঢোকে। হুমকি দেয়। গালমন্দ করে। এমনকী টিচার্স রুমের সামনে দাঁড়িয়েও চিৎকার করে। বলে, সব মেয়েকে টেস্ট পরীক্ষায় পাস করাতে হবে। নইলে স্কুল ভাঙচুর হবে। শিক্ষিকাদের আটকে রাখা হবে।

জানা গেছে, এই গোলমালের পিছনে রয়েছে স্থানীয় এক প্রভাবশালী। সে-ই এই গার্জেনদের জড়ো করে স্কুলে পাঠিয়েছে। সঙ্গে কিছু গুন্ডা। লোকটার এই স্কুলের ওপর বহুদিনের রাগ। ইচ্ছেমতো মেয়েদের ভর্তি করতে পারে না। নিজের লোকদের পিওন, দারোয়ানের চাকরি দিতে পারে না। স্কুলের জিনিসপত্র কেনবার বরাত আদায় করতে পারে না। গোলমালের পর হেডমিসট্রেস তাকে ফোন করেছিলেন। লোকটা ফোনই ধরেনি। হেডমিসট্রেস ভয় পেয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, ফেল করা মেয়েদের ছেড়ে দেওয়া হোক। তারা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় খারাপ করলে নিজেরা বুঝবে। টিচারদের বেশিরভাগই বেঁকে বসেছে। তারা বলছে, পাস-ফেলটা বড় কথা নয়, কিন্তু আজ হুমকি শুনে নরম হলে, আগামী দিনেও সবসময় নরম হতে হবে। যে-কোনও বিষয়ে বাইরের গুন্ডারা এসে গোলমাল পাকাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ টিচারদের চাপে হেডমিসট্রেস আবার পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন। রাখতে বাধ্য হয়েছেন। গতকাল নতুন পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে নোটিস পড়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আজ আবার সেইসব গুন্ডা গার্জেনরা গোলমাল করতে স্কুলে আসবে। শিক্ষিকারা সবাই আজ স্কুলে যাচ্ছে। তমসা তো যাবেই। সে এই ঘটনায় শিক্ষিকাদের মধ্যে বেশি সামনে এগিয়ে গেছে। গুন্ডামি মোকাবিলা করায় সে সব থেকে কড়া। তাকে বড়দি ডেকেছিলেন।

'তমসা, মনে রেখো মেয়েদের স্কুল...সত্যি যদি ওরা গোলমাল করে...সিকিউরিটির প্রশ্ন এসে যাচ্ছে...মাত্র এগারোটা মেয়ের জন্য...তার থেকে অ্যালাও করে দেওয়াটাই ভালো নয় কি?'

তমসা সাধারণত হেডমিসট্রেসের সঙ্গে একা কোনও আলোচনা করে না। সিনিয়র কাউকে নিয়ে যায়। কিন্তু এই ঘটনায় সে উত্তেজিত। তাই একাই গিয়েছিল।

boierpathshala.blogspot.com

'বড়দি, মেয়েদের স্কুল বলেই তো আমাদের বেশি করে রুখে দাঁড়ানো দরকার। এরপর তো ওরা রোজ ঝামেলা করতে আসবে। তা ছাড়া, সিকিউরিটির সঙ্গে আমাদের একটা সম্মান আছে।'

বড়দি বলেছিলেন, 'মাথা ঠান্ডা করো তমসা। কোনও কোনও সময় কমপ্রোমাইজ করাটা অসম্মানের নয়। বরং বুদ্ধিমানের। ওদের সঙ্গে টাকা, গুন্ডা আছে। আমাদের সেসব কিছু নেই।'

তমসা বলল, 'এক্ষেত্রে কমপ্রোমাইজ করা মানে, হাতজোড় করা। করতে পারেন। আপনার ইচ্ছে। তবে বাকি দিনগুলো কিন্তু হাতজোড় করেই আপনাকে এই স্কুলে চাকরি করতে হবে। সেটা কি আপনি পারবেন?'

'তুমি কি তাহলে কনফ্রনটেশনেই যেতে বলছ তমসা?'

তমসা বলে, 'কনফ্রনটেশনের কী আছে? আমরা আমাদের নিয়মে চলব। সত্যি তো আমরা মেয়েগুলোর কেরিয়ার নষ্ট করতে চাইছি না। ওরা তো পরীক্ষায় বসবেই। একটু সতর্ক করে দিতে চাইছি মাত্র। এটা ওদের ভালোর জন্য।'

বড়দি বললেন, 'ওদের বাড়ির লোক বুঝতে চাইছে না।'

তমসা হেসে বলল, 'এটা ঠিক নয় বড়দি। ওদের ভুল বোঝানো হচ্ছে।

বড়দি বললেন, 'তাহলে?'

তমসা বলল, 'তাহলে আর কী? আপনার সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে। নড়চড় হবে না। যা ঘটবার ঘটবে। সেরকম হলে আমরা স্কুলের সব গার্জেনের কাছে অ্যাপিল করব। তারা কী চান জানতে চাইব। তবে এরা বড় কোনও গোলমাল পাকানোর লোক নয়। সে সাহস বা জোর তাদের নেই।'

তমসা খানিকটা টেনশনে আছে। সত্যি ঝমেলার কিছু হলে দায়িত্ব তার ঘাড়ে পড়বে। বড়দি সবার মধ্যে থেকে তার দিকেই বেশি করে আঙুল তুলবেন। বলবেন, তমসাই তাকে সবথেকে বেশি চাপ দিয়েছিল। নইলে এত বড় ঝামেলা হতই না। সকাল থেকেই তমসা খানিকটা ব্যস্ত ছিল। একে ওকে ফোন করছিল। থানাতেও কথা বলেছে। থানা খুব একটা গা করেনি। বলেছে, ঝামেলা হলে হেডমিসট্রেসকে জানাতে হবে। আগে থেকে লোক পাঠানো অসম্ভব।

তমসা এতেও চিন্তিত। প্রভাবশালী লোকটা আগে থেকে পুলিশকে চেপে দেয়নি তো? হতে পারে।

এই অবস্থায় শেখর শরীরের কথা বলে তাকে আরও টেনশনে ফেলতে চায়নি। ছেলেও স্কুলে। শেখর একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়েছে। খটোমটো বই। একটু খটোমটো নয়, বেশি খটমট।

বইয়ের নাম থিওরি অব রিলেটিভিটি। লেখকের নাম বার্ট্রান্ড রাসেল। এক ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ আছে, যারা কথায় কথায় বলে 'সবই আপেক্ষিক'। এই কথা বলে তারা নিজেদের পণ্ডিত এবং দার্শনিক প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। কথাটা অর্থহীন। এই দুনিয়ার সবই যদি আপেক্ষিক হত, তাহলে আপেক্ষিকতা প্রমাণ করার প্রয়োজন হত না। তাই নিয়ে এত আলোচনাও থাকত না। অধিবিদ্যক অসম্ভব, যাকে বলা হয় মেটাফিজিক্যাল অ্যাবসার্ডিটিস, তার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় জগতের সব কিছুই একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ আপেক্ষিক। কিন্তু মজার বিষয় হল, থিওরি অব রিলেটিভিটি, যাকে বাংলায় বলা যায় অপেক্ষবাদ, সে কিন্তু এই তত্ব মেনে নেয়নি। থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে, যা আপেক্ষিক সেটা বাদ দিয়ে এমন একটা সিদ্ধান্ত পৌঁছতে সে সিদ্ধান্ত কখনওই কোনও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে না। এই সিদ্ধান্তকে বলা হয় সেটমেন্ট। এই থিওরিতে দেখা গিয়েছে, একজন পর্যবেক্ষক যা দেখতে পান তার ওপরে এইসব পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব আগে যা ভাবা গিয়েছিল তার থেকে বেশি। পারিপার্শ্বিকের এই ক্রিয়া কীভাবে সম্পূর্ণ দূর করা যায় থিওরি অব রিলেটিভিটি সেটাই দেখায়। এই থিওরিকে বিস্ময়কর যা কিছু আছে এটাই তার উৎস।

শেখর বইটা উলটো করে বিছানা থেকে নামল। টেবিলের ওপর ফ্লাস্ক ভর্তি চা রয়েছে। তমসাই করে রেখেছে। রোজই করে রাখে। শেখর প্রায়ই বারণ করে। সামান্য চা সে কি নিজে তৈরি করে নিতে পারে না? স্কুলের তাড়াহুড়োর মধ্যে আবার চা তৈরির ঝামেলা কেন? তমসা শোনে না। কিছু বলেও না। চা করে যায়।

boierpathshala.blogspot.com

পাশে কাপ। আজকাল অনেক সুন্দর দেখতে কাপ পাওয়া যায়। শেখরের জন্য একটা ঘন লাল কাপ কিনেছে। শেখর লাল কাপে আরাম করে চুমুক দিল। চা যে সবসময় খুব ভালো হয়েছে তা নয়। তাড়াহুড়োতে গোলমাল করে তমসা। কখনও লিকার কড়া, কখনও চিনি দেয় না। তারপরেও শেখর খুব তৃপ্তি পায়। চায়ের জন্য নয়, তমসাকে সঙ্গে পাওয়ার জন্য। মনে হয়, তমসা সবসময় কাজে থাকবার জন্যই এই চাটুকু বানিয়ে দিয়ে গেছে।

চায়ের কাপ নিয়ে শেখর আবার ফিরে এল বইয়ের কাছে।

একটা ঘটনা যখন দুজন পর্যবেক্ষক অনুভব করেন, তখন তাদের অনুভূতির মধ্যে যেমন কিছু মিল থাকে, কিছু অমিলও থাকে। রোজকার জীবনে এই পার্থক্য চোখে পড়ে না। পড়বার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু পদার্থবিদ্যা তো রোজকার জীবন নয়। শুধু পদার্থবিদ্যা নয়, মনস্তত্ত্বও তাই। এরা এই অনুভূতির পার্থক্য বিশেষভাবে নজর করে। কেন এমন হয়? ঘটনা একই। তারপরেও অনুভূতি কেন পৃথক হবে?

এর কারণ তিনটি। পর্যবেক্ষকদের বুদ্ধিবৃত্তি, ভাবনা, কল্পনা আলাদা, তাদের ইন্দ্রিয়গুলির বোধ আলাদা এবং তাদের ভৌত পরিস্থিতি আলাদা। ভৌত পরিস্থিতির অর্থ মূলত বস্তু হিসেবে যখন বিবেচনা করা হবে। ধরা যাক, আল্পস পর্বতের ওপর দুজন উঠেছেন। একজন সেখানকার সৌন্দর্য, রূপ, প্রকৃতি দেখবেন, অন্যজন হয়তো দেখবেন জলপ্রপাত থেকে কতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এই পার্থক্য মনের। যদিও থিওরি অব রিলেটিভিটি শরীর বা মন অনুষঙ্গ নিয়ে কাজ করে না। মাথাও ঘামায় না। তার সবটাই ভৌত পার্থক্য। শুদ্ধ ভৌত। যাকে বলে 'ফিজিকাল চেঞ্জ'। পর্যবেক্ষকদের বদলে যদি ক্যামেরা বা শব্দ রেকর্ড করবার যন্ত্র রাখা যায়, তবেই এই ভৌত পার্থক্য বোঝা যাবে। জীবের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। ধরা যাক, দুজন মানুষ তৃতীয় একজনের কথা শুনছে। যে কাছে থাকবে সে শুনবে জোরে। কোনও বস্তুর পতনের ক্ষেত্রেও দুজন দুই কোণ থেকে বিচার করবে। যন্ত্রের বেলায় তা হবে সমভাবে। পার্থক্য সমভাবে নথিভুক্ত করা যাবে। পর্যবেক্ষকদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে না।

শেখরের অল্প শীত শীত করছে। জ্বরটা এসে গেল মনে হয়। জ্বর এলে ঝামেলা আছে। অনেকগুলো কাজ আছে। কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা সংগঠন করবার পরিকল্পনা রয়েছে। এই সংগঠনে থাকবে যারা মিটিং মিছিল করে না, যারা নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত এবং যারা কম্পিউটার, মোবাইল ফোন নিয়ে থাকতে ভালোবাসে, ওয়াটসঅ্যাপ, মেল, টুইটারে স্বচ্ছন্দ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে হত, রাজনীতি কি শুধুই ফেসবুকে আটকে থাকবে? অর্চিনকে একসময় এই বিষয়ে বুঝিয়েছিল। যারা শুধু ফেসবুকে 'বিপ্লব' করে তাদের সমালোচনা করেছে। কিন্তু এখন সেই মনোভাব বদলাচ্ছে। পার্টিও বদলাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারছে। তাহলে সমাজ বদলের কাজে তাকে ব্যবহার করা হবে না কেন? অবশ্যই করতে হবে। পার্টির অনুমোদনও আছে। তবে সমস্যা একটাই, ওয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ফেসবুক এখন মূলত ব্যক্তি আক্রমণ, চুটকি, কেচ্ছায় মেতে রয়েছে। যেটুকু পছন্দ সবই ইস্যুভিত্তিক। ঘটনা ঘটলে তাকে শাবাশ বলা। এর মধ্যে একটা হিরোইজমও আছে। প্রতিবাদে, সমর্থনে নিজেকে 'বড়' করে দেখানোর চেষ্টা। এখান থেকে ছেলেমেয়েদের বের করে আনতে হবে। তার জন্য রাজনৈতিক ম্যাচিওরিটি তৈরি করা চাই। শুধু ইস্যু নয়, সঠিক পথের কথা নিজে থেকেই বলতে হবে। শুধু মধ্যবিত্তের ভালো লাগা, মন্দ লাগা না, কৃষক সমস্যা, শ্রমিক সমস্যা, যুব সমস্যার কথা বুঝতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে হবে। ওয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে সেসব কথা প্রচার করতে হবে। এই জন্যই শেখর তার এলাকায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা সংগঠন তৈরির কথা ভেবেছে। পার্টির কাছে নির্দিষ্টভাবে অনুমোদন চেয়ে পাঠিয়েছে। সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি পার্টির কোনও যোগ থাকবে না। আড়াল থেকে কন্ট্রোল থাকবে। অর্চিন এখানে থাকলে নতুন সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া যেত। পুলিশের ঝামেলা-টামেলা এড়িয়ে আড়ালে থেকে কাজটা করতে পারত। নিজের বয়সি শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলত। সে তো কোনও কথা শুনল না।

boierpathshala.blogspot.com

শেখর বার্ট্রান্ড রাসেলের পাতা ওলটাল।

আগে জানতে হবে পদার্থবিদ্যার সঠিক উদ্দেশ্য কী? বস্তুজগতে বাস্তবে কী ঘটছে, তার খবরাখবর দেওয়াটাই পদার্থবিদ্যার মূল কাজ। একাধিক বিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত অনুভূতির সম্পর্কে খবর জোগাড় করাটা তার কাজ নয়। পদার্থবিদ্যাকে ভৌত পদ্ধতির সেইসব অবয়ব নিয়ে কাজ করতে হবে যে অবয়বগুলি সব পর্যবেক্ষকের জন্যই এক। কারণ একমাত্র এই অবয়বগুলিতেই ভৌত ঘটনার নিজেস্ব বলে ভাবা যায়। এর জন্য দরকার, কোনও ঘটনা একজন পর্যবেক্ষকের কাছে কীভাবে আসছে, আরেকজনের কাছে কীভাবে আসছে, সেখান থেকে সরে যাওয়া। আসলে প্রয়োজন ঘটনার বিধিগুলি অভিন্ন হওয়া।

শেখর বই বন্ধ করল। তবে কি দুনিয়ার সব কিছু 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' দিয়ে বিচার করা যায়? সব কিছু না হলেও, বেশিটাই যায়। যদি কোনও ঘটনাকে 'বস্তু' হিসেবে না দেখা হয়, তবে তার মূল্যায়ন হবে অসম্পূর্ণ। কখনও কখনও ভুলও বটে। মানুষের দু:খ, অভাব, যন্ত্রণারও একটা ফিজিক্যাল চেহারা আছে। ভৌত অবস্থান। তাকে সরাতে হয়। কখনও বিপ্লবে, কখনও ভালোবেসে। শুধু মন নয়, জীবনকে পদার্থবিদ্যার বিধি দিয়েও ভাবতে হয়।

শেখর গায়ে চাদর টানল। আপশোস হচ্ছে, ফিজিক্স নিয়ে লেখাপড়া করলে রিলেটিভিটি তত্ব ঠিকমতো বোঝা যেত। শুধু ফিজিক্স নয়, দর্শনও জানতে হবে। জীবনে কত কিছু জানবার বাকি রয়ে গেল। রাসেল বোঝবার জন্য কোনও মাস্টারের কাছে গেলে কেমন হয়? নাকি জীবনই মাস্টার? মাস্টার যারা চারপাশে আছে তারাও। যেমন অর্চিন।

শীত করছে। জ্বর বাড়ছে। শেখর গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়েও পড়ল একসময়।

বিকেলে তমসা এসে জানাল, তাদের স্কুলে কোনও গোলমাল হয়নি। বড়দি পরীক্ষার নতুন রুটিন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করা মেয়েরা স্কুলের ভিতরে বাজি ফাটিয়েছে।

তমসা বলল, 'ছি ছি। স্কুলে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল।'

শেখর শুকনো হেসে বলল, 'শুধু মন দিয়ে বিচার করলেই হবে না। ঘটনার অবস্থান বিচার করতে হবে তমসা। থিওরি অব রিলেটিভিটি সেই কথাই বলছে।'

একান্ন

কর্ণিকা বাড়িতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

ড্রইংরুমে দুজন মহিলা বসে। এদের মধ্যে একজনকে কর্ণিকা চেনে। মায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। করবী মাসি। টালিগঞ্জের দিকে কোথায় যেন থাকে। অন্যজনকে চিনতে পারছে না। করবী মাসি সোফায় বসে আছেন, অচেনা মহিলার জন্য ভিতর থেকে কাঠের চেয়ারটা এনে দেওয়া হয়েছে। হাঁটু, কোমরে ব্যথা থাকলে অনেক সময় সোফায় বসতে কষ্ট হয়। তখন ভেতর থেকে কাঠের চেয়ারটা এনে দেওয়া হয়। মা-ও সোফায় বসে আছে। মুখে হাত কচলানো ভাব। কোনও বিষয়ে খুব গদগদ হলে মানুষের মুখে হাত কচলানো ভাব আসে। এটা একটা ভয়ের ব্যাপার। কর্ণিকা সতর্ক হল।

'ওই তো কনি, ওই তো এসেছে। আয় কনি, আয়।'

কর্ণিকা অবাক হল। মা এমন ভাব করছে যেন কনির বাড়িতে আসবার কথা ছিল না। অথচ সে রোজ কমবেশি এই সময়েই অফিস থেকে বাড়ি ফেরে। এক সময় ফেরবার পথে দোকান-বাজার করে ফিরত। মায়ের জন্য আনাজপাতি, বাবার জন্য মুড়ি, চানাচুর, ভাইয়ের জন্য চিপস, মোবাইল রিচার্জ কার্ড, নিজের জন্য তেল, শ্যাম্পু। যখন যেমন লাগে। আজকাল সমস্যা হয়। প্রোমোশনের পর অফিসের গাড়ি দিয়ে যায়। গাড়ি থামিয়ে কীভাবে কেনাকেটা করবে? তারপরেও মাঝে মাঝে নামে। বাজারের কাছে গাড়ি ছেড়ে দেয়।

boierpathshala.blogspot.com

কেনাটাকা করে রিকশা নেয় অথবা হেঁটে ফেরে। আজও তাই করেছে। হাতে একগাদা প্যাকেট। মা উদগ্রীব হয়ে উঠল।

'কীরে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিস নাকি? উফ তোকে কতবার বলেছি, গাড়ি ছাড়বি না। সারাদিন খেটেখুটে আসিস, তারপর আর দোকান বাজারে নামবার দরকার নেই।'

কর্ণিকা বুঝতে পারল, দোকান বাজারে আপত্তি নয়, মা আসলে অতিথিদের শোনাচ্ছে মেয়ে গাড়ি করে ফেরে। সে হতভম্ব ভাব কাটাতে মা এক মুখ হেসে বলল, 'কনি, করবীকে তো তুই জানিসই, আর ইনি হলেন মিসেস বোস। রানী বোস। লেডি ম্যাকলিন কলেজের প্রিন্সিপাল।'

ববকাট এবং মূলত সাদা চুলের অচেনা মহিলা অভিজাত হেসে বললেন, 'প্রিন্সিপাল নয়, এক্স প্রিন্সিপাল।'

মল্লিকাদেবী হাত কচলে হেসে বললেন, 'ওই একই হল মিসেস বোস। টিচার চিরকাল টিচারই থাকে। কখনও এক্স হয় না। এই তো এখনও ছোটবেলার কোনও দিদিমণিকে দেখলে আগে প্রণাম করি।'

মিসেস বোস অহঙ্কারের হাসি হাসলেন।

কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ, দু-হাতে প্যাকেট নিয়ে কর্ণিকা বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। শুধু প্যাকেট নয়, হাতে একটা বেগুনও আছে। বাবা ক'দিন ধরে বেগুনপোড়া খাওয়ার বায়না করছে। মেয়েকেও বলেছে।

'বুঝলি কনি, বেগুনপোড়া একটা ওয়ান্ডারফুল প্লেট। ঠিক মতো তৈরি করতে পারলে জবাব নেই। এক থালা ভাত খেয়ে ফেলা যায়।'

কর্ণিকা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি আবার বেগুনপোড়া নিয়ে পড়লে কেন বাবা?'

সুখময়বাবু এক গাল হেসে বললেন, 'সেদিন টিভিতে দেখাচ্ছিল।'

কর্ণিকা ভুরু কুঁচকে বলল, 'টিভিতে বেগুনপোড়াও দেখায় নাকি!'

সুখময়বাবু মেয়ের বিরক্তিতে পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'আরে, ওই যে রান্নাবান্নার অনুষ্ঠান হয় না? ওখানে দেখাচ্ছিল। কী যেন নাম প্রোগ্রামটা...আহা। কী যেন নাম...খাচ্ছি খাব? না না, খাব খাচ্ছি...না না তাও নয়...। যাক গে, যে নামই হোক রান্নাবান্না ভালো দেখায়।'

কর্ণিকা রেগে গিয়ে বলল, 'উফ বাবা, তুমি টিভি দেখা বন্ধ করো। একটা সুস্থ সবল লোক বাড়িতে বসে টিভিতে রান্নার শো দেখছো! এই কারণে বলি কাজ না করে তোমার মাথাটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

মেয়ের ধমকেও পাত্তা দিলেন না সুখময়বাবু।

'বুঝলি কনি, একেক দিন একেক রকম রান্না। কোনও দিন ঝাল, কোনও দিন ঝোল, কোনও দিন কষা, কোনও দিন অম্বল। সেদিন ছিল তোর পোড়া। বেগুন পুড়িয়ে পেঁয়াজ কুঁচি, লঙ্কা, অল্প লেবু, তার ওপর কাসুন্দি, আহা। এই দেখো জিভে জল এসে গেছে। কতদিন যে বেগুনপোড়া খাইনি। আহা! যাক টিভিতে দেখেই সুখ। এদের উচিত এই ধরনের প্রোগ্রাম আরও বাড়িয়ে দেওয়া!'

কর্ণিকা আরও রাগ দেখাতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। এই মানুষকে রাগ দেখিয়ে কী লাভ? জীবনটাকে সহজ সরল করতে করতে একেবারে বেগুনপোড়ায় নিয়ে গিয়ে ঠেকিয়েছে। কাজকর্ম ছাড়া ঘরে বসে থাকলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। মায়াও হয়।

আজ বাজারে বেগুন দেখে কর্ণিকার বাবার কথা পড়ে গেল। একটা বড় দেখে কিনেও ফেলেছে। নিজেই গ্যাসে পুড়িয়ে দেবে। যতই হোক, বাবা তো।

সেই বেগুনই এখন হাতে।

মল্লিকাদেবী ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, 'প্রণাম কর কনি'।

করবী মাসি বলল, 'আহা, মেয়েটাকে হাতের জিনিসপত্র তো রাখতে দেবে মল্লিকাদি।'

মল্লিকাদেবী বললেন, 'ঠিক আছে, রেখে আয় চট করে। মিসেস বোস আবার বেরিয়ে যাবেন। ওঁর আবার কোথায় মিটিং আছে।'

boierpathshala.blogspot.com

মায়ের এত অর্ডারে কর্ণিকার রাগ হল। মিসেস বোসের মিটিং আছে তো কী! উনি কে? যার জন্য ছুটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে হবে?

মিসেস বোস দাঁত চেপে বললেন, 'মিটিং নয়, সেমিনার। বাংলা আকাদেমিতে যাব। ভাষা নিয়ে একটা আলোচনা আছে। ভাষার বিবর্তন। আমি এসবে মোটে যেতে চাই না। ওরা এমন জোর করে। যাক, মা তুমি হাতের জিনিসগুলো রেখে এসো। দুটো কথা বলে চলে যাই।'

ভিতরে যেতে মানার সঙ্গে দেখা। দিদিকে দেখে ফিচ করে হাসল।

'মানা, এরা কারা? কেন এসেছে? মা অমন গদগদ ভাব করছে কেন?'

মানা চোখ নাচিয়ে বলল, 'তোর শাশুড়ি। আমি মিষ্টি আনতে যাচ্ছি। সঙ্গে ইয়া বড় বড় শিঙাড়া।' মানা হাত ঘুরিয়ে শিঙাড়ার সাইজ দেখাল।

কর্ণিকা অবাক হয়ে বলল, 'শাশুড়ি! কী বলছিস?'

মানা বলল, 'ঠিকই বলছি। তোকে দেখতে এসেছে। তোর উড বি শাশুড়ি। গিয়ে দেখ।'

মানা ডান হাতের বুড়ো আঙুল মুখে দিয়ে সানাই বাজানোর ঢঙে বলল, 'প্যাঁ প্যাঁ...প্যাঁ প্যাঁ।'

কর্ণিকার মনে হল, ভাইকে একটা চড় লাগায়। কিন্তু সে এতটাই হতভম্ভ হয়ে পড়ল যে চড় লাগানোর কথা ভুলেই গেল। পাকা ছেলেটা কী বলছে এ সব!

ঠিক বলছে। কর্ণিকা কোনওরকমে চোখে মুখে জল দিয়ে আবার ড্রইংরুমে যেতেই ব্যাপারটা আঁচ করল।

মিসেস বোস সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বললেন।

'প্রথমে করবী, তারপর তোমার মায়ের কাছ থেকে তোমার কথা শুনলাম। তুমি তো লেখাপড়ায় ভালো ছাত্রী। আরও পড়লে না কেন?'

কর্ণিকা কী বলবে বুঝতে পারল না। চেনা নেই, জানা নেই, এই মহিলার প্রশ্নের উত্তর সে দেবে কেন? আবার উপায়ও নেই। বাড়ি বয়ে এসেছে। অপমানও করা যায় না। ইচ্ছে থাক বা না থাক, কিছু একটা তো বলতেই হবে।

'চাকরি করাটা দরকার ছিল।'

মিসেস বোস একটু চুপ করে বসে বললেন, 'আরও পড়তে ইচ্ছে করে না?'

কর্ণিকা বলল, 'উপায় নেই।'

মিসেস বোস বললেন, 'উপায় থাকলে পড়বে?'

কর্ণিকা ইতস্তত করে বলল, 'এখনই ভাবছি না।'

মল্লিকাদেবী গলে যাওয়া গলায় বললেন, 'ও তো অফিসে বড় প্রোমোশন পেয়েছে। অনেক দায়িত্ব। বড় অফিসার হয়েছে।'

কর্ণিকার এত রাগ হল যে ইচ্ছে করল মায়ের মুখ চেপে ধরে।

করবী মাসি এক গাল হেসে বলল, 'মিসেস বোস সব জানেন। উনি তোমার মেয়ে সম্পর্কে সব খবর নিয়েই আজ এসেছেন।'

মিসেস বোস ঠোঁটের কোনায় হেসে বললেন, 'কর্ণিকা, শুনেছি, তুমি অফিসে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করো। কথাটা ঠিক?'

'ঠিক না ভুল সে তো আমার অফিস বলতে পারবে।'

মিসেস বোস চোখ সরু করে বললেন, 'সে তো জানি। তোমার নিজের ধারণা কী? সেলফ অ্যাসেসমেন্টটাই আসল।'

কর্ণিকা মুখ তুলে বলল, 'আমার ধারণা আমি আমার ডিউটি সিরিয়াসলি করি।'

মিসেস বোস হেসে বললেন, 'ভেরি গুড। কর্ণিকা তোমার হাতে দেখলাম তুমি কি বেগুন দিয়ে কোনও রান্না করবে?'

boierpathshala.blogspot.com

কর্ণিকার মনে হল, এবার একটা ধাক্কা দেওয়া দরকার। বলল, 'হ্যাঁ, করব। বেগুনপোড়া বানাব। আমার বাবা খেতে চেয়েছেন।'

মল্লিকাদেবী তাড়তাড়ি বললেন, 'আমার মেয়ের রান্নার হাত কিন্তু অতি ভালো। আজ না বলে চলে এলেন তাই, নইলে হাতের রান্না খাওয়াতাম। আর একদিন আসুন না।'

মিসেস বোস খানিকটা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'ভালো রান্না খাবার জন্য রেস্টুরেন্টে যাব। এখানে আসব কেন?'

কর্ণিকা হেসে বলল, 'মা কিন্তু বাড়িয়ে বলছে। আমি রান্নার কিছুই পারি না।'

মিসেস বোস সুন্দর করে হেসে বললেন, 'মায়েরা অমন বাড়িয়ে বলেই, আমাকে যখন ছেলের বাড়ি থেকে দেখতে এসেছিল, আমার মা বলেছিল, আমি নাকি খুব ভালো গান করি। এদিকে আমার তো গলায় সুর বলে কিছু নেই। আমি তখন কী বলব বুঝতে পারলাম না। তোমাদের মতো তো আমরা স্মার্ট ছিলাম না। ছেলের মামি বললেন, একটা গান শোনাও তো মেয়ে। আমি তো দর দর করে ঘামতে শুরু করলাম। তারপর...।' কথা থামিয়ে মহিলা হাসতে লাগলেন। কর্ণিকার এবার বেশ লাগল। মানুষটার মধ্যে একটা সোজাসাপটা ভঙ্গি আছে তো। কিন্তু হঠাৎ এসব কী হচ্ছে! এই ভদ্রমহিলা কোথা থেকে এলেন!

মিসেস বোস হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। মহিলার পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাবের মধ্যে এক ধরনের শিক্ষিত, রুচিশীল ব্যাপার আছে। কর্ণিকার মনে হচ্ছে, প্রথম দর্শনে মহিলার প্রতি যে অনীহা, বিরক্তি, রাগ তৈরি হয়েছিল, এখন যেন খানিকটা কমছে।

মিসেস বোস মল্লিকাদেবীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, এবার যে আমাকে উঠতে হবে।'

মল্লিকাদেবী হা হা করে উঠলেন। নিজেও উঠে দাঁড়ালেন।

'কিছুতেই না দিদি। চা না খাইয়ে আপনাকে ছাড়বই না। এখনই মানা আসবে। একটু মিষ্টি আনতে গেছে।'

মিসেস বোস হাত বাড়িয়ে মল্লিকার হাত ধরলেন। নরম গলায় বললেন, 'আজ থাক। আপনাকে না জানিয়ে এসেছি। আমি ইচ্ছে করেই বলিনি। করবীকে বললাম, আজই যাব। উইদাউট এনি প্রিপারেশন আমি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। করবী তো আকাশ থেকে পড়ল। সে গাইগুঁই করছিল। আমি শুনিনি। ঘটা করে মেয়ে দেখতে আসা আমি পছন্দ করি না। খুব খারাপ সিস্টেম। গত মাসে কোনও একটা অফিসিয়াল পার্টিতে আপনার মেয়ের সঙ্গে সুস্নাতর আলাপ হয়। আলাপ না বলে ঝগড়াই বলা যেতে পারে। ঝগড়ার বিষয় ছিল কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট। সেই ঝগড়ার কথা সুস্নাত আমাকে গল্প করে। শুধু তাই নয়, সে আমাকে বার বার বলে মেয়েটির সঙ্গে তার মতে মেলেনি, কিন্তু মেয়েটিকে তার বিশেষ পছন্দ হয়েছে। বাঙালি মেয়ের মধ্যে এই ধরনের কর্পোরেট লজিক নাকি খুব একটা দেখা যায় না। ছেলে আমাকে মেয়েটির নাম বলে। কর্ণিকা। অফিসের নামটাও বলতে পারে। সে নিশ্চয় আপনার মেয়ের কাছে থেকে শুনে মনে রেখেছিল। সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস। এতটা মনে রাখায় আমার কেমন সন্দেহ হয়। মায়ের মন তো। এদিকে সুস্নাত তো আমেরিকায় ফিরে যায়। আপনাকে তো বললাম, ছেলে নিজের বিজনেস কনসালটেন্সি ফার্ম করেছে। কলকাতায় অফিসের কাজেই এসেছিল। তার মধ্যে কয়েকটা পার্টিও অ্যাটেন্ড করতে হয়।'

মিসেস বোস কথা থামিয়ে কর্ণিকার দিকে ঘাড় ঘোরালেন। হেসে বললেন, 'কী কর্ণিকা, আমার এখানে আসবার কারণ স্পষ্ট হচ্ছে? দাঁড়াও আর একটু আছে। আমি তো অথৈ জলে পড়ি। ছেলে তো আমাকে বিরাট বিপদে ফেলল। সে এমন একটা মেয়েকে পছন্দ করে গেল, যার শুধু নাম জানি, অফিস জানি, আর কিছুই জানি না! এমনকী মেয়েটি বিবাহিত কিনা তা-ও নয়। একদিন করবীকে দু:খ করে গল্প করেছিল। করবী লাফিয়ে উঠল। মেয়ে তার আত্মীয়। একেই বলে কোইনসিডেন্স। আসলে জীবনে বড় বড় বাঁকগুলো সব আকস্মিকই পাওয়া যায়। আমি করবীকে বলি, এখনই কিছু বলবার দরকার নেই। আগে, ছেলের পারমিশন নিই। খোঁজখবর নিই। তারপর।'

boierpathshala.blogspot.com

কর্ণিকার মাথা ঝমঝম করছে। সে সুস্নাত নামে যুবকটির মুখ মনে করবার চেষ্টা করছে। অফিসের কারণে ন'মাসে ছ'মাসে তাকে একটা-আধটা পার্টিতে যেতে হয়। স্যর বা অন্য কেউ যেতে না পারলে তার ঘাড়েই চাপ পড়ে। নেমন্তন্ন করলে কোম্পানির একজন প্রতিনিধির যাওয়া উচিত। সাধারণত অ্যাটেন করেই সে পালিয়ে আসে। খাওয়া-দাওয়াও করে না। এর মধ্যে একেবারে ঝগড়া! হতে পারে। কাজকর্ম নিয়ে তার এক ধরনের বিশ্বাস আছে। অন্যকে সেই বিশ্বাস জানাতে তার দ্বিধা নেই। অচেনা হলেও নয়। তবে ছেলেটাকে মনে পড়ছে না কেন? গোটা ঘটনাটা তো গল্পের বইয়ের মতো!

মিসেস বোস বললেন, 'কর্ণিকা, আমার তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। সরাসরি কথা বলতে পারো। আজকের দিনে মেয়েদের এরকম হওয়াই উচিত। যে কাজই করো দায়িত্ব নিয়ে করাটাই আসল। আমার বিশ্বাস সংসারও তুমি দায়িত্ব নিয়ে করতে পারবে। তবে মনে রেখো বিদেশে কিন্তু সংসার করবার অনেক ঝামেলা। সব নিজেদের করতে হয়। কোনও হেলপিং হাত থাকে না। তাছাড়া...সব যদি ঠিকঠাক হয়...তাহলে তো তোমাকে সুস্নাতর ফার্মও সামলাতে হবে।'

রাগের সঙ্গে কর্ণিকার এবার লজ্জাও করল। মেয়েদের হল এই একটা মুশকিল। যতই নিজেদের তালেবর ভাবুক, কোনও কোনও সময় লজ্জা করে বসে। কর্ণিকা মাথা নামিয়ে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলছেন।'

মল্লিকাদেবী তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমাদের কত বড় সৌভাগ্য।'

মিসেস বোস হেসে বললেন, 'সৌভাগ্য আমার। এই বিয়ে হোক না হোক, ছেলের মা হিসেবে আমি একটা ভেলকি দেখালাম। পছন্দর মেয়েকে খুঁজে দিলাম। কর্ণিকা এই নাও, এটা আমার ছেলের ফোন নম্বর। আমি তাকে আজই সব জানাব। যদি অসুবিধে না হয় তোমার ফোন নম্বরটা আমাকে দাও। সে তোমাকে কল করবে। তুমি যদি চাও, তার সঙ্গে কথা না-ও বলতে পারো। তোমার কি আমাকে কিছু বলবার আছে?

মল্লিকাদেবী বললেন, 'না না, ওর আর কী বলবার আছে? ওর তো পরম ভাগ্য। ওর বাবা এলে...?'

মিসেস বোস মল্লিকাদেবীর কথায় পাত্তা না দিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'বলো তোমার কী বলবার আছে?'

কর্ণিকা মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি এখন বিয়ে করব না। এখানে আমার অনেক রেসপনসিবিলিটি আছে। অফিসে, ঘরে...। সরি, আপনি কিছু মনে করবেন না।'

মিসেস বোস কর্ণিকার কাঁধে হাত রেখে হেসে বললেন, 'ভেরি গুড। বিদেশে থাকা ভালো পাত্র দেখে নিজের যাবতীয় দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো মেয়ে যে তুমি নও, আমি বুঝতে পেরেছি। আমার ভেবে ভালো লাগছে যে আমার ছেলে মানুষ চিনতে ভুল করে না। আমার একটাই অনুরোধ, তুমি এই কথাটা সুস্নাতকে বলে দাও। বলে দাও, তুমি এখন বিয়ে করবে না। সে অন্তত জানুক তার মা চেষ্টা করেছে। এইটুকু অনুরোধ রাখবে কি?'

কর্ণিকা মাথা নাড়ল। মিসেস বোস চলে যাওয়ার পর, মল্লিকা মেয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন।

বেশি রাতে কর্ণিকার মোবাইলে বিদেশের নম্বর ভেসে এল। কর্ণিকা প্রথমে ভেবেছিল ধরবে না। তারপর মিসেস বোসের সুন্দর ব্যবহারের কথা মনে পড়ে গেল। তার ওপর সে কথা দিয়েছে। সে কথা রাখা উচিত। এক মিনিটের কম সময়েই ছেড়ে দেবে। কর্ণিকা ফোন কানে নিল।

সেই ফোন ছাড়তে কর্ণিকা রাত কাবার করে ফেলল। এই জন্যই বলে, মানবমন অতি রহস্যময়! এক মুহূর্ত আগেও সেই মনের খবর কেউ বুঝতে পারে না।

বাহান্ন

কিছু কিছু মানুষকে বয়েস লুকোতে হয় না। বয়স নিজে থেকেই লুকিয়ে থাকে।

boierpathshala.blogspot.com

সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট-এর নিখিলেশ উপাধ্যায় সেরকম একজন। তাঁকে দেখে কে বলবে মানুষটার বয়স সত্তর বছর ছুঁই-ছুঁই? ফিটফাট চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত মুখে সবসময়েই একধরনের হাসি লেগে আছে। হাসি ঠিক নয়, হাসির ছায়া। সেই ছায়ায় একইসঙ্গে প্রশ্রয় আছে, আবার 'বস' সুলভ কাঠিন্যও রয়েছে। কাছে টানবে, আবার দূরেও ঠেলবে। এটা সহজ ব্যাপার নয়। কর্মক্ষেত্রের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রপ্ত করা সম্ভব। সবাই পারে না, কেউ কেউ পারে। কাজের জায়গায় ব্যক্তিত্ব মানে শুধু গাম্ভীর্য নয়, এটা বুঝতে সময় এবং বুদ্ধি লাগে। নিখিলেশ উপাধ্যায়ের দুটোই আছে।

মানুষটা এই কোম্পানিতে আছেন প্রায় গোড়া থেকে। কমলকান্তি সেন নিয়েছিলেন। নেওয়ার পিছনে মজার কারণ ছিল।

সেই সময় অনেকেই কাজের জন্য কমলকান্তি সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। চাকরি চাই। অফিসে সারাদিন, বাড়িতে সকালের দরবারে প্রচুর আবেদন। রোজই কেউ না কেউ আসছে। তাদের বেশিরভাগই সঙ্কুচিত। যোগ্যতা থাকলেও কাঁচুমাচু। চাকরির জন্য চেষ্টা করাকে বাঙালি জাতি অতি নিম্নস্তরের একটা জিনিস বলে মনে করে। যেন কাজ খোঁজাটা খুবই লজ্জার একটা বিষয়। ভিক্ষে চাইতে বেরিয়েছে। যে কাজ খোঁজে সে সবসময় মাথা নীচু করে থাকে, হাত কচলায়। ভাবটা হল, বিরাট অপরাধ করে বসেছে। এই অপরাধের জন্য তার নরকে স্থান হওয়া উচিত। নেহাত হাতের কাছে নরক নেই তাই বাঁচোয়া। বাঙালি চাকরিপ্রার্থী চিরকুণ্ঠিত, চির অনবত। এর জন্য দায়ী যারা কাজ দিতে পারে তারা। সে রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীই হোন, বড় কোম্পানি কর্তাব্যক্তিই হোন, ইন্টারভিউ বোর্ডের মেম্বারই হোন, পাড়ার মাতব্বরই হোন, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বড়মামা, মেজোকাকাই হোন। এঁরা সকলেই চাকরীপ্রার্থীকে হেয়জ্ঞান করেন। গরিব দেশে যার হাতে কাজ দেওয়ার ক্ষমতা আছে, সে হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের হাবভাব হল, বিরাট করুণা দেখাচ্ছে। অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে, তবে তা নগন্য। হিসেবের মধ্যে আসে না। যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা করলেও তাকে বিবিধ অপমানের মধ্যে পড়তে হয়। চাকরিদাতার জমিদারসুলভ মনোভাব বাঙালি চাকরিপ্রার্থীকে হীনমন্যতায় ভুগতে শিখিয়েছে। যুগের পর যুগ ধরে এই জিনিস চলে আসছে। নিজেকে 'ছোট' ভাবা বাঙালি কর্মপ্রার্থীদের রক্তে ঢুকে গেছে। তুমি খেটে উপার্জন করতে চাও? তবে মাথা নামিয়ে থাকো। এটাই রীতি। এমনকী যোগ্যতার পরীক্ষা দিলেও এমনটা ঘটে। বাঙালি একটা কথা জেনে গেছে—

'পরীক্ষা, ইন্টারভিউতে পাস করেছ বাপু, কিন্তু ধরা করা না করলে কিছু হবে না।'

এই আশঙ্কা যে সবসময় সত্যি এমন নয়। কোনও কোনও সময় যোগ্যতার পরীক্ষা থেকেও কাজকর্ম জুটে যায়, অতিরিক্ত 'কারিকুরি' লাগে না। কিন্তু তাতে বাঙালির ধারণা পালটায়নি। পালটানোর কথাও নয়। বাঙালি কর্মপ্রার্থীর হাল কেন এমন হয়েছে? এর জন্য দায়ী কে? যারা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে তারা? নাকি সামাজিক ব্যবস্থাটাই এভাবে গড়ে তোলা হয়েছে? যাতে কাজ জোটানোর সময় বাঙালির মেরুদণ্ড থাকে বেঁকে। এটা গবেষণার বিষয়। হয়তো কোনওদিন গবেষণা হবেও। এই দেশে অনেকরকম 'সেন্টার' আছে। তাদের গালভরা সব নাম। স্টাডি সেন্টার, সোশ্যাল সেন্টার, রিসার্চ সেন্টার। সেখানে বেশিরভাগ সময়েই 'গবেষণা গবেষণা' খেলা খেলে সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের পয়সা ওড়ানো হয়। রাজ্য সরকারের বরাদ্দ, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান, বিদেশের গ্রান্ট—কতরকমের পথে যে এসব জায়গায় টাকা আসে! এসব সেন্টারে নানা বিষয়ে বছরের পর বছর গবেষণা চলে। সেই গবেষণার সময়সীমা অনন্ত। মহাকাশের মতো অসীম। যার শেষ নেই। উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী, যারা মূলত চাকরিবাকরি পায় না বা করতে চায় না অথবা চাকরির থেকে গবেষণাকে বেশি লাভজনক প্রোজেক্ট বলে মনে করে, তারা এইসব গবেষণায় যুক্ত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য সব বিষয়ে সুযোগ আছে। কে গবেষণায় সুযোগ পাবে তাও মূলত নির্ভর করে হাত কচলানোর ওপর। এখানেও ব্যতিক্রম আছে। অবশ্যই কিছু ভালো ছেলেমেয়ে সুযোগ পেয়ে যায়। তারা সিরিয়াসলি কাজও করে। কিন্তু সেটাও ব্যক্তিক্রম। এমনকী ভালোদের মধ্যে 'ধরা করা' থাকে। দুজন

boierpathshala.blogspot.com

ভালোর মধ্যেও কে চান্স পাবে, তাই নিয়ে তদ্বির-তদারকি করতে হয়। দুনিয়ায় কত দুর্নীতি নিয়েই না তদন্ত হয়, কিন্তু গবেষণা দুর্নীতি নিয়ে কখনও তদন্ত হয় না। এসব সেন্টারে কারা ঢোকে, কে ঢোকায়, তারা কী কাজ করে, সেই কাজ দেশ দশের কোন কম্মে লাগে—সে-সব নিয়ে কখনও তদন্ত হয় না। এটা একটা ভালো দিক। রাজনীতির লোক 'চোর' হলে সমস্যা নেই। শিক্ষিত বা শিক্ষার উচ্চপদে আসীন কেউ 'চোর' হলে বিচ্ছিরি।

যা হোক, বাঙালি কেন চাকরি, প্রোমোশন বদলির জন্য মেরুদণ্ডহীন হয়ে গেল সে সম্পর্কে একদিন হয়তো এরকম কোনও স্টাডি সেন্টারে গবেষণা হবে। প্রোজেক্টের নাম হবে 'বাঙালি কর্মপ্রার্থীর হাত কচলানোর আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত।' দশ বছরের কাজ। অর্থ বরাদ্দ সাড়ে সাত লাখ টাকা। দু'বার বিদেশে ভ্রমণ। একবার গবেষকের, একবার গাইডের।

আনন্দের কথা, সময় বদলাচ্ছে। কয়েক বছর হল, তরুণ বাঙালি কর্মপ্রার্থীরা মাথা উঁচু করে চলতে শিখেছে। ছোটবড় কাজ নিয়ে ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করেছে। চাকরি দিতে পারে এমন 'ফুটো জমিদার'দের কাঁচকলা দেখিয়ে হয় বাইরের কোম্পানি, নয় ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছে। সেখানে নিজের যোগ্যতা নিয়ে কাজ করছে। বাঙালি প্রতিষ্ঠানগুলি হয় একটা পর একটা উঠে যাচ্ছে, নয় সুনাম তলানিতে গিয়ে ঠেকছে। অন্য সবকিছুর মতো এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে। সে-ও হাতে গোনা গুটিকয়েক। বুক ফুলিয়ে থাকবার মতো বাঙালি প্রতিষ্ঠান ক'টাই বা অবশিষ্ট রয়েছে?

কমলকান্তি সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস তৈরির সময় ঠিক করেছিলেন, এমন কোনও ব্যবহার করবেন না যাতে কর্মপ্রার্থীরা অসম্মানিত হয়। যোগ্যতা এবং প্রয়োজন না মিললে প্রার্থীকে নেওয়া হবে না ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে জমিদারসুলভ কোনও বদ আচরণ করা হবে না। তিনি সকলকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। 'কোনও চাকরিপ্রার্থী আমাদের কোম্পানির জন্য অপ্রয়োজনীয় হতে পারে তার মানে এই নয়, সে একজন অযোগ্য মানুষ। তার সঙ্গে এমন কোনও ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে অপমানিত বোধ করে।'

কমলকান্তি সেনের এই সিদ্ধান্তে সমস্যাও তৈরি হয়েছিল। বহু হাবিজাবি লোক চাকরির জন্য ভিড় করতে থাকে। চাকরি চাইতে গেলে বাবা বাছা করা হবে—এ সুযোগ কোথায় পাওয়া যাবে?

এরকমই দেখা করতে এসেছিলেন নিখিলেশ উপাধ্যায়। সেদিন কমলকান্তি খানিকটা বিরক্তই ছিলেন। সকাল থেকে লোক এসেই চলেছে। কিন্তু নিজেই তো নিয়ম করেছেন বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না। নিখিলেশ উপাধ্যায় টেবিলের উলটোদিকে বসলে তিনি দ্রুত কথাবার্তা শেষ করতে চাইলেন। বায়োডাটার কাগজ উলটোনোর পর হাতে-গোনা দুটো প্রশ্ন করলেন।

'আপনাকে এই সংস্থায় নেওয়া হবে কেন?'

নিলিলেশ উপাধ্যায় কোনওরকম দ্বিধা না করে বললেন, 'আপনার কোম্পানি একজন যোগ্য ব্যক্তিকে পেয়ে লাভবান এবং গর্বিত হবে বলে।'

থমকে গেলেন কমলকান্তি। বললেন, 'আর যদি কাজটা না পান?'

নিখিলেশ বলেছিলেন, 'তাতে একটু অসুবিধে হবে। আমি যেখানে চাকরি করতাম, অফিসটা বন্ধ হয়ে গেছে। একটু বেশি বয়সে বেকার হয়ে পড়েছি। তবে সেটা কোনও বিষয় নয়। সাময়িক সমস্যা মাত্র। আপনার এখানে কাজ না পেলেও আমার অন্য কোথা থেকে অবশ্যই সুযোগ আসবে। সে যোগ্যতা আমার আছে। কিন্তু আমার মতো একজন কর্মচারী পাওয়ার সুযোগ আপনার আর না-ও আসতে পারে।'

কমলকান্তি এই কনফিডেন্সে খুবই খুশি হন। এই তো সাচ্চা বাঙালি! যে মিনমিন করে না, যে মাথা উঁচু করে চলে, মাথা উঁচু করে কথা বলে।

এরপর নিখিলেশ উপাধ্যায়কে অ্যাপয়েনমেন্ট লেটার দিতে এক মুহূর্ত দেরি করেননি কমলকান্তি। ছোট পদ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত অনেক বড় জায়গায় চলে যান উপাধ্যায়। এমনকী নিজে সংস্থা থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেকে যখন দায়িত্ব পুরোপুরি বুঝিয়ে দেন, তখনও মানুষটাকে ছাড়েননি কমলকান্তি। গোপন দায়িত্ব

boierpathshala.blogspot.com

দিয়ে রেখেছিলেন। কোনও কারণে বিমলকান্তি সমস্যায় পড়লে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়েছিলেন উপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতার কারণেই রাজি হয়েছিলেন। নিখিলেশ উপাধ্যায় একটা সময় পর্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালনও করেছেন। বহু জটিলতা থেকে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে উনি রক্ষা করছেন। বিমলকান্তি জানতেও পারেননি, উপাধ্যায় আসলে তাঁর বাবার প্রতিনিধি। বাবার চোখ এবং ব্যবসায়িক বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে সাহায্য করে চলেছেন।

কিন্তু মানুষের মন বড় গোলমেলে। সে শুধু সাদা বা কালো নয়, ধূসরও। সেই ধূসর রং কখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তা কেউ বলতে পারে না। নিখিলেশ উপাধ্যায়ের বেলাতে এত বেশি বয়েসে তাই ঘটেছে।

তিনি লোভে পড়েছেন। সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে প্যাঁচে ফেলতে চাইছেন। প্যাঁচে ফেলে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসতে চাইছেন যেখান থেকে বেরোনোর জন্য বিমলকান্তি সেন হাবুডাবু খাবে। কমলকান্তি সেন তাকে খবর পাঠাবে, এই জটিলতা থেকে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে বের করে আনতে হবে। তিনি তাই করবেন। কিন্তু খুব বড় দাঁও মারবেন। আর সেটাই হবে এখানে তার শেষ কাজ।

নিখিলেশ উপাধ্যায় পরিকল্পনা করেছেন। কোম্পানির কারণেই আন্ডারওয়ার্ল্ডের কিছু লোকের সঙ্গে তার চেনাজানা ছিল। ব্যবসার জন্য ভালো লোককে যেমন হাতে রাখতে হয়, খারাপকেও রাখতে হয়। তিনি এডি নামের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই এডি বৈশাখী সান্যালকে পাঠিয়েছে। এই মহিলা ঠকজোচ্চুরির কাজে নাকি খুবই পাকা। বহু জটিল কাজ করেছে। পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছে। এডি জানিয়েছে মহিলা কাজের ব্যাপারে পেশাদার। অ্যাসাইনমেন্ট নিলে কাজ শেষ করে। উপাধ্যায় বয়েসের কথা জিগ্যেস করেছিলেন।

'বয়স কেমন?'

এডি বলেছে, 'একটু বেশির দিকে।'

উপাধ্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'আমি বেশি বয়সই চাই।'

এই মুহূর্তে ভবানীপুরের কাছে একটা পুরোনো রেস্টুরেন্টে উপাধ্যায় এবং বৈশাখী মুখোমুখি বসে আছেন। চা, চপ-কাটলেটের রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টে উপাধ্যায়ের বিশেষ পরিচিতি। রেস্টুরেন্ট তৈরির সময় মালিককে টাকা দিয়েছিলেন। মালিক সেই টাকার পুরোটা শোধ করতে পারেনি। রেস্টুরেন্ট সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের বদলায়নি। এখনও সেই হলুদ আলো, পরদাটানা কেবিন। জায়গাটা উপাধ্যায়ের পছন্দ। প্রাইভেসি আছে। কর্মীরা নিখিলেশকে আলাদা গুরুত্ব দেয়। গোলমেলে কাজের কথা বলতে গেলে নিখিলেশ এখানে লোক ডেকে নেন। বড় কোম্পানি চালাতে গেলে গোলমেলে কথা বলতেই হয়। এখন একটু কমেছে এই যা। পেছনের দিকে একটা কেবিন বেছে নিয়েছেন নিখিলেশ। এখন দুপুরবেলা। তারপরেও কেবিনে আলো জ্বালাতে হয়েছে। রেস্টুরেন্টে লোকজনও নেই। একজন মাত্র বেয়ারা গোছের লোক সার্ভিসের জন্য রয়েছে। নিখিলেশ উপাধ্যায় তাকে বলে দিয়েছেন, বাইরে নজর রাখতে। না ডাকলে যেন কেউ কেবিনে না আসে। লোকটি ঘাড় কাত করে।

নিখিলেশ উপাধ্যায় বললেন, 'কী খাবেন?'

'কিছু খাব না। কাজের কথা বলুন।'

উপাধ্যায় বলেন, 'আপনি নিশ্চয় পরিশ্রান্ত। এক কাপ চা বলি?'

বৈশাখী এবার যেন একটু কঠিন গলায় বললেন, 'বললাম তো কিছু খাব না। কাজের কথা বলুন। আমাকে দুর্গাপুর ফিরতে হবে।'

নিখিলেশ উপাধ্যায়ের পছন্দ হল। কড়া মহিলা। কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না।

'আপনি দুর্গাপুর থাকেন?'

বৈশাখী চোখ তুলে বলেন, 'আমার পেশায় কোথাও থাকা যায় না।'

উপাধ্যায় নিজেকে সামলে বললেন, 'সরি।'

boierpathshala.blogspot.com

'এবার বলুন।'

উপাধ্যায় বললেন, 'যে কোম্পানিতে আপনাকে কাজ করতে হবে, সেখানে মালিক কড়া। একজন সিরিয়াস লোক। তাকে চট করে টলানো কঠিন। আপনাকে টলাতে হবে।'

বৈশাখী বিরক্ত গলায় বললেন, 'টলানো বলতে আপনি কী বলছেন? যদি সেক্স ধরনের কিছু হয় আমাকে দিয়ে হবে না। শরীর দিয়ে পুরুষমানুষকে বশ করবার মতো বয়স আমার নয়। আপনি নিশ্চয় দেখে বুঝতে পারছেন। অবশ্য বয়স থাকলেও ওই ধরনের ছেঁদো কাজ আমি কখনও করিনি। তার জন্য আলাদা পার্টি আছে। তারপরেও যদি বলেন, তাহলে আপনারা ভুল করেছেন। এডি কিন্তু এমন কথা আমাকে বলেনি।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, আমি সে কথা বলছি না। এই লোককে আপনাকে অন্যভাবে টলাতে হবে।'

'কীরকম?'

উপাধ্যায় একবার কেবিনের পরদার দিকে তাকিয়ে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনি কোম্পানির মালিকানা দাবি করবেন।'

বৈশাখী ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মানে! মালিকানা দাবি করব কীভাবে?'

উপাধ্যায় ফিসফিস করে বললেন, 'আপনাকে সবরকম কাগজপত্র আমি হাতে তুলে দেব। আপনি সেই কাগজ দেখিয়ে বলবেন, এই কোম্পানিতে আপনারও শেয়ার আছে।'

বৈশাখী বললেন, 'কোম্পানির শেয়ার আছে! কাগজপত্র পাব কোথা থেকে?'

নিখিলেশ উপাধ্যায় হাসলেন। বললেন, 'জাল কাগজপত্র বানানোর দায়িত্ব আমার। আপনাকে শুধু চেপে বসে থাকতে হবে। মালিককে টলমল করে দিতে হবে। সে হয়তো থানা-পুলিশ করবে, কোর্টে মামলা করবার ভয় দেখাবে, আপনি হাল ছাড়বেন না।'

বৈশাখী চুপ করে রইলেন। কিছু একটা ভাবলেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'কতক্ষণ হাল ছাড়ব না?'

নিখিলেশ উপাধ্যায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'যতক্ষণ না আমি বলব।'

বৈশাখী মাথা নামিয়ে বসে রইলেন। উপাধ্যায় চিন্তিত গলায় বললেন, 'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?'

বৈশাখী এ কথার জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার রুমালটা কোথায় গেল? কোথায় রাখলাম?' বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিড়বিড় করতে করতেই সামনে রাখা ভ্যানিটি ব্যাগের চেন খুলে জিনিসপত্র হাতড়াতে থাকেন। একটা একটা করে জিনিস বের করে টেবিলে রাখছেন। রুমালের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুঁজে না পেয়ে মহিলা ব্যস্ত। বাকি সব ভুলে গেছেন। উপাধ্যায় একটু অবাকই হলেন। সামান্য একটা রুমালের জন্য এত! বৈশাখী টেবিলে রেখেছেন চশমার খাপ, জলের বোতল, ছোট নোটবুক, মাথার ক্লিপ একটা। একইভাবে একটা রিভলভার বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

রিভলভারের নলের সঙ্গে জড়ানো অবস্থায় রুমালও পাওয়া গেল। বৈশাখী সেই রুমাল দিয়ে ভালো করে মুখ মুছলেন।

তিপান্না

কর্ণিকার মন খারাপ।

সে আজ অফিসে রেজিগনেশন লেটার জমা দেবে। এই চাকরিতে সে যে বহুদিন জয়েন করেছে এমন নয়। বরং সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের বেশিরভাগ কর্মীই তার থেকে সিনিয়ার। তার পরেও কোম্পানি তাকে গুরুত্ব দিয়ে উঁচু পদে বসিয়েছে। অফিসে কাজের পরিবেশও ভালো। কাজের এমন পরিবেশ আর কোথাও পেত না। পাবে না। সুদূর আমেরিকায় বসে সুস্নাত এই মনখারাপের কথা শুনে অবাক হয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

'কোম্পানি ছাড়ছ বলে তুমি আপসেট হয়ে পড়েছ কনি।'

দ্বিতীয় দিন থেকে সুস্নাত তাকে 'কনি' ডাকছে। এত দ্রুত 'কনি' ডাকে লজ্জা লজ্জা করছে, আবার ভালোও লাগছে। 'এই অফিসটা আমার খুব ভালো লাগে।'

সুস্নাত বলেছে, 'অফিস ভালো লাগা মন্দ লাগার কী আছে। অফিস ইজ অফিস।'

কর্ণিকা বলেছে, 'বা: যেখানে কাজ করি সেই জায়গাটা ভালো না লাগলে কাজ করব কী করে?'

সুস্নাত হেসে বলে, 'এখানে তোমার আরও ভালো লাগবে। নিজের জায়গায় কাজ করবে। আমার ফার্ম মানে তো তোমার ফার্ম।'

কর্ণিকা এই কথাতেও লজ্জা পায়। মানুষটার সঙ্গে তার ভালো করে পরিচয়ই হয়নি, শুধু টেলিফোনেই যা কথা হয়েছে, অথচ এমন ব্যবহার করছে যেন বিয়ে হয়ে গেছে। হয়তো এরকমই হয়। যখন ভালো লাগার তখন অতি অল্প আয়েসেই ভালো লেগে যায়।

প্রথম ফোনালাপের পরদিনই মিসেস বোস কর্ণিকার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি ছেলের বিয়ের বিষয়টা দ্রুত শেষ করতে চাইছেন। সব ঠিক থাকলে পরের মাসেই সুস্নাত আসবে। রেজিস্ট্রি করে বউকে নিয়ে চলে যাবে। এর মাঝখানে কর্ণিকাকে পাসপোর্ট ভিসার জন্য ছোটাছুটি করতে হবে। এসব জায়গায় মিসেস বোসের চেনাজানা আছে। তৎকালে অ্যাপ্লাই করতে হবে।

ভিসার জন্য ওদেশ থেকে সুস্নাত কাগজপত্র পাঠিয়ে দেবে। এই কাজের জন্য সময় দিতে হবে। অফিসে, পুলিশের দপ্তরে গিয়ে পড়ে থাকতে হবে। কর্ণিকা ভেবেছিল অফিস ছুটি নেবে। মিসেস বোস এ ব্যাপারে তাকে অন্য পরামর্শ দেন।

'ছুটির কী দরকার কর্ণিকা? তুমি রিজাইন কর।'

কর্ণিকা আকাশ থেকে পড়েছিল।

'চাকরি ছেড়ে দেব।'

মিসেস বোস বলেছিলেন, 'আজ না হোক, কাল তো ছেড়ে দিতেই হবে। এখনই বরং চিঠি দিয়ে দাও। দিয়ে পাওনা ছুটি নিয়ে নাও।'

কর্ণিকা বলেছিল, 'যে ক'টা দিন পারি করি...।'

মিসেস বোস শাশুড়িসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বলেছিলেন, 'সেটা তোমার ব্যাপার। তবে উচিত হবে কিনা সেটাও ভেবে দেখ। তুমি একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে আছ। তোমার বদলে অফিস সেখানে একজনকে আনবে। তাদের সময় লাগবে। সেই সময়টা তাদের দেওয়া উচিত। তা ছাড়া...তা ছাড়া...বিয়েটা যখন ফাইনাল হয়ে গেছে, এখন রোজ অফিসে না গিয়ে তোমার উচিত বাড়ির সবার সঙ্গে সময় কাটানো। শুধু তো বিয়ে নয়, তুমি অনেকটা দূরেও চলে যাচ্ছ। আমার বিয়ের পর আমারও এরকম একটা ফিলিংস হয়েছিল। আপশোস বলতে পার। মনে হয়েছিল, ইস, ক'টা দিন যদি শুধু বাড়িতে থাকতাম। যাক, তুমি ভেবে নাও।' কথা থামিয়ে হেসে মিসেস বোস বলেছিলেন, 'তবে আমাকে ক'টা দিন সময় দিতে হবে কিন্তু। না বললে চলবে না। তোমাকে নিয়ে কেনাকাটা আছে। কয়েকজন আত্মীয়ও তোমাকে দেখতে আসবেন।'

মিসেস বোস চলে যাওয়ার পর মাও মেয়েকে বোঝাল। অফিসে জানিয়ে দেওয়াই ভালো। 'বুঝব না, বুঝব না' ভেবেও শেষ পর্যন্ত কর্ণিকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ না হোক, কাল তো ছাড়তেই হবে। মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?

সে কাল রাতে রেজিগনেশন লেটার লিখেছে। অফিসিয়াল হয়নি। অনেকটাই ব্যক্তিগত ছোঁয়া রয়ে গেছে। প্রথমে ইংরেজিতে লিখতে শুরু করেও দু-এক লাইন পরেই সেই চিঠি বাতিল করে কর্ণিকা। বাংলায় লেখে।

'শ্রী বিমলকান্তি সেন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস।

boierpathshala.blogspot.com

মাননীয় মহাশয়

আগামী মাস থেকে আমি আর আপনার সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছি না। আমাকে পাকাপাকিভাবে বিদেশে চলে যেতে হচ্ছে। নতুন কোনও চাকরির জন্য নয়, একান্তই ব্যক্তিগত কারণে যাচ্ছি। আমার এই চিঠি পদত্যাগপত্র হিসেবে গ্রহণ করলে বাধিত হব। আপনি যদি অনুমতি দেন, এই সপ্তাহ থেকেই আমি ছুটিতে চলে যেতে পারি। বিদেশে যাওয়ার জন্য জরুরি কিছু কাজ আমাকে করতে হবে। ছুটি পেলে সেই কাজগুলি করব। তার আগে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব, বকেয়া কাজ সেরে ফেলতে। জানি, আরও আগে আপনাদের জানালে ভালো হত, কিন্তু আমার বাইরে চলে যাওয়ার বিষয়টি হঠাৎই ঠিক হয়েছে। আমি নিজেও প্রস্তুত ছিলাম না।

সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ছেড়ে চলে গেলেও আমি সেই সংস্থাকে কোনওদিন ভুলতে পারব না। আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করি। এই কোম্পানির সঙ্গে আমি মনের দিক থেকেও জড়িয়ে পড়েছি। এখানে আমি আর আসব না, কিন্তু আমার মন এখানেই থাকবে। আপনার অধীনে কাজ করবার মতো যোগ্যতা আমার ছিল কিনা জানি না, কিন্তু আপনার পরিচালনা, নির্দেশ এবং স্নেহে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ছেড়ে যেতে আমার খুব খারাপ লাগছে। তারপরেও আমাকে যেতে হচ্ছে। জীবনের এক একটা বাঁকে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা এড়ানোর উপায় থাকে না।

আপনি ভালো থাকবেন। আমার প্রণাম জানবেন।'

এই চিঠি শেষ করে কর্ণিকা আরও একটি চিঠি লিখতে বসল। অন্ধকার ঘরে টেবিল ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, সাদা পাতায় কেউ খানিকটা সোনালি রং ঢেলে দিয়েছে।

'অর্চিন, কেমন আছ? নিশ্চয় ভালো আছ।

আসলে, সকলেই ভালো থাকবার জন্য নিজের মতো পথ বেছে নিতে চায়। কেউ পারে, কেউ পারে না। তুমি পেরেছ। ভালো থাকবার জন্যই পছন্দের পথ বেছে নিয়েছ। কেরিয়ার ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে, শহর ছেড়ে চলে গেছ গ্রামে। যতদূর জানি, তোমাদের মতো মানুষ বিশ্বাস করে, ভালো শুধু নিজে থাকলে হয় না, অন্যদেরও ভালো রাখতে হয়। তাই তো? কথাটা কি বেশি সরল হয়ে গেল? হোক গে। আমি একটা বোকা মেয়ে। আমার কথায় গা কোরো না। কী বলতে কী বলে ফেলি তার ঠিক নেই। অবশ্য আমি জানি তুমি গা করবেও না। কখনও তুমি আমার কথায় গুরুত্ব দাওনি। শুধু কথা কেন? আমাকেও গুরুত্ব দাওনি। প্রথম প্রথম দু:খ পেতাম। যে মেয়েটি তোমাকে পেয়েছে, তার ওপর হিংসে হত। তোমার ওপর রাগ হত। তারপর ধীরে ধীরে বুঝলাম, ঠিকই হয়েছে। তোমার মতো মেধাবী ছেলের জন্য আমি নই। শুধু বই পড়া বিদ্যে নয়, চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কেও তোমার ধারণা স্পষ্ট। আর পাঁচটা 'গুড বয়'-এর মতো তুমি স্বার্থপর নও। তোমার সঙ্গে আমাকে কখনওই মানাত না। আমি খুবই সাধারণ। তোমার থেকে বয়েসে একটু বড় হয়েও, একটু বোকা। তাই আমি হিংসে, রাগ সবই ধাপে ধাপে ভুলতে থাকি। মনে মনে নিজেকেও তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছি। তারপরেও কখনও কখনও পারিনি। কখনও কখনও ভালোমন্দ কিছু হলে ইচ্ছে করেছে তোমাকে জানাই। দুম করে ফোন করে বসেছি। সাধারণ বলেই করেছি। অবশ্য তুমি তখনও গুরুত্ব দাওনি। ঠিকই করেছ। আবার বলছি, আমি তোমার গুরুত্ব পাবার যোগ্য নই।

অর্চিন, আমি রাজনীতি বুঝি না। আরও কঠিন করে বলতে গেলে, রাজনীতি আমার ভালোও লাগে না। এর থেকেও যদি কঠিন কথা বলতে হয়, তাহলে বলব রাজনীতি যারা করে তাদেরও পছন্দ করি না। মনে হয়, তারা হয় ভণ্ড, নয় তারা ভুল পথে হাঁটছে। মানুষকে মিথ্যে কথা বলে, বোকা বানিয়ে তারা নিজেদের আখের গোছায়। আমাদের দেশে রাজনীতির পবিত্রতা অনেকদিন আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু থাকতে পারে, তা ব্যতিক্রমই মাত্র। আমার বড়মামা কলেজ জীবনে ছিলেন কড়া বিপ্লবী। ছেলেমেয়েদের নেতা ছিলেন। পুলিশের ধরপাকড় থেকে বাঁচতে আমার দাদুর সাহায্য নিয়ে বিদেশে

boierpathshala.blogspot.com

পালালেন। আর যাদের খেপিয়েছিলেন, তারা কলকাতার অলিগলিতে হয় পুলিশের গুলিতে মরল, নয় ধরা পড়ে জেল খেটে জীবন নষ্ট করল। আমার বড়মামা কয়েক বছর আগে তার মেমসাহেব বউ আর আধা বাঙালি ছেলেমেয়ে রেখে বিদেশেই মারা গেছেন। আর রেখে গেছেন বিপুল সম্পত্তি। মৃত্যুর পর কারও সম্পর্কে নিন্দে করতে নেই। নিজের আত্মীয়স্বজনকে তো নয়ই, কিন্তু এই মামাকে ভণ্ড ছাড়া আর কী বলতে পারি অর্চিন? আমার মনে হয়, রাজনীতি মানুষকে ভুল পথে চলতে শেখায়। শেখায় নিজের দায়িত্ব পালন না করে, নিজের কাজ না করে শুধু দলাদলি করতে। পাশের মানুষকে শত্রু ভাবতে শেখায়। নয়তো আদর্শ, বিশ্বাসের নামে কোনও দল আর কিছু নেতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বলে। সেই দলের, নেতার হাজার ভুল থাকলেও মুখ ফুটে বলবার অধিকার থাকে না।

অর্চিন, এসব কথা পড়ে তুমি নিশ্চয় খুব অবাক হচ্ছ? নিশ্চয়ই ভাবছ, আমার মতো একটা সাধারণ, বোকা, কেরিয়াসর্বস্ব একটা মেয়ে এত কথা শিখল কোথা থেকে! তাই তো? আমিও অবাক হচ্ছি। কোথা থেকে এসব বড় কথা আমি শিখলাম তার জন্য অবাক হচ্ছি না, অবাক হচ্ছি, তোমাকে বলবার সাহস কোথা থেকে পেলাম সেটা ভেবে।

অর্চিন, সাধারণ মানুষ একেবারে কিছু বোঝে না, কিছু ভাবে না এমনটা মনে করা ঠিক নয়। তাদেরও একটা মত আছে। ধরতে পারো সেটুকু জানাবার জন্যই তোমাকে এসব বললাম।

আশা করি, তুমি ভুল বুঝবে না। তোমার যে জীবন তুমি বেছে নিয়েছ তাকে আমি ছোট করছি না। হয়তো তুমি আমার মতো বহু সাধারণ মানুষের ধারণা ভেঙে দেবে। প্রমাণ করবে, রাজনীতি মানে ভাণ্ডামি নয়, রাজনীতি মানে ভুল পথে চলা নয়, রাজনীতি মানে নিজের আখের গোছানো নয়। রাজনীতি, মানে অনেক বড় কিছু। আমি সেই কামনা করি। আশা করি, এমনটা হবে না যে-কোনও একদিন তুমিও বুঝবে, ভুল হয়ে গেছে। সব ছেড়ে চলে যাওয়া নয়, নিজের কাজটুকু মন দিয়ে করলেও মানুষের জন্য কিছু করা যায়। আমি যে একটা কোম্পানিতে এতদিন ম্যানেজারের কাজ করেছি সেটা কি কিছু করা নয়? কোম্পানির সঙ্গে কত মানুষ জড়িত। কোম্পানি ঠিকমতো চলার ওপর তাদের জীবন, তাদের সংসার নির্ভর করে। শুধু অফিসে চাকরি নয়, যে গরিব মালবাহক আমাদের প্রোডাক্ট ঘাড়ে করে ট্রেনে তুলে দেয়, জাহাজে তুলে দেয়, তার জন্য কি খুব দূর থেকে আমি কোনও দায়িত্ব পালন করিনি? সবটাই কি কেরিয়ারসর্বস্ব আর সাধারণ মানুষ বলে উড়িয়ে দেওয়ার মতো বিষয়?

যাক, খানিকটা রেগে গিয়েই হয়তো তোমার জগৎ, তোমার বিশ্বাসকে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ করে বসলাম। কিছু মনে কর না। রাগ নাকি অভিমান? তোমার ওপর অভিমান করবার মতো অধিকার কি আমার আছে? কী জানি।

দেখছ, তোমাকে চিঠি লিখতে বসে রাগের বশে কত হাবিজাবি কথা লিখে ফেললাম? বাদ দাও এসব। ভুলে যাও। তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটা কি তোমার মনে আছে অর্চিন? আমার মনে আছে। শুনবে?

জোর বৃষ্টির দিন ছিল সেটা। যাদবপুরের এইট বি বাসস্ট্যান্ডে একটা অটোতে বসেছিলাম। অটো দাঁড়িয়ে ছিল ট্রাফিক আলোয়। বৃষ্টির ছাঁদে ভিজেও যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোথা থেকে তুমি ছুটে এসে, রাস্তা পার হয়ে অটোতে উঠতে গেলে। ভিজে একশা। আমি খুব কড়া গলায় বললাম, এখানে কোথায় বসবেন? দেখছেন না, আমরা কীভাবে চেপেচুপে বসে আছি? তুমি হকচকিয়ে গেলে। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি। তোমার মাথায় ছাতাও ছিল না। একটা ব্যাগের মতো কী যেন মাথার ওপর ধরে ছিলে। তুমি খানিকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে চশমার কাচ মুছতে মুছতে রাস্তার পাশে চলে গেলে। ট্রাফিকের সবুজ আলো পেয়ে অটো আবার ছুটতে শুরু করল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে অতি অবহেলায় তোমাকে একবার দেখতে গেলাম। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুমি ভিজছ। দু-পাশ দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। তোমাকে বৃষ্টিধোয়া শহরের রাস্তায় কী যে অমলিন লাগল! মুহূর্তের মধ্যে আমার কী যেন হল! মনে হল, বিরাট একটা অন্যায় করেছি। আমি একটু সরে বসলেই একজন রোগাসোগা ছেলের জায়গা হয়ে যেত। হয়তো হত না। আমি আর দেরি

boierpathshala.blogspot.com

করিনি। অটো থামিয়ে নেমে পড়ি। কোনওরকমে ছাতা খুলে তোমার কাছে পৌঁছেও যাই। তুমি তখন রাস্তার পাশে পৌঁছেছ। আমাকে দেখে চিনতে পারলে না। আমি বললাম, সরি। তুমি অবাক হয়ে তাকালে। সেই চোখ আজও আমি দেখতে পাই। মনে পড়ছে অর্চিন? আমরা ভিজতে ভিজতে অনেকটা পথ হেঁটেছিলাম। যা ছিল গল্পের থেকেও অসম্ভব। এই জন্যই বলে জীবন গল্প উপন্যাসের থেকেও বিস্ময়কর, আকস্মিক।

অর্চিন, কোনওদিন বলিনি, আমি সেদিনই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। নিজেকে সামলাতে পারিনি, নির্লজ্জের মতো তোমার মোবাইল ফোন নম্বর চেয়ে নিয়েছিলাম।

তুমি আমাকে কোনওদিনই ভালোবাসনি, অর্চিন, অবহেলাই করেছ শুধু, অপমান করেছ। তারপরেও তোমাকে আমি ভালোবেসেছি। কেন? আমি জানি না। আমার ধারণা, কোনও ভালোবাসার পেছনেই কারণ থাকে না। থাকে না বলেই ভালোবাসা এত সুন্দর। আমার ভালোবাসাও সুন্দর।

অর্চিন, আমি বিয়ে করছি। বিয়ে করে বিদেশে চলে যাচ্ছি। আমার যে বর হতে চলেছে সেই ছেলেটি খুব ভালো। ভীষণ ব্রাইট। বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে সে তার কেরিয়ার তৈরি করেছে। আমার সঙ্গে ক'টা কথা বলেই সে আমার প্রেমে পড়ে গেছে। আমার রূপের নয়, আমার কাজের। এখন অবশ্য অন্য কথা। আমাকে ফোন না করলে ছটফট করে। ছেলেটিকে আমার পছন্দ হয়েছে। তবে এখনও ভালোবাসতে পারিনি। সম্ভবত ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে অনাগ্রহ, অবহেলা পেয়ে আমার বিচ্ছিরি অভ্যেস হয়ে গেছে। অভ্যেস বদলাতে হবে। মনে হয় পেরে যাব। তোমার কী মনে হয়? খুব ভালো থাক। তোমার স্বপ্ন পূরণ হোক। যদি পার ঋষাকেও তোমার স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে নাও। মেয়েটা তোমাকে বড্ড ভালোবাসে। আমার থেকে অনেক অনেক বেশি। সে তোমার জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করবে। আমার মতো দামি বর পেয়ে গলায় ঝুলে পড়বে না। ঋষা সাধারণ নয়।

টা টা।'

চিঠি লেখা শেষ করে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়েছিল কর্ণিকা। তারপর দীর্ঘক্ষণ সেই চিঠির পাতা গালে চেপে ধরে নি:শব্দে কেঁদেছে। চোখের জল আর চিঠির লেখা মাখামাখি হয়ে গেছে।

শেষরাতে চিঠি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে চোখ মুছেছে কর্ণিকা।

চুয়ান্ন

বৈশাখী দাঁড়িয়ে আছেন ক্যানিং লঞ্চঘাটে।

সামনে দিয়ে হু হু করে মাতলা নদী বয়ে যাচ্ছে। সকালের রোদ পড়ে নদীকে দেখাচ্ছে ঝলমলে। মনে হচ্ছে, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়েছে।

এখন ক'টা বাজে? বৈশাখী হাত উলটে ঘড়ি দেখলেন। ন'টা বেজে দশ মিনিট। বৈশাখী এখন ভুটভুটিতে নদী পেরোবেন। সেখান থেকে বাসে ধামখালি। ধামখালি থেকে ভ্যানে আরও খানিকটা গেলে গ্রামে পৌঁছবেন। গ্রামের নাম সুন্দর। নোনাজল। সুন্দরবনের সবটাই তো নোনাজল। সব মিলিয়ে ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। তাও ভুটাভুটি, বাস, ভ্যান সময় মতো পেলে। না পেলে আরও দেরি। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তাড়াহুড়ো করাও যাবে না। লোকে সন্দেহ করবে। অ্যাকশনের নিয়ম হল, অ্যাকশনের সময় যতটা মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়, অ্যাকশনের পর পর মাথা ঠান্ডা রাখতে হয় তার থেকে অনেক বেশি।

বৈশাখী অ্যাকশন করেছেন কাল সন্ধেবেলা। তারপর বাসে উঠে শিয়ালদা এসেছেন। শিয়ালদা স্টেশনের বাইরের বাজারে শান্ত ভাবে খানিকক্ষণ ঘোরঘুরি করেছেন। হকারদের সঙ্গে দরদাম করেছেন। শাড়ি, জামা-কাপড়, উলটে পালটে দেখেছেন। তার মধ্যে একটা ছোকরা মতো ছেলে গায়ের ওপর একটা চাদর ফেলে দিয়ে কেনবার জন্য জোরাজুরি শুরু করে।

'আপনি এতক্ষণ ঘাটাঘাঁটি করেছেন, এবার নিতে হবে।'

boierpathshala.blogspot.com

বৈশাখী অবাক হয়ে বললেন, 'ঘাঁটাঘাঁটি করলাম কই!'

ছেলেটি দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'ঘাঁটাঘাঁটি করেননি? এতবার যে চাদরটার ভাঁজ খুললেন।'

বৈশাখী আরও অবাক হয়ে বলেন, 'আমি তো চাদরটায় হাতই দিইনি ভাই। তুমিই তো জোর করে খুলে দেখালে।'

ছোকরা এবার মেজাজ চড়িয়ে বলে, 'ওই একই হল। এই ঘাঁটা জিনিস অন্য কোনও খদ্দের কিনবে?'

বৈশাখী বলেন, 'সে তো তোমার ব্যাপার।'

ছোকরা বলল, 'ও সব জানি না। এই মাল আপনাকেই নিতে হবে।'

বৈশাখী এবার ছেলেটির দিকে এ পা এগিয়ে যান।

'ভাই তুমি কি গুন্ডামি করছ?'

ছোকরাটি এবার চোখ পাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, করছি।'

বৈশাখী নীচু গলায় বললেন, 'তুমি আমার ছেলের বয়সি, তোমাকে যদি একটা কষিয়ে চড় লাগাই তোমার কি খুব রাগ হবে?'

ছোকরাটি এবার থতমত খেয়ে যায়। পাড়াগাঁয়ের মানুষকে এইভাবে জোর-জবরদস্তি জিনিস গছানোর ব্যবসা সে অনেকদিন থেকেই করেছে। ঝামেলাও হয়েছে। তবে কেউ এই ভাবে ঠান্ডা গলায় চড় মারবার কথা বলেনি।

'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

বৈশাখী শান্ত ভঙ্গিতেই বললেন, 'এবার বল, কোন গালে চড় মারব।'

ছেলেটি এবার চুপসে যায়। মহিলার ভাবভঙ্গি সুবিধের নয়। গলার স্বর, চোখের চাউনিতে এমন কিছু একটা আছে, যেটা ভয়ের।

'বাজে কথা বলবেন না। আপনি যান তো।'

বৈশাখী আরও একটু এগিয়ে যান। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখেন জামা কাপড়ের ওপর। তারপর ফিসফিসিয়ে বলেন, 'ক্ষমা চা। আগে ক্ষমা চা। নইলে একটা চড় নয়, আরও বেশি মারব। তুই আমাকে চিনিস না। একটু পরে চিনতে পারবি।'

ছেলেটি তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলে, 'ক্ষমা চাইছি। ভুল হয়ে গেছে। আপনি এখান থেকে যান।'

বৈশাখী এরপর স্টেশনে যান। সেখানে ক্যান্টিনে বসে রুটি তরকারি আর ডিমের ঝোল খান। বিভিন্ন ট্রেনের যাওয়া আসার অ্যানাউন্সমেন্ট শোনেন। রাত বাড়ে। এক সময় দার্জিলিং মেল স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। আরও মিনিট কুড়ি পরে ওঠেন। লেডিজ রিটার্নিং রুমে যান। বাইরে মাঝবয়সি একজন মহিলা টেবিল চেয়ারে বসে ঢুলছেন। সামনে রিটার্নিং রুমের এন্ট্রি খাতা। বৈশাখী সামনে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিতে তিনি চোখ খোলেন।

'কী চাই?'

'রিটার্নিং রুমে জায়গা চাই।'

মহিলা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মানে!'

বৈশাখী বলেন, 'আমি দার্জিলিং মেল মিস করেছি। আমার আত্মীয়রা চলে গেছেন। এত রাতে মছলন্দপুর ফিরতে পারব না। কাল সকালে কোনও গাড়ি ধরে এন জি পি যাওয়ার চেষ্টা করব।'

মহিলা অতি বিরিক্ত নিয়ে বলেন, 'জায়গা নেই।'

বৈশাখী বলেন, 'আছে। একটা বেড হয়ে যাবে।'

মহিলা বলেন, 'টিকিট দিন।'

বৈশাখী বলেন, 'আমার আত্মীয়রা নিয়ে চলে গেছেন। এক সঙ্গে টিকিট ছিল। বিয়ের অনুষ্ঠান। যেতেই হত!'

boierpathshala.blogspot.com

'টিকিট ছাড়া রিটার্নিং রুমে অ্যালাও নেই। আমি কিছু পারব না।'

বৈশাখী গলা নামিয়ে বললেন, 'ভাই, আমি প্ল্যাটফর্মেই থাকতে পারতাম, কিছুক্ষণ হল দুটো গুন্ডা টাইপের লোক আমার পিছু নিয়েছে। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই চলে যাচ্ছে। একটু আগে ক্যান্টিনে বসে খেলাম সেখানেও...প্ল্যাটফর্মে থাকতে কেন, স্টেশন থেকে বেরোতেই আমার ভয় করছে।'

মহিলা বললেন, 'আপনি পুলিশে খবর দিন।'

বৈশাখী কাতর গলায় বললেন, 'আপনি যাবেন? চলুন না। দুজনে গিয়ে পুলিশকে বলি।'

মহিলা এবার ঝামেলায় পড়া মুখ করে বললেন, 'না না, ডিউটি ছেড়ে আমি কোথায় যাব?'

বৈশাখী আতঙ্কিত গলায় বললেন, 'তাহলে আমাকেও একা পাঠাবেন না।'

মহিলা এবার খাতায় নাম-ঠিকানা না লিখেই বৈশাখীকে রিটার্নিং রুমের ডরমেটারিতে একটা বেডের ব্যবস্থা করে দিল।

বৈশাখী নিশ্চিন্ত হলেন। পুলিশ নিশ্চয় এতক্ষণে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। যেখানেই খুঁজুক, শিয়ালদা স্টেশনের রিটার্নিং রুমে আসবে না। রাতে ভালো ঘুম হল না। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম। খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়লেন। সাউথ সেকশনে গিয়ে স্টলে বসে চা খেলেন। তারপর ধীরস্থিরভাবে ক্যানিং লোকালে উঠে, একটা কোণের দিকে ফাঁকা বেঞ্চে বসে, জানালার হাওয়া খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই ঘুমও গভীর হল না। বৈশাখী ছেলেকে স্বপ্ন দেখলেন। অর্চিন আর তার বাবা একটা জঙ্গলের মধ্যে হাঁটছে। তারা নীচু গলায় কথা বলছে, কিন্তু সে কথা পুরো শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ অর্চিনের পায়ে একটা কাঁটা ধরনের কিছু ফোটে।

তার বাবা নীচু হয়ে বসে সেই কাঁটা তুলে দিতে যায়। অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। একটা সময়ের পর অর্চিন বাধা দেয়। এবার তাদের কথা স্পষ্ট শুনতে পায় বৈশাখী।

'বাবা থাক। আমি কাঁটা নিয়েই হাঁটব।'

'তোর কষ্ট হবে তো।'

'হোক। আমি কাঁটা নিয়েই চলব।'

'কতদিন এভাবে থাকবি?'

'যতদিন পারি।'

'কেন?'

'পায়ে কাঁটা বিঁধে থাকলে আমার সব সময় তোমার কথা মনে পড়বে বাবা। মনে পড়বে, আমার বাবা খুব সুন্দর একটা মানুষ। আমার পায়ের কাঁটা তুলে দিতে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। এটা ভালো হবে না?'

অর্চিনের বাবা হেসে বলে, 'দূর বোকা ছেলে। আমি ভালো মানুষ কেন হতে যাব? আমি একটা খারাপ মানুষ। ক্রিমিনাল একজন। লোক ঠকিয়ে, জালিয়াতি করে জীবন শেষ করেছি।'

অর্চিন দেবশিশুর মতো হেসে বলল, 'সে যাই হোক, আমার বাবা, খুব সুন্দর একজন মানুষ।'

স্বপ্নের এই পর্যায়ে এসে বৈশাখীর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চোখ খুলে দেখেন ক্যানিং স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।

বৈশাখীর খিদে খিদে পাচ্ছে। কিছু খেয়ে নেওয়াই ভালো। অনেকটা পথ যেতে হবে। তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন। উলটো দিকে একটা দোকানে গরম পারোটা বিক্রি হচ্ছে। পেটাই পরোটা। ময়দার তাল পিটিয়ে মস্ত চেহারার পরোটা বানিয়ে উনুনে দেওয়া হচ্ছে। তারপর ছিঁড়ে, ওজন করে খদ্দেরদের দেওয়া হচ্ছে। বৈশাখী দুশো গ্রাম পরোটা কিনলেন। প্লেট নিয়ে এসে বসলেন বেঞ্চের ওপর।

গতকালের ঘটনা মনে পড়ছে। বৈশাখী বিরক্ত হলেন। এটা ভালো কথা নয়। কোনও অ্যাকশনের পরেই ঘটনা মনে পড়া ঠিক নয়। তার পরেও পড়ছে। কেন? অ্যাকশন বড় বলে? নাকি একেবারেই প্রস্তুতি ছিল না তাই?

boierpathshala.blogspot.com

ভবানীপুরের রেস্টুরেন্টে বসে কথা শুরুর একটু পরেই নিজের দর বোঝাতে ব্যাগ থেকে ইচ্ছে করে রিভলভারটা বের করে টেবিলে রেখেছিলেন বৈশাখী। রুমাল খোঁজবার ছুতোয়। নিখিলেশ উপাধ্যায় আড়চোখে দেখে কাজের কথা শুরু করেন। কথা বেশি ছিল না। কথা না বলে গল্প বলা উচিত। যে গল্পের ওপর দাঁড়িয়ে পুরো কাজটা বৈশাখীকে করতে হত।

সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস নামে এক কোম্পানিতে গিয়ে দাবি করতে হবে, কোম্পানির মূল কর্ণধারের আর একটি স্ত্রী ছিল। সেই মহিলা ছিলেন একজন প্রস্টিটিউট। কোনও এলাকায় তিনি কাজ করতেন না, কাজ করতেন সমাজের উচ্চবলয়ে। এই কোম্পানির কর্ণধারের সঙ্গে মহিলার কোনওভাবে আলাপ হয়। প্রেম হয়। শেষ পর্যন্ত গোপনে বিয়ে। ভদ্রলোকের স্ত্রী ছিল বলেই গোপনে বিয়ে। মহিলার নাম ধরা যাক অঞ্জলি। অঞ্জলির একটি মেয়ে হয়। মেয়ে বড় হয়। সেন অ্যাসোসিয়েটসের কর্ণধারের সঙ্গে অঞ্জলির চুক্তি হয়, তারা কখনও সামনে আসবে না। আড়াল থেকে টাকা পয়সা দেওয়া হবে। অঞ্জলি মারা যেতে টাকাপয়সা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার মেয়েও বিষয়টা নিয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া করেনি। সে তার পিতৃ পরিচয় ভালো করে জানত না। কিন্তু সম্প্রতি ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর জানতে পেরেছে, কে তার বাবা ছিলেন। কত বড় কোম্পানির মালিক তিনি। তাই মেয়ে ভদ্রলোকের ছেলের কাছে এসে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের অংশীদার হতে চাইবে। সেই মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে বৈশাখীকে। তাকে বিয়ের যাবতীয় জাল কাগজপত্র, এমনকী জাল ফটোগ্রাফ পর্যন্ত দেওয়া হবে। ভদ্রলোকের বিয়ের ফটো উপাধ্যায়ের সংগ্রহে আছে। সেখানে কনের মুখ বদল করা হবে কম্পিউটারের কারসাজিতে।

অ্যাসাইনমেন্ট শোনবার পর বৈশাখী জিগ্যেস করেন, 'টাকা-পয়সার কী হবে?'

নিখিলেশ বলেন, 'সমস্যা পাকালে আমার কাছে আসবেন। আমি আপনার সঙ্গে নেগোসিয়েশনে যাব। আপনি টাকা, বাড়ি, জমি চাইবেন। আমি রফা করব। রফার পর টাকা আমার। আপনি আপনার চার্জ বুঝে নেবেন।'

বৈশাখী চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'রাজি নই। আমার রিস্ক খুব। চার্জের বাইরেও আমাকে শেয়ার দিতে হবে।'

নিখিলেশ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এরকম তো কথা ছিল না। আপনি তো চার্জ নিয়ে কাজ করেন। এডি সে রকমই আমাকে জানিয়েছে।'

বৈশাখী বললেন, 'সব কাজ করি না। এই ধরনের কাজে ধরা পড়লে ভিতরে কম করে দশ বছর থাকতে হবে।'

নিখিলেশ থমথমে গলায় বললেন, 'ধরা পড়বেন না।'

বৈশাখী ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, 'ক্রাইমের আগে সবাই ওরকম ভাবে।'

নিখিলেশ বললেন, 'আমি সবার মতো নয়। সব দিকের আটঘাট বেঁধে এগোচ্ছি। আমার নিজেরও বড় ঝুঁকি। আপনি ধরা পড়লে আমিও তো ফাঁসব।'

বৈশাখী স্থির চোখে খানিকক্ষণ বুড়ো মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আর যদি আপনিই আমাকে ধরিয়ে দেন?'

নিখিলেশ উপাধ্যায়ের চোখ ঝলসে উঠল। এই মহিলা সামান্য জালিয়াত নয়। এর বুদ্ধি তুখোড়।

'আপনাকে ধরিয়ে আমার লাভ?'

বৈশাখী তুচ্ছ করবার ভঙ্গিতে বললেন, 'নিজে সাধু সাজবেন। কোম্পানির বিশ্বাসযোগ্য হবেন।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় মুচকি হেসে বললেন, 'আমি তো এমনিই বিশ্বাসযোগ্য। সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের মূল লোক বলুন, বর্তমান মালিকই বলুন, সবাই আমাকে বিশ্বাস করে। নতুন করে আর কী আস্থাভাজন হব?'

বৈশাখী বললেন, 'আপনি কতদিন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত?'

নিখিলেশ বললেন, 'আপনার কী প্রয়োজন? আপনি টাকা পাবেন, কাজ করবেন।'

boierpathshala.blogspot.com

বৈশাখী বললেন, 'প্রয়োজন আছে। আমি বুঝতে চাইছি, আপনি যে গল্পটা সাজিয়েছেন, সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে কিনা।'

নিখিলেশ উপাধ্যায়, একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এই কোম্পানি যিনি মূলত তৈরি করেছেন, অর্থাৎ যে মানুষটার বিরুদ্ধে গল্প সাজানো হচ্ছে, তিনি আমার থেকে বয়েসে অনেকটা বড়। আমি তার অধীনস্থ একজন এমপ্লয়ি ছিলাম। তার পরেও এক রকম বন্ধুত্ব তৈরি হয়। ধীরে ধীরে আমার ক্ষমতা, প্রতিপত্তি বাড়ে। আমি আমার যোগ্যতা দিয়ে নিজেকে দক্ষ এবং আস্থাভাজন প্রমাণ করি। একটা সময়ের পর আমার বস কাম বন্ধু অবসরে যান। আমারও বয়স বাড়ে। কাজ ছাড়তে চাই আমিও। আমার বস আমাকে ছাড়তে দেন না। তিনি আমাকে বলেন, তোমাকে কোম্পানিতে থাকতে হবে। আমার ছেলেকে সাহায্য করতে হবে। কেউ জানবে না, আমি তোমার মাধ্যমে কোম্পানি চালাব। আমার সেই বস কাম বন্ধু কিছুদিন হল মারা গেছেন। এখন তার ছেলেই সব। আমি রয়ে গেছি। কোনও বড় ধরনের সমস্যা হলেই সামলাই।'

বৈশাখী বললেন, 'ও আপনি তা হলে বিশ্বাসঘাতক?'

নিখিলেশ উপাধ্যায় ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক কে? আমি না সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের মালিকরা? যাদের জন্য এই বুড়ো বয়সেও এত করলাম তারা আমাকে কী দিল? স্রেফ কয়েকটা টাকা মাইনে? কেন? এতই যদি বিশ্বাস, আস্থা, তারা আমাকে কোম্পানির একজন করে নিতে পারত না? উচিত ছিল না?'

বৈশাখী হাইয়ের মতো তুলে বললেন, 'তাহলে প্রতিশোধ?'

'খানিকটা তাই বলতে পারেন।'

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নিখিলেশ উপাধ্যায় এবার সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'অনেক কথা হল। আপনি সবই জানলেন। আশাকরি আর সমস্যা রইল না। তা হলে কাজের কথায় আসুন। ফাইনাল বলুন কত টাকা নেবেন?'

বৈশাখী বললেন, 'জাল কাগজপত্র একবার দেখব। তার আগে এক কাপ চা বলুন।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় গলা বাড়িয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। পরদা সরিয়ে বেয়ারা মুখ বাড়াতে, সহজ ভঙ্গিতে চায়ের অর্ডার দিলেন।

সহজ না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। কারণ দুজনের কেউই তখন জানত না, একটু পরে কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে চলেছে।

পঞ্চান্ন

পেটাই পরোটা খেতে বেশ। নামেই পারোটা, আসলে ময়দার রুটি। ঘি-টিয়ের কারবার নেই। একটু তেলের ছিটে থাকে, আবার থাকেও না। বোঝা যায় না।

বৈশাখী আরও খানিকটা পরোটা নিয়ে বেঞ্চে ফিরে এলেন। নদী পেরোনোর আগে জল আর বিস্কুট কিনে নিতে হবে। বেশি নেওয়া যাবে না। দরকার নেই। নোনাজল গ্রামে পৌঁছে গেলে নিশ্চয় সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিছু নেওয়ার মতো জায়গা নেই। এমনিতেই সবসময় একটা একট্রা পোশাক থাকে। প্রসাধনের টুকিটাকি রাখতে হয়। লোক ঠকানোর ব্যবসায় সাজগোজ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বাইরে ঢমক ঢামক দেখে বোকা হওয়ার জন্য সবাই মুখিয়ে থাকে। কম বয়েসে সাজগোজ তেমন লাগত না। শরীর ছিল। তবে বৈশাখী কখনওই শরীর বিলোননি। বিলোব বিলোব করে লোভ দেখিয়েছেন। তাতেই কাজ হাসিল। শরীর দিলে এই ব্যবসায় নাম খারাপ হয়। লোকে রাস্তার 'কল গার্ল' ভাবে। বড় কাজ পাওয়া যায় না। সেক্স একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যত দিন যাচ্ছে, এদেশে গুরুত্ব বাড়ছে। এটাকে যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ধরা যায়, তাহলে বলতে হয় ইন্ডাস্ট্রিতে পয়সা ঢুকছে। শরীর নিয়ে ছেঁদো মূল্যবোধ কমছে। বাইরের মনোভাব গেড়ে

boierpathshala.blogspot.com

বসছে। এই যুগে অল্প আয়েসে পয়সা রোজগার দরকার। শরীর সবথেকে সুবিধের। সাবধানে থাকলে কোনও দাগ পড়বে না। ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াই রিটার্ন। কিন্তু এসবের পরেও বুদ্ধির দাম এখনও অনেক বেশি। সে ভালো কাজেই হোক, বা মন্দ কাজেই হোক।

বৈশাখী এক কাপ চা নিলেন। মুখে নিয়ে নাকমুখ কোঁচকালেন। ইস বেশি চিনি দিয়েছে! নদীর দেশের লোক কি বেশি মিষ্টি খায়? নোনাজলে পৌঁছতে পৌঁছতে যেন অ্যাকশ্যানটা ভুলে যাওয়া যায়।

ভবানীপুরের রেস্টুরেন্টে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিলিখেশ উপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এডি আমাকে বলেছে, আপনি নাকি এ ধরনের কাজে পটু?'

বৈশাখী বললেন, 'কোন ধরনের কাজ?'

নিখিলেশ বললেন, 'এই যে জাল সম্পত্তির কারবার।'

'কাজে পটু না, অভিনয়ে পটু।'

নিখিলেশ বললেন, 'তাহলে তো একজন অভিনেত্রীকে ভাড়া করে আনলেই হয়ে যেত। তা তো হয় না। আপনি ভালো করেই জানেন বৈশাখী, ইমপস্টার হতে গেলে শুধু অভিনয় নয়, সাহস লাগে।'

বৈশাখী নির্বিকার মুখে বললেন, 'বৈশাখী নয়, বৈশাখীদেবী। আপনি আমার থেকে বয়সে বড় নিখিলেশবাবু, কিন্তু প্রফেশনাল কাজে দূরত্ব রাখাই ভালো।'

নিখিলেশবাবু খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, 'সরি। বৈশাখীদেবী, আপনার চার্জটা আগে বলুন। টাকাপয়সার কথা ফাইনাল হয়ে গেলে, আমি আপনাকে কাগজপত্র দেখাব। আপনার একটা ফটো লাগবে।'

বৈশাখী টেবিলের ওপর রাখা ব্যাগটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'দেখুন মিস্টার উপাধ্যায়, বিপদে পড়লে কীভাবে নিজেকে উদ্ধার করতে হয় আমি জানি। আবার কীভাবে অন্যকে বিপদে ফেলতে হয় সে কায়দাও জানতে হয়। কিন্তু সবের জন্যই টাকার প্রয়োজন।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় দাঁত চেপে বললেন, 'এসব আপনার বিষয়। আপনি অ্যামাউন্ট বলুন বৈশাখীদেবী।'

বৈশাখী বুঝতে পারলেন, মানুষটা রেগে যাচ্ছে। পার্টি খুশি হলে যেমন কাজ পেতে সুবিধে, তেমন আবার কোনও কোনও সময় পার্টি রাগ করলেও ভালো। দর বাড়ে। পার্টি তাকে এমনি এই কাজে ডাকেনি। খোঁজখবর নিয়ে, জেনেবুঝেই ডেকেছে। আর এই লোকটা একেবারেই বাজে লোক। থার্ড গ্রেড। ক্রিমিনালরাও বিশ্বাসঘাতকতাকে ঘেন্না করে।

'আমার চার্জের বাইরেও টাকা লাগবে। অপারেশনের পর আপনি কোম্পানির মালিকের সঙ্গে যত অ্যামাউন্ট নেগোসিয়েট করে পাবেন, তার সেভেন পার্সেন্ট আমাকে দিতে হবে।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় চোখমুখ লাল করে বললেন, 'ইমপসিবল! সে তো অনেক টাকা!'

বৈশাখী বললেন, 'তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন! এডির সঙ্গে কথা বলুন। ওর হাতে নিশ্চয় অন্য লোক আছে। আপনাকে কম অ্যামাউন্টে কাজ করে দেবে।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় একটু থম মেরে রইলেন। তাঁর গলা নামিয়ে বললেন, 'দেখুন বৈশাখী, সরি বৈশাখীদেবী, আমার হাতে সময় কম। আপনি জাস্টিফায়েড একটা অ্যামাউন্ট বলুন। কাজটা করাব বলেই আপনাকে ডেকে এনেছি। আমি জানি, অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করালে গোলমাল হয়ে যেতে পারে। বানিয়ে নিজেকে কোনও প্রপার্টির শেয়ার হোল্ডার প্রমাণ করতে হলে এক ধরনের স্কিল চাই। শুধু মামলা-মকদ্দমার ভয় দেখালে হবে না। কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কথা বলে ব্ল্যাক মেইল করতে হবে। আপনাকেই আমার লাগবে। আপনি অ্যামাউন্ট বলুন।'

বৈশাখী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, ফাইফ পার্সেন্ট দেবেন। আর কিন্তু দরাদরি করব না।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে। তবে আমি টাকা পাওয়ার পর আপনি পেমেন্ট পাবেন। এবার কাগজপত্রগুলো দেখুন।'

boierpathshala.blogspot.com

নিখিলেশবাবু পাশে রাখা অ্যাটাচি থেকে কয়েক পাতা কাগজ বের করে বৈশাখীর দিকে এগিয়ে দিলেন। বৈশাখী কাগজ না ধরে বললেন, 'আমি বুঝে গিয়েছি। কাগজ আমাকে দেখাতে হবে না। আপনি মুখে বলুন। কোম্পানির নাম কী? আমাকে কার কাছে যেতে হবে? কবে যেতে হবে? মাঝখানে আমাকে তিনটে দিন সময় দিতে হবে। আমি বাড়িতে যাব।'

কাগজ নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে নিখিলেশবাবু গলা খাদে নামিয়ে বললেন, 'কোম্পানির নাম, সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস।'

বৈশাখী সোজা হয়ে বললেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী নাম বললেন?'

নিখিলেশবাবু মুখ তুলে বললেন, 'এনি প্রবলেম?'

বৈশাখীর চোখমুখের চেহারা বদলে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কী নাম বললেন, আর একবার বলুন।'

'সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস। ক্যামাক স্ট্রিটে অফিস, কসবায় ওয়ার্কশপ। কর্ণধারের নাম কমলকান্তি সেন। তিনি ক'দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর ছেলে বিমলকান্তি সেনই এখন অল ইন অল। যদিও বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি সবটা দেখছেন।' এইটুকু বলে বৃদ্ধ নিখিলেশ উপাধ্যায় খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। লোভে?

'বৈশাখীদেবী, আপনি কমলকান্তি সেনের নামে অ্যালিগেশন আনবেন। বলবেন এই ভদ্রলোক আপনার মাকে লুকিয়ে বিয়ে করেছিল। সেই অর্থে আপনিও এই কোম্পানির সমান অংশীদার।'

বৈশাখী চেয়ারে হেলান দিলেন। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'সেনবাড়ি...।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় চোখ সরু করে বললেন, 'ইয়েস, সেনবাড়ি। আপনি কী করে জানলেন?'

বৈশাখী নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে, এ বাড়ির সঙ্গে আমার আগেও কোনও যোগাযোগ হয়েছে।'

নিখিলেশ অবাক গলায় বললেন, 'আগে যোগাযোগ! সেটা কীরকম?'

বৈশাখী এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, 'বিমলকান্তির স্ত্রী কি মণিকুন্তলা?'

নিখিলেশবাবু আরও অবাক হলেন। বললেন, 'তাই। আপনি কী করে জানলেন?'

বৈশাখীদেবী এবার যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ওই কমলকান্তি সেনের বাড়িতে দুটি মেয়ে আছে না?'

নিখিলেশ খুশি হয়ে বললেন, 'আপনি তো সবাই জানেন! হ্যাঁ, দুই মেয়ে, মেঘবতী আর বারিধারা! আমার বন্ধু কাম বসের নাতনি।'

বৈশাখী বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, 'আপনার বন্ধু! ঠিকই, বন্ধুই বটে। বাড়িতে আর কেউ নেই।'

নিখিলেশবাবু বললেন, 'মনে হচ্ছে, আপনার কাজে সুবিধে হবে।'

'অবশ্যই হবে। সব জানা থাকলে অপারেশনে সুবিধে হবে বই কী। চেনা জায়গায় কাজ করতে সুবিধে। যেমন আপনার হচ্ছে। বাড়িতে আর কে থাকে?'

নিখিলেশবাবু একটু থমকে থেকে বললেন, 'দারোয়ান, ড্রাইভার আর কাজের লোক টোক আছে, ও হ্যাঁ, একটা ছোকরাও থাকত। মণিকুন্তলার দূরসম্পর্কের কোনও আত্মীয়। কী যেন নাম...মনে পড়েছে...অর্চিন...শুনেছি, সেই ছেলের পেছনেও কী যেন কেলেঙ্কারি আছে...ওই ছেলে সেনবাড়ির আশ্রয়ে থেকে পড়াশোনা করত...।'

বৈশাখী উৎসাহ নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'বা:। আসল কেলেঙ্কারির পরিবারে সহজেই নকল কেলেঙ্কারি ঢোকানো যাবে। মিস্টার উপাধ্যায়, সেই ছেলেকে জানেন? তার সম্পর্কে কোনও ইনফর্মেশন আছে আপনার কাছে?'

boierpathshala.blogspot.com

নিখিলেশ গর্বের হাসি হেসে বললেন, 'কেন থাকবে না? ছেলে রাজনীতি করে। পেছনে পুলিশ লেগেছে। সে এখন ভাগল বা। সেনবাড়ির মুখে কালি লেপে পালিয়েছে।'

বৈশাখী বললেন, 'পালিয়েছে!'

'হ্যাঁ, রাজনীতি করব বলে, লেখাপড়া ছেড়ে সুন্দরবনের কোন গ্রামে ঘাপটি মেরেছে।'

বৈশাখী থমথমে গলায় বললেন, 'মানে!'

নিখিলেশ বললেন, 'মানে আর কী, পালিয়েছে। পলিটিক্সে নাম লিখিয়ে কেরিয়ার বিসর্জন দিয়েছে হারামজাদা। আর্মস অ্যাক্টে পুলিশ পিছনে লেগে গেছে। যে কোনও দিন ধরে গারদে পুরবে। আমার কাছে গোপনে খবর এসেছে, সুন্দরবনের কাছে নোনাজল নামে একটা গ্রামে বেটা শেল্টার নিয়েছে। ক্যানিং থেকে নদী পেরিয়ে যেতে হয়। ভেবেছি, সম্পত্তি নিয়ে গোল পাকানোর সময় পুলিশকে খবর দেব। বেটাকে যাতে ধরে ফেলে। এটাতে সেনবাড়িও টালমাটাল হয়ে যাবে। যতই আশ্রিত ছোকরা হোক, পুলিশ তো ওই বাড়ির লোকদের ছেড়ে কথা বলবে না। সাঁড়াশি আক্রমণ হবে। কেমন ভেবেছি?'

বৈশাখী চুপ করে রইলেন। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছলেন। ব্যাগ খুলে রুমাল ভেতরে রাখলেন। রুমালটা বেশ বড়। বললেন, 'খুব ভালো ভেবেছেন মিস্টার উপাধ্যায়।'

'আপনার কাজে এই ইনফর্মেশন কোনও হেল্প করল বৈশাখী, সরি বৈশাখীদেবী?'

বৈশাখী অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'অবশ্যই করল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কাজটা করব না। আপনি অন্য লোক ঠিক করুন।'

নিখিলেশ উপাধ্যায় একটু চুপ করে থেকে কঠিন মুখ করে বললেন, 'কেন?'

বৈশাখী বললেন, 'আমার ইচ্ছে। জালিয়াতের ইচ্ছে থাকতে নেই?'

'আমি তো টাকাপয়সায় এগ্রি করেছি। আপনি কি আরও চাইছেন?'

বৈশাখী বললেন, 'না। আমি কাজ করব না।'

বৈশাখী উঠে দাঁড়ালেন। হাত ঘুরিয়ে ঘড়িতে সময় দেখলেন। তাঁকে যথেষ্ট ধীরস্থির দেখাচ্ছে।

নিখিলেশ উপাধ্যায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'তা কী করে হবে বৈশাখীদেবী? কাজ তো আপনাকে করতেই হবে। আপনি সব জেনে গেছেন। বেশি জেনে গেছেন। কাজ যদি না করেন, আমি আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব। আপনি জেলখাটা ক্রিমিনাল। জালিয়াতির মামলা আপনার নামে আছে। আপনাকে পেলে পুলিশের সুবিধে হবে। হবে না?'

বৈশাখী নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, 'তা হবে। আপনি বরং পুলিশে খবর দিন।'

নিলিলেশ উপাধ্যায় দাঁতে দাঁত চেপে অসহায়ভাবে বললেন, 'এই আপনার ফাইনাল কথা?'

বৈশাখী হেসে বললেন, 'না ফাইনাল কথা নয়। এবার ফাইনাল কথা বলব। আপনার কাছে গিয়ে বলব।'

কথা শেষ করে বৈশাখী টেবিলের পাশ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যান। তারপর চকিতে ব্যাগ থেকে রিভলভার বের করে বাট দিয়ে নিখিলেশ উপাধ্যায়ের ঘাড়ের পেছনে আঘাত করেন। বৃদ্ধ, নিখিলেশ কিছু বোঝার আগেই চেয়ারে মাথা এলিয়ে জ্ঞান হারান। এই কায়দা বৈশাখী শিখেছিলেন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। রক্ত ছাড়া হত্যা। যেখানে ছুরি বা গুলি ব্যবহার করা যাবে না, সেখানে দারুণ কাজ দেয়। গোটা শরীরের জোর নিয়ে আসতে হবে হাতে। মারতে হবে ঘাড়ের ঠিক মাঝবরাবর। হাড় ভেঙে যেন শ্বাসনালিতে ঢুকে যায়। বৈশাখী তা-ই করেছেন। শরীরের সব শক্তির সঙ্গে তিনি পেয়েছেন ঘৃণা। বিশ্বাসঘাতকের প্রতি ঘেন্না। আর সেই সঙ্গে সেনবাড়ির প্রতি কৃতজ্ঞতা।

বৈশাখী কোনও সুযোগ রাখেনি। রিভলভার ব্যাগে ঢুকিয়ে রুমাল বের করেন। নিখিলেশের গলায় ভালো করে প্যাঁচ দেন। সেই প্যাঁচ টেনে ধরে রাখেন টানা তিন মিনিট।

চুল ঠিক করে, শান্তভাবে পরদা সরিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়েন। একসময় রেস্টুরেন্ট থেকেও বেরিয়ে পড়েন। তারপর বাস ধরে শিয়ালদা।

boierpathshala.blogspot.com

পরোটার দোকানে দাম মিটিয়ে লঞ্চঘাটে নেমে আসেন বৈশাখী। এবার নদী পার হতে হবে। এত জল পেরিয়ে ছেলের কাছে যেতে বড় ভালো লাগছে। অনেক কান্না পেরিয়ে যাওয়া যেন। অর্চিন তাকে চিনতে পারবে? পারবে না।

'আপনি কে?'

'আমি কেউ নই।'

'তবে? আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন?'

'আমি তোর কাছে থাকতে এসেছি অর্চিন। আর পারছি না। খুব ক্লান্ত লাগছে। খুব ক্লান্ত। বাকি জীবনটা তোর সঙ্গে থাকতে চাই সোনা আমার। তুই আমাকে ফিরিয়ে দিস না। আয়, বাছা কাছে আয়, তোকে আদর করি। কতদিন তোকে আদর করিনি।'

নদী পারাপারের নৌকোতে পা দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বৈশাখীর দু-পাশে দুজন এসে দাঁড়াল। একজন মহিলা, একজন পুরুষ। মহিলা কঠিনভাবে বৈশাখীর হাত চেপে ধরল। পুরুষটি নীচু গলায় বলল, 'পালাবার চেষ্টা করবেন না বৈশাখীদেবী। আমরা পুলিশ। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। নিখিলেশ উপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধকে খুন করবার অপরাধে আমরা আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম। আসুন আপনি।'

নদীতে জোয়ার এসেছে। জল ফুলে উঠছে।

ছাপান্ন

'...প্রিয়তমা,
দেখেছি তোমার স্বপ্নাহত কৃশ পা, আমার
স্বপ্ন বুঝি মনে হয় কারণ এবার
অসময়ে নৈশ-বিরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে–
সান্ধ্য ক্লাস ছুটি হয়ে যায়।'

বই বন্ধ করে শেখর সিগারেট ধরাল। সত্যি কি প্রিয়তমা আজ স্বপ্নাহত? অসময়ে নৈশ-বিরতির ঘণ্টা বেজেছে? ছুটি হয়ে গেছে ক্লাস?

বহুদিনের পর শেখরের মন খারাপ। কবিতা পড়ে মন আরও খারাপ হয়ে গেল। রাত দশটা এখন। খানিক আগে পার্টি অফিস থেকে ফিরেছে শেখর। দশটায় বাড়ি ফেরা মানে তাড়াতাড়িই হল। এক সময় বাড়ি ফিরতে রাত একটাও বেজে যেত। অপেক্ষা করে করে তমসা ঘুমিয়ে পড়ত। সেসব অতীতের কথা। নিশুতি রাতে বাড়ি ফেরবার সময় মনে হত, ইস, অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল। জেলা কমিটিকে চিঠি লেখবার ছিল, দুটো লোকালে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়ার ছিল, এখনও পার্টি পত্রিকার এ মাসের হিসেব হয়নি, যুবর ছেলেদের নিয়ে বসা বাকি, মহিলা সমিতিতে একটা ফ্যাচাং চলছে, ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনি নিয়ে মিটিং না করলে পরে চাপ পড়ে যাবে, কলেজের ছাত্রদের ইনভলব করবার জন্য ওদের নিয়ে এখনই বসতে হবে। এরকম হাজার কাজের কথা মনে পড়ে যেত। সেই সময় রাতে বাড়ি ফেরাটা কোনও উদ্বেগের ছিল না। এলাকা ছিল হাতের মুঠোয়। ভদ্রলোক তো বটেই চোর-ডাকাতরাও পার্টির লোকদের সমীহ করত। লোকাল থানার টহলদারি ভ্যান পার্টি অফিসের দূরে দাঁড়িয়ে নজর রাখত, নেতাদের যাতে সমস্যা না হয়। পর পর দু'বার ভোটে হারবার পর সবটাই উলটে গেছে। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার পরাজয় জোর ধাক্কা হিসেবে এসেছে। এই ধাক্কা শুধু পরাজয়ের নয়, পরিকাঠামোগত অনেক সমস্যা তৈরি করেছে। ভোটের আগে পার্টি তাও অনেক নড়েচড়ে বসেছিল। কর্মী-সমর্থকরা পথে বের হচ্ছিল, পার্টি অফিসে ভিড় করছিল। ক্ষমতায় ফেরবার আশায় এই উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল। সেই উদ্দীপনা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে। এখন বেশি রাত

boierpathshala.blogspot.com

পর্যন্ত পার্টির কাজ করবার প্রশ্নই ওঠে না। সেফ নয়। রাতে পার্টি অফিসে বসে মিটিং করবার সময় সতর্ক থাকতে হয়। কে কখন বোমা মেরে, আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। অনেক জায়গায় ব্রাঞ্চ, লোকাল অফিসগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মুখে বলে দেওয়া হয়েছে, অফিসে বসে কাজকর্ম দিনের বেলায় সেরে ফেলতে হবে। সরাসরি কনফ্রনটেশনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পুলিশ, পাড়ার লোক কেউই এখন পাহারা দেবে না। সমস্যা হল, শুধুই অন্য দলের লোক হামলা চালাচ্ছে না, কোনও কোনও এলাকায় দলের পুরোনো বিক্ষুব্ধ সমর্থকরাও সুযোগ নিচ্ছে। তারাও অন্য দলের নামে হামলা করে যাচ্ছে বলে খবর আসছে। বড় সমস্যা হল আক্রমণ ঠেকাবার মতো লোক নেই। দলে লোক কমছে। কলকাতার বাইরে এরকম কয়েকটা ঘটনা ঘটছে। শেখর কিন্তু নিজের এলাকার পার্টি অফিস সন্ধের পরেও খুলছে। এই নিয়ে অন্য নেতাদের সঙ্গে তার মতের পার্থক্যও হয়েছে। কেউ কেউ আপত্তি করেছিল।

'শেখরের এত সাহস দেখানোর কিছু হয়নি। পরিস্থিতি যেমন বলছে, তেমনভাবেই চলা উচিত। পার্টির লোকেরা মরলে এখন আর কেউ শহিদ বলবে না। সামনে ভোটও নেই। বরং যে দু-পাঁচজন সঙ্গে আছে, তারাও ঘাবড়ে যাবে।'

শেখর এ কথা শোনেনি।

'মার খেতে হলে খেতে হবে। তার জন্য শহিদ সাজাবার দরকার নেই। কাউকে ধরবারও প্রয়োজন নেই। নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে মার খাব। পার্টি অফিসটা আমাদের, সেটা শুধু একটা ঘর নয়, ক্লাবের মতো গুলতানি দেওয়ার জায়গা নয়। তার সঙ্গে ভাবনাচিন্তা, নীতি, আদর্শ জড়িয়ে আছে। সেখান থেকে কেউ সরাতে গেলে অত সহজে সরব কেন? ভেঙে দিলে, পুড়িয়ে দিলে কী এসে যায়? আদর্শ-নীতি তো ভাঙা যায় না, পোড়ানো যায় না।'

'শেখর, এ সব জ্বালাময়ী ভাষণ ভোটের সময় ভালো লাগে। রাতের অন্ধকারে এসে মারধোর করবে, তখন ভালো লাগবে না। হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হব নাকি?'

শেখর রেখে গিয়ে বলেছে, 'হাসপাতালে যেতে হলে যেতে হবে। যার ইচ্ছে সে আসবে। যার নীতি-আদর্শ ভেঙে যাওয়ার থেকে হাত-পা ভেঙে যাওয়ার বেশি ভয়, সে আসবে না। বলতে লজ্জা নেই, একদল নেতা, কর্মী, সমর্থক একসময় পার্টি অফিসটাকে পাড়ার ক্লাবের মতো ব্যবহার করতেন। সন্ধেবেলা অফিস সেরে, স্নান করে, পাউডার মেখে আড্ডা দিতে আসতেন। পাওয়ারের সঙ্গে খানিকটা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গেলাম। পাড়ায় একটা সুবিধে হবে, অফিসে ট্রান্সফার আটকানো যাবে, ছেলেমেয়েকে এমএলএ, এমপি ধরে ভালো স্কুল-কলেজে ভর্তি করা যাবে। গত পাঁচ বছর ধরে সে সুবিধে না থাকায় আসা-যাওয়া কমে গিয়েছিল। ভোটের আগে আবার খানিকটা জমেছিল। যদি ক্ষমতা ফিরে আসে, এখন আবার কমেছে। এদের পার্টি অফিসে এসে ভিড় না করাই মঙ্গল। সরি, আমি এইসব কর্মী-সমর্থকদের জন্য পার্টি অফিসে তালা দিতে পারব না।'

কেউ কেউ মাথা নামিয়ে বলেছে, 'শুধু অন্য দলের লোক নয়, আমাদের ওপর খেপে থাকা পাবলিকও পেটাবে।'

মুখে এত কথা বললেও রাত করা বন্ধ করে দিয়েছে শেখর। সত্যি যদি কোনও হামলার ঘটনা ঘটে আর তাতে কেউ আহত হয়, তা হলে দায়িত্ব তার ঘাড়েই পড়বে। যদিও হামলা দিনের আলোতেও হতে পারে। তাও এই পরিস্থিতিতে সাবধানে থাকাই উচিত।

এখন কি এক কাপ চা খাবে? না থাক, তমসা ছেলেকে খাইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। শান্তর কাল পরীক্ষা। শান্ত সে ঠিকমতো স্কুল যাচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, এটাই যথেষ্ট। তমসাও স্কুলে যাচ্ছে। ভোটের ফল ঘোষণার সময় মনে হয়েছিল, পাড়াছাড়া হতে হবে। সেসব হয়নি। স্কুলে তমসাকে একটু বিদ্রুপ শুনতে হয়েছে এইটুকু যা। জিওগ্রাফির টিচার সুচরিতা নাগ বলেছেন, 'কী তমসা, তোমরা যে বললে এত মহিলা রোজ রেপড হচ্ছেন? মেয়েরা পথে বেরোতে পারছেন না। সে সবের কী হল? তাঁরা কাকে ভোট দিলেন?'

boierpathshala.blogspot.com

তমসা উত্তর দিয়েছিল, 'ভোটে জিতলেই ঘটনা মিথ্যে হয়ে যায় না সুচরিতাদি। মেয়েদের প্রতি অসম্মান, অন্যায়, অত্যাচার হয়েছে সেগুলো সবসময়ই সত্যি হয়ে থাকবে।'

সুচরিতাদি বললেন, 'আহা, আমি তা বলিনি তমসা। আমি বলিনি, মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয়নি। আমি বলছি, তারপরেও মহিলারা ভোটটা কাকে দিল?'

তমসা কথা বাড়ায়নি। বাড়িতে এসে শেখরকে বলতে সে বলল, 'গায়ে মেখো না।'

তমসা চুপ করে থেকে বলেছিল, 'সুচরিতার বিদ্রুপ যতটা অপমানের তার থেকে বেশি অপমানের কথাটার ঠিক মতো জবাব দিতে না পারা। সত্যি যদি মহিলাদের প্রতি অপমান, অসম্মান বেশি হয়, তা হলে মহিলারা কেন বিরুদ্ধে ভোট দিল না?'

শেখর চিন্তিতভাবে বলল, 'পার্টি নিশ্চয় বিষয়টা নিয়ে ভাববে। আমরা কি মানুষকে বোঝাতে পারলাম না? নাকি মানুষ আমাদের কথা বুঝতে চাইলও না? আবার এমনটাও হতে পারে, আমরা বেশি প্রচার করেছি। মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা মেলেনি। এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে প্রচারের আগে দশবার ভাবা উচিত, কতটা যাব। এরপর যখন সত্যি ঘটনাগুলো ঘটবে তখন আর মানুষ আমাদের বিশ্বাস করবে না। বুঝতে চাইবে না।'

তমসা বলল, 'কেউ বোঝেনি বললে কী করে হবে? অনেক মানুষ তো বুঝেছেও।'

শেখর বলল, 'তারপরেও বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।'

না, এখন আর চা নয়। তমসাকে করতে হবে। শেখর কবিতার বইটা আবার টেনে নিল।

ছিল বটে সেই সব দিন।
বুদ্‌ধি ছিল প্‌রতিবন্‌ধ,
ছিল ফুলহীন পুষ্‌পগন্‌ধ–
ঐতিহ্‌য নবীন।

তমসা ঘরে ঢুকল। বরের কাছে এসে বলল, 'কী পড়ছ?'

শেখর বই উলটে দেখাল। বলল, 'পড়ে দেখো, ভালো লাগবে।'

তমসা বলল, 'আচ্ছা পড়ব।'

শেখর বলল, 'না, থাক। খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব।'

তমসা শেখরের কাঁধে হাত রেখে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে?'

শেখর বলল, 'না, একটু টায়ার্ড ফিল করছি। লম্বা মিটিং ছিল।'

তমসা গলায় সামন্য বিরক্তি নিয়ে বলল, 'এবার এ সব কমাও। আমিও সব কমিয়ে দেব ঠিক করেছি।'

শেখর মুখ ঘুরিয়ে বউয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন? পার্টি ভোটে হেরে গেছে বলে?'

তমসা বলল, 'ঠিক উলটো। হেরে গেছে বলে পার্টির হা হুতাশ দেখে ঘেন্না হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই পার্টির জন্ম হয়েছিল, শুধু ইলেকশনের জন্য। পার্টির যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই মুখ শুকিয়ে বলে, কী হল বলো তো। যেন পার্টির নীতি-আদর্শ সব বরবাদ হয়ে গেছে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।'

শেখর অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'বড় আঘাত তো বটেই।'

তমসা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো। মিটিংয়ে ঝগড়া হয়েছে।'

শেখর শান্ত ভাবে বলল, 'কিছু হয়নি। মিটিংয়ে তর্ক-বিতর্ক তো লেগেই থাকে। কমিউনিস্ট পার্টিতে তর্ক-বিতর্কটাই আসল।'

শেখর মুখে যাই বলুক, আজকের তর্ক অন্য দিনের মতো নয়। সে যথেষ্ট শক্ত মনের মানুষ। কিন্তু আজ তার মন ভেঙেছে। মিটিংয়ে তর্ক শুরু হয়েছিল বিজয়ের সঙ্গে, পরে সৌমাল্য, ঋত্বিক, প্রশান্তদা জয়েন করে।

boierpathshala.blogspot.com

মিটিংয়ে স্থানীয় ভাবে পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা হচ্ছিল। কেন এই এলাকার পার্টি এত কম ভোট পেল তাই নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছে জেলা কমিটি। ভোটের প্রচারে স্থানীয় ইস্যুতে কোনও ফাঁক ছিল কি না, মানুষের মন বুঝতে কোথাও অসুবিধে হয়েছে কি না, পার্টির কর্মীরা আত্মতুষ্টিতে ভুগছিল কি না। শেষ পর্যন্ত শেখরকে সবাই মিলে আক্রমণ করল। এমনকী এতদিন তার গোষ্ঠীতে যারা ছিল তারাও ছেড়ে কথা বলেনি। তমসার স্কুলের সুচরিতাদির প্রশ্নের মতো অনেক প্রশ্নের উত্তর শেখরও দিতে পারেনি।

বিজয় বলল, 'পার্টির কর্মী-সমর্থকরা মানুষের মন বোঝবার থেকে আজও অনেক বেশি করে লিডারের মন বুঝতে ব্যস্ত থাকে। লিডার কী চাইছে, লিডার কী বলছে। লিডারের মন জুগিয়ে চললে পার্টিতে পজিশন থাকবে। গত পরাজয় থেকে কর্মীরা কোনও শিক্ষাই নেয়নি। আমাদের এখানেও তাই হয়েছে। শেখর বলে দিয়েছিল, ভোটের প্রচারের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের মন বুঝতে হবে। আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়েছি। মানুষের মন বুঝতে পারিনি। কিন্তু শেখরকে রিপোর্ট করেছি উলটো। তাকে খুশি রাখতে হবে যে।'

শেখর বলে, 'এটা যে করেছে সে পার্টি বিরুদ্ধ কাজ করেছে। আমাকে নয়, পার্টিকে মিসগাইড করেছে।'

বিজয় বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, 'এ সব বইয়ের কথা এবার বাদ দাও শেখর। এখানে পার্টি কে? পার্টি তো তুমি। আমরা যদি এসে বলতাম, মানুষের মন বুঝতে পারিনি, তুমি খুশি হতে?'

শেখর বলে, 'আমি সত্যিটা জানতে পারলাম না। গতবারের মতো এবারও জেলাকে ভুল রিপোর্ট দিয়েছি। বলেছি, জিতব। সেটা আপনাদের ভুল রিপোর্টের জন্য হল।'

সৌমাল্য তেড়েফুঁড়ে বলল, 'বা:, এটা তো মন্দ নয়। সব আমাদের দোষ শেখরদা? আর আপনি সেক্রেটারি হয়ে কোনও দায় নেবেন না?'

শেখর বলল, 'অবশ্যই নিচ্ছি। আলটিমেট তো সেক্রেটারির রেসপন্সিবিলিটি।'

প্রশান্তদা দুম করে বলল, 'এ সব অনেক শুনেছি, গতবার থেকেই শুনছি। ভুল রিপোর্ট পাঠানোর জন্য কোন নেতার শাস্তি হয়েছে বলো তো শেখর? পার্টি খারাপ রেজাল্ট করলে, সেক্রেটারির শাস্তি হবে না কেন? সে কে? কেন তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে না?'

শেখর চুপ করে রইল। এ সব তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। ঋত্বিক বলল, 'কজন সেক্রেটারিকে সরানো হবে? সর্বত্র তো হার হয়েছে।'

প্রশান্তদা উত্তেজিত গলায় বলল, 'যারা ভুল রিপোর্ট দিয়েছে তাদের সবাইকে সরানো উচিত। নেতা হওয়ার তো কারও পৈতৃক অধিকার নয়। পার্টি তো কারও জমিদারি নয়। তুমি পারোনি, একবার নয়, বারবার পারোনি। তা হলে তুমি সরে যাও। আর একজনকে সুযোগ দাও। এরা পার্টির হিরো নয়, ভিলেন?'

শেখর কড়া গলায় বলল, 'আপনি কিন্তু বেশি মাত্রায় উত্তেজিত হচ্ছেন প্রশান্তদা। এ ভাবে পার্টিতে মিটিং হয় না। একটা ডিসিপ্লিন আছে।'

বিজয় ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'রাখো তোমার ছড়ি ঘোরানো ডিসিপ্লিন। পার্টির নেতা মানে বস নয়। সাধারণ মানুষ আর কর্মীদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর নাম ডিসিপ্লিন? এই জন্যই তো এই হাল। নেতাদের উচিত ছিল নিজে থেকেই সরে যাওয়া।'

শেখর বলল, 'এই মিটিং লোকাল কমিটির সেক্রেটারি সরানোর জন্য ডাকা হয়নি।'

প্রশান্তদা বলল, 'পরাজয়ের কারণ নিয়ে আলোচনা করতে হলে নেতার ব্যর্থতা নিয়েও বলতে দিতে হবে। অনেক সহ্য করেছি, আর করব না। পার্টি কারও পিতৃদেবের নয়।'

সৌমাল্য বলল, 'তুমি একা কেন শেখরদা, দায় আমরাও নেব। বোঝাতে পারিনি, মানুষকে বোঝাতে পারিনি তাহলে আর কেন পার্টি করছি? শুধু অন্য দলকে গাল দিয়েছি। দিয়ে খুশি থেকেছি। নিজেদের পায়ের তলার মাটি নিয়ে ভাবিনি।'

বিজয় বলল, 'আসলে পার্টির ক্লাস ক্যারেকটারটাই বদলে গেছে। তারাই এখন পার্টিকে সাপোর্ট করছে যাদের মোটা মাইনের চাকরি আছে, বড় লাভের বিজনেস আছে। বাড়িতে ফ্রিজ, এ সি আছে। গাড়ি আছে।

boierpathshala.blogspot.com

তারা সব আমাদের পার্টির লোক। তারাই আমাদের কাছে এসেছে যারা নিজেদের ডি এ, এ টি, বোনাস নিয়ে ব্যস্ত। আরও চাই, আরও চাই। লাখ টাকার রোজগারিরা আমাদের এবারও ভোট দিয়েছে। অথচ কমিউনিস্ট পার্টিটা তৈরি হয়েছিল গরিব, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য। যার কিছু নেই তারা ছিল পার্টির নেতা।'

শেখর আর নিজেকে সামলাতে পারল না। বলে বসল, 'আমারও কিছু নেই। আমি একজন হোলটাইমার।'

বিজয় ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'এটা কী বলছ শেখর! তোমার স্ত্রী একজন সরকারি স্কুল শিক্ষক। কত টাকা বেতন পান তুমিই ভালো করে জানো। এরপরেও নিজেকে সর্বহারা বলে চালাও, গরিব মানুষরা হাসবে।'

শেখর কঠিন গলায় বলল, 'তমসা নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে।'

বিজয় বলল, 'আমি তো বলিনি, তাকে কেউ চাকরি করে দিয়েছে। সে নিজের যোগ্যতাতেই লেখাপড়া শিখে কাজ পেয়েছে, আমি বলছি, দয়া করে তুমি নিজেকে দরিদ্র বলো না শেখর। পরিবারের উপার্জনটা মাথায় রেখে নিজের শ্রেণি চরিত্র বিচার করো। এটাই নিয়ম।'

শেখর বলল, 'তা হলে দরিদ্র না হলে তাকে নেতাই করা যাবে না।'

বিজয় বলল, 'জানি না করা যাবে কি না, কিন্তু একজন জমিহারা কৃষক, একজন বন্ধ হাওয়া কারখানার শ্রমিক নেতৃত্বে না থাকলে গরিব মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকবে কেন? নেইও। তারা উলটো দিকে চলে গেছে। যে দলকে কোনও লাখপতি সমর্থন করছে, তাকে কিছুতেই কপর্দকহীন একজন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। পার্টি চরিত্র হারাচ্ছে। এটা আগে বোঝো শেখর।'

মিটিং এখানেই বন্ধ করে দিতে হয় শেখরকে। স্পষ্ট তার বিরুদ্ধে অনাস্থা। অনাস্থা হবে নাই বা কেন? সত্যি তো তার নিজের দায়িত্ব সবথেকে বেশি। বড় বড় কথা শুধু দলের কর্মীদের বলেছে। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেনি। আর করলেও বা কী হত? হয়তো ভোটে জিতত। কিন্তু ক্লাস ক্যারেকটার? তার উত্তর কী?

রাতে শোওয়ার পর তমসা কাছে এল। শেখরের পাশে বসে জামা খুলতে খুলতে গাঢ় গলায় বলল, 'এসো। আজ তুমি খুব অস্থির। আমার কাছে এসে শান্ত হও।'

শেখর তমসার নগ্ন বুকে মুখ রেখে ফিসফিস করে বলল, 'ভালো লাগছে না। কিছু ভালো লাগছে না তমসা।'

তমসা শেখরের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'চলো, কদিন কোথাও ঘুরে আসি। ফিরে এসে ভুল শুধরে আবার কাজ শুরু করবে। করতেই হবে।'

সাতান্ন

বিমলকান্তি নিজের অফিসঘরে চুপ করে বসে আছেন। তিনি যেন খানিকটা ঘোরের মধ্যে আছেন।

কর্ণিকা দরজা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'স্যর, আসব?'

বিমলকান্তি মাথা নাড়লেন। কর্ণিকা ঘরে ঢুকে বলল, 'স্যর, বাড়ি যাবে না?'

বিমলকান্তি ঘোর কাটিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। চাপা বললেন, 'যাব। তুমি চলে যাও কর্ণিকা। ইস, তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। তোমার এখন কত কাজ।'

কর্ণিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বিমলকান্তি বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

কর্ণিকা চুপ করেই রইল। বিমলকান্তি এবার হালকা বিরক্ত হলেন। বললেন, 'কী হল। বললাম তো চলে যাও। তোমার দেরি হয়ে গেছে। গাড়ি আছে তো?'

কর্ণিকা মৃদু গলায় বলল, 'হ্যাঁ, স্যর আছে।'

বিমলকান্তি বললেন, 'তাহলে আর দেরি কোরো না। বাড়িতে ফোন করে দিয়েছ?'

boierpathshala.blogspot.com

কর্ণিকা মাথা নীচু করে বলল, 'দিয়েছি।'

বিমলকান্তি এবার বেশ বিরক্ত হলেন। গলা একটু কঠিন করে বললেন, 'আমার নিজের কিছু কাজ আছে কর্ণিকা। সেই কাজ আমাকে একা করতে হবে।'

কর্ণিকা বসের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলে এসে বসল। আটটা বাজে। অফিস ফাঁকা। অ্যাকাউন্টসে দুজন আছে। কাল মাল ডেলিভারি আছে। চালান তৈরি করছে। কর্ণিকা মোবাইলে নম্বর টিপল। ওপাশে ফোন ধরল বারিধারা।

'কী হয়েছে কর্ণিকা?'

কর্ণিকা নীচু গলায় বলল, 'স্যর তো উঠছেন না। এই মাত্র আমি গিয়ে রিকোয়েস্ট করলাম।'

বারিধারা চিন্তিত গলায় বলল, 'কী করছে বাবা?'

কর্ণিকা তার বসের দরজার দিকে তাকিয়ে গলা আরও নামিয়ে বলল, 'কিছু করছে না। চুপ করে বসে আছে। বুঝতে পারছি খুব মনখারাপ।'

বারিধারা টেলিফোনের ওপাশে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মন খারাপ তো হবারই কথা। খুব বড় ধাক্কা...।'

কর্ণিকা বলল, 'তুমি একবার ফোন করবে?'

বারিধারা বলল, 'করছি। কিন্তু আমার কথা শুনে বাড়ি চলে আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

কর্ণিকা বলল, 'তাও একবার কোরো। নইলে ম্যাডামকে বোলো। স্যরের উচিত বাড়িতে গিয়ে রেস্ট করা।'

বারিধারা চিন্তিত গলায় বলল, 'দেখছি। সেরকম হলে আমি অফিসে গিয়ে বাবাকে গিয়ে নিয়ে আসছি। কর্ণিকা, তুমি বাড়ি চলে যাও। তোমার অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কর্ণিকা একটু চুপ করে থেকে দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি থাকব। স্যার যতক্ষণ থাকবেন, আমিও থাকব। তুমি স্যারকে ফোন কোরো।'

গত দু দিন ধরে ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে।

বুধবার সকালে অফিসে এসেই কর্ণিকা সোজা চলে গিয়েছিল এইচ আর ডিপার্টমেন্টে। রেজিগনেশন লেটার জমা দেয়। এইচ আর হেড চিঠি পড়ে তো আকাশ থেকে পড়লেন। একরকম চেপে ধরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কর্ণিকার কাছ থেকে সব খবর বের করলেন। কীভাবে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। সে কী করে? বিয়ের পর কর্ণিকা কী করবে? শুধু ঘরসংসার? নাকি কাজেকর্মে ঢুকবে? কর্ণিকার মনে হচ্ছিল, পালাতে পারলে বাঁচি।

বিমলকান্তি আসবার পরেই সেই চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হল তার টেবিলে। বিমলকান্তি চিঠি পড়ে কর্ণিকাকে ঘরে ডেকে পাঠান। কর্ণিকা দুরু দুরু বুকে ঘরে ঢোকে। যতই হোক, ফট করে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। স্যর নিশ্চয় বিরক্ত হবেন। গম্ভীর বিমলকান্তি একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'কনগ্র্যাচুলেশন কর্ণিকা। খুব ভালো খবর। তুমি বিয়ে করে বাইরে চলে যাচ্ছ এবং সেখানে নতুন করে কর্মজীবন শুরু করছ জেনে খুব খুশি হলাম।'

কর্ণিকা প্রথমে বাড়ানো হাত ছুঁয়ে, তারপর টেবিল ঘুরে এসে বসকে প্রণাম করে।

বিমলকান্তি বললেন, 'বিয়েতে কিন্তু জমিয়ে খাওয়াদাওয়া চাই। মাকে বলবে।'

কর্ণিকা চোখের জল সামলে বললেন, 'অবশ্যই স্যর।'

বিমলকান্তি এর পর পাত্র সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। কর্ণিকা লজ্জায় মুখ লাল করে ছোট ছোট বাক্যে উত্তর দেয়।

'আমি এত তাড়াতাড়ি রাজি হচ্ছিলাম না স্যর...মা জোর করলেন...।'

বিমলকান্তি বললেন, 'এটা তো শুধু বিয়ে নয়, বাইরে গিয়ে নিজের মতো কাজ করতে পারবে, সেটাও খুব বড় কথা। আমাদের দুর্ভাগ্য, মেয়েদের বেলায় আমরা বিয়ে-টিয়েগুলো খুব বড় করে দেখি। কাজটাকে দেখি

boierpathshala.blogspot.com

না। তুমি সেই সুযোগ পেলে।'

কর্ণিকা আবেগ সামলে বলল, 'থ্যাঙ্কু স্যর।'

বিমলকান্তি বললেন, 'সবথেকে বড় কথা সিরিয়াস হওয়া। তুমি সিরিয়াস বলেই বিয়েটাকে যেমন সিরিয়াস ভাবে নিয়েছ, এই কাজটাকেও নিয়েছ। যখন নতুন জীবনে ঢুকতে হয়, তখনও যেমন সিরিয়াস হতে হয়, যে জীবন ছেড়ে যাচ্ছ, তার প্রতিও সিরিয়াস হতে হয়। তুমি চলে গেলে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের যেমন ক্ষতি, আমারও পার্সোনাল ক্ষতি হবে। কিন্তু এটাই তো নিয়ম মাই ডটার।'

কথা শেষ করে হাসলেন বিমলকান্তি।

কর্ণিকা এবার নিজেকে সামলাতে পারল না। তার চোখে জল।

বিমলকান্তি বললেন, 'তোমার মায়ের সঙ্গে আমি কথা বলব। মণিকুন্তলা, বারিধারাকে নিয়ে যাব।'

কর্ণিকা আবেগবিহ্বল গলায় বলল, 'খুব ভালো হবে স্যর।'

বিমলকান্তি বললেন, 'ছেলেটির সঙ্গেও আমি কথা বলতে চাই। ফোনে ধরিয়ে দেব।'

কর্ণিকা কী বলবে বুঝতে পারছে না। এটা যেন একটা অন্য বিমলকান্তি সেন। যে মানুষটা কঠিন, মূলত রাগী, অফিসে ব্যক্তিগত কথাবার্তা মোটে পছন্দ করেন না, তাঁকে মনে হচ্ছে পরম আত্মীয়। যেন নিজের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। আজ আবার প্রমাণ হল, বাইরে থেকে একজন মানুষকে যতটা দেখা যায়, সেটা মানুষটার একটুখানি। বাকি বিশাল অংশটা থাকে ভিতরে। ভালোবাসা, স্নেহ, আদর মানুষ চট করে কাউকে দেখাতে চায় না। পছন্দের মানুষের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কর্ণিকার নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী বলে মনে হল...।'

'স্যর, আপনার অসুবিধে হবে...।'

বিমলকান্তি হেসে বললেন, 'তোমার আগামী কর্মজীবন যদি সাকসেসফুল হয়, তাহলে কিন্তু আমার সুবিধে হবে কর্ণিকা। আমি বুঝতে পারব, একটা কোম্পানি চালাতে এসে আমি মানুষ চিনতে ভুল করিনি। তোমার মতো কম বয়েসের একজন মেয়েকে যখন গুরুদায়িত্বে বসিয়েছিলাম, তখন ভাবিনি। কেউ আপত্তি করবার সাহসও পায়নি। কিন্তু সংশয় ছিল, তুমি পারবে কিনা। তুমি পেরেছ।'

কর্ণিকা অস্ফুটে বলল, 'থ্যাঙ্কু স্যর।'

'কবে তুমি রিলিজ চাইছ?'

কর্ণিকা মাথা নামিয়ে দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

বিমলকান্তি বললেন, 'ফাইন। আমি এখনই বলে দিচ্ছি। কাল থেকেই তুমি ছুটিতে চলে যাও। পরে এসে হিসেব-টিসেব বুঝে নিও।'

কর্ণিকা একটু বাধো বাধো করে বলল, 'স্যর, আমি কি কাউকে চার্জ বুঝিয়ে দেব?'

বিমলকান্তি হেসে বললেন, 'তুমি চলে গেলে এই পোস্টটা থাকবে কিনা, এখনও ভাবিনি। ডোন্ট ওয়ারি মাই ডটার। আমি সামলে নেব।'

বসের ঘর থেকে কর্ণিকা বেরিয়ে আসবার একটু পরেই বারিধারা তাকে ফোন করে অভিনন্দন জানাল।

'দারুণ খুশির খবর পেলাম কর্ণিকা। আমি কিন্তু তোমার কাছে বেড়াতে যাব।'

কর্ণিকা বলল, 'অশব্যই যাবে। তার আগে আমি আর মা তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি।'

বারিধারা বলল, 'না এলেও কোনও সমস্যা নেই। আমি তোমার বিয়েতে তিনদিন খাব। নেমন্তন্নে খাওয়ার থেকে নেমন্তন্ন ছাড়া খেতে বেশি মজা। খাবারের টেস্ট বেশি পাওয়া যায়।'

দুজনেই খুব হাসতে লাগল। ফোন ধরলেন মণিকুন্তলাও।

'অনেক আশীর্বাদ কর্ণিকা। খুব ভালো হল।'

কর্ণিকা লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, 'এভাবে করলে হবে না ম্যাডাম, এসে করতে হবে।'

একটু পরে মেঘবতীও ফোন করল। ফোন করে ফিচ করে একটু যেন কেঁদেও ফেলল।

boierpathshala.blogspot.com

'তুমি বাবাকে যেভাবে দেখতে...চলে গেলে কী যে হবে...তুমি বয়সে ছোট, তার পরেও বলি, আমরা তোমার কাছে খুবই গ্রেটফুল কর্ণিকা...।'

কর্ণিকা নিজেকে কোনও রকমে সামলে বলল, 'অমন করে বলো না দিদি। আমি আমার ডিউটি করেছি মাত্র। তবে চিন্তা করো না, স্যর নিশ্চয় আমার থেকে অনেক এফিসিয়েন্ট কাউকে খুঁজে পাবেন।' ফোন ছেড়ে দিয়ে কর্ণিকার ভীষণ ভালো লাগল। সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের মালিকের বাড়ির মানুষ সে নয়, সামান্য কর্মচারীর সুখবরে তারা যেভাবে খুশি, এটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এমন কি আজকাল হয়? না, হয় না। কর্পোরেট জীবন মানুষের এই সব আবেগ, কৃতজ্ঞতা কেড়ে নিয়েছে। মানুষ আর পুরো মানুষ নেই। সভ্যতার জন্য, এগিয়ে চলবার জন্য সেটাই হয়তো ঠিক। সেটাই উচিত। তবে তাতে উপার্জন করা যায় বেশি কিন্তু ঠিকমতো বাঁচা যায় না। কর্মজীবনটাও তো বাঁচার মধ্যে পড়ে। আসলে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এখনও পাকা মাথার কর্পোরেট হয়ে উঠতে পারেনি। এখনও সে পারিবারিক ব্যবসা। পরিবারের স্নেহ, মমতা জড়িয়ে আছে। কর্ণিকা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, সে যেখানেই থাক, এই কোম্পানিকে সে ভুলবে না।

বিমলকান্তি কর্ণিকার রেজিগনেশন লেটারের ওপর নোট দিয়ে এইচ আর ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিলেন। টাকা-পয়সার হিসেব দ্রুত তৈরি করতে বললেন। কর্ণিকা বিদেশে চলে যাবে। তার পক্ষে বার বার এসে ছোটাছুটি করা সম্ভব নয়। মেয়েটাকে কি বেশি কিছু দেওয়া যায় না? না, সেটা ঠিক হবে না? কোম্পানির নিয়ম সবার জন্য সমান। বিয়ের উপহার হিসেবে যা দেওয়া হবে সেটা সেনবাড়ির পক্ষ থেকেই যাবে, অফিস থেকে নয়।

সারাদিনের কাজের মধ্যেই বিমলকান্তি এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করলেন। এইটুকু মেয়েকে বড় দায়িত্ব দেওয়ার সময় তিনি সংশয়ের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু ভুল করেননি। কর্ণিকা বিয়ে করবার সময় বিদেশ দেখেনি, তার কাজকে যে পছন্দ করেছে তাকেই গ্রহণ করেছে। খুব ভালো।

বিমলকান্তি এই সময় কফি খান না। তার পরেও ক্যান্টিনে ফোন করে কফি পাঠাতে বললেন। কফি আসবার সামন্য পরেই থানা থেকে ফোন আসে।

'বিমলকান্তি সেন বলছেন?'

'বলছি।'

'নিখিলেশ উপাধ্যায় নামে আপনাদের কোম্পানিতে কেউ কাজ করেন?'

বিমলকান্তি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'কাজ করেন মানে, উনি খুব সিনিয়ার, আমার বাবার বন্ধু, আমাদের অ্যাডভাইসার। কেন কী হয়েছে?'

টেলিফোনের ও প্রান্তে পুলিশ অফিসার একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'একটা ব্যাড নিউজ আছে মিস্টার সেন।'

বিমলকান্তি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'অ্যাকসিডেন্ট?'

'না, হি ইজ মার্ডারড। তাকে খুন করা হয়েছে।'

বিমলকান্তি দু হাতে ফোন চেপে ধরে কাঁপা গলায় বললেন, 'কী বলছেন?'

'আপনাকে একবার আসতে হবে মিস্টার সেন। বডি আইডেনটিফাই করতে হবে। তবে অমরা মার্ডারারকে ট্র্যাক করে ফেলেছি। আশা করি আজ-কালকের মধ্যে ধরে ফেলব।'

বিমলকান্তি বিহ্বল গলায় বললেন, 'কে? ওর মতো একজন ভালোমানুষকে কে খুন করল...।'

'থানায় আসুন, যতটা জানতে পেরেছি বলব। একজন মহিলা কাজটা করেছে।'

এই ক'টা দিন ঝড়ের মতো কেটে গেল। মর্গ, পুলিশ, পোস্টমর্টেম। উপাধ্যায়ের একমাত্র মেয়ে বেঙ্গালুরু থেকে এলেন। পুলিশ কয়েকবার অফিসে এল। তবে খুনি পরদিনই ধরা পড়েছে। থানায় গিয়ে বিমলকান্তি তাকে দেখেছেন। পুলিশই ব্যবস্থা করেছিল। বিমলকান্তি তাকে চিনতে পারেননি। বয়স্ক মহিলা খুব স্বাভাবিক

boierpathshala.blogspot.com

ভাবে হাত তুলে তাকে নমস্কার জানিয়েছেন। বিমলকান্তি অবাক হন। এই মানুষ নিখিলেশ উপাধ্যায়কে খুন করেছে। কেন? কোর্টে হাজিরা দিয়ে পুলিশ পাঁচ দিনের জন্য মহিলাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। মহিলার নামে নাকি আরও অনেক মামলা আছে। আরও তদন্তের দরকার। মহিলা নিখিলেশ উপাধ্যায়কে হত্যার ব্যাপারে কিছুতেই মুখ খুলছেন না। শুধু বলছেন, 'পুরোনো রাগ।' পুলিশ বিশ্বাস করছে না। তাদের সন্দেহ, এই ঘটনার সঙ্গে সেন এন্ড অ্যাসোসিয়েটসের কোনও যোগসূত্র আছে।

তদন্তে কী কী জানা যাচ্ছে, নিয়মিত পুলিশ বিমলকান্তিকে জানাচ্ছে।

চাকরি ছেড়ে দিলেও কর্ণিকা অফিস রিলিজ অর্ডার নেয়নি। বিয়ে তো অতি সামান্য ব্যাপার। মরে গেলেও সেই ভয়ংকর অবস্থায় 'স্যার'কে ছেড়ে, অফিস ছেড়ে যাবে না। বাড়িতে তো বলেছেই, ভাবী শাশুড়িকেও জানিয়ে দিয়েছে। অবস্থা খানিকটা নর্মাল হলে তবে বিয়ের মার্কেটিং হবে। 'স্যর' যতক্ষণ অফিসে থাকছে, কর্ণিকাও থাকছে। আজও তাই করছে।

কথা ছিল বারিধারা ফোন করে 'মনখারাপ' করা বাবাকে বাড়ি যেতে বলবে। সে নিজেই চলে এল।'

বারিধারাকে দেখে উঠে দাঁড়াল কর্ণিকা।

বারিধারা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি এখনও বসে আছ?'

কর্ণিকা নীচু গলায় বলল, 'স্যর না গেলে কী করে বেরোব?'

বারিধারা এগিয়ে এসে কর্ণিকাকে জড়িয়ে ধরল।

আটান্ন

বারিধারা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে মাথা নামিয়ে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে অস্ফুটে বলল, 'বাবা, তুমি কি পুলিশের কথা বিশ্বাস করছ?'

বিমলকান্তি নীচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, করছি। ওরা আমাকে কাগজপত্র দেখিয়েছে। নিখিলেশ উপাধ্যায়ের ব্যাগ থেকে সেই সব কাগজপত্র পাওয়া গেছে।'

বারিধারা বলল, 'কী আছে, সেই কাগজে?'

বিমলকান্তি একটু থমকে বললেন, 'থাক। তোর শুনলে খারাপ লাগবে।'

বারিধারা মালিন হেসে বলল, 'লাগুক, তারপরেও শুনব। সবটাই তো খারাপ।'

বিমলকান্তি ঠিক করেছিলেন, আজকের ঘটনায় কাউকেই কিছু বলবেন না। অফিসে বাড়িতে কোথাও নয়। এখন ছোট মেয়ের অফিসে চলে আসবার পর নিজেকে সামলাতে পারছেন না। মনে হচ্ছে, কাউকে বলা দরকার। মনটা হালকা হবে।

থানা থেকে আজ বিমলকান্তিবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিল। বিমলকান্তিবাবু তখন সবে অফিসে এসেছেন। গুছিয়ে বসাও হয়নি। জরুরি ডেলিভারির ব্যাপার আছে। যে বিরাট আর্ডার একসময় দেরির কারণে বাতিল হয়ে যেতে বসেছিল সেটা ছাড়া হবে। নিখিলেশ উপাধ্যায়ের পরামর্শ মতো চিঠি লিখেই অর্ডারটা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল। কী অদ্ভুত। সেই মানুষটার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে পুলিশ ডাকছে! বিমলবাবু সময় চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিকেলের দিকে যদি যাওয়া যায়। থানার অফিসার বললেন, না, এখনই আসতে হবে। বিষয়টা খুবই জরুরি। দেরি করা যাবে না। থানায় যাওয়ার পর অফিসার খাতির করে বসালেন।

'চা খাবেন মিস্টার সেন?'

বিমলকান্তি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'না'।

অফিসার বললেন, 'সরি মিস্টার সেন, আপনাকে জোর করে ডেকে পাঠালাম। বুঝতে পারছি, এখন আপনাদের ব্যস্ততার সময়।'

বিমলকান্তি শুকনো হেসে বললেন, 'এতে সরির কী আছে? আপনার ডিউটি। করতে তো হবে।'

boierpathshala.blogspot.com

অফিসার বললেন, 'কোনও কোনও ডিউটি পরেও করা যায়, কিন্তু এটা করা যাবে না। মনে হচ্ছে, নিখিলেশ উপাধ্যায়ের মার্ডার কেস সলভ করা গেছে।'

বিমলকান্তি আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'তাই? সব জানা গেছে?'

অফিসার একটু হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে। এবার আপনার কাছ থেকে ছোটখাটো দু-একটা কনফার্মেশনের প্রয়োজন। সেটা পেলেই আমরা কেসটা ফ্রেম করতে পারব। কাল ওই মহিলার কোর্ট প্রোডাকশন রয়েছে। কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ে যেতে না পারলে সমস্যা আছে। আমরা ওকে আমাদের হেফাজতে নিতে চাইছি। মহিলার নামে বহু পুরোনো কেস আছে। মনে হচ্ছে মার্ডার কেসও আছে। স্বামীর সঙ্গে মিলে করেছিলেন। আপনার সাহায্য দরকার। সেই কারণে তাড়াতাড়ি আপনাকে ডেকে পাঠালাম।'

বিমলকান্তি বললেন, 'বলুন আমাকে কী করতে হবে।'

অফিসার কাগজপত্র বের করতে করতে বলেন, 'কাল রাতে ইন্টারগেশনের সময় মহিলা সব বলেছেন। কেন তিনি নিখিলেশ উপাধ্যায়কে খুন করেছেন।'

বিমলকান্তি বললেন, 'কেন?'

অফিসার বললেন, 'দুটো পার্ট আছে। তার মধ্যে একটা হল, আপনাদের কোম্পানিকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা নেওয়া।'

বিমলকান্তি অবাক হয়ে বললেন, 'ব্ল্যাকমেল! আমাদের কোম্পানিকে? সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে? কী বলছেন অফিসার! ওই মহিলাকে কীভাবে ব্ল্যাকমেল করবে?'

অফিসার সামান্য হেসে বললেন, 'ওই মহিলা মিস্টার সেন, ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল নিখিলেশ উপাধ্যায়। এই কাজে বৈশাখী রাজি হননি। এই নিয়ে দু'জনের ঝগড়া হয়।'

বিমলকান্তিবাবু এতক্ষণ সোজা হয়ে বসে অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন, এবার চেয়ারে হেলান দিলেন। বিড়বিড় করে বলেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

অফিসার এবার সংক্ষেপে গোটা ঘটনা জানান। নিখিলেশ উপাধ্যায় কীভাবে জাল কাগজপত্র তৈরি করেছিল, প্রফেশনাল ব্ল্যাকমেলার হিসেবে বৈশাখীকে অ্যাপয়েন্ট করেছিল, কীভাবে ঝগড়া লাগে—সব।

এরপর ফাইল থেকে কাগজপত্র বের করে বিমলকান্তিকে হাতে দেয়।

বারিধারা বলল, 'কীসের কাগজ?'

বিমলকান্তিবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'কোর্টের জাল কাগজ। সেখানে তোর দাদুর সঙ্গে এক মহিলাকে জড়ানো হয়েছে। আমার মা ছাড়াও উনি নাকি একজনকে লুকিয়ে বিয়ে করেছিলেন। ওই মহিলা নাকি তার মেয়ে। সে এসে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের কাছ থেকে সম্পত্তির ভাগ চাইবে।'

বারিধারার হাত-পা কেমন যেন অবশ লাগছে। ভয়ও করছে। দাদু-বাবাকে ঘিরে এত বড় চক্রান্তের জাল ছড়ানো হয়েছিল!

'এতে নিখিলেশ দাদুর কী লাভ হত?'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'জানি না। ওই মহিলা বলেছেন, নিখিলেশ উপাধ্যায় নাকি মাঝখানে এসে বিষয়টা ধামাচাপা দেবে বলে ঠিক করেছিলেন। আমাকে পারিবারিক কেলেঙ্কারির ভয় দেখিয়ে খুব বড় একটা অ্যামাউন্ট মহিলাকে দিতেন! সেখান থেকে ভাগ পেতেন।'

বারিধারা অস্ফুটে বলল, 'কী ভয়ঙ্কর!'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'শুনে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। পুলিশ অফিসার কাগজপত্র দেখাতে বুঝতে পারলাম, ঠিক। ওরা আমার কাছ থেকে নাম, ঠিকানা কনফার্ম করল। আমার এত খারাপ লাগছিল...।'

বারিধারা বুঝতে পারছিল, আজ বাবার মন এত খারাপ কেন। বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতাই মানুষের সবথেকে বড় অপরাধ। অথচ কত অনায়াসে মানুষ সহজ স্বাভাবিকভাবে এই অপরাধ করে চলে। বুক ফুলিয়ে থাকে। নিখিলেশদাদুকে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস কী দেয়নি! কবে অবসরের বয়স হয়ে গেছে।

boierpathshala.blogspot.com

তারপরেও মাথায় তুলে রেখেছে। বারিধারার চিরকালই মনে হত, কোথাও যেন দাদুর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছিল। কিন্তু ওই মহিলা এতদূর এগিয়েও কাজটা করলেন না কেন? টাকা-পয়সার দরদাম দিয়ে পোষাচ্ছিল না?

বিমলকান্তি মুখ তুলে মেয়ের চোখে চোখ রাখলেন।

'ঘটনার দ্বিতীয় অংশটা আরও মারাত্মক বৃষ্টি।'

বারিধারা বলল, 'বলো।'

বিমলকান্তিবাবু মাথা নামিয়ে টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে খানিকটা আঁকিবুকি কাটলেন। কীভাবে বারিধারাকে কথাটা বলবেন?'

বারিধারা আবার বলল, 'কী হয়েছে বাবা?' সে হাত বাড়িয়ে বাবার হাতটা স্পর্শ করল।

বিমলকান্তি মাথা নামিয়েই বললেন, 'ওই মহিলা...বৈশাখী...উনি অর্চিনের মা।'

বারিধারা বিস্ফারিত চোখে বলল, 'কী বলছ বাবা? উনি অর্চিনের মা!'

বিমলকান্তি মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাঁ, বৃষ্টি। পুলিশকে উনি নিজের সব পরিচয় জানিয়েছেন। আমার ধারণা জানাতে বাধ্য হয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওরা নিশ্চয় চাপ দিয়েছিল। পুলিশ জানে কীভাবে কথা বের করতে হয়।'

বারিধারা-মেঘবতীরা অর্চিনের পরিচয় খুব গভীরে গিয়ে জানত না। মামার বাড়ির দিকের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, কলকাতায় তাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করছে, ব্যস এইটুকুই। এ ব্যাপারে মেয়েরা তাদের মাকে খুঁচিয়ে জিগ্যেস করেনি কখনও। প্রয়োজন হয়নি। ছেলেটা এত ভালো, কিছু নিয়ে কখনওই বেশি কৌতূহল তৈরি হয়নি। তার ভদ্র আচরণে সবাই খুশি ছিল। এই ছেলের মা ওই খুনি মহিলা!

বিমলকান্তিবাবু নীচু স্বরে বললেন, 'আমরা জানতাম মহিলা একজন প্রফেশনাল ফ্রড। ইমপস্টার। বিয়ের পর অভাবে এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। স্বামী একজন ক্রিমিনাল ছিল। বউকেও সেই পথে নিয়ে যায়। বেরোনোর কোনও উপায় ছিল না মহিলার। নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেনি। অর্চিন জন্মানোর পর তাকে নিজের মায়ের কাছে রেখে আসে। তার মা শর্ত দেন। কোনওদিন ছেলেকে নিজের পরিচয় জানাতে পারবে না। বৈশাখীও চাননি, অর্চিন আর মায়ের পরিচয় জানুক। সে জানত মা মরে গেছে। দাদু-দিদার কাছে মানুষ। কলকাতায় পড়বার কথা উঠতে, তোর মা-ই প্রস্তাব দিয়েছিল, ছেলেটা আমাদের বাড়িতে এসে থাকুক। ছেলেটার প্রতি আমাদের দুর্বলতা ছিল। আমাদের মনে হয়েছিল, ছেলেটার পরিবারিক ভালোবাসা প্রয়োজন। তোর দাদুকে সব বলেই আমরা অর্চিনকে এ বাড়িতে দিয়েছিলাম। তোর দাদু, মণিকুন্তলাকে দু-হাত তুলে সমর্থন করেছিলেন।'

বিমলকান্তি চুপ করলেন।

বারিধারা ফিসফিস করে বললেন, 'মা-দাদু ঠিক করেছিলেন। অর্চিনদার কোন দোষ ছিল না।'

বিমলকান্তি বললেন, 'অর্চিনের মা তার প্রতিদান দিলেন।'

বারিধারা অবাক হয়ে বলল, 'প্রতিদান! কী প্রতিদান?'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'পুলিশকে উনি সব জানিয়েছেন। যখন শুনলেন তাকে এমন মানুষদের ব্ল্যাকমেল করবার জন্য ভাড়া করা হয়েছে যাদের বাড়িতে তার ছেলে ছিল, তিনি কাজটা নিতে অস্বীকার করলেন। নিখিলেশ উপাধ্যায় পরিচয় না জেনেই অর্চিনের বিরুদ্ধে কিছু বলেন। সে গ্রামে চলে গেছে রাজনীতি করতে, তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন এই ধরনের কিছু। বৈশাখী যদি সেন বাড়ির বিরুদ্ধে কাজ না করে তা হলে তাকেও পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এরপরেই নিখিলেশ উপাধ্যায়কে খুন করেন এই মহিলা।'

বিমলকান্তি একটু থমকে বাকিটাও মেয়েকে বলেন।

পুলিশ অফিসার তাকে বলেছেন, খুনের কায়দাটা ছিল প্রাচীন। প্রথমে ঘাড়ে মারে, তারপর গলায় ফাঁস। এই কায়দা দেখে পুলিশের সন্দেহ হচ্ছে, মহিলা আরও খুন করেছেন। রেস্তোরাঁ থেকে খবর পেয়েই শিয়ালদা, হাওড়া স্টেশন, বিভিন্ন বাস টার্মিনাসকে অ্যালার্ট করে পুলিশ। এই ধরনের ঘটনার পর মার্ডারার

boierpathshala.blogspot.com

সাধারণত শহর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। কমন হ্যাবিট। প্লেস অফ অকারেন্স থেকে যতটা দূরে সরে যাওয়া যায়। পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার ফিরে আসে। খানিকক্ষণের মধ্যে পুলিশের কাছে খবর আসে, এক মহিলা শিয়ালদা স্টেশনে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেস্তোরাঁর এক কর্মীকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে আইডেন্টিফাই করা হয়, কিন্তু তখনই তাকে ধরা হয় না। অপেক্ষা করা হয়, তার জন্য কোনও সঙ্গী আছে কি না জানার জন্য। শেষ পর্যন্ত ক্যানিংয়ের নদী পেরনোর সময় অ্যারেস্ট করা হয়। মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, উনি নাকি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। ছেলের গ্রামের নাম নিখিলেশ উপাধ্যায়ই তাকে জানিয়েছিলেন। সুন্দরবনের গ্রাম। নাম নোনাজল। পুলিশকে খবর দেবেন বলে নিখিলেশ উপাধ্যায় এ সব তথ্য গোপনে জোগাড় করেছিলেন।

বারিধারা শান্ত গলায় বলল, 'মহিলার সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল বাবা।'

বিমলকান্তি নীচু গলায় বললেন, 'আমারও।'

বারিধারা বলল, 'বাবা, এবার বাড়ি চলো। সবাই চিন্তা করছে।'

বিমলকান্তি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ভালোই হল তুই এসেছিস। বাড়িতে এত কথা বলার সুযোগ হত না।'

বারিধারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেন হত না?'

বিমলকান্তিবাবু বলল, 'তোর মা জেনে যেত।'

বারিধারা বলল, 'জানতে তো হবেই বাবা। মাকেও সব জানতে হবে।'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'মণিকুন্তলা খুব দু:খ পাবে।'

বারিধারা সামান্য হেসে বলল, 'মাকে এত দুর্বল ভাবছ কেন বাবা? মেয়েরা বেশিরভাগ সময়েই ছেলেদের থেকে অনেক বেশি স্ট্রং। ওই বৈশাখী নামের মহিলাকে দেখে তুমি বুঝতে পারছ না? মা দু:খ পাবে না। বরং, ওই মহিলার জন্য গর্ব বোধ করবে। আমি যেমন করছি। উনি শুধু একজন বিশ্বাসঘাতককে চরম শাস্তি দেননি, উনি তোমাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, উনি নিজের সন্তানকে দূর থেকে হলেও রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। এনার জন্য আমাদের সবার গর্ব করা উচিত। মাকে, দিদিকে সব বলব। এমনকী তোমার উচিত অফিসেও সবাইকে এই ঘটনা জানানো। বিশ্বাসঘাতকতাই শেষ নয়।'

বারিধারার কথা শুনে বুক ভরে গেল বিমলকান্তিবাবুর। এই মেয়ে সিরিয়াস নয় বলে, হালকা রসিকতার জীবন কাটায় বলে কত চিন্তাই না করেছেন। এখন বুঝতে পারছেন, না, মেয়েটা মানুষ হয়েছে। অনেকের থেকে বড় মানুষ হয়েছে। বেঁচে থাকবার আসল সত্যিটা বুঝতে পারাই 'মানুষ' হওয়া। সেটা হাসতে হাসতে হলেও কোনও ক্ষতি নেই।

মেয়েকে নিয়ে যখন গাড়িতে উঠলেন বিমলকান্তি তখন তিনি অনেকটা হালকা বোধ করলেন। বুক থেকে ভার নেমে গেছে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শ্রবণকে ফোন করল বারিধারা।

'খুব ভালো করেছিস বারি, তোকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

বারিধারা গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমাকে না বলেছি, সকালে কখনও ফোন করবে না। তুমি সকালে ফোন করা মানে গোটা দিনটা গোলমাল হয়ে যাওয়া।'

শ্রবণ বলল, 'সরি ধারা, কিন্তু আমি তো তোমাকে ফোন করিনি, করব করব ভাবছিলাম।'

বারিধারা বলল, 'তোমার ভাবনা এখন সরিয়ে আমার কথা শোন।'

শ্রবণ আমতা আমতা করে বলল, 'কাল একটা কেলো করেছি।'

বারিধারা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী করেছ?'

শ্রবণ বলল, 'বলতে ভয় করছে।'

বারিধারা বলল, 'তা হলে বলবে না। কবে মুম্বই যাচ্ছ?'

boierpathshala.blogspot.com

শ্রবণ এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোমার পরীক্ষা কবে শেষ হচ্ছে বারি? এ মাসের আঠাশ তারিখ না?'

বারিধারা বিরক্ত গলায় বলল, 'কেন? তুমি কী করবে? আমার হয়ে পরীক্ষা দেবে?'

শ্রবণ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ওরা আবার মেল পাঠিয়েছে। সামনের মাসের দু-তারিখে ওদের ফাংশান। চার তারিখ ওরা আমার সঙ্গে বসতে চায়। চাকরির ব্যাপারে ফাইনাল কথা বলবে। চার তারিখ রাতের প্লেনে ফিরে আসতে পারব। এক তারিখ বিকেলে যাব, চারে ফিরব।'

বারিধারা আরও বিরক্ত গলায় বলল, 'আমাকে এ সব জানাচ্ছ কেন? আমি কি ফুলের তোড়া নিয়ে তোমাকে এয়ারপোর্টে ছাড়তে যাব? বোকার মতো কথা বলবে না।'

শ্রবণ টেলিফোনের ওপাশে বিড়বিড় করে কিছু বলল। তার পুরোটা শোনা গেল না।

'না, তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে...।'

বারিধারা এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে কথা বলছিল। ঘরের দরজা বন্ধ। সে একটা শার্ট পরে আছে। বেশিরভাগ সময়ে এটাই তার রাত পোশাক। টি শার্টের বুকে শ্রবণ ডিজাইন করে দিয়েছে। একটা গাছ। গাছটা পুরো সত্যি নয়। খানিকটা রিয়েল, খানিকটা কল্পনার। ডালপালা মেলে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে আছে। বারিধারা উঠে বসল। ধমক দেওয়া গলায় বলল, 'বার বার আমার পরীক্ষার রুটিন নিয়ে কথা বলছ কেন?'

ওদিক থেকে শ্রবণ থতমতো খেয়ে বলল, 'আর বলব না বারি। কিন্তু ধারা...।'

বারিধারা বলল, 'চুপ করো। একটা কথাও বলবে না। আজ আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যাবে। আমাদের গাড়িতে যাব। আজই ফিরে আসব। যত রাত হোক।'

শ্রবণ একটু থেমে বলল, 'কোথায়?'

বারিধারা বলল, 'তোমার জেনে কী হবে? তৈরি হয়ে নাও। এক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে যাব। আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

শ্রবণ বলল, 'বারি তোমার আজ পরীক্ষা নেই?'

বারিধারা বলল, 'না, তিনদিন অফ। পরীক্ষা থাকলেও তোমাকে একা পাঠাতাম।'

শ্রবণ আমতা আমতা করে বলল, 'কোথায় জানতে চাইছি না।'

বারিধারা ফোন কেটে দিল। বাবাকে বলে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। বাবা কথা দিয়েছে, এখন কাউকে বলবে না। মা, দিদি শুনলে টেনশন করবে। বাবা সঙ্গে লোক পাঠাতে চেয়েছিল। বারিধারা রাজি হয়নি। শ্রবণ তো থাকছেই। গাড়িতে নোনাজল গ্রাম খুব কিছু দূরে নয়। ঘণ্টা তিনেকের বেশি লাগবে না।

ঊনষাট

অফিস থেকে ফেরবার পথে জ্যোতিষ্ক একটা ভয়ঙ্কর কাজ করেছে।

কাজটা করে জ্যোতিষ্ক রোমাঞ্চিত। কিন্তু স্ত্রীকে বলতে পারছে না। না বলেই ভালোই করেছে। ঘটনা শোনবার পর মেঘবতী তুলকালাম কাণ্ড করতে পারে। করতে পারে কেন, করবেই। সুটকেস গুছিয়ে বাড়ি থেকে তো বেরিয়ে যাবেই, তার থেকেও বেশি কিছু হবে।

জ্যোতিষ্ক ঠিক করেছে, তাড়াহুড়ো করবে না। ঘটনা একটু একটু করে বলে মেঘবতীকে ধাতস্ত করবে। একটু একটু করে ধাতস্ত করবার প্রক্রিয়াটি ঠিক কেমন হবে তা অবশ্য জ্যোতিষ্কর জানা নেই। কিছু একটা করতে হবে। জ্যোতিষ্ক গ্যারেজে গাড়ি রেখে শান্ত ভাবে বাড়িতে ঢুকল। গুপির মা দরজা খুলে দিয়েছে। বংশীবাদকের হাতে অপমানিত হওয়ার পর গুপির মা এ বাড়ির কাজ ছেড়ে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বারিধারা তাকে বারণ করে।

'এখন কাজ ছেড়ো না গুপির মা। পুলিশ সন্দেহ করবে।'

boierpathshala.blogspot.com

গুপির মা তেড়েফুঁড়ে উঠে বলল, 'কেন আমাকে সন্দেহ করবে কেন? আমি কি ডাকাতি করেছি?'

বারিধারা বলেছিল, 'আমাদের দেশের পুলিশের নিয়মটাই এরকম। নিরীহ এবং গরিব মানুষকে আগে সন্দেহ করা। তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেওয়া সহজ কি না।'

গুপির মা সমান তেজের সঙ্গে বলেছিল, 'দিক। আমি ভয় পাই না।'

বারিধারা বলল, 'ভয়ের কথা বলছি না, পুলিশকে সুযোগ না দেওয়ার কথা বলছি। তুমি বরং ক'টা দিন পরে ছেড়ে দিও।'

গুপির মা বারিধারাকে 'ছোড়দি' ডাকে। ছোড়দিকে সে আলাদা চোখে দেখে। এই মেয়ে পাগলাটে এবং অতিরিক্ত ভালো। বুদ্ধিও খুব। শেষ পর্যন্ত বারিধারার কথা মেনে সে কাজে থেকে যায়। পুলিশ যখন বাড়িতে তদন্ত করতে এসেছিল, মেঘবতী খুব জোরের সঙ্গে বলেছিল, 'আপনারা গুপির মাকে কোনও ভাবে হ্যারাস করবেন না। ইনি আমাদের বাড়ির একজন মেম্বার। মনে রাখবেন, ওই বাঁশিওয়ালা তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তাকে ভয় পেয়েছিল। আর তাই হাত-পা বেঁধে রান্নাঘরে আটকে রেখেছিল।'

ঘটনা সত্যি। ঘটনার দিন গুপির মা চিৎকার করতে গিয়েছিল। ডাকাতরা তাকে জোর করে রান্নাঘরে আটকে দেয়। পুলিশ প্রথমে গাঁইগুঁই করে। তারা চেয়েছিল, গুপির মাকে থানায় নিয়ে গিয়ে ধমকধামক দিতে। জ্যোতিষ্ক নিজে বড় সরকারি অফিসার বলে পারেনি। তার পরেও আড়াল থেকে মহিলার ওপর নজর রাখে। তবে ক'দিনের মধ্যে তারা জানতে পারে মহিলা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।

যাই হোক, গুপির মা শেষ পর্যন্ত এ বাড়িতে রয়ে গেছে। রয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ অনেকদিন পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিল, সেদিনের ডাকাতরা আবার ফিরে আসবে। তাদের সে মুখোমুখি হতে চায়। খানকতক বঁটির কোপ এদের প্রাপ্য। তাদের জানা দরকার, গুপির মা কোনও এলেবেলে মেয়ে নয়। সেদিন হাত-মুখ না বাঁধলে মজা টের পাইয়ে দিত। আবার সুযোগ পেলে, ঠেলা বুঝিয়ে দেবে। রান্নাঘরে গুপির মা একটা বঁটি আলাদা করে রেখে দিয়েছিল। ছোট বাঁটি। তাতে ধার দেওয়াও থাকত। কদিন আগে পর্যন্ত দুপুরের দিকে কলিং বেল বাজলে গুপির মা বঁটি হাতে নিয়ে দরজা খুলতে যেত। বঁটি লুকোনো থাকে পিছনে। দরজার আই হোল দিয়ে চেনা লোক দেখেও বঁটি শক্ত করে ধরে রাখত। চেনা লোক তো কী হয়েছে? ওই বাঁশিওয়ালা তো চেনা হয়ে গিয়েছিল। পরে বংশীবাদকের মৃত্যু, সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ডাকাতরা ধরা পড়ে, বাড়ির গায়নাগাটি, টাকাপয়সা, জামাকাপড় অনেকটাই উদ্ধার হওয়ার খবর জেনে গুপির মা বঁটি ত্যাগ করেছে।

ঘরে ঢুকেই জ্যোতিষ্ক খবর নিল মেঘবতী কোথায়।

গুপির মা বলে, 'বড়দি ওপরে।'

জ্যোতিষ্ক একটু ইতস্তত করে বলল, 'গুপির মা গেস্টরুমের কী অবস্থা?'

গুপির মা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী অবস্থা মানে?'

'ঘরের কন্ডিশন কী? ধুলো টুলো ঝাড়া আছে?'

গুপির মা'র ভুরু আরও কুঁচকে গেল। বলল, 'এ বাড়ির সব ঘরের ধুলোই ঝাড়া হয়।'

জ্যোতিষ্ক একটু হাসবার চেষ্টা করল। বলল, 'গুড। বাড়িতে ধুলোময়লা থাকা মোটে স্বাস্থ্যকর নয়। ঠিক আছে তুমি চা করো। চা করে ওপরে নিয়ে এসো।'

মেঘবতী এখন দোতলায়, বেডরুমে। ফোনে বারিধারার সঙ্গে কথা বলছে। গত ক'দিন ধরে ঝড়ের মতো সব ঘটনা ঘটে গেছে। অর্চিনকে সুন্দরবনের গ্রাম থেকে নিয়ে এসে থানায় তার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছে বারিধারা। পুলিশ যে শুধুমাত্র কড়া হয় এমন নয়, মানবিকও হয়। বারিধারার মুখে সব শোনবার পর তারা ব্যবস্থা নিয়েছে। নিয়মকানুনের অনেক বাধানিষেধ টপকে মাতা-পুত্রকে আলাদা ঘরে মুখোমুখি বসিয়ে দিয়েছে। বড় ঝুঁকি থাকা সত্বেও সেই সময় ঘরের মধ্যে কোনও গার্ড ছিল না। সেই সময় থানায় বারিধারা, শ্রবণ তো ছিলই, এসেছিলেন বিমলকান্তি, মণিকুন্তলা। আর ছিল ঋষা। মায়ের সঙ্গে দেখা করে সহজ ভাবে

boierpathshala.blogspot.com

থানার বাইরে বসে অর্চিন। একদিন রাতে সেনবাড়িতে থেকে আবার সুন্দরবনে ফিরে গেছে। যাওয়ার আগে বিমলকান্তি, মণিকুন্তলাদেবী, বারিধারার সঙ্গে বসে কথা বলে।

'আমি মায়ের জন্য ভালো ল'ইয়ার দেব।'

বিমলকান্তি বলেছেন, 'অবশ্যই দেবে। টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা কোরো না।'

অর্চিন বলে, 'মা যা করেছে তাতে আইনের চোখে অনেক বড় শাস্তি হওয়া উচিত। হবেও। তার পরেও আমি লড়ব।'

মণিকুন্তলাদেবী নরম ভাবে বলেন, 'বড় শাস্তি হবে এমন ভাবছ কেন। কাজটা তো তিনি পরিকল্পনা করে করেননি। তাকে প্রোভোক করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে তিনি...।'

অর্চিন মণিকুন্তলাদেবীকে পুরো কথা বলতে দেয় না। মলিন হেসে বলে, 'শুধু এই হত্যা নয়, অতীতে মা যা যা অপরাধ করেছে তার শাস্তিও তো প্রাপ্য হয়ে রয়েছে। সে শাস্তিও কম হবে না। ফাঁসি না হোক, যাবজ্জীবন জেল তো বটেই।'

বারিধারা নীচু গলায় বলে, 'দেখাই যাক না কী হয়। সবাই মিলে চেষ্টা করলে নিশ্চয় কিছু করা যাবে।'

মণিকুন্তলাদেবী বলেন, 'তুমি অতটা ভেঙে পোড়ো না।'

অর্চিন বলে, 'আমি ভেঙে পড়িনি। আপনারা আমার জন্য অতীতে যা করেছেন এবং এখনও যা করছেন সে ঋণ মেটানোর ক্ষমতা আমার নেই। চেষ্টাও করব না।'

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'এভাবে ভেবো না। তুমিও তো সেনবাড়ির একজন।'

অর্চিন মাথা নামিয়ে বলে, 'জানি। জানি বলেই এত কথা বলতে পারছি। কোনও আইনে মায়ের শাস্তি কমানো যাবে না। আমি যে খুব একটা শাস্তি কমাতে চাই এমনটাও নয়। মাও চায় না। আমাকে বলেছে, তুই চিন্তা করিস না। এটাই আমার ভবিতব্য ছিল। আমার যা সাজা হওয়ার হবে। সব থেকে ভালো হয় যদি ফাঁসি হয়। তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ব্যস আমার কাজ শেষ।'

অর্চিন একটু থামল। নিজের মনে একটু হাসলও যেন। মণিকুন্তলা কোনও রকমে চোখের জল সামলালেন। ছোট মেয়ে তাকে সাবধান করে রেখেছে।

'মা, অর্চিনদার সামনে তুমি কোনও রকম দুর্বলতা দেখাবে না। সে একজন খাঁটি মানুষ। কোনওরকম সহানুভূতি, করুণা, চোখের জল সে পছন্দ করবে না। সব থেকে বড় কথা, তার সামনে আমরা যদি দুর্বল হই, সে নিজেও ভেঙে পড়তে পারে। আমরা তাকে শক্ত হতে সাহায্য করতে পারি মা, ভেঙে পড়তে নয়।'

মণিকুন্তলা মেয়ের এই কথা মেনে চলতে চাইছেন। তিনি ঠোঁট কামড়ে রইলেন।

অর্চিন মাথা নামিয়ে বলল, 'কিছু করতে পারব না জেনেও আমি আদালতে মায়ের হয়ে লড়ব। প্রাণপণ চেষ্টা করব। মা যেন বুঝতে পারে, তার ছেলে তার পাশে আছে। যত অন্যায় করুক, সন্তানের পাশে যেমন বাবা-মা থাকে, কেউ থাকে না, শুধু তারাই থাকে। আমিও সেভাবে মায়ের পাশে থাকব। মৃত্যুপথযাত্রী জেনেও তো সন্তান বাবা-মায়ের চিকিৎসা করে। ছেড়ে তো পালায় না। তাই না?'

অর্চিন মুখ তোলে। বাকিদের কাছ থেকে যেন সমর্থন চাইছে। তার মুখ ছিল উজ্জ্বল। বিমলকান্তি সিরিয়াস মানুষ। সেন্টিমেন্ট তাকে খুব একটা স্পর্শ করে না। স্পর্শ করলেও তিনি তা গোপন রাখলেন। এটাই তার নিয়ম। বহু বছর পড়ে তিনি নিয়ম ভাঙলেন। নিখিলেশ উপাধ্যায়ের বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃজ্ঞতার কালি একটা ছোট ছেলে কত সহজে ধুয়ে দিল। বিমলকান্তি নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে অর্চিনকে জড়িয়ে ধরলেন।

'অর্চিন, তুমি নিজের ইচ্ছে মতো রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছ। নিজের ইচ্ছে মতো ব্রাইট কেরিয়ার ছেড়ে দিয়েছ। নিজের ইচ্ছেয় তুমি আমাদের ছেড়ে গ্রামে চলে গেছ। এবার একটা কথা আমার ইচ্ছে মতো তোমাকে শুনতে হবে।'

অর্চিন মৃদু গলায় বলল, 'কী কথা?'

boierpathshala.blogspot.com

বিমলকান্তি সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, 'আগে বলো শুনবে। আমি তো কখনও কোনও বিষয়ে তোমাকে জোর করিনি, কিন্তু এবার করছি।'

অর্চিন একটু থমকাল। বলল, 'আচ্ছা, কথা দিচ্ছি।'

বিমলকান্তি বললেন, 'তোমার মায়ের জন্য তুমি যে আইনি লড়াই করবে তার সব খরচ আমরা দেব। বেস্ট ল'ইয়ার থাকবেন।'

অর্চিন কিছু একটা বলতে গেল। বিমলকান্তি হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কোনও কথা শুনব না। এটাই ফাইনাল। সেন এন্ড অ্যাসোসিয়েটসে যে ল'ইয়ার ফার্মের সঙ্গে কাজ করে তুমি তার সঙ্গে বসবে।'

বারিধারা নিজেই আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কারও সামনে সে কাঁদতে পারে না।

অর্চিন পরদিন সকালেই সুন্দরবনে ফিরে গেছে। সেখানে অনেক দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে। সেই কাজ অন্যদের খানিকটা বুঝিয়ে দিতে হবে। কোর্টের দিনগুলো তাকে কলকাতায় থাকতে হবে। তা বলে আসল কাজ তো বন্ধ হতে পারে না। এর দু'দিনের মধ্যেই পুলিশ বৈশাখীকে জেল হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে। পুলিশ যাতে বৈশাখীকে আর খুব বেশি চাপাচাপি না করে তার জন্য জ্যোতিষ্ক ওপর মহল থেকে কিছু ব্যবস্থা করেছিল। আসামি যদি সবটাই স্বীকার করে নেয়, তা হলে আর থানা লকআপে আটকে রাখবার দরকার কী?

সেই অর্থে সেনবাড়িতে ঝড় কিছুটা কমেছে। বারিধারা-মেঘবতী দুই বোন বহুদিন পর টেলিফোনে প্রাণের-মনের গল্প করেছে। এতই প্রাণের-মনের যে অফিস থেকে স্বামীর ফিরে আসবার সাড়াশব্দও মেঘবতী পায়নি।

'দিদি, একটা ঝামেলায় পড়েছি।'

মেঘবতী মোবাইল কানে চেপে ধরে বলল, 'আবার ঝামেলা!'

বারিধারা বলল, 'এখনও হয়নি তবে হবে মনে হচ্ছে।'

মেঘবতী বলল, 'পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে?'

বারিধারা বলল, 'ধুস, কী যে বলিস। এখন কীসের রেজাল্ট। সবে তো পরীক্ষা শেষ হল। ইউনিভার্সিটিতে রেজাল্ট বেরোতে সাত মাস।'

মেঘবতী বলল, 'তা হলে এখন কীসের ঝামেলা বৃষ্টি?'

বারিধারা রহস্যভরা গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে একটা ঝড় ঝামেলা ঘটতে চলেছে।'

মেঘবতী বিরক্ত গলায় বলল, 'এত ভণিতা না করে সরাসরি বল।'

বারিধারা ফিসফিস করে বলল, 'আমি একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়তে চলেছি।'

মেঘবতী আঁতকে উঠল। এই বোনটাকে নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই।

'কী বলছিস যা তা।'

বারিধারা নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'যা তা নয় রে দিদি, সত্যি বলছি। ঘটনা জানাজানি হলে, আমার নামে একেবারে ঢি ঢি পড়ে যাবে। তোরা আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারবি না। খুব সম্ভবত আমাদের সিরিয়াস বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে। মা তিনদিন না খেয়ে থাকবে। হয়তো আমি তোর বাড়িতে আশ্রয় নেব। তুই আমাকে যত্ন আত্তি করবি ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝেই ফোঁস ফোঁস করে নি:শ্বাস ফেলবি, আর বলবি, এটা তুই কী করলি! কেমন করে করলি বৃষ্টি! সেনবাড়ির সম্মানের কথা একবার মনে এল না।'

মেঘবতী আধশোয়া হয়ে কথা বলছিল। সোজা হয়ে বসল। ধমক দিয়ে বলল, 'ড্রামাবাজি থামা বৃষ্টি। কী হয়েছে বল।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা গলা নামিয়ে বলল, 'চেঁচাস না। বলছি তো এখনও হয়নি, হতে চলেছে। শ্রবণ বোকাটা একটা বিরাট বোকামি করে ফেলেছে।'

মেঘবতীর ভুরু কুঁচকে গেল। বৃষ্টি কি ইঙ্গিত দিচ্ছে? হতে পারে না। অসম্ভব। সে বলল, 'শ্রবণ করেছে মানে! সে তো খুব ভালো ছেলে।'

বারাধিারা ফোনের ওপাশ থেকে ফিক করে হেসে বলল, 'আহা! দিদি, এমন ভাবে বলছিস, যেন ভালো ছেলেরা কখনও বোকামি করে না। তাদের জন্য আমার মতো সহজ সরল মেয়েদের কেলেঙ্কারি হয় না।'

এ তো স্পষ্ট ইঙ্গিত। মেঘবতী উত্তেজনায় খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার বসল। ভয়ে তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। বিয়ের আগে এ সব কী কাণ্ড!

'বৃষ্টি, ঠাট্টা বন্ধ করে সোজা কথা বল।'

বারিধারা স্বাভাবিকভাবে বলল, 'বললাম তো শ্রবণ বোকামি করেছে।'

মেঘবতী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আর তুমি কী করছিলে? নেকা? তুমি বড় হওনি? তুমি জানো না কী থেকে কী হয়? ছি ছি বৃষ্টি। তুই এটা করলি...। আমি ভাবতেও পারছি না।'

বারিধারা বলল, 'দেখলি তো দিদি, আমার নামে কেমন ঢি ঢি পড়ে যাবে। তুই পর্যন্ত ছি ছি করছিস। তাও তো কেলেঙ্কারি এখনও হয়নি। কিছুদিন পরে হবে।'

মেঘবতী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'বৃষ্টি, আমি কিন্তু এবার কেঁদে ফেলব। আগে বল, তুই এ সব ঠাট্টা করে বলছিস। বল আগে।'

জ্যোতিষ্ক দরজার আড়াল থেকে মেঘবতীর 'এবার কেঁদে ফেলব' কথাটুকু শুধু শুনতে পেল। বেডরুমে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। এই রে! মেঘবতী যদি কেঁদে ফেলবার মুডে থাকে তা হলে তো খুব মুশকিল। সে যে ভয়ঙ্কর কাজটা করে বসে আছে সেটা জানাবে কী করে?'

কেঁদে ফেলবার জন্য মেঘবতীর মন আকুলি বিকুলি করছে। করবে না? একেই তার কাদুনি স্বভাব। যে কোনও ছোটখাটো ব্যাপারে কান্না পায়, আদরের বোন যদি এরকম একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তো কেঁদে ফেলবারই কথা। আজকালকার ছেলেমেয়ে কখনও এমন ভুল করে! এ তো আর পঞ্চাশ-একশো বছর আগের ব্যাপার নয়। এখন কত ব্যবস্থা এসেছে, কত সহজ কায়দাকানুন হয়েছে।

টেলিফোন কানে চেপে মেঘবতী ফোঁস করে নি:শ্বাস ফেলল। কান্নার পূর্বলক্ষণ।

ওপাশ থেকে বারিধারা গম্ভীর গলায় বলল, 'দিদি, তোর কি কান্না পাচ্ছে?'

মেঘবতী বলল, 'ফাজলামি করবি না বৃষ্টি। আমার ভালো লাগছে না।'

বারিধারা বলল, 'ঘটনা শুনে তারপর কান্নাকাটি শুরু কর। মন খুলে কাঁদতে পারবি।'

মেঘবতী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'ঘটনা তো বলছিস না। খালি ঘোরাচ্ছিস। তবে বৃষ্টি একটা কথা জেনে রাখ, যত কেলেঙ্কারিই ঘটিয়ে থাকিস না কেন, আমি তোর সঙ্গে আছি। তুই আমার এখানে চলে আসবি। আমি আর তোর জ্যোতিষ্কদা মিলে, সব ব্যবস্থা করে দেব। কেউ জানতেও পারবে না। তবে পাকামি করতে যাস না। তোকে নিয়ে ওইটাই আমার চিন্তা।'

বারিধারা বলল, 'আমারও চিন্তা। তার আগে ঘটনাটি শুনে নে দিদি। বললাম না, কান্নাকাটি করতে সুবিধে হবে।'

বারিধারা গুছিয়ে সব বলল। শ্রবণ সত্যি একটা বোকামি করে বসেছে। মুম্বইয়ের যারা তাকে প্রাইজ দিচ্ছে, তারা জানিয়েছিল, দুজনের ব্যবস্থা করবে। শ্রবণ যেন সঙ্গে একজন স্পেশাল গেস্ট নিয়ে আসে। তবে প্লেনের টিকিট, হোটেল, খাওয়াদাওয়ার দায়িত্ব সব তাদের। কদিন আগে তারা স্পেশাল গেস্টের নাম চাইলে, শ্রবণ বারিধারার নাম পাঠিয়ে দিয়েছে। বারিধারাকে জিগ্যেস করা হয়নি। সেদিন অর্চিনকে নিয়ে আসতে যখন দুজনে মিলে সুন্দরবনের নোনাজল গ্রামে যাচ্ছিল, তখন বলেছে।

'একটা গোলমাল করে ফেলেছি বারি।'

boierpathshala.blogspot.com

'বারিধারা শান্তভাবে বলেছিল, 'এটা আর নতুন কথা কী? গোলমাল করাটাই তো তোমার কাজ। গোলমালটা কী জানতে পারি?'

শ্রবণ কাঁচুমাচুভাবে বলল, 'আসলে তোমাকে বলতাম ধারা, তোমার কাছে পারমিশান নিতাম ঠিকই, কিন্তু তোমরা এমন সমস্যায় রয়েছ যে এই বিষয়ে কথা বলবার সুযোগ হয়নি।'

বারিধারা চোখ কটমট করে বলেছিল, 'আমার পারমিশন ছাড়া কী করেছ?'

শ্রবণ মাথা চুলকে বলল, 'মুম্বাইয়ে তোমার নাম পাঠিয়ে দিয়েছি বারি। প্রাইজ গিভিং সেরিমনিতে তুমি আমার স্পেশাল গেস্ট হয়ে যাবে।'

বারিধারা সেদিন আর বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে পারেনি। দু'দিন পরে শ্রবণকে চেপে ধরেছিল।

'আমার নাম পাঠালে কেন?'

শ্রবণ বলল, 'ভুল হয়ে গেছে।'

বারিধারা বলল, 'বোকামি করো না। তোমাকে আমার হাড়ে হাড়ে চেনা হয়ে গেছে।'

শ্রবণ বলল, 'বিশ্বাস করো ধারা, ভেবেচিন্তে কিছু করিনি। দিন তিনেকের তো ব্যাপার। প্রাইজ নেব, চাকরির ব্যাপারে ফাইনাল কথা বলব, একদিন একটু এদিক-ওদিক ঘুরব, ব্যস।'

বারিধারা ধমক দিয়ে বলল, 'বাজে কথা বোলো না। বাড়ির কাউকে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

শ্রবণ বলল, 'কাকে ছেড়ে কাকে নিয়ে যাব? সবাই তো গাল ফোলাবে। যাক তুমি যখন যেতে পারবে না, একাই চলে যাব।'

বারিধারা চাপা গলায় বলল, 'বেশি সেন্টু দেখিও না। তুমি ভালো করেই জানো শ্রবণ, আমি ওসবে ঘাবড়ানোর পার্টি নই। দুটো অবিবাহিত ছেলেমেয়ে হুট করে একসঙ্গে তিনদিনের ট্যুর করতে পারে?'

শ্রবণ বলল, 'কেউ জানতে পারবে?'

বারিধারা চোখ বড় বড় করে বলল, 'মানে! না বলে চলে যাব?'

শ্রবণ মুচকি হেসে বলল, 'কেন? এই তো সেদিন আমাকে দিয়ে তুমি বাড়ি পালানো প্র্যাকটিস করালে। এবার তোমার পালা। তুমি পালিয়ে দেখাও বারি।'

স্মার্ট, বুদ্ধিমতী বারিধারা এখানেই কুপোকাত হয়ে গেছে। শ্রবণ এভাবে তার দেওয়া প্যাঁচ মেরে তাকেই ফেলে দেবে ভাবতেও পারেনি। গাধাটার বুদ্ধিতে খুবই খুশি হল বারিধারা। সে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, এবার আমার পালা। আমি তোমার সঙ্গে পালাব। তবে তিনদিনের জন্য।'

শ্রবণ উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'সত্যি বারি? সত্যি কথা বলছ? তুমি মুম্বাইতে আমার সঙ্গে যাচ্ছ ধারা?'

বারিধারা গম্ভীরভাবে বলল, 'তুমি জানো না শ্রবণ যে আমি দুরকম কথা বলি না?'

বোনের মুখে 'কেলেঙ্কারির ঘটনা' শুনে মেঘবতী যেমন খুশি, তেমন উত্তেজিত। আবার খাটের ওপর ধপ করে বসে পড়ল।

'এ তো খুব আনন্দের কথা বৃষ্টি। শ্রবণ অত বড় একটা প্রাইজ পাবে, আর তুই সেই সময় থাকবি না তা হতে পারে?'

বারিধারা গলা নামিয়ে বলল, 'এই জন্যে তোকে আমি আর দাদু মিলে মোস্ট ইনটেলিজেন্ট লিস্টের ওপর দিকে রেখেছিলাম। সত্যিই তুই খুব বোকা দিদি।'

মেঘবতী এক গাল হেসে বলল, 'আমি বোকা হই আর যাই হোক, তুই শ্রবণের সঙ্গে যাবি এটা খুব ভালো হয়েছে। আমি তোদের এয়ারপোর্টে ছাড়তে যাব।'

বারিধারা বলল, 'উফ দিদি বুঝতে পারছিস না। বাবা, মা ছাড়বে নাকি? মা যদি বা রাজি হয়, বাবার মুখ হাঁড়ি হয়ে যাবে। বিয়ের আগেই মেয়ে হবু জামাইয়ের একসঙ্গে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা উনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। দাদু থাকলে একটা কথা ছিল। বাবাকে ধমক দিয়ে রাখত।'

boierpathshala.blogspot.com

মেঘবতী বলল, 'ধুস ওসব ছাড় তো। বাবা রাগ করুক আর যা-ই করুন, তুই চলে যা। বাকিটা আমি বুঝে নেব।'

বারিধারা গলা নামিয়ে বলল, 'দিদি, আসল সমস্যাটার কী হবে?'

মেঘবতী বলল, 'আবার কী সমস্যা?'

বারিধারা বলল, 'আরে, এতক্ষণ ধরে কী বললাম? কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা কী হবে? আমাকে আর শ্রবণকে যদি রাতে একঘরে থাকতে হয়? তখন কিছু যদি হয়ে যায়?'

মেঘবতী হেসে বলল, 'একটা চড় খাবি। বড় দিদিকে এসব কেউ বলে? একঘরে থাকতে হলে থাকবি। দু'দিন পরে বিয়ে আর এখন উনি ঘর দেখাচ্ছেন। মারব এক থাপ্পড়।'

বারিধারা নাটকীয় কায়দায় বলল, 'না রে দিদি, পরে ঢিটি পড়ে যাবে। আমি আলাদা ঘর চাইব।'

মেঘবতী বলল, 'নেকা। আলাদা ঘর থাকলে যেন তোমরা আলাদা ঘরে কত থাকবে! তবে সাবধান। ঝামেলায় পড়বে না। বড় হয়েছ, সতর্ক থাকবে।'

বারিধারা এবার অভিনয় ছেড়ে জোরে হেসে উঠল।

'তাহলে বলছিস দিন তিনকের জন্য পালাব?'

মেঘবতী হাসতে হাসতে বলল, 'অবশ্যই পালাবি। আমি বাবাকে বলব, বৃষ্টি আমার এখানে আছে। খুব মজা হবে। ইস তোর জ্যোতিষ্কদাটা একদম রোমান্টিক নয়। তাহলে আমরাও পালাতাম।'

বারিধারা বলল, 'তোরা কার কাছ থেকে পালাতিস!'

মেঘবতী বলল, 'আরে পালানোটাই মজা রে বৃষ্টি, কার কাছ থেকে পালাতাম সেটা কি বড় কথা? এখন রাখি। চিন্তা করিস না। আমি রইলাম।'

বারিধারা বলল, 'আমি জানতাম, আমার বোকা ছিঁচকাদুনে দিদি সিরিয়াস সময়ে ঠিক একটা পথ বের করে দেবে। টা টা। তোর জন্য মুম্বাই থেকে কিছু আনতে পারব না বলে দু:খ করিস না। পালানোর সময় কিছু কেনাকাটা করা যায় না।'

স্ত্রীর হাসাহাসি শুনে দরজার আড়ালে দাঁড়ানো জ্যোতিষ্ক মনে জোর পেল। মেয়েরা এরকমই, এই একটু কাঁদে তো পরমুহূর্তে হাসতে শুরু করে। এ ব্যাপারে তার স্ত্রীর তো কোনও জবাব নেই। তাহলে এবার তার ভয়ঙ্কর ঘটনাটা বলা যাবে।

ঘটনা সত্যি ভয়ঙ্কর।

আজ অফিস থেকে ফেরবার পথে বাইপাসের ধারে হ্যান্ডিক্র্যাফটের মেলায় নেমেছিল জ্যোতিষ্ক। কলকাতা শহরে অজস্র মেলা হয়। তার মধ্যে বইমেলা আর এই হস্তশিল্প মেলা হল সেরা। এই দুই মেলা শুধু কলকাতার সেরা মেলা নয়, দেশের সেরা মেলা। সঠিকভাবে বিচার করা হলে পৃথিবীতেও মেলার 'বেস্ট টেন' তালিকায় এরা এক থেকে দশের মধ্যে হাসতে হাসতে জায়গা পেয়ে যাবে। ঠিকমতো বিচার হয় না তাই। অন্য কোনও দেশ হলে এই দুই মেলা নিয়ে এমন লাফালাফি করত যে বিদেশ থেকে লোকজন ছুটে আসত। হোটেল ভর্তি হয়ে যেত। বাংলাদেশের একুশের বইমেলা আর জার্মানিতে ফ্রাঙ্কফুট বইমেলা খুব নামকরা। কিন্তু এই দুটোর কোনওটাতেই কলকাতা বইমেলার মতো পাঠক থাকে না। শুধু পাঠক দেখবার জন্যই তো বিদেশ থেকে বইভক্তদের আসা উচিত। বই তো আছেই। আর হস্তশিল্প মেলার তো কোনও তুলনা নেই। বাংলার গাঁ-গঞ্জে যে কত শিল্পী আছে একমাত্র এই মেলাতে এলেই জানা যায়। বিশ্বের মানুষ প্যারিস বলতে অজ্ঞান। সেখানে শিল্পীরা গিজগিজ করে। দুনিয়া কাঁপানো সব শিল্পী। বাংলার হস্তশিল্প মেলা নিয়ে দুনিয়াকে বলুক, এখানকার মানুষের কথা বলতে অসুবিধে কোথায়? বাংলার গরিব শিল্পীরা এখানে হাতের কাজ নিয়ে আসেন বলে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে ভালো জিনিস নিয়ে লাফালাফি কম হয়। হস্তশিল্প মেলায় জ্যোতিষ্ক কম করে চার-পাঁচদিন ঢুঁ মারে। এর মধ্যে দুদিন মেঘবতীর সঙ্গে। আজ গিয়েছিল একা। গোপন কাজ ছিল। এই কাজ স্ত্রীর সঙ্গে গেলে হওয়ার নয়। বংশীবাদকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই

boierpathshala.blogspot.com

জ্যোতিষ্কর ভালো বাঁশি কেনবার শখ। এই মেলায় নিশ্চয়ই বাঁশি মিলবে। কিন্তু বাঁশির বদলে দেখা মিলল কুটকুটের সঙ্গে। কুটকুট একজন দশ-এগারো বছরের বালক। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে মেলার এক কোনায়, আধো আলো, আধো অন্ধকারে বসে সে কাঠের টুকরোর গায়ে রং দিচ্ছিল। মলিন হাফপ্যান্ট আর কলার ছেঁড়া জামা। জ্যোতিষ্ক সামনে দাঁড়িয়ে বালকের কাঠের রঙ করা দেখছিল। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেল। মিনিট দশকের মধ্যে কাঠের টুকরো একটা পুতুলের চেহারা পেলে। প্রাণ পেল যেন। রঙে ঝলমলে। কুটকুট যতটা বর্ণহীন পুতুলটা ঠিক তার উলটো।

'কী দ্যাখেন?'

'তোর কাজ দেখি।'

'কাজ দেখে কী হবে? পুতুলটা নেবেন?'

'দাম কত?'

'দশ টাকা।'

জ্যোতিষ্ক বলে, 'ধুস, একটা কাঠের টুকরোর দাম দশ টাকা কী রে বেটা!'

'কুটকুটে ছোট বলে, তার সঙ্গে দরদাম করেন না।'

জ্যোতিষ্কর খুব মজা লাগল। বলল, 'তোর নাম কুটকুটে?'

বালক মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, 'নাম জেনে আপনার কাম কী? পুতুলটা কিনবেন তাই বলেন?'

জ্যোতিষ্ক বলে, 'তুই কাঠের পুতুল বানাস?'

'সবের পুতুল বানাই। একটা মাটির ঢেলা দেন পুতুল বানিয়ে দেব। আমি সবরকম হাবিজাবি দিয়ে পুতুল বানাতে পারি।'

বলতে বলতে কুটকুটে একটা পোড়া মাটির ঢেলা নিয়ে ঝটপট চোখমুখ আঁকতে বসল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে গোলগাল হাসিখুশি একটা ছেলের মুখ বানিয়ে ফেলল। বলল, 'আমি সবের পুতুল বানাতে পারি। কাঠ, মাটি, ফেলে দেওয়া কাগজের গোল্লা।'

জ্যোতিষ্কর মুগ্ধতা দশগুণ বেড়ে গেল। যে কোনও অসাড় জিনিসকে এই ছেলে নিমেষে প্রাণ দিতে পারে! এ তো অতি ক্ষমতাবান! অথচ বসে আছে ভিখিরির মতো। সামনের এক টুকরো চটে কিছু পুতুল সাজানো থাকলেও মেলার খরিদ্দাররা সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সারাদিনে দু-চারটেও বিক্রি হয়েছে কিনা সন্দেহ। জ্যোতিষ্কর মনে হল, সে একজন বিরাট শিল্পীকে খুঁজে পেয়েছে। উবু হয়ে বসে গল্প শুরু করল।

'তোর বাড়ি কোথায়?'

'গ্রামে।'

'বাড়িতে কে আছে? বাবা-মায়ের সঙ্গে এসেছিস নাকি?'

কুটকুটে কাপড়ের টুকরোয় রং করতে করতে বলল, 'বাপ-মায়ে নাই। এর বাড়ি, তার বাড়ি থাকি। গ্রামের এক কাকা নিয়ে এসেছে। ভারী মালপত্র টানাটানি করবার জন্য। বড্ড খাটায়, খেতে দেয় না। তিনদিন হল সেই কাকাকে ছেড়ে চলে এসেছি। কাকাই তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি পুতুল বানাচ্ছি বলে বদটা আমায় চড় মেরেছে। আমিও হাত কামড়ে দিয়েছি। সে বলেছে, তুই দূর হয়ে যা। আমি বলেছি, বয়ে গেছে। আমি নিজেরটা নিজে বুঝে নেব। তাই নিজেই পুতুল বানিয়ে বেচছি। যা বিক্রি হয় তাই দিয়ে মুড়ি কিনে খাই। রাতে অফিসঘরের নীচে বস্তা পেতে ঘুমোই।'

জ্যোতিষ্কর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত বড় একজন শিল্পীর এই দুরবস্থা!

'আমাকে পুতুল বানানো শেখাবি?'

'শেখাতে পারি, তবে টেইম লাগবে।'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'আমি সময় করে নেব। তুই আমার বাড়িতে থাকবি।'

boierpathshala.blogspot.com

কুটকুটে বলল, 'বাসন মাজতে, কাপড় কাচতে পারব না।'

জ্যোতিষ্ক হেসে বলল, 'দুর পাগল ছেলে। তোর মতো এক আর্টিস্ট ওসব কাজ করে সময় নষ্ট করবে কেন? তুই আমাকে হাবিজাবি দিয়ে পুতুল বানাতে শেখাবি আর খাবিদাবি খুমোবি। লেখাপড়াও শিখবি। যাবি আমার বাড়ি?'

কুটকুটে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'বাড়িতে খাওয়াদাওয়া কেমন?'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'খুব খারাপ নয়।'

কুটুকুটে ভুরু কুঁচকে বলল, 'পেট ভরবে তো? বহুদিন পেট ভরে খাই না।'

জ্যোতিষ্ক আর পারল না। হাত বাড়িয়ে বালকের জটপাকানো চুল ঘেঁটে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভরবে। আমার ভরলে, আমার বউয়ের ভরলে, তোরও ভরবে।'

'মামি কি খিটখিটে?'

জ্যোতিষ্ক হেসে ফেলল। এরমধ্যে মামা-মামি সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে বেটা।

'তা একটু খিটখিটে, তবে খুব ভালো।'

কুটকুটে বলল, 'ভালোমানুষ খিটখিটে হলে সমস্যা নেই। খারাপ মানুষ খিটখিটে হলে সমস্যা আছে। আমি থাকব না। খাবার না পেলে ক্ষতি নাই, কিন্তু খারাপ লোকের ধমকধামক শুনি না। পেস্টিজে লাগে।'

জ্যোতিষ্ক সস্নেহে বলল, 'তোকে কেউ ধমক দেবে না, যাবি?'

কুটকুটে তার পুতুলের মতো চোখ তুলে বলল, 'চলেন তাহলে। দেখি আপনার বাড়ি পছন্দ হয় কিনা।'

থলিতে পুতুল, মাটির ঢেলা, কাগজ, কাঠের টুকরো, কাপড় আর সস্তার রং গুছিয়ে নিয়ে জ্যোতিষ্কর সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

সেই ছেলেকে গ্যারাজে লুকিয়ে জ্যোতিষ্ক মেঘবতীর কাছে এসেছে। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। সে কি বুঝবে? বুঝবে না। বংশীবাদকের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। খুবই খারাপ। আবার একজনকে রাস্তা থেকে বাড়িতে নিয়ে এলে সে কি অ্যালাও করতে পারে? কখনওই পারে না। তারপরেও চেষ্টা চালাতে হবে। বয়েসে যতই ছোক হোক এমন শিল্পীকে এত কষ্টের মধ্যে ফেলে আসা যায় না।

মেঘবতী কুটকুটের ঘটনা শুনে থম মেরে থাকল। তারপর বলল, 'কালই আমি মায়ের ওখানে চলে যাব। সেদিন বাঁশির নাম করে ডাকাতদের বাড়ি ঢুকিয়েছিল, আজ পুতুলের দোহাই দিয়ে ছিঁচকে চোরকে বাড়িতে নিয়ে এসেছ। তোমার কোনও শিক্ষা হয় না।'

জ্যোতিষ্ক কাঁচুমাচুভাবে বলল, 'খুবই ভুল করেছি মেঘ। কালই ছেলেটাকে মেলায় ছেড়ে দিয়ে আসব। মেলায় তো কত মানুষ হারিয়ে যায়, এই ছেলেও যাবে। শুধু আজকের রাতটা কি তাকে গেস্টরুমে রাখা যায় না?'

মেঘবতী গনগনে গলায় বলল, 'আমি জানি না। আমি এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব।'

রাতে মেঘবতীর গুছিয়ে দেওয়া দুধ ভাত কলা মাখা খেতে খেতে কুটকুটে বলল, 'মামি, আপনাদের কলায় তেমন স্বাদ নেই। কেমন কষটে মার্কা। কাল ভালো কলা আনতে বলবেন। দেন, আর একটু ভাত দেন দেখি। দু'দিন ভাত খাওয়া হয় নাই।'

মেঘবতী কুটকুটের বাটিতে আরও খানিকটা ভাত আর দুধ দিল। তার চোখভরা জল। কোনও কোনও সময় সুন্দর চোখে জল থাকলে, চোখ আরও সুন্দর দেখায়। মেঘবতীকেও খুব সুন্দর লাগছে।

ষাট

'কেমন আছ বাবা?'

'ভালো আছি। তুমি কেমন আছ বিমল?'

boierpathshala.blogspot.com

বিমলকান্তি মলিন হেসে বললেন, 'তুমি সব জানো বাবা।'

কমলকান্তি বললেন, 'তারপরেও তোমার কাছ থেকে জানতে চাইছি। একজন মানুষ কেমন আছে, প্রকৃত ভাবে তা কেবল সে নিজেই বুঝতে পারে। বাইরে থেকে আমরা নানারকম ভাবি, কিন্তু সেটা ঠিক হয় না। ঘটনার ওপর মানুষের ভলো থাকা, মন্দ থাকা নির্ভর করে না। নির্ভর করে তার বোধের ওপর, চেতনার ওপর। কেমনভাবে সে নিজেকে রাখতে চাইছে এটাই আসল। সেকথা অন্য মানুষ জানবে কী করে?'

বিলমকান্তি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'বাবা, মনটা খুব খারাপ।'

কমলকান্তি বললেন, 'কেন?'

'উপাধ্যায়কাকুর মতো একজন মানুষ, যাকে তুমি এত পছন্দ করতে, তিনি এমন কাজ করতে পারলেন। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

কমলকান্তি বললেন, 'প্রথমটায় মন আমারও খারাপ হয়েছিল বিমল। তারপর বুঝতে পেরেছি, এটাই ভালো হয়েছে। মানুষটাকে আমরা চিনতে পারিনি। সে নিজেই তার পরিচয় দিল। এমন যদি হত, সে কোনওদিন নিজেকে ধরা না দিত? সেটা কি তোমার জন্য, সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের জন্য বেশি মন খারাপের ব্যাপার হত না? সবাই জানত, ও খুব বড় মনের মানুষ ছিল। কমলকান্তি সেন আড়াল থেকে যে দায়িত্ব দিয়ে গেছে সেটাই পালন করছে। এই ভুল জানাটা কি ভালো হত?'

বিমলকান্তি বললেন, 'ভালো হত বাবা। মানুষ বিশ্বাস ভাঙলে বড় আঘাত লাগে।'

কমলকান্তি একটু যেন হাসলেন। বললেন, 'এত বড় হয়ে ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ বিমল। বিশ্বাস কোনও স্থির বিষয় নয়। সে হল নদীর পাড়ের মতো। একদিক ভাঙবে, একদিকে গড়বে। উপাধ্যায় শেষ বয়সে বিশ্বাস ভাঙলে, কর্ণিকা নামের মেয়েটি জীবনের শুরুতেই নতুন করে তোমার বিশ্বাস অর্জন করল।'

বিমলকান্তি অস্ফুটে বলল, 'সেটা ঠিক। মা কেমন আছেন?'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'খুব ভালো। আমাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। পুত্র হলেও তুমি এখন বড়, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, বুড়োবুড়িতে চুটিয়ে প্রেম করছি। এতদিন অনেক খামতি পড়েছে। পুষিয়ে দিতে হবে। একানব্বই বছর কি প্রেমের জন্য ঠিক বয়স নয়?'

বিমলকান্তি লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলেন। বাবা-মায়ের প্রেম নিয়ে কোনও মন্তব্য করা যায়? কমলকান্তি চুপ করে রইলেন।

'এ সব রস তোমরা বুঝবে না। আমার ছোট নাতনি বুঝবে। সে কোথায়?'

বিমলকান্তি বললেন, 'বৃষ্টি ভালো আছে। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছে।'

কমলকান্তি বললেন, 'জানি।'

'তাকে কি তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলব?'

কমলকান্তি বললেন, 'প্রয়োজন নেই। সে আমার সঙ্গে সবসময়ই কথা বলে। হাজার প্রশ্ন। আমি জবাব দিই না। ও বুদ্ধিমতী। নিজের মতো উত্তর তৈরি করে নেয়। কখনও ভুল হয়, কখনও ঠিক হয়। তবু সেটাই আমার কথা। গভীর ভালোবাসার সম্পর্কে ঠিক ভুল কোনও বিষয় নয়। মেয়েটাকে যত্নে রেখো।'

বিমলকান্তি হালকা চিন্তিতভাবে বললেন, 'বাবা, তুমি তো জানো, বারিধারার মধ্যে কোনও সিরিয়াস বোধই নেই। লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্ট করেছে, করেছে হেলাফেলায়। একটি ছেলেকে ভালোবাসে, সম্ভবত বিয়েও করবে, সেও উড়নচণ্ডী ধরনের।

কমলকান্তি হাসলেন। বললেন, 'সিরিয়াস বিষয়টা হাবেভাবে দেখানোর বিষয় নয় বিমল। কেউ যদি হাসি রসিকতায় কোনও সিরিয়াস কাজ করে বসে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মুখ গম্ভীর ডাক্তার অসুখ সারানোর থেকে হাসিমুখের ডাক্তার পেট কাটলে ব্যথা কম লাগে। এ কথা তোমাকে আগে বলেছি। তুমি মানতে চাওনি। সে তো তোমার ব্যাপার। আমার বিশ্বাস সেনবাড়ির সব থেকে সিরিয়াস মানুষটির নাম বারিধারা। আর

boierpathshala.blogspot.com

উড়নচণ্ডীকে ভালোবেসে কেউ যদি তার সঙ্গে ঘর বাঁধতে যায়, তা হলে ক্ষতি কী? শিল্পী মানুষ উড়নচণ্ডী হবে না তো কী হবে? দশটা-পাঁচটার অফিসার?'

বিমলকান্তি অস্ফুটে বলল, 'বৃষ্টি যদি সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে নিজেকে জড়াত তা হলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। আমার তো বয়স হচ্ছে। এরপর কে? উপাধ্যায়কাকুর ঘটনা মানসিকভাবে আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে। বাইরের কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

কমলকান্তি একটু চুপ করে রইলেন। বললেন, 'তোমার দুই মেয়ে-দুই জামাই। ব্যবসার দায়িত্ব কাকে দেবে তুমি ঠিক করবে। কীভাবে রাজি করাবে তুমি ঠিক করবে। বড় মেয়ের কথা মাথায় রেখো। শুধু ইমোশন দিয়ে যদি আমাদের মেঘবতীকে বিচার করা হয় তা হলে খুব ভুল হবে। মেঘের ভিতরটা খুব শক্ত। হালকা-পলকা ঘটনায় সে যেমন আবেগতাড়িত হয়, যে-কোনও কঠিন কাজ সে ঠান্ডা মাথায় সামলাতে জানে। ব্যবসায় যেমন অর্থের প্রয়োজন, তেমন আবেগের প্রয়োজন। মেঘের এই আবেগ আছে। সে পারবে।'

বিমলকান্তি বললেন, 'ওই মেয়ে বহুদিন আগে না বলে দিয়েছে।'

'আবার বোঝাও। সময় বদলালে মানুষের মনও বদলায়।'

বিমলকান্তি বললেন, 'আচ্ছা বলব। বাবা, আর একটা কথা ছিল।'

কমলকান্তি বললেন, 'কী কথা? তাড়াতাড়ি বলবে। এবার আমাকে ফিরতে হবে। তোমার মা অপেক্ষা করছে।'

বিমলকান্তি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'আমার একটা সমস্যা হচ্ছে বাবা। আমি মাঝে মাঝে সামনে থাকা অন্য কোনও মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, তার শরীর, মন দুটোই আমার। তার কথা আমার কথা। তার সুখ-দু:খ, আমারই সুখ-দু:খ। তার চোখ দিয়ে জগৎ দেখতে পেয়েছি।' একটু থেমে থেকে বিমলকান্তি বললেন, 'বলতে অস্বস্তি হচ্ছে, কিন্তু অফিসের খুব সাধারণ স্টাফ প্রহ্লাদ থেকে শুরু করে আপনি পর্যন্ত এই ঘটনা আমার ঘটেছে। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও আমি প্রহ্লাদ হয়ে গিয়েছিলাম, এমনকী আমি তুমিও গিয়েছিলাম... একবার উপাধ্যায়কাকুর মনের কথাও জেনেছিলাম...নিজের মনের কথা ভেবে...সেই কথা জেনে সন্দেহ হয়েছিল...কিন্তু নিজের পাগলামি ভেবে আমল দিইনি। মাঝে মাঝে খুব ভয় হয়। মনে হয় ভিতরে পাগলামি ডেভেলপ করছে। নইলে একজন মানুষ অন্য একটা মানুষ হয়ে যাবে কেন? কাউকে বলতে পারি না। লজ্জায় নয়, বলি না বাড়ির সবাই ভয় পেয়ে যাবে এই চিন্তা করে।'

বিমলকান্তি চুপ করলেন। কপালে হাত দিয়ে মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

কমলকান্তি শান্ত ভাবে বললেন, 'আমি জানি বিমল। আগে জানতাম না, পরে জানতে পেরেছি। অফিসের ওই মেয়েটি তোমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠিয়েছিল।'

বিমলকান্তি মুখ তুলে অস্ফুটে বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা।'

কমলকান্তি বললেন, 'তিনি তোমাকে বলেছেন, এটা কোনও মানসিক রোগ কি না সেটাই তিনি বুঝতে পারছেন না। তাই তো?'

'হ্যাঁ, বাবা। তারপর থেকে আর এমনটা হয়নি, কিন্তু আমার ধারণা যে কোনও সময় আবার হতে পারে। বাবা, আমার ভয় করে।'

বিমলকান্তির গলায় আত্মসমর্পণের সুর। মানবজন্মের শুরু থেকে এই আত্মসমর্পণে পিতার কাছে পুত্র ভরসা চায়। আশ্রয় চায়। এই আত্মসমর্পণ একমাত্র পিতার কাছেই করা যায়। তখন পুত্রকে কাছে টেনে নিয়ে পিতাই বলতে পারে, 'দুর বোকা, আমি আছি তো।'

কমলকান্তি পুত্রকে কাছে টানতে পারলেন না। সে ক্ষমতা এখন আর তার নেই। তবে সস্নেহে বললেন, 'ভয়ের কী আছে? কোনও ভয় নেই। একজন মানুষ যদি তার সামনের মানুষটার মতো হতে পারে, সে তো আনন্দের। ক্ষণিকের জন্য হলেও তার সুখ-দু:খ যদি নিজের হয়ে যায়, সে তো বিরাট পাওয়া। তার প্রতিবাদ, চক্রান্ত যদি তুমি জানতে পারো, তার থেকে সুবিধের কী আছে? এ সবের থেকে বড় কথা কী

boierpathshala.blogspot.com

জানো বিমল, নিজের চোখে দেখা পৃথিবীটা একরকম, অন্যের চোখে দেখা আরেকরকম। সে পৃথিবী আলাদা। সে পৃথিবী দেখবার সুযোগ সবাই পায় না। তুমি পেয়েছ। এটা তোমার পরম সৌভাগ্যের। একে আনন্দ করে গ্রহণ করো।'

বিমলকান্তি নীচু গলায় বললেন, 'তারপরেও অন্য মানুষ হয়ে যেতে অস্বস্তি হয়।'

কমলকান্তি নরম গলায় বললেন, 'যখন থেকে তুমি বুঝতে পারবে এটা কোনও অসুখ নয়, এটা তোমার পাওনা, সেদিন থেকে আর অস্বস্তি হবে না। দেখবে, আর সামনের মানুষটা হতে পারবে না। তুমি এমনিই তার চোখ দিয়ে তার সুখ-দু:খ বুঝতে পারবে। তাকে বুঝতে পারবে।'

পিতা-পুত্র দুজনেই চুপ করে রইল।

কমলকান্তি বললেন, 'আমি এবার আসি বিমল? তোমার মা অপেক্ষা করছে। বয়স হয়েছে তার। আমাকে না দেখতে পেলে বড্ড ব্যাকুল হয়ে পড়ে। একবার হারিয়েছিল, দ্বিতীয়বার আর হারাতে চায় না।'

বিমলকান্তি বললেন, 'আবার কবে আসবে?'

কমলকান্তি হেসে বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে সবসময় আছি। ছেড়ে যায়নি কখনও। সাবধানে থাকবে। মনে রাখবে, মেঘ আসবেই। বিষণ্ণ, বিষাদমাখা, অন্ধকার মেঘ। সেই মেঘ না এলে জীবন সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মেঘ আবার কাটেও। কেটে পরে রোদ ওঠে। ঝলমলে রোদ। চারপাশে আলো ছড়িয়ে দেয়। এই রোদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যে যার মতো করে অপেক্ষা করে। কেউ উদ্যমী হয়, কেউ চুপ করে বসে থাকে। আজ এলাম।'

মণিকুন্তলার পায়ের আওয়াজে বিমলকান্তির ঘোর কাটল। তিনি মুখ তুলে কমলকান্তি সেনের শূন্য চেয়ারের দিকে তাকালেন।

'এ কী তুমি এখানে! তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

মারা যাওয়ার পর নিয়ম না করেও বাবার ঘরে মাঝে মাঝে আসেন বিমলকান্তিবাবু। বিশেষ করে অফিস যাওয়ার সময় একবার উঁকি মেরে যান। আবার অনেকদিন আসাও হয় না। বিমলকান্তি সেন প্র্যাকটিকাল মানুষ। রোজ মৃত বাবার ঘরে এসে ছবিতে প্রণাম ঠুকতে হবে, এমন ধারণায় তিনি বিশ্বাস করেন না। এ বাড়ির কেউই করে না। তারা কমলকান্তি সেনকে মনের ভেতর থেকে ভালোবাসে। কপালে হাত ঠুকে শ্রদ্ধা তাদের জানাতে হয় না। আজ বিমলকান্তি ঘরে এসেছিলেন। ঢুকে মনে হল, বাবার ইজি চেয়ারটার পাশে খানিকক্ষণ বসি। মোড়া টেনে নেন। এ ঘর থেকে কোনও কিছুই সরানো হয়নি। সব কিছুই আগের মতো রয়েছে। মণিকুন্তলাই সরাতে দেননি। তিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন না। তারপরেও তার মনে হয়, শ্বশুরমশাই আজও এ ঘরে আছেন। একজন মানুষ তার জীবন দিয়ে উপস্থিত থাকে, মৃত্যু দিয়েও থাকতে পারে। বাবার ইজি চেয়ারের পাশে, বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বিমলকান্তিবাবুর মনে হয়, সামনে বাবা বসে আছেন। যেমন তিনি থাকতেন।

এরপরেই মৃত বাবার সঙ্গে বিমলকান্তি কথা শুরু করেন।

মণিকুন্তলা অবাক হয়ে বললেন, 'কী গো। এতক্ষণ এ ঘরে বসে আছ?'

বিমলকান্তি খানিকটা লজ্জাই পেলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই তো একটু আগে এসছি।'

মণিকুন্তলা কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেলেন। বাবার শূন্য চেয়ারের পাশে ছেলে কেন চুপ করে বসে আছে, তাই নিয়ে কথা বলবার অধিকার তার নেই। দুনিয়ার কারওরই নেই।

মণিকুন্তলা বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। তোমার কি এখন সময় হবে?'

বিমলকান্তি বুঝতে পারলেন তাঁর মনটা ঝরঝরে লাগছে। মনে মনে বাবার সঙ্গে কথা বলে অনেকটা হালকা হতে পেরেছেন। শুধু হালকা নয়, কিছু খুব জরুরি পরামর্শও পেয়েছেন। কাউকে এ কথা বলতে গেলে হাসবে। হাসাই উচিত। তিনি যে মৃত বাবার সঙ্গে কথা বলে মনে করছে, সেটা তো আসলে চিন্তা।

boierpathshala.blogspot.com

নিজের সঙ্গে নিজের কথা। বাবার পরামর্শ তো আসলে নিজের চিন্তা করে বের করা উপায়। তারপরেও ভাবতে ভালো লাগছে, বাবা এতক্ষণ ছিল।

'বলো মণিকুন্তলা।'

মণিকুন্তলা আলমারিতে হাত রেখে বললেন, 'এবার আমাদের বাবার প্রোজেক্টটা নিয়ে কাজ শুরু করবার সময় এসে গেছে।'

বিমলকান্তি উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'কীভাবে শুরু করবে ভাবছ।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'আগে সবাই মিলে কথা বলে নিই।'

বিমলকান্তি বললেন, 'অবশ্যই। তুমি একদিন মিটিং ডাকো। এই ঘরেই মিটিং হবে। বাবার সামনে কথা হয়ে যাবে।'

কথাটা বলে বিমলকান্তি 'হো হো' করে হাসলেন। মণিকুন্তলা অবাক হলেন। ব্যাপার কী। তার সিরিয়াস ভাব বুড়ো বয়সে যে এক ধাক্কায় অনেকটা কমে গেছে। ভারী ভালো লাগছে।

বিমলকান্তিবাবু বললেন, 'মণিকুন্তলা, তুমি কি জানো একটু পরে রোদ উঠবে মানে কী? বাবা তার ড্রিম প্রোজেক্টের এরকম একটা অদ্ভুত নাম কেন দিলেন? জানো তুমি?'

মণিকুন্তলা বললেন, 'অবশ্যই জানি।'

বিমলকান্তি আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'বলো তো।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'একটু পরে রোদ উঠবে কথাটার মানে একটু পরে রোদ উঠবে। ঠিক হয়েছে?'

বিমলকান্তি আবার হেসে উঠলেন। স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'খুব ঠিক হয়েছে। সাধে কি বাবা তোমাকে এত গুরুত্ব দিতেন? তোমার কাজ থেকে আমারও অনেক কিছু শেখবার আছে।'

দুপুরের পর থেকেই টিভিতে খবর বলতে শুরু করল, বঙ্গোপসাগরের ওপর একটা নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই নিম্নচাপ গভীর হবে। তারপর এগিয়ে আসবে স্থলভাগের দিকে। রাত থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু বিকেলের পর থেকেই আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। চারপাশ থম মেরে গেল। বৃষ্টি নামল সন্ধের পর থেকে।

একষট্টি

'ওই কে এলে আকাশ পরে দিক-ললনার প্রিয়/ চিত্তে আমার লাগল তোমার ছায়ার উত্তরীয়...'

মণিকুন্তলা গান করছেন। গলা খুলে নয়, গুনগুন করে। তিনি ছোট মেয়ের ঘর গোছাতে এসেছেন। বাসি জামা, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় আলাদা করেছেন, এদিক-সেদিক ছুড়ে ফেলে রাখা জামাকাপড় ভাঁজ করে ওয়ার্ডরোবে রাখছেন, খোলা বই তাকে গুছিয়ে তুলছেন। কম্পিউটারের ঢাকা দিলেম। জানলার নীচে জল। নিশ্চয় জানলা খোলা ছিল। কাপড় এনে সেই জল মোছবার সময় মণিকুন্তলা মনে মনে মেয়েকে ধমকও দিচ্ছেন। এই মেয়ে বৃষ্টি-বাদলায় জানলা আটকাতে কবে শিখবে? শুধু ছোট মেয়ের ঘরের কাজ নয়, একই সঙ্গে বাড়ির অন্যদিকেও খেয়াল দিতে হচ্ছে মণিকুন্তলাকে। সকালবেলায় সংসারে অনেক কাজ। যতই কাজের লোক থাকুন না কেন, বাড়ির গিন্নিকে নজর রাখতে হয়। এর সঙ্গে গুনগুন করে গান। কাজ করতে করতে যখন মেয়ের ঘরে আসছেন, গানের ভলিউম বাড়ছে। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা বা পাশের ঘরে যাচ্ছেন গান হয়ে যাচ্ছে আবছা।

এখন যেমন মণিকুন্তলা এই ঘরে। তাই গান স্পষ্ট।

'মেঘের মাঝে মৃদঙ্গ তোমার বাজিয়ে দিলে কি ও
ও তালেতে মাতিয়ে আমায় নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো...'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা বিছানায় শুয়ে আছে। গলা পর্যন্ত চাদর। পাশবালিশ জড়িয়ে গুটিশুটি মেরে আছে। খানিক আগে তার ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু এখনও সে ঘুম থেকে ওঠেনি। ঘুম ভাঙা আর ঘুম থেকে ওঠার মধ্যে বিস্তর ফরাক। এমনকী খাট থেকে নেমে ব্রাশ করলেও অনেক সময় ঘুম থেকে ওঠা হয় না। বারিধারা দেখেছে, বহুবার ব্রেকফাস্ট করতে করতেও সে ঘুমের মধ্যে থেকেছে। এখন যেমন ঘুম ভেঙে এবং ঘুম থেকে না উঠে মায়ের গান শুনছে। খুব ভালো লাগছে। লাগবারই কথা। এই মহিলার গানের গলা যতটা না ভালো, গান করবার ধরনটা বেশি ভালো। খুব স্বত:স্ফূর্ত। এত সহজভাবে গাইতে পারে যে মনে হয় গানটা আর পাঁচটা কাজের মতোই। কোনও আয়োজন লাগে না। কোনও জোরজার লাগে না। প্রাণে গান এলেই গাওয়া যায়। মহিলার ওপর বারিধারার হালকা হিংসেও হল। ইস সে যদি মায়ের গলার খানিকটা পেত। নিমেষে আবার হিংসে চলেও গেল। গান গাইতে পারবার থেকে গান শুনতে পাওয়াও কম আনন্দের নয়।

মণিকুন্তলা গান থামিয়ে, মেয়ের দিকে তাকালেন। কড়া গলায় বললেন, 'কী রে, কখন উঠবি?'

বারিধারা চাদরটা মাথার ওপর টেনে নিয়ে বলল, 'উ: গান থামিও না। তোমার পরীক্ষা হচ্ছে।'

মণিকুন্তলা হাতে মেয়ের জামা নিয়ে থমকে গেলেন।

'কীসের পরীক্ষা?'

বারিধারা চাদরের নীচ থেকে বলল, 'এই গানটা তুমি ভালো গাও না শ্রাবণী সেন ভালো গায়। আবার মুখড়াটা ধরো।'

মণিকুন্তলা কটমট করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চাদর মুড়ি দেওয়া মেয়ের চুলের ঝুঁটিটা ঠিক কোনদিকে বোঝবার চেষ্টা করলেন। বুঝতে পারলেই ধরে নাড়িয়ে দেবেন। সাতসকাল থেকেই রসিকতা করা বেরিয়ে যাবে।

বারিধারা বলল, 'মা, ঘাবড়িও না। পরীক্ষার ফার্স্ট রাউন্ডে এগিয়ে আছ।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'একটা চড় মারব।'

বারিধারা খিলখিল করে হেসে চাদর সরিয়ে উঠে বসল। ডান হাত বাড়িয়ে নাটকীয় ঢঙে বলল, 'মণিকুন্তলা ম্যাডাম, রাগ করবেন না। সত্যি আপনি একজন সুকণ্ঠের অধিকারিণী। সংসার নামক হারমোনিয়ামের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্যাঁ পো করে মরছেন। অধিকাংশ গুণী মহিলার জীবনে এমনটাই ঘটে। রান্নাঘরের দোরগোড়ায় প্রতিভা মাথা কুটে মরে। আপনি যদি সঙ্গীতের চর্চা নিয়মিত করতেন তা হলে শ্রাবণী সেন না হোন মণিকুন্তলা সেন হিসেবেই শ্রোতাদের কাছে পরিচিত এবং সমাদৃত হতেন। তবে দু:খ করবেন না ম্যাডাম, আপনি আপনার এই কন্যার কাছে কোনও বড় গায়িকার থেকে কম নন।'

মণিকুন্তলা বুঝলেন, এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলা ঝকমারি ছাড়া আর কিছুই নয়। সকাল মেয়ের সঙ্গে ঝকমারি করার জন্য নয়, সকাল সংসারের কাজ করবার জন্য। চটি ফটফটিয়ে রাগের শব্দ করে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাক, মেয়ের ঘুমের মধ্যে ঘরটা তাও খানিকটা সাফসুতরো করা গেছে।

বারিধারা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশ মেঘ ভরা। কালো মেঘ নয়, কাজল লেপটানো মেঘ। কাল সারারাত ধরে বৃষ্টি পড়েছে। তবে খুব জোরে নয়। সকালের দিকে খানিকটা ধরেছে। আকাশ বলছে, আবার যে-কোনও সময় ঝমঝমিয়ে নামবে। সব মিলিয়ে চমৎকার একটা বৃষ্টির দিন।

বারিধারা আড়মোড়া ভাঙল। তার মন ভালো লাগছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মন ভালো লাগা একটা সুলক্ষণ। বৃষ্টির দিনের কতগুলো নিজস্ব নিয়ম আছে। একে বলে 'বৃষ্টির দিনের নিয়ম'। এই নিয়ম না মানলে, বৃষ্টি রাগ করে। সেই রাগ যদি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় তখন বিপদ ঘটে। বৃষ্টি অভিমান করে এবং বেশ ক'দিন এ মুখো হয় না। বারিধারা মনে মনে নিয়মগুলো ঝালিয়ে নিল। সারারাত বৃষ্টি পড়লে এবং পরদিন সকালেও আকাশ মেঘে ভরা থাকলে সহজে বিছানা ছাড়তে নেই। সেদিনের যাবতীয় রুটিন কাজ বাতিল করতে হয়। গোটা সকালে বারবার গরম চা চাই। সঙ্গে ডিমের পকৌড়া। পিছনে গাঁক গাঁক করে রবীন্দ্রসঙ্গীত

boierpathshala.blogspot.com

চলবে। দুপুরে খিচুড়ি। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনন্দীর 'মরীরা দুপুর' বা অরহান কামুকের উপন্যাস 'দ্য মিউজিয়ম অফ ইনসেন্স' পড়তে হবে। বিকেলে পুরোনো বন্ধুদের খুঁজে খুঁজে ফোন বা ফেসবুকে আড্ডা। সন্ধেবেলা খাটে আধশোয়া হয়ে ল্যাপটপে সিনেমা দেখতে হবে। কোরিয়ান মুভি 'আ বিটার সুইট লাইফ' অথবা বাংলায় 'সোনার কেল্লা'। এর মাঝখানে প্রেমিক বা প্রেমিকা ফোন করবে। সেই ফোন ধরা চলবে না। তাকে টেনশনে রাখতে হবে। এতে এক ধরনের বিরহও তৈরি হবে। স্বেচ্ছাবিরহ। বৃষ্টিতে মিলনের চেয়ে বিরহ বেশি ইন্টারেস্টিং।

বারিধারা ঠিক করল, সে আজ বৃষ্টি দিনের নিয়ম মেনে চলবে। সে আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বার তোড়জোড় শুরু করল।

মণিকুন্তলা আবার ঘরে ঢুকলেন।

'বৃষ্টি, জরুরি কথা আছে। মুখ ধুয়ে নীচে এসো। চা খেতে খেতে কথা বলব।'

বারিধারা শোবার প্ল্যান ত্যাগ করে বলল, 'আজ তো জরুরি কথা শোনা যাবে না মা।'

মণিকুন্তলা চোখ পাকিয়ে বলল, 'কেন? আজ তোমার কী?'

বারিধারা গায়ের চাদর সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে মায়ের হাত ধরল। হাসিমুখে বলল, 'আজ বৃষ্টির দিন। আজ জরুরি কথা বলা বারণ।'

মণিকুন্তলা হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলালেন। তার এই মেয়েটা ছেলেমানুষ বয়স থেকেই বৃষ্টি পাগলা। বৃষ্টি পড়লে চোখে চোখে রাখতে হত। ছুতোনাতা পেলেই বারান্দা, উঠোন, ছাদে ভিজতে চলে যেত। মণিকুন্তলা একবার পিটুনি দিলেন। নাতনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে দাদুর কাছে গেল। কমলকান্তি সেন পুত্রবধুকে ডেকে পাঠালেন। মণিকুন্তলা ঝগড়া করবেন বলেই প্রস্তুত হয়ে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে গেলেন।

'বাবা আপনি আর আশকারা দেবেন না। এই সেদিন জ্বর থেকে উঠল মেয়ে। বারণ শুনছে না।'

কমলকান্তি সেন গম্ভীর ভাব বললেন, 'তুমি শাসন করে ঠিক করেছ। অবাধ্য ছেলেমেয়েকে দু-ঘা দেওয়াটাই উচিত। আমি তোমাকে এই কারণে ডাকিনি।'

মণিকুন্তলা গজগজ করতে করতে বললেন, 'তা হলে কী কারণে ডেকেছেন?'

কমলকান্তি অপরাধীর ঢঙে বললেন, 'নাতনির এই বৃষ্টি ভেজা স্বভাবের জন্য আমিই দায়ী সেকথাটাই বলতে ডেকেছি।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। তবে ওই মেয়ে যদি আবার বৃষ্টিতে ভিজতে যায়, আবার আমার হাতে মার খাবে।'

কমলকান্তি বললেন, 'আর ভিজবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'সে আপনার ব্যাপার। আমি ছাড়ব না।'

কমলকান্তি বললেন, 'তুমি ঠান্ডা হও। যার ভালো নাম বারিধারা, ডাকনাম বৃষ্টি সে তো বৃষ্টিতে ভিজবেই। না চাইলেও ভিজতে হবে। তার কোনও অপরাধ নেই। ছোট নাতনির নাম আমি বদলে দিচ্ছি। সেই ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমি তোমাকে ডেকেছি। আচ্ছা, মেয়ের নাম যদি রোদ্দুর দিই? কেমন হবে? তবে তাতেও চিন্তা আছে। তখন হয়তো রোদে টইটই করে ঘুরবে। তাই না? সবথেকে ভালো হয়, এইমেয়ের নাম আমি দিই ঘর। তা হলে নিশ্চয়ই চুপটি করে ঘরে বসে থাকবে।'

মণিকুন্তলা আর পারেননি। শ্বশুরমশাইয়ের সামনেই ফিক করে হেসে ফেলেছিলেন। বারিধারার সেই বৃষ্টি পাগলামি যায়নি। এখনও ভেজে। বড় হয়েছে বলে লুকিয়ে-চুরিয়ে ভেজে। টুক করে ছাদে চলে যায়।

মণিকুন্তলা হাত সরিয়ে নিয়ে মেয়েকে বললেন, 'বাজে কথা পরে বলবে। তোমার দিদিকে আনতে গাড়ি গেছে। সে এলে আমরা তোমার দাদুর প্রোজেক্ট নিয়ে মিটিং করব।'

বারিধারা এবার প্রায় লাফিয়ে উঠল।

boierpathshala.blogspot.com

'খুব ভালো হবে। একটু পরে রোদ উঠবে, প্রোজেক্টের জন্য কাজ করাটা কোনও কাজ নয়। এটা আনন্দ। মিটিংয়ে আর কে কে থাকবে? বাবা?'

মণিকুন্তলা বললেন, 'না, আজ আমরা শুধু তিনজনে একটু কথা বলে নেব। সবাইকে নিয়ে কবে বসা হবে, তাই ঠিক করব। তোমার বাবার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।'

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে তিনজনে কথা হল। সাতদিন বাদে মিটিংয়ের একটা দিন ঠিক হল। সবাইকে থাকতে হবে। ওই সময় কোর্টের কাজে অর্চিনের কলকাতায় আসবার কথা। সেও থাকবে। বারিধারার দায়িত্ব পড়ল, সবাইকে খবর দেওয়ার।

প্রথম কাজ হবে, একটা ট্রাস্ট তৈরি করা। ঝাড়গ্রামের জমিটা একদিন সরজমিনে দেখে আসা হবে। পাঁচিল দিয়ে সেই জমি ঘিরে ফেলা দরকার। ভিতরে আপাতত একটা ঘর বানানোর বন্দোবস্ত করলেই চলবে। ওটা হবে সাইট অফিস। আপাতত সেনবাড়িতে বসে কাজ শুরু হবে। বাকি কাজ সেদিন মিটিংয়ে আলোচনা করে ঠিক হবে।

বারিধারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ব্যস, তাহলে আজকের মতো জরুরি কথা শেষ। এবার রেনি ডে উদযাপন হবে।' মেঘবতী বলল, 'দাঁড়াও, আমার একটা কথা আছে।'

বারিধারা মুখ ভেটকে বলল, 'আবার কী কথা দিদি? চল ছাদে গিয়ে ভিজি। দেখ কেমন জোরে বৃষ্টি নেমেছে।'

মেঘবতী বোনের কথায় পাত্তা না দিয়ে থমথমে গলায় বলল, 'বাবা আমাকে সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসে জয়েন করতে বলছে। বলছে, এখন থেকে অফিসে গিয়ে কাজকর্ম শিখতে।'

বারিধারা মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

'কী ব্যাপার মা? দিদি, যা বলছে সত্যি?

মণিকুন্তলা চায়ের কাপ মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি। তোদের বাবা আমাকে বলেছে, কোম্পানির দায়িত্ব তো এবার কাউকে বুঝে নিতে হবে। সেটা বাড়ির কাউকেই নিতে হবে। তোর বাবার তো বয়স হচ্ছে। বাড়ির কেউ দায়িত্ব না নিলে কীভাবে চলবে?'

বারিধারা উৎসাহ নিয়ে বলল, 'এটা তো খুব ভালো কথা। সেন অ্যাসোসিয়েটস তো তুলে দেওয়া যায় না। বাইরের লোক দিয়ে ব্যবসা চলেও না। দিদি যদি দায়িত্ব নেয় তার মতো ভালো আর কিছু হবে না। তোর কি আপত্তি আছে দিদি?'

মেঘবতী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আগে ছিল। বলেছিলাম, এ সবের মধ্যে আমি নেই। এখন বাবা বুঝিয়ে বলবার পর কেমন যেন গুলিয়ে গেছে। বাবা বলল, আমার তো ছেলে নেই। দুই মেয়ে। ছেলে থাকলে সে ব্যবসা চালাত। মেয়ে আছে বলে কি ব্যবসা তুলে দিতে হবে? বাবার কথাটায় ধাক্কা খেলাম। সত্যি তো মেয়েরা ব্যবসা চালাতে পারে না? বড় বড় কোম্পানির মাথায় মেয়েরা রয়েছে। অনেক ব্যবসায় মালিকও মেয়ে। তা হলে আমরা কেন বাবাকে হেল্প করতে পারব না? বাবার বয়স বাড়ছে। বাবার ওপর চাপ পড়ছে। জ্যোতিষ্ককে বলেছিলাম। সে বলল, অবশ্যই তোমার দায়িত্ব নেওয়া উচিত। জটিল কাজে তোমার মাথা পরিষ্কার। বাবাকে কিছু বলিনি। আগে তোমাদের বললাম। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। তোমরা বলে দাও।'

বারিধারা মেঘবতীকে জড়িয়ে ধরে ফটাস করে গালে একটা চুমু খেল। মেঘবতী বোনকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল। বারিধারা একগাল হেসে বলল, 'ভেরি গুড। এই না হলে তুই বারিধারা সেনের দিদি? অবশ্যই রাজি হবি। তোর কড়া হাতে বাপ-ঠাকুরদার কোম্পানির আরও ভালো হবে। তুই যদি রাজি না হতিস তোকে ত্যাজ্য দিদি করতাম।'

মেঘবতী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি কি পারব? অত বড় অফিস। অত কাজ। আমি তো কখনও এরকম কঠিন কাজ করিনি।'

boierpathshala.blogspot.com

বারিধারা হেসে বলল, 'তুই অফিসে জয়েন করেই একটা ছিঁচকাঁদুনে রুম বানাবি। যখন দেখবি কাজ সামলাতে পারছিস না, নাকানি-চোবানি খাচ্ছিস, তখন ওই ছিঁচকাঁদুনে রুমে গিয়ে খানিকক্ষণ কেঁদে নিবি। বাইরে বোর্ড ঝোলানো থাকবে বস ইস নাউ ক্রাইং, ডোন্ট ডিসটার্ব।'

মেঘবতী হাত বাড়িয়ে বোনের কান ধরবার চেষ্টা করল। মণিকুন্তলা মেয়েদের ধমক দিয়ে বললেন, 'তোরা থামবি? এরকম একটা সিরিয়াস সময়ে বাচ্চাদের মতো মারামারি করছিস?'

তারপর বড় মেয়ের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তুই পারবি মেঘ। তোর বাবা জেনেশুনেই তোর কথা ভেবেছে। বলেছে, সহজ কাজে কেঁদে ফেললেও, কঠিন কাজে আমার বড় মেয়ের খুবই ঠান্ডা মাথা।'

মেঘবতী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আর একটু পরে রোদ উঠলে প্রোজেক্টের কী হবে?'

মণিকুন্তলা হেসে বললেন, 'তার জন্য তো আমরা সবাই আছি। তুইও থাকবি।'

মেঘবতী কান্নার ভাব ঝেরে ফেলে বলল, 'আমি থাকব তো?'

মণিকুন্তলা বললেন, 'এ মা! কেন থাকবি না? অফিসের কাজের পর যতটা পারবি সময় দিবি।'

বারিধারা হুকুমের ঢঙে বলল, 'শনি, রবি আর অন্যান্য ছুটির দিন আপনি প্রোজেক্টে যাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন সেখানে আপনি বস নন, সেখানে বস আমি। আমি যা অর্ডার করব সেই মতো কাজ করবেন।'

মেঘবতী এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে বোনকে তাড়া করল। বারিধারা হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে ছুটল। মেঘবতী হাসতে হাসতে গেল পিছনে। দুই মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন মণিকুন্তলা। খুশিতে তাঁর বুক ভরে গেল। কিন্তু এই খুশি একটু পরেই মণিকুন্তলার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। খানিকক্ষণ মেয়েদের সাড়াশব্দ না পেয়ে খানিকটা চিন্তিত হয়েই মণিকুন্তলা ছাদ পর্যন্ত চলে যান এবং সেখানে যা দেখলেন তাতে রাগে মাথায় আগুন ধরবারই কথা। ধেড়ে মেয়েরা এ কী কাণ্ড করছে! বৃষ্টিতে হাত ধরাধরি করে পাগলের মতো ভিজছে যে! ছি-ছি, এদের কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই?

বারিধারা আর মেঘবতী ভিজতে ভিজতে তাদের মাকে দেখতে পায় এবং হাত ধরে জোর করে টেনে ছাদে নামায়।

'ওরে আমায় ছাড়, ওরে আমায় ছাড়' বলতে বলতে মণিকন্তলাও ভিজতে থাকেন। মাথায় রাগের আগুন নিয়ে বৃষ্টিতে ভেজার এমন আনন্দ তিনি আগে কখনও পাননি।

মা-মেয়ের এই আনন্দস্নানে সব থেকে খুশি হল খোদ বৃষ্টি। সে আরও ঝেঁপে নামল।

বাষট্টি

'পার্টি সংগঠনের প্রস্তুতি।'

কথাটা পাতার ওপর লিখে পেন তুলে নিল শেখর। কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর লেখাটা কাটল। এবার লিখল —'বিভিন্ন বাম পার্টি কীভাবে সংগঠন গড়ে তুলেছিল।' এবারও হাত তুলে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল শেখর। তার চোখ মুখ বলছে, এই বাক্যটিও তার পছন্দ হয়নি। শেখর পেন কামড়ে বেশ খানিকক্ষণ ভাবল। পেন কামড়ানোর অভ্যেসটা তার বহুদিনের। আগে বেশি ছিল, তমসা বলে বলে কমিয়েছে।

'ছেলে বড় হচ্ছে। বদভ্যাসগুলো কমাও, ছেলেও তো শিখবে।'

শেখর বলেছিল, 'পেন কামড়ানো বদভ্যাস তোমায় কে বলল তমসা?'

তমসা অবাক হয়ে বলেছিল, 'কী বলছ তুমি। অবশ্যই একটা বিচ্ছিরি হ্যাবিট। ময়লা মুখে যাচ্ছে।'

শেখর হেসে বলেছিল, 'মাও লেখবার সময় পেন কামড়াতেন। পৃথিবীর ময়লা দূর করতে চেয়েছিলেন তিনি। শোষণ, বঞ্চনা ময়লা ছাড়া কী? কী জানি, হয়তো লং মার্চের জন্য পার্টিকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন,

boierpathshala.blogspot.com

সেটাও হয়তো পেন কামড়ে লিখেছিলেন।'

তমসা রেগে গিয়ে বলেছিল, 'তুমি লং মার্চের চিঠি লিখছ না। মাও, হোচিমিন, লেনিন, চে গুয়েভারা করলেও এটা ঠিক নয়। তুমি করবে না।'

শেখর বদভ্যাস কমিয়ে এনেছে। তারপরেও লেখালিখির সময় কোথাও আটকে গেলে অজান্তে পেন মুখে চলে যায়।

শেখর এবার লিখল—'বিবিধ বাম দলের সূচনাকালীন সাংগঠনিক কাঠামো আমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারে?'

হেডিং হিসেবে বড় হয়ে গেল? হোক। এখানে ছোট বিষয় নয়, পার্টি নেতৃত্ব যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে। পুরো বাক্যটির নীচে লম্বা দাগ দিল শেখর। দ্রুত এই লেখা শেষ করতে হবে। নির্বাচনের রিপোর্ট নিয়ে লোকাল কমিটির গোলমালের পর জেলা সেক্রেটারি শেখরকে ডেকে পাঠালেন। 'এসব নিয়ে বেশি চিন্তা কোরো না শেখর। যে কোনও বিপর্যয়ের পরই এই ধরনের বিরোধ তৈরি হয়। আমাদের পার্টির ইতিহাসে বারবার হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট যখন ভেঙে গেল, আমাদের পার্টির একটা বড় অংশ আমাদের ত্যাগ করল। পরে এমারজেন্সির সময়ও এক ঘটনা ঘটেছে। একদল বলল, এখনই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে। একদল বলল, আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া আর পালিয়ে যাওয়া এক কথা। তার থেকে সারফেসে থেকে কাজ করে জেলে যাওয়াই ঠিক হবে। এতে মানুষের মধ্যে পার্টির বিপ্লবী ইমেজ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রভিনসিয়াল কমিটিতে এই নিয়ে তুলকালাম হল। শেষ পর্যন্ত এমন ধরপাকড় শুরু হল যে আন্ডারগ্রাউন্ডে না গিয়ে উপায় ছিল না। এতদিন পাওয়ারে থাকার পর, পরাজিত হয়েছি। একবার নয়, পরপর দু'বার। এবার তো জটিলতা অনেক বেশি হবার কথা।'

শেখর বলল, 'এটাই তো সবাই বুঝতে চায় না।'

সেক্রেটারি বললেন, 'সবাই কোনওদিনই সবটা বুঝতে চায়নি শেখর। কমিউনিস্ট পার্টিকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, অতীতকে আঁকড়ে বসে থাকতে হবে। আমাদের নতুন করে সংগঠন গোছানোর কথা ভাবতে হবে। প্রয়োজনে নতুন পথ বের করতে হবে। স্ট্রাকচার বদলাতে হবে। তুমি একটা নোট তৈরি করো। আমার কাছে জমা দাও। পয়েন্ট ঝাড়াই বাছাই করে পার্টির কাছে প্রস্তাব হিসেবে পাঠাব।'

শেখর জিগ্যেস করেছিল, 'সব এলসি কি নোট তৈরি করবে?'

জেলা সেক্রেটারি বললেন, 'খেপেছ? সবাই জানে কী? নতুন করে পথ চিহ্নিত করবার কথা কথা কেউ ভাবে নাকি? বেশিরভাগই তো গয়ংগচ্ছ। যা চলছে তাই চলবে। আমি তোমার কাছ থেকে নেব, আমি নিজেও তৈরি করব।'

শেখর বলল, 'এই নোটে কী থাকবে?'

সেক্রেটারি বললেন, 'কী আবার থাকবে? অর্গানাইজেশন ঢেলে সাজানোর কথা থাকবে। জোরদার করবার কথা থাকবে। আরও ডিসেনট্রালাইজেশনের কথা থাকবে। নীচের কমিটিগুলোকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় সেই কথা ভাবতে হবে। কখন জেলা প্রোগ্রাম পাঠাল তার জন্য হ্যাপিত্যেশ করে বসে না থেকে লোকাল ব্রাঞ্চকে নিজের মতো কর্মসূচি ঠিক করতে হবে। নিজের এলাকার এমন অনেক অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে যা আমরা ওপরে বসে ভাবতে পারি না। তুমি সবদিক ভেবেচিন্তে একটা নোটস পাঠাও শেখর।'

শেখর ক'দিন ভাবনাচিন্তা করেছে। তার মনে হয়েছে, একেবারে শুরু থেকে ভাবাটাই উচিত। বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলো কীভাবে তাদের সংগঠন গড়েছিল সেগুলো একবার ঘষে মেজে দেখা যেতে পারে। সবার থেকে ভালো দিকটা নিয়ে নিজেদের চলবার দিশা বের করতে পারলে সবথেকে ভালো হয়। এই ভাবনা নিয়েই সে লিখতে বসেছে। আজ সকালে বেরোনো হয়নি। খুব বৃষ্টি পড়ছে। ছেলে পরীক্ষার পর ছুটি পেয়ে

boierpathshala.blogspot.com

দু'দিনের জন্য মামাবাড়িতে গেছে। তমসা স্কুলে। সে যখন বেরিয়েছে, বৃষ্টি খানিকটা থমকে ছিল। বাড়িতে একা বসে শেখর মন দিয়ে লিখে চলেছে।

আমাদের পার্টির আদর্শ বিশ্বাস, ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে যদি স্বত:স্ফূর্ত আবেগ তৈরি করতে পারি তাহলে সংগঠন নিজে থেকেই গড়ে উঠবে। আমরা আগেই বুদ্ধিজীবীদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই। পাড়ায় পাড়ায় তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার সময় দেওয়া হোক। অতি বিপ্লবী দলের ভ্রান্ত পথ যেমন আমাদের কাছে পরিত্যজ্য, তেমন তাদের সাংগঠনিক কৌশল আমাদের গ্রহণ করবার মধ্যে কোনও দোষ নেই।

ডোর বেল বাজল। কেউ এসেছে। শেখর পেন নামিয়ে উঠে পড়ল। সামনে রাখা হাতঘড়িটা তুলে দেখল একটা বেজে গেছে। অনেক বেলা হল। সদর দরজার কাছে যেতে যেতে শেখর বুঝতে পারল, বৃষ্টির বেগ বেড়েছে।

দরজা খুলেই ঝাপটা মেরে খানিকটা বৃষ্টি ঘরে ঢুকে পড়ল। ভিজে চুপচুপে হয়ে তমসা দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ছাতা। শিকভাঙা, নড়বড়ে ছাতা বৃষ্টি ঠেকাতে পারেনি। তমসাকে ভিজিয়ে ছেড়েছে।

তমসা ছাতা বন্ধ করতে করতে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

শেখর বলল, 'কী হল? চলে এলে যে?'

তমসা এবার দরজা আটকে দিতে দিতে বলল, 'রেনি ডে হয়ে গেল। আরও যদি বৃষ্টি বাড়ে, তাই ছুটি। সরো, আগে বাথরুমে যাই।'

শেখর বলল, 'ইস একদম ভিজে গেছে। একটা রিকশো পেলে না?'

তমসা বলল, 'কেউ আসতে চাইল না।'

তমসা বাথরুমের দিকে এগিয়ে বলল, 'রাস্তায় জল জমেছে কিন্তু।'

শেখর সিগারেট ধরাল। বলল, 'তা তো জমবেই, এইভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে ঘরেও জল ঢুকবে।'

তমসা বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'খেয়েছ?'

শেখর নিজের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে, 'না। বিকেলে পার্টি অফিস যাব কী করে ভাবছি।'

তমসা বাথরুমের ভিতর থেকে বলল, 'খাওনি তো সিগারেট ধরালে কেন? বিকেলে বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না।'

শেখর টেবিলে ফিরে এল। লেখাটা শেষ করতে হবে। তবে এখন আর হবে বলে মনে হয় না। মুডটা কেটে গেল। খেয়ে নিয়ে আর একবার চেষ্টা করতে হবে। যদিও তমসা চলে আসায় ভালোই হয়েছে। খাবার টাবারগুলো গুছিয়ে দেবে।

বরকে ভাত দিয়ে তমসাও বসে পড়ল। সে খেয়ে স্কুলে গিয়েছিল, তারপরেও খিদে পেয়ে গেছে। এতটা পথ বৃষ্টিতে হেঁটে এলে খিদে পাবারই কথা। এক হাতা ভাত খেলে ভালো হয়। বেশি করে লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে অমলেট ভেজে নিল। বৃষ্টির সময় ভাত ডালের সঙ্গে ঝাল ঝাল অমলেট অমৃত।

শেখর বলল, 'একটা নোট তৈরি করছি।'

তমসা বলল, 'কীসের নোটস?'

শেখর বলল, 'অর্গানাইজেশন রিফর্ম।'

তমসা বলল, 'তোমার কথা কে শুনবে? তুমি পার্টি সংগঠনের পুনর্বিন্যাস করবার কে?'

শেখর বলে, 'এটা কোনও কথা নয়। ঠিকমতো বোঝাতে পারলে নিশ্চয় কিছুটা শুনবে। আর এ তো কোনও অফিসিয়াল পেপার নয়। জেলা সেক্রেটারি নিজের উদ্যোগে কিছু প্রোপোসাল পাঠাতে চাইছে। আমার কাছ থেকে পয়েন্টস চেয়েছেন। ভালো কথা। ব্রাঞ্চ, লোকাল, জোনাল কমিটিগুলি যদি শক্তিশালী হয়, সংখ্যায় বাড়ে সেটা তো পার্টির জন্য ভালো।

তমসা খানিকটা নিস্পৃহ ভাবে বলল, 'যদি হয় ভালোই তো।'

boierpathshala.blogspot.com

শেখর বলল, 'আমি খেয়ে উঠে লেখাটা শেষ করব। বিকেলে তোমাকে পড়াব। একটু দেখে দেবে। মনে হচ্ছে, একটু বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। হোক বিতর্ক। বিতর্ক না থাকলে কোনও পার্টি টিকতে পারে না।'

তমসা বলল, 'আচ্ছা দিও।'

শেখর ভেবেছিল খাবার পরই লিখতে বসবে। বৃষ্টি আরও বেড়েছে। তমসার সঙ্গে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

তমসা উদ্ভাসিত গলায় বলল, 'দেখ, কী সুন্দর! চারপাশ একবারে সাদা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সাদা ওড়না দিয়ে কিশোরী মুখ ঢেকে হাসছে। সেই হাসির সঙ্গে কান্নার মতো ঝরে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা! এই হাসি কান্না বুঝতে পারা যায়, আবার যায়ও না। তাই এত ভালো।'

শেখর বলল, 'পার্টিকে বাচাতে গেলে আগে সংগঠনকে...।'

তমসা ঘুরে দাঁড়িয়ে শেখরের ঠোঁটে আঙুল দিল। মুচকি হেসে অস্ফুটে বলল, 'তোমারে পাছে সহজে বুঝি, তাই কি এত লীলার ছল/ বাহিরে যবে হাসির ছটা, ভিতরে থাকে আঁখির জল। / বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব ছলনা—/ যে কথা তুমি বলতে চাও, সে কথা তুমি বলো না।'

শেখর বউকে পাঁজাকোলা করে বিছানায় নিয়ে এল। পোশাক খুলতে লাগল অতি যত্ন করে। যেন ফুল সাজাচ্ছে। বৃষ্টিদিনের আঁধার ঘরে শুধু মেঘের আলো। সেই ভেজা আলোয় নগ্ন তমসাকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী, জীবনের পরম আনন্দ মুহূর্তের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বুকে মুখ নামিয়ে শেখর ঘ্রাণ নিল।

'তমসা, তুমি সাবান মাখোনি।'

তমসা দু'হাত দিয়ে শেখরের এলোমেলো চুল চেপে ধরল গভীর আশ্লেষে।

'না, মাখিনি।'

জলের ফোঁটার মতো নাভিতে দাড়ি না কামানো গাল ঘষতে ঘষতে জড়ানো গলায় শেখর বলল, 'কেন?'

শেখরের কাঁধ খিমচে ধরে তমসা বলল, 'তোমরা জন্য গায়ে বৃষ্টি রেখে দিয়েছি।'

শেখর সেই বৃষ্টিতে ডুব দিল। মেঘের গর্জন মুচকি হেসে তমসার শিৎকার ঢেকে দিল পরম ভালোবাসায়।

বিকেলে জেলা অফিস থেকে ফোন করে শেখরকে জানানো হল, তার লোকাল কমিটি ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে পার্টিতে এত কমিটির কোনও প্রয়োজন নেই।

তেষট্টি

ডিয়ার বারিধারা,

আমাকে কি আপনার মনে আছে?

যদি মনে না থাকে তা হলে গলা জড়িয়ে একটা চুমু পাবেন। আর যদি থাকে তা হলে পাবেন চাঁটি। এবার বলুন ম্যাডাম, কোনটা আপনার চাই? চুমু না চাঁটি? অবশ্য আমার চুমু আপনার মোটেও পছন্দ হবে না। শ্রবণের চুমু পেয়ে আপনার স্বভাব অতিশয় খারাপ হয়ে গেছে। অন্য কারও চুমু সইবে না। খ্যাসটা মার্কা লাগবে। তার ওপর মেয়েমানুষের চুমু। ছ্যা।

কীরে বারিধারা আমার মুখে চুমুর কথা শুনে অবাক লাগছে? হি হি। ঠিক করেছি, এই চিঠি লিখতে লিখতে যখনই আমার হাসি পাবে, অমনি আমি সেই হাসির কথা তোকে জানাব। এখন তো আমরা মুখোমুখি নেই, তুই আমার হাসি দেখতেও পাবি না। তাই লিখে লিখেই জানাব। এখন যেমন 'হি হি' লিখে জানালাম।

ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি, যেদিন তোর সঙ্গে দেখা হবে তোকে চুমু না খাই, ঠিক খিমচে দেব। তোর ওপর খুব রাগ হয়েছে। তিথিকে তুই ভুলে গেলি! সেই যে বিয়ে বলে ইউনিভার্সিটি থেকে চলে এলাম, তারপর একটা খোঁজ পর্যন্ত নিস না। আমার মনে আছে, তোর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে ক্যান্টিনে। তুই

boierpathshala.blogspot.com

আমাকে ডাকলি, অ্যাই তিথি, আমি না শুনতে পাওয়ার ভান করে বেরিয়ে গেলাম। তাই না? আমি জানি, তুই নানা কৈফিয়েত দিবি। বলবি, তিথি, তুই তো সেদিন পালিয়ে গেলি। বলবি, বিয়ে করে নিজেই বেপাত্তা হয়েছিস। বলবি তিথি, তুই কি মোবাইলের নম্বরও বদলে ফেলেছিস? ফেসবুকেও থাকিস না। হোয়াটসঅ্যাপে নেই। এমএ শেষ করা তো দূরের কথা, বিয়ের পর ইউনিভার্সিটির দিকে পা পর্যন্ত বাড়াসনি। তুই কি এখন বিদেশে? আর সব্বার শেষে বলবি, তুই তো নিজেও একটা ফোন করতে পারতিস? এরকম হাজার কথা শোনাবি। তাই তো? আচ্ছা বাবা, আমি হার স্বীকার করছি। সব দোষ আমার। হয়েছে? সত্যি, আমরাই উচিত ছিল তোকে ফোন করা, যোগাযোগ করা। কেন করি না জানিস? আমার লজ্জা করে। অপরাধবোধ জাগে। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। কথাগুলো কি সস্তা নাটকের মতো শোনাচ্ছে? হি হি। বিয়ের পর ঘর সংসার করতে এসে আমি খুব নাটুকে হয়ে গিয়েছি।

আজ সকালে ঘুম ভেঙেছে বৃষ্টিতে। ধড়াম ধড়াম করে বাজ পড়ছিল। কলকাতার বাইরে ঝড়বৃষ্টি বেশি হয়। আমার বাপের বাড়িতেও তাই হত। আমি খাট থেকে নেমে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর জানলার পাল্লা খুলে অনেকক্ষণ হাত বার করে ভিজলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তোকে চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

এরকম একটা বৃষ্টির দুপুর ছিল সেটা। ইউনিভার্সিটির তিনতলার বারান্দায় দুজনে গল্প করছিলাম। হঠাৎ আকাশ ফাকাশ কালো করে হেভি বৃষ্টি নামল। তুই চোখ চকচক করে বললি, 'অ্যাই তিথি ভিজিবি? চল না নীচে নেমে ভিজি।'

আমি বললাম, 'খেপেছিস? ইউনিভার্সিটিতে ভিজব কী!'

তুই চোখ পাকিয়ে বললি, 'কেন ইউনিভার্সিটিতে কি ভেজা বারণ?'

তোর উদ্ভট কথায় আমি সবসময় মজা পেতাম। বললাম, 'অবশ্যই বারণ। এখানে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে, বৃষ্টিতে ভিজতে আসে না।'

তুই বললি, 'তোকে কে বলল লেখাপড়া করবার জায়গায় ভেজা যায় না? এক সময়ে শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি পড়লে মাস্টারমশাইরা ছেলেমেয়েদের ভেজবার জন্য ছুটি দিয়ে দিতেন। ছেলেমেয়েরা গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে গাইতে গাইতে সাইকেল চালিয়ে ভিজতে ভিজতে খোয়াই, কোপাইতে চলে যেত। তাদের সঙ্গে মাস্টারমশাইরাও যেতেন। আমি বইতে পড়েছি।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'এটা শান্তিনিকেতন নয় আর আমাদের ভি সি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন।'

তুই বললি, 'নো প্রবলেম, চল, আমরা একটা জোব্বা নিয়ে ভি সি-র কাছে যাই। গিয়ে বলি স্যর আপনি এই জোব্বাটা গায়ে চাপিয়ে কিছুক্ষণের জন্য রবি ঠাকুর হয়ে যান।'

আমরা দুজনেই খুব হাসতে লাগলাম। এরপর তুই বললি, 'দাঁড়া, তোকে ভেজবার একটা কায়দা শিখিয়ে দিই। যখন পুরো ভিজতে পারবি না তখন বৃষ্টিতে হাত বাড়িয়ে রাখবি। এক সময় দেখবি বৃষ্টির জল তোর মন পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে।'

তারপর আমরা দুজনে বারান্দা থেকে হাত বের করে জল ধরতে লাগলাম। মনে আছে? হি হি।

বারিধারা দেখেছিস এতদিন পরেও তোর কথা কেমন সব মনে রেখেছি? একেবারে ডায়লগ টু ডায়লগ বলে যাচ্ছি। তুই নিশ্চয় অবাক হচ্ছিস। ভাবছিস, গাধা মেয়েটার মেমরি এত শার্প! আসলে কী জানিস বারিধারা, যা মনে থাকবার তা নিজেই থেকে যায়। মন বাকি সব ফেলে দেয়।

বারিধারা, তোর চেনা তিথি একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। সেই গল্প বলতেই আজ তোকে এই চিঠি লেখা।

বিয়ের পর গোলমাল হয়ে গেল। সেই গোলমালের কথা কাউকে বলতেও পারি না। আমার তো বন্ধু নেই। ছোটবেলায় তেমন করে কারও সঙ্গে মিশতে পারিনি। বড় হয়েও নয়। সত্যি কথা বলতে কী, তুই ছাড়া ইউনিভার্সিটিতে কারও সঙ্গে তেমন করে মিশিনি। অথচ তোকেই কেমন অপমানের মধ্যে ফেলেছি।

boierpathshala.blogspot.com

ইউনিভার্সিটির বখাটে ছেলে যেদিন আমাকে নোংরা কথা বলল, সেদিন তুই এগিয়ে গিয়েছিলি। আমি ভয়ে পালিয়ে গেলাম। পালিয়ে শুধু যাইনি, তোকে মিথ্যেবাদীও বলে এসেছি। এরপরে কোন লজ্জায় তোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি বল তো? আমি ডুব মেরেছিলাম। ভালো করেছিলাম না? শুধু আমার অন্যায়টা দেখবি, আমার লজ্জাটা দেখবি না? লজ্জাটাও তো একটা শাস্তি। নিজের একমাত্র ভালোবাসার বন্ধুর থেকে নিজেকে সরিয়ে শাস্তি দিয়েছি।

বারিধারা, তুই আবার ভাবতে বসিস না, আজ বৃষ্টি বলে আমি ইমোশনাল হয়ে তোর কাছে ক্ষমা চাইতে বসেছি। মোটেই নয় বস। কোথায় যেন শুনেছিলাম, আকাশ মেঘলা থাকলে মানুষের অনুভূতিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ সব কবিদের হয়, আমার মতো হাবিজাবিদের হয় না। আমি সেদিন যা করেছিলাম, ঠিকই করেছিলাম বারিধারা। আমার মতো ভিতু, স্বার্থপর মানুষের (নাকি অমানুষ?) জন্য ওটাই সাজে। আমি মধুজা ম্যাডামের কাছে গিয়ে বলে এসেছিলাম, বারিধারা আমার নামে যা বলেছে সেটা সত্য নয়। দিন, আমি লিখে দিচ্ছি কেউ আমাকে অপমান করেনি। মধুজা রায় আমাকে ডেকে পাঠালে সেদিন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, একটা ছেলে আমার সঙ্গে নোংরা ব্যবহার করেছে, এটা জানাজানি হয়ে গেলে সর্বনাশ। বিয়ে ভেঙে যাবে। আমার বাড়ি থেকে ইউনিভার্সিটি যাওয়া বন্ধ করে দেবে। একবারও তোর সাহস, তোর প্রতিবাদের কথা মাথায় আসেনি। আমার মতো মেয়ের জন্য এটাই স্বাভাবিক। তাই না? তোর কাছে ক্ষমা চাইতে যাব কোন দু:খে? হি হি।

তা হলে এতদিন টেলিফোন করিনি কেন? না, সবটা লজ্জায় নয়। তুই শুনে খুশি হবি, আমার পুরোনো মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বাজেয়াপ্ত শুনে হাসছিস? হি হি। দেখ, আমিও হাসছি। ঘটনা কিন্তু সত্যি। বিয়ের পর যখন এ বাড়িতে এলাম, তার কিছুদিনের মধ্যে আমার বর বাবাজীবন বলল, 'তি, তুমি তোমার মোবাইল ফোনটা আমার কাছে রেখে দাও।'

আমার বর বিয়ের পরদিন থেকেই আমাকে 'তি' ডাকে। আদরের ডাক। একদিনের আলাপে এত আদর ভাবা যায় না। আমিও ভাবতে পারিনি। আনন্দে পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হল আমার। দ্রুত সেই পাগলামি কাটল। আদরের ভিতরে অন্ধকারটা দেখতে পেলাম। শৌর্য, আমার বরের নাম, সুন্দর নাম না? যখন সম্বন্ধ এসেছিল, তখন কতদিন একা একা রাতে ফিসফিস করে বলতাম, 'শৌর্য, শৌর্য, শৌর্য...।' হি হি।

বারিধারা, আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। তোর ওখানে কি বৃষ্টি পড়ছে? এই চিঠি তোকে কীভাবে পাঠাব? আমি তো তোর ঠিকানা জানি না। আচ্ছা, একটা কাজ করব, ইউনিভার্সিটি গিয়ে ডিপার্টমেন্টে রেখে আসব। আর যদি বলিস চিঠি নিয়ে সটান তোর বাড়ি চলে যেতে পারি। এই রে তোর বাড়িও যে চিনি না। ইস কেমন পাগলের মতো বকছি। হি হি। আমি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।

শৌর্যরা ধনী। পারিবারিক ব্যবসা। যখন বিয়ের কথা বলতে তার বাবা-মা-বোনেরা আমাদের বাড়ি এসেছিল, তখন মনে হয়েছিল যেমন অভিজাত, তেমন সম্ভ্রান্ত। সবাই নীচু গলায় কথা বলে। অল্প হাসে। শিক্ষিত তো। ওরা চলে যাওয়ার পর বাবা বলেছিল, 'টাকা-পয়সাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল মানুষগুলো বড্ড ভদ্রলোক।'

সেই 'ভদ্রলোক' বুঝতে, চিনতে পারলাম অতি অল্প সময়ে। শৌর্য যখন আমার মোবাইল ফোন চাইল আমি অবাক হলাম।

'আমার ফোন দেব কেন?'

শৌর্য বলল, 'দেবে কারণ এখন আর তুমি আলাদা কেউ নয়। তুমি আর আমি এক। এবার তোমাকে একার জিনিস বাদ দিতে হবে। আমি তোমাকে নতুন ফোন দেব। দামি ফোন। সেখানে আমাকে জিগ্যেস করে তুমি নম্বর লিখে দেবে।'

আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম, 'এখানে যে আমার অনেক নম্বর আছে। পুরোনো নম্বর।'

boierpathshala.blogspot.com

শৌর্য আবার হাসল। জানিস বারিধারা, আমার বর সুপুরুষ। তার হাসিও সুন্দর! সেই সুন্দর হাসি হেসে বলল, 'পুরোনো ঘরবাড়ি ছেড়েছ, পুরোনো পরিচিতও ছাড়বে। এখন থেকে আমার পরিচিতরাই তোমার পরিচিত হবে তি।'

আমি প্রায় কেঁদেই ফেললাম। বললাম, 'কিছুতেই না।'

শৌর্য এবার কঠিন গলায় চাপা ধমক দিয়ে বলল, 'আমি কোনও কথা দু'বার বলা পছন্দ করি না। আমি চাই না তুমি এমন কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখো যাকে আমি চিনি না। ফোন আমার কাছে দাও।'

জানিস বারিধারা, আমি সেদিনই বুঝেছিলাম। আমার বিয়ে খুব ভুল জায়গায় হল। এরপর শৌর্যর গোটা বাড়ি আমার পায়ে একটার পর একটা শিকল পরাতে লাগল। আমার লেখাপড়া বন্ধ করল। আমার বাড়ি থেকে বেরনো বন্ধ করল। আমার নিজের পছন্দ, ভালো লাগে এমন সব বন্ধ করল। বাপের বাড়িতে যেতে হলে অনুমতি লাগে। মাকে ফোন করতে হলে অনুমতি লাগে। নিজের মনের মতো একটা জিনিস কিনতে অনুমতি লাগে। এমনকী নিজের পছন্দ মতো সাজগোজ করতেও পারি না। কখনও বর চোখ পাকায়, কখনও শাশুড়ি-ননদ, এমনকী শ্বশুরমশাই পর্যন্ত।

মেয়েরা এখন আকাশে উড়তে পারে। কেউ অলিম্পিকে আকাশে ভল্ট দিচ্ছে, কেউ মহাকাশযানে চেপে মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেয়, কেউ যুদ্ধ বিমানের পাইলট। অথচ আমি একটা মেয়ে হয়ে পাঁকে গড়াগড়ি খাচ্ছি। মেয়েতে মেয়েতে কত তফাত! আমার ঘটনা শুনতে কেমন লাগছে বারিধারা? পচা মেগা সিরিয়ালের মতো না? হি হি। আমারও তাই মনে হতে লাগল। ভাবতে লাগলাম সিরিয়াল একদিন শেষ হবে। আমিও একদিন আকাশে উড়ব।

শেষ হল না। মিথ্যে জিনিস শেষ হয়, সত্য শেষ হয় না। এতদিন যে জিনিস সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না, এবার বুঝতে পারলাম তার দাম কত বেশি। তা হল নিজের স্বাধীনতা, নিজের অধিকার, নিজের মতামত। লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। শাশুড়ি বুঝতে পারলে তেড়ে আসত। জানিস, বারিধারা, বই নিয়ে বসলেও শৌর্য রেগে যেত। ধমক দিয়ে বলত, 'বাড়ির বউ হয়েছ। বউ পড়ে সময় নষ্ট করো কেন?' ভিতু আমি, শান্ত আমি বই বন্ধ করে রাখতাম। নিজেকে বন্দি করেই রাখতে শিখলাম। শৌর্য কিন্তু ভদ্র সভ্য। মদ, মেয়েমানুষ, বাইরের নেশা—কোনও দোষ নেই। ব্যবসার কাজ মন দিয়ে করে। বাড়ি ফিরে এসে আমাকেই শুধু চায়। নিয়মমতো বরের চাওয়া সুখের হওয়ার কথা, শৌর্যর চাওয়া ভয়ঙ্কর। একেক সময় মনে হয় পারভার্ট। বিকৃত। ইচ্ছে না থাকলেও কাপড় খুলে তার কাছে যেতে হবে। উদোম করে যত না ভোগ করে তার বেশি অপমান করে, যন্ত্রণা দেয়। এ কথা কাকে বলব? কে শুনবে? স্বামী স্ত্রীর শরীর কীভাবে ভোগ করবে সে তো তার অধিকার। আদরে সোহাগে না মেরে ধরে, আঁচড়ে, কামড়ে সে বুঝবে। তুমি বলবার কে হে? ভাবতাম পালিয়ে যাব। সাহসে কুলোয়নি। সবাই কী বলবে? সমাজ কী বলবে? মা বুঝতে পেরে বলত 'মানিয়ে নে।' বাবা বলত, 'একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বারিধারা আজ মনে হয় বৃষ্টি থামবে না। বেশ হয় না থামলে। সব ভেসে যাক। আমার ঘ্যানঘ্যানানি কেমন লাগছে? দাঁড়া, আর একটু বাকি আছে।

কাল একটা কাণ্ড করেছি। তুই বিশ্বাসই করবি না। সত্যি কথা বলতে কী, সেই ঘটনা জানাতেই আমার এই লম্বা চিঠি। কাল রাতে তখন খুব বৃষ্টি নেমেছে। আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম। শৌর্য ঘরে এসে নরম গলায় বলল, 'তি, কী করছ?' আমি চুপ করে রইলাম। শৌর্য খাটে বসে বলল, 'তি, চলে এসো।' আমি চুপ করে রইলাম। শৌর্য এবার অধৈর্য হয়ে উঠল। আমি জানলা দিয়ে অন্ধকারে বৃষ্টি দেখতে লাগলাম। কী ভালো যে লাগছিল বারিধারা, তোকে কী বলব! শৌর্য এবার উঠে এসে আমার পিছনে দাঁড়াল। কড়া গলায় বলল, 'এতবার ডাকছি শুনতে পারছ না?'

আমি অস্ফুটে বললাম, 'না। পাচ্ছি না।'

boierpathshala.blogspot.com

শৌর্য আমার হাত ধরে তার দিকে ফেরাতে চেষ্টা করল। চোখ মটকে বিশ্রী হেসে বলল, 'এসো, কাপড় খুলে তোমার সুন্দর বুক দুটো দেখি।'

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং ডান হাত তুলে শৌর্যর গালে সপাটে চড় মারলাম।

বারিধারা, সেদিন ইউনিভার্সিটিতে যা পারিনি, কাল সে কাজ পারলাম। সাহসী হতে অনেকটা সময় লাগল ঠিকই। তা লাগুক। সবারই সময় লাগে। মানুষ তো কোন ছাড়, পাখির ছানারও আকাশে উড়তে সময় লাগে। যাই হোক, আজ সকাল থেকে আমার বড় আমার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাচ্ছে। তোর কি মনে হয়, ওর মা-বাবাকে নালিশ করেছে? করলে ভালো হয়। ওরাও আমাকে ভয় পাবে। যদি চড় মেরে দিই। হি হি।

যাক, এই হল আমার গল্প। এই গল্প তোকে না জানালে অন্যায় হত না?

এখন বল, এই চিঠি তোকে কেমন করে পাঠাব?

ইতি তোর ভিতু তিথি। হি হি।

চৌষট্টি

ঋষা অফিসে বসে আছে। তার চোখ মুখ থমথম করছে। কিছুদিন হল ঋষা এই চাকরিটা করছে। খুব বড় কিছু নয়, আবার একেবারে ছোটও নয়। একটা এনজিও অফিসে কাজ। কৃষ্ণকলি এই কাজটা তাকে জোগাড় করে দিয়েছে।

'বাড়িতে বসে না থেকে কাজটা কর না।'

ঋষা বলেছিল, 'দুর, আমার চাকরিবাকরি করতে ভালো লাগে না।'

কৃষ্ণকলি মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, 'কেন? তুই কোন রাজনন্দিনী যে চাকরি করতে ভালো লাগে না? নাকি বাপের রাজত্ব আছে? খাজনার টাকায় খাস?'

ঋষা আড়মোড়া ভেঙে বলেছিল, 'এই তো সবে ইউনিভার্সিটির পাট চুকোলাম। এখন ক'টা দিন বিশ্রাম নিই।'

কৃষ্ণকলি রাগ করা গলায় বলল, 'বিশ্রাম নিই বলছিস কেন? বল, ঘরে বসে, লিটল ম্যাগাজিন নামক একটা অখাদ্য জিনিসের পিছনে সময় নষ্ট করি। হাবিজাবি কিছু কবিতা লিখি। তাই তো?'

ঋষা খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বন্ধুর দিকে মিটিমিটি হেসেছিল। বলেছিল, 'কবিতার ওপর তোর এত রাগ কেন কৃষ্ণ? লিখতে পারিস না বলে?'

কৃষ্ণকলি ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'বয়ে গেছে আমার! কবিতা বাঙালি জাতিটাকে ভোগে পাঠিয়েছে। কবিতা লেখা মানে কাজ না করবার ধান্দা। একটা অলস জাতি তৈরি হয়েছে। সবার পিছনে পড়ে আছে।'

ঋষা আরও মিটিমিটি হেসে বলল, 'তাহলে বলছিস রবীন্দ্রনাথ না জন্মালে বাঙালির মঙ্গল হত?'

কৃষ্ণকলি এবার তেড়েফুড়ে উঠে বলল, 'মাঝে মাঝে তো তাই মনে হয়। সবাই নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ভাবে। বানান ঠিক করে দু-ছত্র লিখতে পারে না এদিকে রবীন্দ্রনাথের মতো দাড়ি রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মারতে হয় ঠাঁটিয়ে চড়।'

ঋষা বালিশ আকঁড়ে ধরে বলে, 'আহা, ভালো-মন্দ যাই হোক, কবিতা লিখছে তো। চুরি তো করছে না।' কৃষ্ণকলি ভেংচি কেটে বলে, 'আহা রে ধন্য করছে। কাজকর্ম না করে উনি কবিতা লিখছেন। লক্ষ লক্ষ ম্যান পাওয়ার নষ্ট। সারা দুনিয়ার অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য কাজ করব। আর এখানে দেখ, কী করো? না কবিতা লিখি।'

ঋষা এবার চিৎ হল। বলল, 'তাহলে বলছিস কবিতা নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত? কবিতা লিখলেই ধরে ধরে জেলে পোরা ভালো?'

boierpathshala.blogspot.com

কৃষ্ণকলি জোরের সঙ্গে বলল, 'অবশ্যই। বাঙালির এই অসুখ ছাড়াবার জন্য গভর্মেন্টের কড়া স্টেপ নেওয়া দরকার। কবিগুলোকে ধরে তিনটে করে কবিতা লিখতে দেওয়া হোক। পরীক্ষা করে দেখা হবে সেগুলো। কবিতা হয়েছে কিনা। ফেল করলেই পাথর ভাঙতে পাঠিয়ে দাও। কবিগিরি ছুটে যাবে।'

ঋষা হাসতে হাসতে উঠে বসল। বলল, 'ভাগ্যিস কৃষ্ণ তুই গভর্মেন্টের কেউ নোস। তাহলে কবিদের বিরাট ঝামেলা হত।'

কৃষ্ণকলি দাঁতে দাঁতে ঘষে বলল, 'আমি এমনিই ঝামেলা করে ছাড়ব। আমাকে গভমেন্টের কেউ হতে হবে না। এখন যেমন তোর সঙ্গে ঝামেলা করব। তোকে কাজে পাঠাব।'

ঋষা বলল, 'কী কাজ?'

কৃষ্ণকলি বলল, 'একটা এন জি ও। ভালো ছেলেমেয়ে খুঁজছে। আমার এক দিদি ওখানে আছে। আমাকে বলল, দেখ না, সিরিয়াস, বুদ্ধিমতী যদি কাউকে পাস।'

ঋষা বলল, 'রক্ষে কর। এনজিও মানে ঘুরে ঘুরে জনসেবা তো? আমি নেই।'

কৃষ্ণকলি বলল, 'ঘুরে ঘুরে নয়। অফিসে বসতে হবে। এরা খুব ভালো কাজ করে। খুব বেশি টাকা হয় তো দেবে না, আবার একেবারে খারাপও নয়। তোর এই পিজি খরচ অনায়াসে উঠে যাবে।'

ঋষা বলল, 'কাজটা তুই নিচ্ছিস না কেন?'

কৃষ্ণকলি বলল, 'গাধার মতো কথা বলছিস কেন? কবিতা লিখে লিখে বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে গেছে দেখছি। আমার ফাইনাল ইয়ার চলছে না? তুই কি বলছিস সে সব ছেড়ে চাকরি করব?'

ঋষা তারপর দুটো দিন ভেবেছে। তার ইচ্ছে আছে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পর নেটের জন্য প্রিপারেশন শুরু করবে। রিসার্চও করবে। সে কলেজে পড়াতে চায়। তার জন্য অনেকটা সময় লাগবে। তার আগে এন জি ও-র কাজটা কদিন করে দেখলে ক্ষতি কী? হাতে কিছু টাকা পয়সা পেলে ভালোই হয়। অর্চিনকে সাহায্য করা যাবে। ওর মায়ের কেস চালানোর টাকা পয়সা অবশ্য সব সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস দিচ্ছে। কিন্তু অর্চিনের নিজের জন্যও তো টাকা পয়সা দরকার। যদিও অর্চিন তার উপার্জনের টাকা নেবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তা থাক। জোর করতে হবে। নিজে উপার্জন না করলে জোরও তো করা যায় না। অবশ্য অর্চিন সুন্দরবনে একটা ছোটখাটো কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। ওখানকার একটা কো-অপারেটিভে হিসেব দেখে। মাছের কো-অপারেটিভ। পাকা কাজ নয়। সপ্তাহে তিনদিন যেতে হয়। ওরা অর্চিনের বিষয় তেমন কিছুই জানেন না।

কৃষ্ণকলি ওর দিদির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। ঋষা অফিসে গিয়ে দেখল, সত্যি কাজটা ভালো। এন জি ও-র নাম 'উওম্যান হেলথ'। গ্রামে গ্রামে ঘুরে গরিব মেয়েদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে। এর জন্য এদের বড় টিম আছে। তারা যে তথ্য পায় সেগুলো অফিসে এনে রিপোর্ট তৈরি হয়। রিপোর্ট পাঠানো হয় হু, ইউনেসকো ধরনের বড় বড় সংগঠনে। এই সব সংগঠন সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য টাকা অনুমোদন করে। কিন্তু কোন প্রকল্পে, কাকে টাকা পাঠানো হবে তার জন্য আগে ভালো করে খোঁজ খবর নেয়। শুধু সরকারের পাঠানো তথ্যের ওপর নির্ভর করে না। তথ্য অনেক সময়ই অসম্পূর্ণ, পক্ষপাতদুষ্ট, জল মেশানো হয়। তাই হু, ইউনেসকো বহু এন জিও-র সঙ্গে ব্যবস্থা করেছে। তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেয়। 'উওম্যান হেলথ' তেমনই একটা এন জি ও। ঋষার কাজ হল, ডেটা থেকে রিপোর্টের একটা অংশ তৈরি করে দেওয়া। সাতদিন কাজ করেই ঋষার সামনে একটা অন্য জগৎ খুলে গেল। সেই জগৎ যথেষ্ট দু:খের। গ্রামগঞ্জের মেয়েরা শারীরিক ভাবে যে কত ধরনের সমস্যার মধ্যে আছে তার কোনও শেষ নেই! অপুষ্টি একটা গভীর সমস্যা। এর সঙ্গে তো মা হওয়ার সময়কার সমস্যা, বিভিন্ন অসুখে চিকিৎসা না পাবার সমস্যা, রক্তাল্পতার সমস্যা তো রয়েছেই। ঋষার যেমন দু:খ হল, তেমন কাজ করবার জন্য মনে জোরও পেল। মনে হতে লাগল, এই কাজটা আর পাঁচটা চাকরির মতো শুধু উপার্জন নন, তার ওপরেও আরও কিছু আছে।

boierpathshala.blogspot.com

ঋষার কাজের উৎসাহে সবথেকে খুশি কৃষ্ণকলি।

'শালা, আমার ওপর কৃতজ্ঞ থাকবি। মনে রাখবি, আমার মতো একজন পিজি পার্টনার পেয়েছিলি। আমিই না তোকে জোর জবরদস্তি করে ওখানে পাঠালাম। শালা, মুঝে ইয়াদ রাখোগি।'

ঋষা হেসে বলল, 'শালা নয়, শালী বল। প্রথম মাসের মাইনে পেলে কী নিবি বল? কবিতার বই দেব?'

কৃষ্ণকলি বলল, 'কবিতার বই! মারব একটা চড়। কবিতা তুমি মাথায় তুলে রাখো। আমাকে রেস্তোরাঁয় খাওয়াবি।'

ঋষা হেসে বলল, 'সে না হয় খাওয়াব। কিন্তু কবিতার বই তোকে আমি দেবই দেব।'

এরপর কৃষ্ণকলি এগিয়ে এসে পিছন থেকে ঋষাকে জড়িয়ে ধরে। কানের কাছে মুখ নিয়ে হাসি হাসি মুখে বলে, 'এই একটা মজার কাণ্ড হয়েছে। আমার মনে হয় প্রেম হয়েছে।'

ঋষা নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'হতেই পারে। তোর প্রেম হওয়াটা নতুন কিছু নয়। এটা কত নম্বর হল?'

কৃষ্ণকলি বান্ধবীকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'কেন, হিংসে হচ্ছে? আমি কি তোমার মতো ননী যে একজনকেই পেয়ে গলে যাব? ওগো আমার প্রাণসখা গো বলে যাত্রা দলের সখী হয়ে থাকব?'

ঋষা মুচকি হেসে বলল, 'আহা, রাগ করছিস কেন? আমি তো খারাপ কিছু বলিনি, শুধু বলছি এটা তোর কত নম্বর প্রেম? আমি যতদিন দেখছি, তাতে হিসেব করলে মিনিয়াম এগারো বা বারো হবে। হবে না? নাকি আর দু-একটা বেশি?'

কথা শেষ করে খিলখিল করে হেসে উঠল ঋষা। কৃষ্ণকলি বলল, 'বারো হোক, একশো বারো হোক, তোর কী?'

ঋষা সিরিয়াস হবার ভান করে বলল, 'আমার কিছু নয়। আচ্ছা, বলো এবারের প্রেমিকটি কে শুনি। তুই ডায়েরিতে লিখে রাখিস তো কৃষ্ণ? নইলে গুলিয়ে যাবে।'

ঋষা এবার আরও জোরে হেসে উঠল।

কৃষ্ণকলি বলল, 'যা বলব না।'

ঋষা কৃষ্ণকলিকে চেপে ধরে বলল, 'আহা ননীর বন্ধু ফণী, রাগ করে না বাবু। নামটা শুনেই ফেলি।'

কৃষ্ণকলির চোখ বড় করে বলল, 'নামটা আসল কথা নয়। ছেলে কী করে শুনলে চমকে যাবি ঋষা। সেন্সও হারাতে পারিস।'

ঋষা বলল, 'সে কী রে! বল, বল। শুনে ধড়াস করে অজ্ঞান হয়ে পড়ি।'

কৃষ্ণকলি চোখ নাচিয়ে বলল, 'এই ছেলে কবিতা লেখে। শুধু কবিতা লেখে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো দাড়িও আছে।'

ঋষা সত্যি সত্যি চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল।

'ঠাট্টা করছিস?'

কৃষ্ণকলি বলল, 'ঠাট্টা না। ছেলের একটা বইও আছে। কবিতার বই। বইয়ের নাম...বইয়ের নাম...বইয়ের নাম...যা : নামটা ভুলে গেলাম।'

ঋষা বলল, 'আর ইউ সিরিয়াস? নাকি বাকি প্রেমগুলোর মতো এটাও খুব তাড়াতাড়ি গণ কেস হবে?'

কৃষ্ণকলি নাটুকে কায়দায় বলল, 'ভবিষ্যতে কী হবে তা জানি না বৎস্য। তবে এখন তো ঘটনা সিরিয়াসই মনে হচ্ছে।'

ঋষা নিজের বুকে হাত রেখে বলল, 'কেমন ধড়াস ধড়াস করছে। সাসপেন্সে না রেখে এবার সবটা বলে ফেল। সত্যি সত্যি কিন্তু সেন্স হারাব। এমন একজন কবিতাবিরোধী কন্যার সঙ্গে কবির প্রেম!'

ঘটনা গুছিয়ে বলল কৃষ্ণকলি।

ক'দিন আগে কলেজ স্ট্রিটে অটো ধরবে বলে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কথা কাটাকাটি শুনে পিছনে ফিরে দেখে পাঞ্জাবি পরা, দাঁড়ি গোঁফওয়ালা এক যুবক এক ট্যাক্সিওয়ালাকে শান্ত ভাবে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে।

boierpathshala.blogspot.com

ট্যাক্সি ড্রাইভার দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে এসেছে। হাত-পা ছুড়ে ছেলেটির দিকে তেড়ে যাচ্ছে। পথের ঝগড়ায় মন দেওয়ার মতো সময় কৃষ্ণকলির ছিল না। সে দেয়ওনি। হঠাৎই ট্যাক্সি চালকের চিৎকার কানে এলও।

'আরে ভাই, কবিতার বই নিয়ে আমি কী করব? গিলব? তোমার কবিতা দিয়ে আমার গাড়ি চলবে? যদি চলে, দাও পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তেলের ট্যাঙ্কে ফেলে দিই।'

কোনও ট্যাক্সিচালকের মুখে এই ডায়লগ যে কারোরই জন্যই ইন্টারেস্টিং। সে ঝগড়ার সময়েই হোক, ভাব ভালোবাসার সময়েই হোক। কৃষ্ণকলি এগিয়ে যায় এবং ঘটনা জানতে পারে।

এই ছেলে ট্যাক্সি করে বরানগর থেকে কলেজস্ট্রিটে এসেছে। নামবার সময় জানতে পারে, সে মানিব্যাগটি আনতে ভুলে গেছে। কাঁধের ঝোলা ঝেড়ে ঘেঁটে একটা পয়সাও পায় না। পায় নিজের লেখা কবিতার বই। বাধ্য হয়ে ভাড়ার বদলে সে তার কবিতার বইটি ট্যাক্সি চালককে দিতে চাইছে।

কৃষ্ণকলির একই সঙ্গে মজা লাগে এবং যুবকটির প্রতি মায়া হয়। কৃষ্ণকলিকে এগিয়ে আসতে দেখে ট্যাক্সিচালক আরও বীরবিক্রমে চেঁচামিচি শুরু করে। ছেলেটি লজ্জিত হয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে। তার লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছিল সত্যি সে টাকা পয়সা নিয়ে বেরোতে ভুলে গেছে।

কৃষ্ণকলি ড্রাইভারকে কড়া গলায় বলে, 'থামুন। অনেক হয়েছে। আমি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। কত হয়েছে বলুন।'

অচেনা যুবকটি এতটাই অবাক হয় যে কী করবে কী বলবে বুঝতে পারে না। কৃষ্ণকলি ভাড়া মিটিয়ে দিলে ট্যাক্সিচালক গজগজ করতে করতে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। কৃষ্ণকলি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'যান। এরপর থেকে মানিব্যাগ সঙ্গে রাখবেন। শুধু কবিতা নিয়ে কলকাতার পথে বেরোনোও যায় না। কলকাতা অত কবিতাপ্রেমী নয়। পথে টাকা পয়সাও লাগে।'

ছেলেটি গদগদ গলায় বলে, 'আমি যে কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব...আমি লোকটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না...যদি কিছু মনে না করেন, এই বইটা কি আপনাকে দিতে পারি ম্যাডাম?'

কৃষ্ণকলি আর পারেনি। হেসে ফেলে। বলে 'আচ্ছা দিন।'

প্রেমের পিছনে এটাই ঘটনা।

ঋষা চোখ কপালে তুলে বলে, 'এ তো কবিতার মতো রোমাঞ্চকর! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। ছেলের নাম কী?'

কৃষ্ণকলি হাসিমুখে চুকচুক আওয়াজ করে বলল, 'এখন বলব না। যেদিন আমাকে খাওয়াবি সেদিন কবিকেও নিয়ে আসব। আলাপ করিয়ে দেব। হাঁদাটা ছেলে ভালো। দেখবি, তোকেও বই দেবে।'

ঋষা বান্ধবীর গাল টিপে বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

ঋষা অফিসে কামাই করে না। আজ বৃষ্টির মধ্যেও এসেছে। কয়েকজনের ডেটা নিয়ে আসবার কথা। অনেক দূর দূর থেকে আসে। তাকে না পেলে ফিরে যেতে হবে। তবে আজ এসেছিল মাত্র একজন। ঋষাকে কাজ বুঝিয়ে, কথা বলে চলে গেছে। তারপরই চোখমুখ থমথমে করে ঋষা বসে আছে। তার কান্না পাচ্ছে। সে শক্ত মেয়ে বলে কাঁদতে পারছে না। টেবিলে ফেলে রাখা মোবাইল ফোনটা নিতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিল।

পঁয়ষট্টি

ঋষা ডান হাত দিয়ে কপালের দুটো রগ চেপে বসে আছে। তার মাথা নামানো।

একটু আগে যে মেয়েটি ঋষার অফিসে এসেছিল তার নাম বকুল। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। গায়ের রং মাজা, মুখে এক ধরনের শ্রী আছে। সব মিলিয়ে দেখতে মিষ্টি। বকুল অফিসে যখন ঢুকল, বৃষ্টি তখন খানিকটা ধরেছে। দরজার পাশে ভেজা ছাতা রেখে ঋষার টেবিলের সামনে এসে বসল।

boierpathshala.blogspot.com

ঋষা মেয়েটিকে চেনে। আগেও দু-একবার অফিসে এসেছে। বকুল এসেছে সুন্দরবন থেকে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও অত দূর থেকে এসেছে দেখে ঋষার ভালো লাগল। গ্রামে ঘুরে ঘুরে ডেটা কালেকশনের জন্য ক'টা টাকাই বা পায় কিন্তু কাজের ব্যাপারে এরা বেশির ভাগই রেসপন্সিবল। কাজটাকে শুধু উপার্জন হিসেবে দেখে না। এন জি ও-তে নানারকম গোলমাল থাকলেও এটা একটা ভালো দিক। যারা যুক্ত, তাদের মধ্যে এক ধরনের আবেগ থাকে।

ঋষা বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজেছেন?'

বকুল শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথার আর হাতের জল মুছতে মুছতে হাসল। বলল, 'না, তেমন নয়। বাস স্টপে দাঁড়িয়েছিলাম। জলটা ধরতে এলাম।'

ঋষা বলল, 'আপনি বরং ওয়াশরুমে যান। ওখানে টাওয়াল আছে। মাথাটা মুছে আসুন। ঠান্ডা লেগে যাবে।'

বকুল বলল, 'লাগবে না। এই তো মুছে ফেলেছি। বসি?'

ঋষা বলল, 'অবশ্যই। বসুন। আপনি কি সোজা বাসন্তী থেকে আসছেন?'

বকুল বলল, 'না, বাসন্তী থেকে এসেছি কাল বিকেলে। সন্তোষপুরে মাসির বাড়ি ছিলাম।'

ঋষা বলল, 'তাও বাঁচোয়া। আজ যা অবস্থা।'

বকুল চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ব্যাগ রাখল। ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করতে করতে বলল, 'এ হপ্তায় কাজ বেশি পারিনি দিদি। শরীরটা ভালো ছিল না। একটা মাত্র গ্রাম ঘুরেছি। তারপর তো কাল থেকে বৃষ্টি নামল।'

ঋষা বলল, 'আজ না এলেই তো পারতেন। এত বৃষ্টি হচ্ছে।'

'ভেবেছিলাম আসব না। তারপর ভাবলাম সন্তোষপুর পর্যন্ত যখন এসেছি, তখন যেটুকু কাজ হয়েছে দিয়ে যাই। মাসিও বলল, আজ যাস না। আমি বললাম, না, আবার কবে আসতে পারব, তার তো ঠিক নেই।'

ঋষা বলল, 'ঠিক আছে দিন।'

আফিসে বাপু আছে। বাপু এখানে হোলটাইমার। পিওন কাম দারোয়ান। আবার ক্যান্টিনও চালায়। আজ বাকি স্টাফরা আসেনি। ঋষা বাপুকে চা বানাতে বলল।

বকুল কাগজপত্র এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই গ্রামটায় অদ্ভুত একটা ব্যাপার হয়েছে দিদি।'

'অদ্ভুত ব্যাপার!'

বকুল বলল, 'একটা সময় এখানে মেয়েদের হেলথ প্রবলেম অ্যাকিউট ছিল। নিউট্রিশনের অভাব ছিল খুব। মেয়েদের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনও গুরুত্বই ছিল না। নিজেরাও দিত না। যারা মাঠে, নদীতে কাজ করতে যেত তারা মুড়ি খেয়ে দিনের খিদে মেটাত। কোনও কোনও দিন একবেলা খেয়েই কাটত। বাড়ির কেউ খোঁজখবরও নিত না মেয়েটা কী খেল, আদৌ খেল কি না। এই নেগলিজেন্স একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। বংশ পরম্পরায় চলত। মেয়েরা বাইরে থেকে খেটে বাড়ি ফিরে আগে স্বামীর জন্য রান্না করতে বসত। সেই সঙ্গে ছিল ইনফেকশনের সমস্যা। অপরিচ্ছন্নতার কারণে নানারকম ইনফেকশন হত। পেটের অসুখ তো ঘরে ঘরে। পচা খাবারও খুব চলত। কেউ প্রাণে ধরে বাসি খাবার ফেলত না। গরিব মানুষ ফেলবেই বা কী করে? আর তার এফেক্ট পড়ত শরীরে।'

ঋষা মুখে 'চুক চুক' করে আফশোসের আওয়াজ করল। বলল, 'ছি ছি। এটুকু সতেচন করা যায়নি। আপনি রিপোর্টে সব লিখেছেন তো? এগুলো ডিটেইলসে থাকা দরকার। আমি রিপোর্টে নোট দেব। শুধু কতজনের শরীরে ভিটামিনের অভাব, আর বি সি কম, এ সব লিখলে চলবে না। সচেতনতার অভাবটাও বলতে হবে।'

বকুল হেসে বলল, 'মজার ব্যাপার কী জানেন দিদি, গত কয়েক মাসে এই সমস্যা কিছু কিছু করে কমছে। মেয়েরা নিজেদের খাবারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শিখেছে। নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, ঘরদোর পরিষ্কার

boierpathshala.blogspot.com

রাখতে শিখছে। বাসি পচা খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে যে লোকসান বেশি বুঝতে পারছে। যতটা পারছে অ্যাভয়েড করছে।'

বাপু চা টেবিলে এনে রাখল। সঙ্গে প্লেটে ক'টা বিস্কুট। ঋষা বলল, 'নিন আগে চা খেয়ে নিন।'

বকুল চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিয়ে বলল, 'আমি তো এই গল্প শুনে অবাক। দুম করে হেলথ কনসাস হয়ে গেল। তাও আবার গ্রামের মেয়েরা।'

ঋষা চায়ে চুমুক দিয়ে হেসে বলল, 'সত্যি তো, ব্যাপার কী? কোনও গুরুমশাই গ্রামে গেছে নাকি?'

বকুল চোখ বড় করে বলল, 'ঠিক ধরেছেন দিদি। কী করে বুঝলেন?'

ঋষা বলল, 'গল্পে-সিনেমায় এরকম হয়। বাইরে থেকে কেউ একজন গিয়ে মানুষকে জাগিয়ে তোলে। নিশ্চয় কোনও ডাক্তারবাবু।'

বকুল উত্তর দিল না। মিটিমিটি হাসতে হাসতে চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খেতে লাগল। ঋষা মজা পেলে। মেয়েটা সাপপেন্স তৈরি করছে।

আজ সকাল থেকে অর্চিনের জন্য মন কেমন করছে ঋষার। সত্যি কথা বলতে কী, সেই মন কেমন কাটাতেই জলবৃষ্টিতেও অফিস চলে এসেছে। কৃষ্ণকলি বাড়িতে থাকলেও একটা কথা ছিল। সেও ক'দিনের জন্য নিজের বাড়িতে গেছে। একা একা থাকতে আরও মন খারাপ লাগে। অর্চিন শেষ এসেছিল তিন মাস আগে। কোর্টে তার মায়ের কেসের ডেট ছিল। ঋষাও গিয়েছিল। অর্চিনের মায়ের সঙ্গে দেখা করেছে। কোর্ট লকআপের ভিতর মহিলা বসেছিলেন। ক্লান্ত, অবসন্ন। ঋষা গিয়ে কাছে দাঁড়াল। পুলিশ এখন আর বাধা দেয় না। তবে খুব বেশিক্ষণ কথা বলতে দেয় না। বৈশাখী মলিন হেসে বললেন, 'কেমন আছ ঋষা?'

ঋষার খুব খারাপ লাগছিল। যতবারই মহিলাকে দেখে, ততবারই কান্না পায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ভালো আছি। আপনি ঠিক আছেন তো মাসিমা?'

বৈশাখী বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি।'

ঋষা বললেন, 'শুনলাম জেলে আপনি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করছেন না। এটা করবেন না। আমাদের খারাপ লাগবে।'

বৈশাখী বললেন, 'না করব না। ক'টা দিন শরীরটা ঠিক ছিল না।'

'ওষুধ খাচ্ছেন?'

বৈশাখী মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ খাচ্ছি। জেলের ডাক্তার খুব ভালো। যত্ন করে দেখে। এখন অনেকটা ঠিক আছি।'

বৈশাখী বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। বড় উকিল আপনার হয়ে লড়ছে।'

বৈশাখী এ কথার কোনও উত্তর দিলেন না। নীচু গলায় বললেন, 'তুমি আমার ছেলেটার ওপর খেয়াল রেখো মা। বড্ড একগুঁয়ে। নিজে যা ভালো বোঝে, সেটাই করে।'

ঋষা কী বলবে বুঝতে পারেনি। কোনওবারই বুঝতে পারে না। মাথা নেড়েছে। আর সময় নষ্ট না করে অর্চিনকে কথা বলবার সুযোগ করে দিয়ে সরে আসে।

মামলার অবস্থা ভালো নয়। মহিলা পুলিশের কাছে যেভাবে সব স্বীকার করেছে, তাতে ফাঁকফোকর খুঁজে বের করা কঠিন। তার পক্ষের উকিল অনেকটাই হতাশ। বলেছে, একটাই পথ। কোর্টে বৈশাখীদেবীকে সব অস্বীকার করতে হবে। বলতে হবে, পুলিশ জোর করে তার বয়ান আদায় করেছিল। নিখিলেশ উপাধ্যায় নামের লোকটা সেদিন রেস্টুরেন্টে ডেকে তাকে টোপ দেয়, তারপর ভয় দেখায়। জালিয়াতির কাজটা না নিলে তাকে খুন করবে বলে শাসায়। একটা সময় তার গলা টিপে ধরতে যায়। বৈশাখী তখন বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তাতে যে লোকটা মারা যাবে, বুঝতে পারেনি। এতে শাস্তি অনেকটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গলায় রুমালের ছাপটা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠবে, সেটা অন্য কোনও কায়দায় সামলাতে হবে। একবার যদি আত্মরক্ষার থিওরিটা কোর্টে প্রমাণ করা যায়, তাহলে বাকিটাও করা যাবে। নিজেকে

boierpathshala.blogspot.com

বাঁচাতে একজন মহিলা বন্দুক না রুমাল ব্যবহার করবে, সেটা তার ব্যাপার। সে অত কিছু ভেবে করে না। সেই সময়ও থাকে না। সমস্যা হল অর্চিনের মা রাজি হচ্ছেন না। উকিল অর্চিনকে বোঝাবার দায়িত্ব দিয়েছে। সেদিনও অর্চিন চেষ্টা করে।

আলিপুর কোর্ট থেকে বেরিয়ে ঋষা অর্চিনকে বলেছিল, 'আমার বাড়িতে চল। কিছু খাবি। রেস্ট নিবি।'

অর্চিন মাথা নেড়ে বলল, 'সল্টলেক অনেক দূরে। অতদূর যাব না। ফিরে যাব।'

ঋষা নরম গলায় বলেছিল, 'আজকের দিনটা থেকে যা না অর্চিন। তোকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

অর্চিনকে সত্যি বিধ্বস্ত লাগছিল। বলল, 'না, থাকা যাবে না। কাল সকালে ওখানে প্রোগ্রাম আছে। অনেককে বলা আছে। দূর থেকে আসবে। সুন্দরবনে যাতায়াতটা একটা বড় সমস্যা। এসে ফিরে যেতে হলে সেটা অন্যায় হবে।'

ঋষা বিরক্ত হয়ে বলল, 'প্রোগ্রাম একদিন বাদ দিলে হয় না। দুদিন কলকাতায় থেকে একটু রেস্ট নেওয়া যায় না? তোর কথাই সবসময় ফাইনাল হবে?'

অর্চিন বলল, 'প্রোগ্রাম একদিন কেন, সারা জীবনই বাদ দেওয়া যায় ঋষা। কিন্তু আমি তো তা করব না বলেই ঠিক করেছিলাম। সেই জন্যই তো সব ছেড়েছুড়ে চলে যাওয়া।'

ঋষা মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'আমারও তো কিছু চাওয়ার থাকতে পারে।'

অর্চিন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'খিদে পেয়েছে। চল কোথাও বসে খাই।'

ঋষার খুব ইচ্ছে করল আরও কড়া কিছু বলে। বলে, 'আমি খাব না।'

নিজেকে দ্রুত সামলে নেয়। যে ছেলে নিজের নীতি-আদর্শের জন্য সব ছেড়েছুড়ে গ্রামে গিয়ে পড়ে আছে, যে ছেলে পঁচিশ বছর বয়সে প্রথম তার মায়ের পরিচয় জানতে পায়, যে ছেলে জানে তার মা একজন ক্রিমিনাল, যে ছেলে তার মায়ের ফাঁসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে কড়া কথা বলা অন্যায়। অর্চিন যে এখনও শক্ত হয়ে আছে, এটাই যথেষ্ট। অন্য কেউ হলে দুমড়ে-মুচড়ে যেত।

একটা চিনা রেস্টুরেন্টে বসে সেদিন ঋষা নরম গলায় বলেছিল, 'ল'ইয়ার যা বলছেন, তাতে মাসিমা রাজি?'

অর্চিন খিদে পেয়েছিল বলে খাবার নিলেও ঠিকমতো খাচ্ছিল না। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ঋষা, এই মামলাটা চালানো অর্থহীন।'

ঋষা অবাক হয়ে বলেছিল, 'কেন? অর্থহীন কেন?'

'মা কোনও কিছুতেই রাজি নয়। আজ তুই সরে যাওয়ায় বলল, আমার কোর্টে আসতে ভালো লাগছে না। তুই জজ সাহেবকে বলে দে, আমাকে যেন সাজা দিয়ে দেয়। যা ওনার খুশি। যেমনটা উনি মনে করেন, আমার ভালো লাগছে না।'

ঋষা বলল, ছি, ছি। এ সব কি হতাশার কথা? মাসিমাকে মনের জোর আনতে হবে।'

অর্চিন বলল, 'জোর আনতে বললেই তো হয় না। আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি ঋষা। মাই মাদার লস্ট এভরিথিং। আমাকে বলল, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে এই যথেষ্ট। আর কিছু চাই না খোকা। আমার অশান্তি লাগছে। আমার ভালো লাগছে না। বন্দি জীবনে আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছি। আমিও ভাবছি...।'

একটু থেমে অর্চিন বলল, 'ভাবছি...ভাবছি কেসটা আর চালাব না। মায়ের যখন ইচ্ছে নেই।'

ঋষা বলল, 'অসম্ভব। এতদূর এগিয়ে থেমে যাওয়া যায় নাকি?'

অর্চিন শুকনো হেসে বলেছিল, 'থেমে যাওয়ার বিষয় নয়, বিষয়টা হল মানুষটাকে রিলিফ দেওয়া। ল'ইয়াররা যা-ই বলুন, কিছু করা যাবে না আমি জানি। আমরা সবাই জানি। তা হলে কেন মিছিমিছি আর টানাহেঁচড়া? আমাকে ভেবে দেখতে হবে। মা জেনেছেন, আমি তার পাশে আছি। সন্তান হিসেবে আছি। ব্যস, এটাই আমি চেয়েছিলাম।'

অর্চিন চুপ করে বসে থাকে। ঋষা তাকে বিরক্ত করেনি। বাকি সময়টুকু চুপ করেই ছিল। বাসে ওঠবার আগে গলা নামিয়ে বলে, 'ঋষা, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

boierpathshala.blogspot.com

'কী কথা? এখন বলবি?'

অর্চিন বলে, 'না, এখন নয়। সময় হলে বলব। আজ যাই।'

তিন মাস সে কথা বলা হয়নি অর্চিনের। এই কদিন খুব একটা যোগাযোগও করেনি সে। আজ মন কেমনের মাঝখানে একবার ফোন করেছিল ঋষা। অর্চিনের মোবাইল সুইচ অফ।

বকুল বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন দিদি। গুরুমশাই বটে। তবে ডাক্তার নয়, কলকাতা থেকে গেছে। সেই ছেলেকে নিয়ে গ্রামের লোকদের খুব গর্ব দেখি। দাদা বলতে অজ্ঞান।'

ঋষা অবাক হয়ে বলল, 'দাদা। দাদা কে?'

বুকল হাসিমুখে চোখ বড় করে বলে, 'একটা কম বয়সি ছেলে দিদি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। কথা বলে।'

'কী বলে?'

বকুল বলল, 'অনেক কিছু। বলে শুধু রাজনীতি নয়, মেয়েদের সম্মান দিতে হবে। যত্ন করতে হবে। তারাই পরিবারে আসল মানুষ। তাদের অবহেলা করলে সবার ক্ষতি। মেয়েদের একটা দলও বানিয়েছে। নারী সমিতি না কী যেন। গ্রামের মানুষকে পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতার কথা বলে। কয়েক মাসের মধ্যে ইমপ্রুভ করেছে। শুধু মেয়ে নয়, ছেলেমেয়ে সবার ভালো হয়েছে। কী ক্ষমতা বুঝুন দিদি। বাইরে থেকে কদিন গিয়েই সবাইকে একেবারে বশ করে ফেলেছে।

ঋষাও হাসিমুখে বলল, 'বা:, চমৎকার ছেলে তো। সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। মানুষের বিশ্বাস পেয়েছে। আপনার ওই গ্রামের নাম কী?'

বকুল উজ্জ্বল চোখে বলল, 'দিদি, গ্রামের নাম নোনাজল। আর ওই ছেলের নাম অর্চিন। আমি তো দেখা করতে চেয়েছিলাম। উনি কোথায় যেন মিটিংয়ে গেছেন।

ঋষার মনটা আনন্দে ভরে গেল। সে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। অর্চিনকে সে চেনে এ কথা বলবার দরকার নেই। তা হলে তো অনেক কথা বলতে হয়। বলতে হয়, শুধু চেনে না, এই ছেলেকে সে নিজের থেকেও ভালোবাসে। বলতে হয়, তাদের বিয়ে হবে।

বকুল এবার গলা নামিয়ে বলল, 'শুনলাম ওই ছেলে নোনাজল গ্রামে পাকাপাকি থাকবে। খুব শিগগিরই ওই গ্রামের জামাই হতে চলেছে।'

ঋষার প্রথমটায় মনে হল, ভুল শুনছে। সে ঠান্ডা ভাবে জিগ্যেস করল, 'অর্চিন কী করবে বললেন?'

বকুল উদ্ভাসিত মুখে বলল, 'আপনি ওনাকে চেনেন নাকি দিদি? উনি গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করবেন শুনলাম। নোনাজল গ্রামের। তার সঙ্গে ভাব ভালোবাসা চলছে। সেও তার সঙ্গে কাজ করে। কী যেন নাম বল...কী যেন নাম বলল...ইস, নামটা ভুলে গেলাম...হ্যাঁ, মনে পড়েছে নন্দনা। লেখাপড়ায় ভালো। হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের টিচার। ভালোই হয়েছে। বিয়ে থা দিয়ে এই ছেলেকে গ্রামেই আটকে রাখা উচিত।'

ঋষা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কড়া গলায় বলল, 'বা:, আপনি তো অনেক খোঁজখবর রাখেন দেখছি। এন জি ও-র কাজ করতে গিয়ে একেবারে গ্রাম্য প্রেম-প্রীতি, বিয়ে পর্যন্ত জেনে এসেছেন। দিন কাগজপত্র দিন। অনেক সময় নষ্ট হল।'

'দিদি'র এই হঠাৎ পরিবর্তনে বকুল অবাক হয়। সে খানিকটা থতমত ভাবেই হাতের কাগজ এগিয়ে দেয়।

কাজ বুঝে একই রকম কঠিন গলায় ঋষা বলে, 'আপনি আসুন। দুর্যোগ বাড়ছে।'

কপাল থেকে হাত নামাল ঋষা। বাইরে বৃষ্টির জোর বেড়েছে। তার কান্না পাচ্ছে। সে এখন কী করবে? কাঁদবে? নাকি অর্চিনকে ফোন করে জানতে চাইবে, 'তুমি কি নন্দনা নামের কোনও মেয়েকে ভালোবেসেছ? তাকে তুমি বিয়ে করবে? এই জরুরি কথাই কি তুমি সেদিন আমাকে বলতে চেয়েছিলে অর্চিন?' নাকি সে

boierpathshala.blogspot.com

এখনই নোনাজল গ্রামের উদ্দেশে রওনা হবে? এই ঝড়জল মাথায় করেই রওনা দেবে। সেখানে গিয়ে অর্চিনকে বলবে, 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি ব্যাগ গোছাও। আমি একটা কথাও শুনব না।'

কী করবে ঋষা?

ছেষট্টি

বারিধারার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল।

সে ঠিক করেছিল, আজ কোনওভাবেই শ্রবণের সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। একটি নিটোল বৃষ্টিমুখর বিরহ ডে পালন করবে। এর জন্য মনকে কঠিন করতে হয়েছিল। শ্রবণ ফোন করবে, সে ধরবে না। মেসেজ করবে, রিপ্লাই দেবে না। হোয়াটসঅ্যাপে পিন হবে, হেলায় চোখ ফিরিয়ে নেবে। ফেসবুকেও যাবে না। তারপরেও সেই কঠিন মন গোলমাল করল। গোলমাল করল বড় অদ্ভুত একটা কারণে। এইসব বারিধারা কখনও বিশ্বাস করে না। আজও করেনি। তারপরেও নিজেকে পুরোপুরি সামলাতে পারল না। অবিশ্বাসের ঘাড়ে বিশ্বাস চেপে বসল। ভালোবাসার ক্ষেত্রে কত রকম যে কী হয়!

দুপুরের মেনুতে ছিল খিচুড়ি। বহুদিন পরে সবাই মিলে খাওয়া হল। যতই বৃষ্টি হোক, বিমলকান্তি অফিসে গিয়েছিলেন। লাঞ্চে এসেছিলেন, সবার সঙ্গে বসে খুশি মনে খেয়ে আবার চলেও গেছেন। খেতে বসার আগে মণিকুন্তলা বলেছিলেন, 'জ্যোতিষ্ক থাকলে বেশ হত। জলবৃষ্টির দিনে একটা পিকনিকের মতো হত। হ্যাঁ রে, ডাকবি নাকি? অফিস থেকে আসতে পারবে? ঘণ্টাখানেকের তো মামলা।'

বারিধারা বলল, 'না, মা। আজ সেনবাড়ির কোর কমিটি একসঙ্গে খাবে। পিতা-মাতা, আর তার দুই কন্যা। অন্য কাউকে ডাকা যাবে না।'

মেঘবতী ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'কেন? ও আমাদের বাড়ির কেউ নয়?'

বারিধারা টেনে টেনে বলল, 'অবশ্যই কেউ। জ্যোতিষ্কদা হচ্ছে সেনবাড়ির জামাই। সে তো কোর কমিটিতে নেই।'

মেঘবতী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'তোর যত সব গা জ্বালানো কথা। বাড়িতে আবার ওইসব কমিটি-ফমিটি কী?'

দিদির রাগ দেখে বারিধারা মুখ টিপে হেসে বলল, 'কোর কমিটি হল নিউক্লিয়াস বডি। বস্তুর একেবারে ভিতরের ব্যাপার। ধর বস্তুর মধ্যে যে অণু-পরমাণু আছে তাকেও যদি ভাঙতে থাকি...।'

মেঘবতী চোক কটমট করে বলল, 'তুই থামবি বৃষ্টি?'

বারিধারা হেসে বলল, 'আহা, রাগ করছিস কেন? বৃষ্টিতে ভেজবার পর সবসময় মন প্রসন্ন রাখতে হয়। নইলে বৃষ্টি দেবতা ক্রু[illegible]দ্ধ হন। ঠান্ডা লাগিয়ে হাঁচি সর্দি করিয়ে দেবেন।'

মেঘবতী তেড়েফুঁড়ে উঠে বলল, 'এবার কিন্তু আমি না খেয়ে চলে যাব।'

বারিধারা বলল, 'ঠিক আছে বাবা আমি চুপ করছি। তবে এটা মনে রাখিস কোর কমিটি ইজ কোর কমিটি। জামাইবাবু, মামাবাবুদের সেখানে অ্যালাউ নেই।'

মেঘবতী খেপে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মা, শুনতে পাচ্ছ? তোমার ছোট মেয়ে আমার বরকে কীভাবে অপমান করছে শুনতে পাচ্ছ? আমি কিন্তু সত্যি চলে যাব।'

মণিকুন্তলা রান্নাঘরে ফিনিশিং টাচে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বললেন, 'তোরা ঝগড়া না থামালে আমি এবার বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে যাব। দুটো ধেড়ে মেয়ে সারাক্ষণ খিচিরমিচির করছিস। তোরা কবে বড় হবি?'

বারিধারা বলল, 'রোদ উঠলে। আপাতত মেঘে-বৃষ্টিতে আমাদের ছোটই থাকতে দাও।'

খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা। মাছের ব্যাপারে দুই বোন একেবারে দুই মেরুতে। মেঘবতী যেমন মাছ ভালোবাসে, বারিধারা ঠিক উলটো। সে মাছ দেখলে আঁতকে ওঠে। কাঁটার ভয়ে। ক্লাস ফোরে গলায় কাঁটা

boierpathshala.blogspot.com

ফুটে গিয়েছিল, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তুলতে হয়েছিল। সেই থেকে মাছ দেখলেই দশ হাত দূরে। বুঝিয়ে, বকেও মণিকুন্তলা ছোট মেয়ের এই ভয় দূর করাতে পারেননি। তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়। আজও হয়েছে। ডিম ভাজা হয়েছে। কিন্তু মেঘবতী বোনকে ছাড়ল না। 'ইলিশ ছাড়া খিচুড়ি খাবি কী রে! তুই তো বিরাট গাধা রে বৃষ্টি!'

বারিধারা বলল, 'গাধা হই আর যাই হই, আমি বাবা অত কাঁটায় নেই। যদিও গন্ধটা মার্ভেলাস।'

বিমলকান্তি মাছ ভেঙে মুখে দিয়ে বললেন, 'বাবা বলতেন ইলিশ মাছের গন্ধ নিয়ে এক হাঁড়ি ভাত খেয়ে ফেলা যায়। একসময় দার্জিলিং যেতে হলে ফরাক্কায় নেমে পড়তে হত। তখনও ব্রিজ হয়নি। বাক্স-পেঁটরা নিয়ে লঞ্চে নদী পেরিয়ে আবার ট্রেন। নদীর এদিকেও দার্জিলিং মেল, ওদিকেও দার্জিলিং মেল। ফরাক্কায় নামতে রাত হয়ে যেত। লঞ্চঘাটায় সারি দিয়ে ভাতের হোটেল। হোটেল মানে ওই আর কী, ঝুপড়ির মতো। সেখান থেকে চিৎকার করত, গরম ভাত ইলিশ মাছ, গরম ভাত ইলিশ মাছ...। বাক্স পেঁটরা লটবহর নিয়ে ছুটে গিয়ে গরম গরম ভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল খেয়ে স্টিমার ধরতে ছুটতাম। আহা! দার্জিলিং বেড়ানোর প্যাকেজের মধ্যে এটা পড়ত। তোদের মাও খেয়েছে। মনে আছে মণি?'

মণিকুন্তলা প্লেটে আর এক হাতা খিচুড়ি নিয়ে বললেন, 'মনে নেই আবার? একবার খেতে খেতে দেরি হয়ে গেল, কাঁটা বেছে ইলিশ খাওয়া বলে কথা, তারপর ছুটলাম লঞ্চ ধরতে। পা পিছলে পড়লাম। ইলিশের কাঁটা যেন গলার বদলে পায়ে বিঁধল। ব্যথা রয়ে গেল তিনদিন। বাপ রে!'

সবাই হেসে উঠল। অতি সামান্য ঘটনা, তারপরেও কী যে ভালো লাগল। প্রিয়জনদের সঙ্গে থাকলে ছোটখাটো গল্পও মন ভরিয়ে দেয়। মনে হয়, একেই সুখ বলে। সিরিয়াস বিমলকান্তি সেনও আজ বহুদিন পরে যেন মন খুলেছেন। হাসি-ঠাট্টা করছেন।

গল্পের ফাঁকেই মেঘবতী তার বোনের প্লেটে সমানে কাঁটা বেছে মাছ দিয়ে গেছে। বারিধারাও অন্যমনস্ক হয়ে খেয়ে গেল।

বিমলকান্তি বললেন, 'রবিবার একটা নেমন্তন্ন আছে। অল্প সময়ের জন্য হলেও যেতে হবে।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'কীসের নেমন্তন্ন।'

বিমলকান্তি বললেন, 'প্রহ্লাদ ফ্ল্যাট কিনেছে। সেই ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশ। গৃহপ্রবেশ নয়। ফ্ল্যাট প্রবেশ।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'প্রহ্লাদ কে?'

'আমাদের অফিসের স্টাফ।'

মণিকুন্তলা অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি তো এ সব নেমন্তন্নে খুব একটা যাও না।'

বিমলকান্তি মুচকি হেসে বললেন, 'যাই না, কিন্তু এটায় যেতে হবে। কারণ আছে।'

বারিধারা ভুরু কুঁচকে বলল, 'বাবা, মনে হচ্ছে কোনও রহস্য আছে।'

বিমলকান্তি বললেন, 'হ্যাঁ আছে। প্রহ্লাদ রহস্য।'

মেঘবতী বললেন, 'প্রহ্লাদ রহস্য। সে আবার কী?'

বিমলকান্তি লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন, 'সে একটা ব্যাপার আছে। বলা যাবে না।'

বারিধারা বলল, 'বলে ফেলো বাবা। এরকম হেভি বৃষ্টির দিনে সব বলে ফেলতে হয়।'

বিমলকান্তি বললেন, 'ব্যাপারটা যে সত্যি নয়, মিথ্যে।'

বারিধারা হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমি আজীবন জানি/ সমস্ত কথাই সত্যি, সমস্ত কথাই মিথ্যে...শুধু/ সব কথা খুলে বলা ভালো।'

মেঘবতী বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা আবার কী!'

বারিধারা গম্ভীর মুখে বলল, 'বুঝলি না দিদি। এটা একটা কবিতার লাইন। কবিতার নাম শূন্যের বাঁশি।'

মেঘবতী ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুই আবার কবিতা লিখিস নাকি?'

বারিধারা বলল, 'কেন, লিখতে পারি না? তবে এই কবিতা আমার নয়। কবির নাম বিভাস রায়চৌধুরী।'

boierpathshala.blogspot.com

মেঘবতী ঠোঁট উলটে বলল, 'তাই বল। আমি তাই ভাবছিলাম, এত সুন্দর কথা তুই কীভাবে বানালি! ঠাট্টা তামাশা করা ছাড়া তোর তো কোনও গুণ নেই।'

বারিধারা চোখ বড় বড় করে দিদির দিকে ঘুরে বসল। মণিকুন্তলা বললেন, 'দেখো, দেখো, আবার দুজনে ঝগড়া করবার তাল করছে।'

বিমলকান্তি বললেন, 'এই প্রহ্লাদকে নিয়ে আমার একটা বিদঘুটে অসুখের শুরু হয়েছিল।'

মণিকুন্তলা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'অসুখ! কী অসুখ?'

বিমলকান্তি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'অনেকদিন আগে প্রহ্লাদ আমার কাছে এসেছিল। টাকা চাইতে। সেদিনে আমি প্রহ্লাদ হয়ে গিয়েছিলাম।'

বারিধারা চোখ কপালে তুলে বলল, 'মানে! কী বলছ বাবা! তুমি প্রহ্লাদ হয়ে গিয়েছিলে! এ কথার মানে কী?'

বিমলকান্তি সংক্ষেপে গোটা ঘটনা বললেন। সবাই চুপ করে শুনল।

বিমলকান্তি সেন মৃদু হেসে বললেন, 'চিন্তা নেই। বললাম তো ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। যেদিন থেকে বুঝতে পারলাম এটা কোনও অসুখ নয়, এটা আসলে আমার জীবনে একটা বাড়তি পাওনা ছিল সেদিন থেকে ফিলিংসটা আমার আর কখনও হয়নি। ওই যে বৃষ্টি তোর কবিতার মতো, যা সত্যি আবার যা মিথ্যেও। সম্ভবত গোটাটাই আমার মনের ভুল ছিল। সম্ভবত কেন? তাই হবে। মানুষের মনের ভিতর অনেকগুলো মন থাকে। কোনও কোনও মন হয়তো ঘুমিয়ে থাকে। আমরা তার খবরও পাই না। তাদের কেউ কেউ কোনও কোনও সময় জেগে ওঠে। আমার এটাই হয়তো সেরকম কিছু ছিল। অন্য মানুষ হয়ে যাওয়ার মন। কিছু সময়ের জন্য জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।'

মণিকুন্তলা কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। মেঘবতী বলল, 'বাবা, আমার ভয় করছে। তুমি কি আমার মনের কথা কিছু জানতে পেরেছ?'

বিমলকান্তিবাবু খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'কারও মনের খবরই আমি জানতে পারিনি। অন্য মানুষ হওয়া মানে তার মনের কথা জানা নয় মেঘ। তার চোখে পৃথিবীটা দেখা। এটারও মাঝে মাঝে দরকার আছে।'

বিমলকান্তি একটু থামলেন। তারপর হেসে বললেন, 'বাদ দাও এ সব ভারী কথা। যা ঘটবার ঘটে গেছে। এখন এভরিথিং ইজ নর্মাল। আমি এবার বেরোব। অফিসে মিটিং ডাকা আছে।'

মেঘবতী বাবার গাড়িতেই চলে গেল। মণিকুন্তলা বলেছিলেন, 'থেকে যা না। এই বৃষ্টি-বাদলার সময় কোথায় যাবি? রাতে জ্যোতিষ্ক ফেরবার সময় নিয়ে যাবে। এখান থেকে খেয়েও যাবে।'

মেঘবতী বলল, 'না মা, আজকাল বাড়ি বেশিক্ষণ ফাঁকা রাখতে ভয় করে। সেই ডাকাতির পর থেকেই...তার ওপর উনি তো বাড়িতে আর এক আর্টিস্টকে নিয়ে এসেছেন না। কুটকুটে নামের বালকটি এবার কোন কম্ম করে তার ঠিক আছে?'

মণিকুলন্তলা বড় করে নি:শ্বাস ফেলে বললেন, 'উফ! সব পাগলের পাল্লায় পড়েছি। একজন অন্য মানুষ হয়ে যায়, আরেকজন রাস্তা থেকে শিল্পী ধরে আনে। কী কুক্ষণে যে সেনবাড়িতে বিয়ে হয়েছিল।'

বারিধারা বলল, 'আর একজন পাগলের কথা তো বললে না মা! যে মহিলা শ্বশুরমশাইয়ের পাগল টাইপ প্রোজেক্টের যাবতীয় দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে বসে আছেন। মণিকুন্তলা সেন।'

মেঘবতী হেসে বলল, 'তোর মতো পাগলি কে আছে বৃষ্টি।'

বারিধারা চোখ গোল করে, গলা ভারী করে বলল, 'দিদি, কদিন পর থেকে অফিসে বসবি। সাবধানে থাকিস। দেখিস বাবা যেন তুই না হয়ে যায়। কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। বাবার যদি তোর মতো বুদ্ধি-টুদ্ধি হয়ে যায় সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে।'

boierpathshala.blogspot.com

মেঘবতী বোনের কথায় পাত্তা না দিয়ে মণিকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, আমার বিজনেসে জয়েন করবার তাগিদটা আরও বেশি করে ফিল করছি। বাবার সত্যি রেস্ট দরকার।'

দিদি বাবার সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজের ঘরে এল বারিধারা। খানিকক্ষণ থমকে থাকার পর বৃষ্টি আবার ঝিরঝির করে শুরু হয়েছে। জানালার একটা পাল্লা বন্ধ। বারিধারা জানালাটা পুরো খুলে দিল। বৃষ্টির ছাঁট আবার ঘরে ঢুকবে। ঢুকুক। আবার মা বকবে। বকুক। মেঘে মেঘে আকাশটা বড্ড সুন্দর হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, দুনিয়ার যাবতীয় মন কেমন করা মেঘ বারিধারা সেন নামে এক ছটফটে তরুণীর সঙ্গে ছুটে ছুটে দেখা করতে এসেছে। তার সঙ্গে কথা বলছে।'

'ওগো মেয়ে, তুমি কেমন আছ?'

'ভালো আছি, খুব ভালো আছি। তোমাদের খুব সুন্দর লাগছে।'

'ওগো মেয়ে, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি কি জানো তুমিও খুব সুন্দর? তুমি যে মেঘ রঙের শ্লিভলেস ম্যাক্সিটা পরে আছ তাতে তোমাকে শুধু সুন্দর লাগছে না, খুব আকর্ষণীয় লাগছে। যে কোনও পুরুষ তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। তুমি কি সেটা জানো?'

বারিধারা মনে মনে হেসে ফিসফিস করে বলল, 'না জানি না। তুমি কি পুরুষ?'

মেঘ বলল, 'না জানাই ভালো। যে সুন্দর সে নিজের রূপের কথা কখনও জানে, অন্যের সৌন্দর্য খোঁজে। আমরা যার কাছে যাই তখন তেমন থাকি। এখন যেমন তোমার কাছে এসেছি। তোমার সুন্দর চেহারা দেখে পুরুষ হওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।'

'তোমরা খুব দুষ্টু তো।'

'তোমাকে দেখে দুষ্টু না হয়ে থাকতে পারছি না। এটা যদি পাহাড় হত, জানলা দিয়ে ঠিক তোমার ঘরে ঢুকে যেতাম।'

বারিধারা হেসে উঠল। বলল, 'আচ্ছা, পাহাড়ে যখন বেড়াতে যাব, তখন আসবে।'

'ধন্যবাদ সুন্দরী।'

জানলা থেকে নিজের খাটের কাছে এল বারিধারা। এখন কী করবে? বই পড়বে? নাকি কম্পিউটার চালিয়ে সিনেমা দেখবে? চাদর মুড়ি দিয়ে একটা ঘুম দিলে কেমন হয়? বারিধারা ধপ করে শুয়ে পড়ল। বৃষ্টিতে ভেজা, ইলিশ সহযোগে খিচুড়ি ভক্ষণ আর বাবার গা-ছমছমে গল্পের পর দিবানিদ্রা জমবে। তার বয়সি মেয়েরা দুপুরে ঘুমনোর কথা ভাবতেই পারে না। ভুঁড়ি হয়ে যাবে। বিয়ের জন্য বর পাওয়া যাবে না। জিমে দৌড়তে হবে। তার এ সব চিন্তা নেই। তার ছিপছিপে চেহারায় ভুঁড়ি হওয়ার কোনও চান্স নেই। জীবন থেকে জিমের খরচ বেঁচে গেল। তা ছাড়া ভুঁড়ি হলেই বা কী? তার তো বিয়ের চিন্তা নেই। একটা হাঁদা ছেলে তাকে বিয়ে করবার জন্য বসে আছে। শ্রবণ চাকরিটা শুরু করলে বিয়ের জন্য চাপ দেবে। দিক গে, আপাতত বিয়ের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আগে নিজের একটা কিছু হোক। ইউনিভার্সিটির রেজাল্ট বের হলে এম ফিল, রিসার্চের ব্যাপার আছে। তারপর নানারকমের পরীক্ষা। কলেজে চাকরির হ্যাপা আছে। অনেক সময় লাগে। শ্রবণ কি এত ধৈর্য ধরতে পারবে? হয়তো নানা কথা বলবে।

'আমার সঙ্গে মুম্বাই চলো বারি। ওখানেই লেখাপড়া করবে। তারপর না হয় পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে কলেজে পড়াবে?'

সে হয়তো আপত্তি করবে। বলবে, 'খেপেছ। ওখানে গিয়ে আমি কী করব?'

হাঁদাটা শুনবে না। ঘ্যান-ঘ্যান করেই যাবে। হয়তো বলবে, 'কেন ধারা, মুম্বাইতে কি কলেজ নেই? ওখানে কি কেউ পড়ায় না?'

তখন রেগে গিয়ে বলতে হবে, 'না, পড়ায় না। ওখানে কোনও কলেজ নেই।'

'আমি একা একা কী করে থাকব বারি? তুমি ব্যাপারটা সিরিয়াসলি বোঝো ধারা।'

'আমি জানি না তুমি কী করে থাকবে। একটা ধেড়ে ছেলে!'

boierpathshala.blogspot.com

আওয়াজ করেই হেসে ফেলল বারিধারা। চাপা গলায় মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। শীত শীত করছে। বারিধারা হাত বাড়িয়ে চাদরটা টানতে গেল, আর তখনই ঘটনা ঘটল।

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। হঠাৎ কোনও দু:সংবাদ শুনলে যেমন হয় ঠিক সেরকম। বারিধারা ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। কী হল? কেন এমন হল? নিমেষে বারিধারার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। শ্রবণের কিছু হয়নি তো? নিজেকে শান্ত করতে গিয়ে বারিধারা বুঝতে পারল তার বুকের ভিতর এখনও চাপা কাঁপুনি হচ্ছে। বুকের ভিতর? নাকি মনের ভিতর? হঠাৎ এমন হল কেন! শ্রবণের বিপদের কোনও ইনটিউশন সে অনুভব করল? এ কখনও হয়? অসম্ভব। এ সব উদ্ভট ব্যাপারে সে বিশ্বাস করে না।

তারপরেও বারিধারা খাট থেকে নেমে খানিকটা টলোমেলো পায়ে টেবিলের কাছে এল। মোবাইলটা তুলে শ্রবণের নম্বর টিপল। ফোন বেজে যাচ্ছে। বারিধারা বুঝতে পারল, তার কপালে ঘাম জমছে।

সাতষট্টি

বারিধারা চোখ বুজে আছে।

তার কি ঘুম পাচ্ছে? না ঘুম নয়, ক্লান্তি। তার শরীর জুড়ে ক্লান্তি। ইচ্ছে করছে বারান্দায় একটা কোণ দেখে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ি। অল্প শীত শীত করছে। খানিক আগে পর্যন্তও বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধে পর্যন্ত মুষলধারে পড়েছে। তারপর বেগ কমলেও ঘ্যানঘ্যানে, একঘেয়ে ভাবে চলেছে একটানা। খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, বৃষ্টি নয়, কান্না। এই কান্না কোনওদিন থামবে না। যে মেঘ বৃষ্টি নিয়ে দুপুর পর্যন্ত আনন্দ, হইহই হয়েছে তা যে এতটা বিশ্রী আর ভয়ংকর হয়ে উঠবে কে ভেবেছিল! ঘণ্টাখানেক হল বৃষ্টি থেমেছে। তবে এখান-ওখান থেকে জমা জল পড়বার বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে। বারান্দাটা একদিকে খোলা। খানিক আগে পর্যন্ত জলের ছাঁট এসেছে, এখন ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। খানিকক্ষণ হল আকাশ দেখেছে বারিধারা। অন্ধকারেও বোঝা গেছে, মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে। আবার ঢালবে? কে জানে ঢালতে পারে।

এখন রাত কত? দুটো না আড়াইটে। বেশিই হবে। দিদি যখন বাড়ি গেল তখনইতো দুটোর কাছাকাছি বাজে। যাওয়ার আগে কাছে এসে মাথায় হাত রাখল। নরম গলায় বলল, 'বাড়ি যাবি বৃষ্টি? বাড়ি গিয়ে একটু শুয়ে নিবি? অনেক রাত হয়ে গেছে। দুটো বাজাতে চলল।'

বারিধারা মাথা নেড়েছিল। বলেছিল, 'আমি যাব না। তুই যা দিদি। খুব ধকল গেছে তোর।'

মেঘবতী শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল। বলল, 'বাড়ি চল। আবার কাল সকাল হতেই চলে আসবি। একটু না ঘুমোলে শরীর যে খুব খারাপ লাগবে।'

বারিধারা এবার শক্তভাবে বলল, 'আমার কিছু হবে না। আমি রাত জাগতে পারি।'

মেঘবতী বোনের পিঠে হাত রেখে বলল, 'এখানে আর থেকে কী করবি? ডাক্তার, নার্স আছে, যদি কিছু লাগে তারাই দেখবে।'

বারিধারা এবার কঠিন গলায় বলল, 'আমি জানি তারাই দেখবে। তার পরেও আমি যাব না। আমি এখানেই থাকব।'

দূরে দাঁড়িয়েছিল জ্যোতিষ্ক। এবার সে এগিয়ে আসে। বিরক্ত গলায় স্ত্রীকে বলল, 'তোমার কী সমস্যা হচ্ছে বলো তো! বৃষ্টি যদি থাকতে চায় থাকুক না। খানিক পরেই তো সকাল হয়ে যাবে। তুমি কেন ওকে বারণ করছ?'

মেঘবতী লম্বা করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'না, আমি বারণ করছি না। বলছিলাম, বাড়িতে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে একটু রেস্ট নিলে পারত। কাল সকালেও তো থাকতে হবে। তা ছাড়া...তা ছাড়া বাবা-মা-ও চিন্তা করছে। মা একটু আগে ফোন করেছিল। জেগে বসে আছে।'

boierpathshala.blogspot.com

জ্যোতিষ্ক আরও বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার মা কেন জেগে আছেন জানি না, বৃষ্টি থাকতে চাইছে থাকুক। তুমি চলো।'

মেঘবতী বলল, 'বৃষ্টি এত রাতে হাসপাতালে একা থাকবে?'

বারিধারা মলিন হেসে বলল, 'হাসপাতালে একা আবার কী? হাসপাতালে দিন-রাত বলেও কিছু হয় না। তুই নিশ্চিন্তে যা। আমি ছোট মেয়ে নই দিদি। তোরই তো বোন।'

মেঘবতী বোনের পাশে বসে বলল, 'তা হলে আমিও থাকব। তোকে একা ছাড়ব না।'

জ্যোতিষ্ক এবার রেগে গেল। বলল, 'উফ তোমাকে নিয়ে পারা গেল না। আমি বৃষ্টিকে একা ফেলে চলে যাব ভাবলে কী করে! তোমাকে বাড়িতে ছেড়ে আমি চলে আসছি। চলো, দেরি কোরো না।'

মেঘবতী ফের উঠে দাঁড়াল। তাকে বাড়ি যেতেই হবে। বাড়ি ফাঁকা রয়েছে।

'ঠিক আছে। বৃষ্টি, আমি ওর হাত দিয়ে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেয়ে নিস লক্ষ্মী মেয়ে। অনেকক্ষণ খালি পেটে আছিস। এর পর অসুস্থ হয়ে পড়বি।'

বারিধারা খুব ভালো করেই জানে, জল বা চা ছাড়া কিছুই সে এখন খেতে পারবে না। খাবার কথা ভাবলেই বমি পাচ্ছে। হাসপাতালের নীচ থেকে এক বোতল জল কিনে নিয়েছে। দিদিকে বলে লাভ নেই। মাথা নেড়ে সায় দেওয়াই ভালো।

জ্যোতিষ্ক বারিধারাকে বলল, 'তুমি ভিজিটরদের বসবার জায়গাতেই থেকো বৃষ্টি। আমি তোমার দিদিকে বাড়িতে নামিয়েই চলে আসছি। রাস্তায় জল জমে না থাকলে ম্যাটার অফ ফর্টি-ফর্টি ফাইভ মিনিটস।'

বারিধারা বলল, 'হাতের কাছে পেলে গায়ের একটা হালকা চাদর পাঠিয়ে দিস। শীত শীত করছে।'

জ্বর আসেনি তো? যা ভেজা হয়েছে, তাতে জ্বর আসা অসম্ভব কিছু নয়। মেঘবতী উদ্বিগ্ন হয়ে বোনের কপালে গলায় হাত দিল। না, গা ঠান্ডা।

বারিধারা দিদির হাত ধরে বলল, 'তুই যা, আমার জন্য এত চিন্তা করতে হবে না।'

মেঘবতী বোনের জন্য যতই চিন্তা করুক, সেই সবথেকে মাথা ঠান্ডা করে কাজ করেছে। শ্রবণের দাদা হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অপারেশনের পর ভাইয়ের অবস্থা 'ক্রিটিকাল' শুনে প্রেশার বেড়ে যায়। এমারজেন্সিতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার পর্যন্ত দেখাতে হয়। শ্রবণের বউদি এমনিতেই নার্ভাস প্রকৃতির মহিলা। দেওরের ঘটনা জানবার পর থেকেই হাত-পা কাঁপছিল। অপারেশনের সময় ও.টি.-র বাইরে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্নাকাটিও করছিল। বারিধারা তার হাত চেপে ধরেছিল। ফিসফিস করে বলেছিল, 'শান্ত হোন। শান্ত হোন। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সব ঠিক হয়নি। ও.টি. থেকে বেরিয়ে ডাক্তার যখন থমথমে গলায় বললেন, 'অপারেশন সাকসেসফুল। ব্রেন থেকে ব্লাড ক্লট আমরা বের করে দিয়েছি। কিন্তু পেশেন্টের কন্ডিশন ভালো নয়। কাল সকালের আগে কিছু বলতে পারব না।'

এরপরই শ্রবণের দাদা মাথা ঘুরে পড়ে যান। স্বামীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় মহিলা আরও ঘাবড়ে গেছে। ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ খাইয়ে মেঘবতী তাকে বলে, 'আপনি ওনাকে নিয়ে বাড়ি চলে যান। একেই তো শ্রবণের এই অবস্থা, এরপর উনি যদি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন আর এক বিপত্তি হবে। আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা তো রইলাম। ফোন করে খবর দেব।'

মহিলা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'শ্রবণের বাবা-মা-ও আসতে চাইছেন। বাড়ির সামনে এত জল জমে গেছে যে বেরতে পারছেন না। আমরা দুজনে কোনওরকমে জল ঠেলে এসেছি।'

মেঘবতী বলল, 'খবরদার ওনাদের এখন হাসপাতালে আসতে দেবেন না। বয়স্ক মানুষ জলে পড়ে গেলে সমস্যা হবে। জল নামলে আসবেন। আর এখন এসেই বা কী হবে? অপারেশন হয়ে গেছে, পেশেন্ট আই সি সি ইউ-তে। দেখাও তো করতে দেবে না। এখন তো শুধু খবর নেওয়া। কাল সকালের আগে কোনও খবর হবে না। আপনারা চলে যান।'

boierpathshala.blogspot.com

হাসপাতালে এসে ছোটাছুটি করে মেঘবতীই সব করেছে। শ্রবণ তখন এমার্জেন্সিতে শুয়ে। ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে বললেন, 'এখনই মাথায় স্ক্যান করতে হবে। মনে হচ্ছে মাথার ভিতরে কোনও ইনজুরি হয়েছে। তা হলে ইমিডিয়েট ও.টি.-তে নিতে হবে।'

বারিধারা টেলিফোনে শ্রবণের বউদিকে ধরে।

'কী হয়েছে!'

'ঠান্ডা মাথায় শুনুন। শ্রবণের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

মহিলা চিৎকার করে ওঠে, 'অ্যাক্সিডেন্ট! সে কী! কী করে হল? কেমন আছে শ্রবণ?'

বারিধারা গলা নামিয়ে বলেন, 'টেনশন করবেন না বউদি। শ্রবণ ভালো আছে। খবর পেয়ে আমি আর আমার দিদি হাসপাতালে এসেছি। তবে এখনই একটা অপারেশন করবার দরকার হতে পারে। আপনি দাদাকে নিয়ে চলে আসুন।'

মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কী করে এমন হল!'

বারিধারা শান্তভাবে বলল, 'আমিও পুরোটা জানি না। শ্রবণ গুছিয়ে বলতে পারছে না। ওর সঙ্গে যে দুজন ছিল, তাদের একজনের পায়ে চোট হয়েছে। ভেঙে গেছে মনে হয়। অন্যজন খুব শক পেয়েছে। সে এখনও ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার কাছ থেকে ঘটনা জানবার চেষ্টা করছি। তবে তার আগে শ্রবণের ট্রিটমেন্ট শুরু করা দরকার। আপনারা আসুন তারপর সবটা বলব।'

এর পর মোবাইলে বারিধারার সঙ্গে শ্রবণের দাদার দফায় দফায় কথা হল। রাস্তায় এত জল জমেছে যে কিছুতেই তারা হাসপাতালে পৌঁছতে পারছে না। যে ট্যাক্সিটায় উঠেছিল সেটা রাস্তাতেই খারাপ হয়ে যায়। একটা অটোকে হাতেপায়ে ধরে রাজি করিয়েও লাভ হয়নি। সেটাও গর্তে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে বাস পেয়ে উঠেছে, সেই বাস রুট বদলেছে এবং জ্যামে আটকে পড়েছে। সারাদিনের বৃষ্টি কলকাতা শহরটাকে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে তো অপেক্ষা করা যায় না। শ্রবণ বমি করছে। মেঘবতী দ্রুত ব্যবস্থা করতে থাকে। খানিকক্ষণের মধ্যে জ্যোতিষ্কও চলে আসে। স্ক্যান করে দেখা যায়, শ্রবণের মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, অপারেশনের সময় ঠিক করা, ব্ল্যাডের ব্যবস্থা করা, মেডিসিন জোগাড় সবই মেঘবতী করেছে। ওটিতে নিয়ে যাওয়ার সামান্য কিছু আগে শ্রবণের দাদা-বউদি পৌঁছে যায়।

এর মধ্যে শ্রবণের সঙ্গীরা ঘটনা জানায়। তারা শ্রবণের অফিসের সঙ্গে যুক্ত। একজন ক্যামেরা চালায়, অন্যজন তাকে সাহায্য করে। শ্রবণের কোনও একটা অ্যাড ফিল্মের জন্য বৃষ্টির কিছু দৃশ্য দরকার ছিল। দিনটার সুযোগ নিয়েছিল ওরা। গাড়ি নিয়ে বারুইপুরের কাছে শুটিং করতে যায় সকালে। একেবারে হঠাৎই ঠিক করে। অল্প সময়ের কাজ। ভালোভাবে কাজ শেষ করে ফিরেও আসছিল দুপুরের পর। আসবার সময় বাইপাসে গাড়ির চাকা পিছলে যায়। ধাক্কা মারে সামনের একটা বাসে। গাড়ির তেমন ক্ষতি হয় না। কিন্তু একজনের পায়ে খুব জোর লাগে। শ্রবণের মাথাটাও পাশের জানলায় ঠুকে যায়। প্রথমে কিছু মনে হয়নি। মাথা থেকে রক্ত বের হয়নি। ফুলেও যায়নি। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে প্রবল যন্ত্রণা শুরু হয়। শ্রবণ তার সঙ্গীদের বলে, খুব কষ্ট হচ্ছে, হাসপাতালে যেতে হবে। গাড়ি নিয়ে তারা হাসপাতালের আসে। ততক্ষণে শ্রবণ জ্ঞান হারাতে শুরু করেছে। এমন সময় শ্রবণের মোবাইলে বারিধারার ফোন বাজতে থাকে। ক্যামেরাম্যান ছেলেটি বারিধারাকে চেনে। সে ফোন নিয়ে বারিধারাকে হাসপাতালে চলে আসতে বলে।

হাসপাতালের এই দিকটা মূলত শুনশান। লম্বা করিডরে অনেক দূরে দূরে একটা দুটো বসবার জায়গা। ভিজিটিং আওয়ারের পর এসব বেঞ্চে বাইরের কাউকে বসতে দেওয়া হয় না। এত রাতে বারণ করবার নেই। এমার্জেন্সি ভিজিটরদের যেখানে অপেক্ষা করবার কথা সেখান থেকে বারিধারা এদিকটায় চলে এসেছে। করিডর শেষ হলেই আই সি সি ইউ। কাচের দরজা বন্ধ। ভিতরে পর্দা টানা। দরজার মাথায় লাল আলো জ্বলছে। কাচের গায়ে লেখা, 'নো, অ্যাডমিশন'। ওখানেই শ্রবণকে রাখা হয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

কাচের দরজার আওয়াজ শুনে বারিধারা চোখ খুলল। সাদা পোশাক পরে বয়স্ক একজন নার্স বেরিয়ে আসছেন। বারিধারা উঠে দাঁড়াল। একটু এগিয়ে যেতে নার্স থমকে দাঁড়ান।

'কী ব্যাপার?'

বারিধারা কাঁপা গলায় বলে, 'ওখানে আমাদের পেশেন্ট আছে। রাতে অপারেশন হয়েছে। নাম শ্রবণ রায়। তিনি কেমন আছেন একটু বলতে পারেন দিদি?'

নার্স মহিলা মোটার দিকে। চোখেমুখে রাগ। এত রাতে ডিউটি করতে হচ্ছে বলে সম্ভবত বিরক্তও। বারিধারার কথার জবাবে খুব শান্তভাবে বললেন, 'আপনি কি হাসপাতালে নিয়মকানুন কিছু জানেন না? জানেন না এত রাতে পেশেন্টদের খবর দেওয়া হয় না? যদি দেওয়ার দরকার পড়ে আমরাই যোগাযোগ করব। জানেন না?'

বারিধারা অস্ফুটে বলল, জানি। কিন্তু খুব চিন্তায় রয়েছি।'

'হাসপাতাল তো নাটক বা সিনেমা হল নয়। এখানে আপনি আনন্দ করতে আসেননি। এটা তো চিন্তারই জায়গা।'

বারিধারা বলল, 'সরি দিদি।'

নার্স মহিলা এবার কড়া গলায় বললেন, 'আপনি এতদূর পর্যন্ত এসেছেন কেন? এই ফ্লোরে আপনাকে উঠতে দিল কে? লিফটে সিকিউরিটি নেই।'

সত্যি নেই। গেটের সিকিউরিটি ঘুমোচ্ছে। লিফটম্যান একবার চোখ তুলে তাকিয়েছিল। এত রাতে যখন একটি সুন্দরী তরুণী ওপরে উঠছে নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া খুব সিরিয়াস হলে তো অনেক সময় ওয়ার্ড থেকে ডেকেও পাঠানো হয়। সম্ভবত এই সব ভেবে আর আটকায়নি।

বারিধারা রাগী নার্স মহিলাকে কী বলবে বুঝতে পারল না। কিছু বলবার মতো মনের অবস্থাও তার নেই। চুপ করে থাকে। নার্স বলেন, 'এটা আপনি অন্যায় কাজ করেছেন। হয় আপনি চলে যান, নয় সিকিউরিটিকে বলছি।'

বারিধারা ক্লান্ত গলায় বলল, 'প্লিজ দিদি। আমাকে এখানে একটু বসতে দিন। আমি দূরে ওই বেঞ্চে বসে থাকব। কাউকে ডিসটার্ব করব না।'

নার্স মহিলা একটু থমকে গেলেন, বললেন, 'পেশেন্ট আপনার কে হন?'

বারিধারা চুপ থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মহিলার চোখে চোখ রেখে জোর গলায় বলল, 'আমার বন্ধু হয়। আমরা বিয়ে করব।'

নার্স মহিলা ভুরু কুঁচকে বারিধারার দিকে তাকালেন। তার চোখ বলে দিচ্ছে, বারিধারার এই উত্তরে তিনি থমকে গেছেন। থমকে যাওয়ারই কথা। এখন সরাসরি ভালোবাসায় পরিচয় দেওয়ার জোর কতজনের আছে? তাও একটা কমবয়সি মেয়ে। মহিলা হাত দিয়ে নিজের গাল মুছলেন।

'পেশেন্টের নাম কী বলছেন?'

বারিধারা আগ্রহ নিয়ে বলল, 'শ্রবণ রায়। হেড ইনজুরি। ব্লাড বের করা হয়েছে।'

নার্স মহিলা একটু চুপ করে থাকলেন। নরম গলায় বললেন, 'আপনার নাম কী আমি জানতে পারি।'

'আমি বারিধারা।'

নার্স আবার একটু চুপ করে রইলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'বা:, সুন্দর নাম। আমার যতদূর মনে পড়েছে, আমি ভিতরে যেসব পেশেন্ট দেখছি তার মধ্যে শ্রবণ নামে একজন আছেন।'

বারিধারা উত্তেজিত হয়ে দু'পা এগিয়ে যায়। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।

'কেমন আছে? কেমন আছে শ্রবণ?'

রাগী মহিলা এবার একটা অদ্ভুত কাজ করেন। হাত বাড়িয়ে বারিধারার বাঁ-কাধে হাত রাখেন। ভীষণ নরম গলায় বলেন, 'মন শক্ত করুন বারিধারা। পেশেন্টের অবস্থা ভালো নয়।'

boierpathshala.blogspot.com

কথা শেষ করে হাত দিয়ে মুখ মুছে, জুতোয় খটখট আওয়াজ তুলে করিডর ধরে এগিয়ে গেলেন। সেই আওয়াজে যেন মৃত্যুর পদশব্দ!

শরীর কাঁপছে বারিধারার। সে কোনওরকমে কাছের একটা বেঞ্চে বসে পড়ল। নার্স তাকে এ কী বলে গেল! শ্রবণের অবস্থা কি খারাপ হচ্ছে? সে কি বাঁচবে না? ভাবতেও পারছে না বারিধারা। ঝুঁকে পড়ে দু-হাত দিয়ে মুখ চেপে বসল। সে কি কাঁদবে? চিৎকার করে কেঁদে উঠবে? অনেকক্ষণ ধরেই সে কাঁদছে। লুকিয়ে কাঁদছে। কেউ যেন দেখতে না পায়। কান্নার পর চোখে মুখে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছে। এই কান্না তো শ্রবণের জীবন-মৃত্যুর কান্না নয়, এ তার ভালোবাসার কান্না। এ কান্না কাউকে দেখাতে নেই। বারিধারা মুখ থেকে হাত সরাল। না, কাঁদবে না। কিছুতেই কাঁদবে না। হাওয়া দিচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া। গোটা শরীর অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে। ঘোরের মতো লাগছে। এই ঘোরের মধ্যেই সে এক বুড়ো মানুষের গলা শুনতে পেল। সেই গলায় অল্প অল্প হাসি।

'কীরে দিদিভাই, কেমন আছিস?'

'দাদু, তুমি! তুমি কোথা থেকে এলে!'

'কোথা থেকে এলাম মানে! কমলকান্তি সেন এখন সব জায়গায় থাকে।'

বারিধারা ঘোরের মধ্যেই ডুকরে কেঁদে ওঠে।

'দাদু, তুমি এসো। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো। মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে আদর করো।'

'দ্যাখ দেখি কাণ্ড! বোকা মেয়ে একটা। এই তো আমি তোর মাথায় হাত রেখেছি। তুই না আমার সাহসী নাতনি? বীর নাতনি। ছি:, সাহসী মেয়ে এত ভেঙে পড়ে?'

'দাদু, শ্রবণ মারা যাচ্ছে।'

'জন্ম-মৃত্যু সব এক বৃষ্টি। কেউ বেঁচে থেকেও মরে আছে, কেউ আবার মরে গিয়েও বেঁচে আছে। তোরা তো তোদের মায়ের মতো গান করতে শিখলি না, শিখলে জাতনিস, তবুও শান্তি, তবু অনন্ত জাগে।'

'শ্রবণ না থাকলে আমিও একা হয়ে যাব দাদু। আমি বাঁচতে পারব না।'

'পাগল মেয়ে একটা। বৃষ্টি তুই খুব বোকা হয়ে গিয়েছিস। হওয়াটাই স্বাভাবিক। মোস্ট ইনটেলিজেন্ট লিস্ট নিয়ে যে আর মাথা ঘামাস না। সবাই অমন ভাবে। ভাবে ভালোবাসার মানুষ চলে গেলে আর বাঁচব না। তারপরও বাঁচতে হয়। জীবন খুব নিষ্ঠুর, নির্মম রে পাগলি।'

'সত্যি বলছি দাদু, শ্রবণের যদি কিছু হয়...সে যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায়...।'

'মৃত মানুষরা কাউকে ছেড়ে যায় না রে বৃষ্টি। তারা জীবিতদের পাশে ঘুরে বেড়ায়। তারা হাসে কাঁদে আর বারবার বলে আমায় ভালোবাস, আমায় এমন ভালোবাস যেন আমি আবার ফিরে আসি। আবার ফিরে আসি তোমার কাছে। জীবিতরা সেকথা শুনতে পায় না।'

'দাদু, কাল দুপুরে আমার বুকের ভিতর হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, শ্রবণের কোনও বিপদ হয়েছে। আমি ফোন করলাম। যদি ফোন না করতাম তাহলে আরও দেরি হয়ে যেত।'

'মৃত্যু তার দায়িত্ব পালন করে। তোকে এখানে ডেকে খেলা করছে বলতে পারিস। তোরা আধুনিক সময়ের ছেলেমেয়ে এসব তো মানিস না।'

'দাদু, তুমি এসব কী বলছ!'

'কাঁদ বৃষ্টি। যত কাঁদবি, ভাব-ভালোবাসা তত শক্ত হবে। জীবনে হবে, মৃত্যুতেও হবে। ভয় কীসের? কেউ তোকে ছেড়ে যাবে না। আমি কি গিয়েছি? তুই খুব ক্লান্ত। তুই ঘুমো। অনেক যুদ্ধ বাকি আছে তোর। অনেক লড়াই।'

ধড়ফড় করে বসে বারিধারা। জ্যোতিষ্কদা, তার পিঠে হাত রেখেছে।

'উফ এখানে বসে আছ! আমি তো গোটা হাসপাতাল খুঁজে ফেললাম।'

boierpathshala.blogspot.com

লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়াল বারিধারা। জ্যোতিষ্ক অবাক হয়ে বলল, 'এ কী তুমি কাঁদছিলে নাকি! বোঝো কাণ্ড!'

বারিধারা তাড়াতাড়ি চোখ মুছল আর তখনই সে বুঝল, ভোর হচ্ছে! আলো ফুটছে। নরম আলোয় চারপাশ জেগে উঠেছে। তবে কি মেঘ কেটে গেল?

'বেঞ্চে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'বেশ করেছিলে। চলো নীচ থেকে চা খেয়ে আসবে। তার আগে এই চাদরটা গায়ে দাও। তোমার দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

বারিধারা কিছু একটা বলতে গেল। বলতে পারল না। আই সি সি ইউয়ের কাচের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন সেই রাগী নার্স। তিনি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন। সারা রাত রোগী সেবা করে পরিশ্রান্ত। এবার তাঁর ছুটি।

মহিলা বারিধারা আর জ্যোতিষ্কর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'বারিধারা, কাল সারা রাত আপনি হাসপাতালের নিয়ম ভেঙেছেন। আজ সকালে আমি ভাঙব। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। নিয়ম না থাকলেও আমি আপনাকে আই সি সি ইউয়ের ভিতরে নিয়ে যাব। শ্রবণ রায়ের জ্ঞান ফিরেছে।'

জ্যোতিষ্ক তাড়াতাড়ি বলে, 'আমিও যাব।'

ভারীক্কি চেহারার নার্স কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'না। আর কেউ নয়। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।'

বারিধারা এগিয়ে যাচ্ছে। তার দু'চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। এদিক-ওদিক একজন দুজন করে জেগে উঠছে। তাদের মধ্যে যারা বারিধারাকে দেখতে পাচ্ছে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আহা রে! কী সুন্দরই না লাগছে মেয়েটাকে!

হাঁটতে হাঁটতেই মুখ তুলল বারিধারা। বারান্দার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। মেঘহীন নীল আকাশ। একটু পরে রোদ উঠবে।

————

boierpathshala.blogspot.com